নাটমঞ্চ নাট্যরূপ

পবিত্র সরকার

প্রমা প্রকাশনী
৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭
৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

NATMANCHA NATYARUP

[A collection of articles on dramaturgy and Bengali theatre]

by

Pabitra Sarkar

প্রথম সংস্করণ | ১ বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ

প্রমা প্রকাশনী

৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ | কলকাতা-১৭

মুদ্রাকর

কালাচাঁদ ঘোষ

বাণী আর্ট প্রেস

১১, নরেন সেন স্কোয়ার | কলকাতা-৯

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭/১, বিধান সরণী | কলকাতা-৬

৺অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

দীপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের আর একটি বই

বাংলা বলো

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আক্ষরিকভাবে এটি আমার প্রথম বই নয়। তবে আ[illegible] ও ব্যবহার হিসেবে এ আমার প্রথম বই। বিশ্ব-চরাচরের জন্য এ কথাও রেকর্ড করে রাখা দরকার যে, শ্রীমান সুরজিৎ ঘোষের প্ররোচনা, উৎসাহ ও প্রশ্রয়েই এটি বেরোতে পারল। নতুন ও পুরোনো কয়েকটি রচনার সংকলন এটি। দুটি ছাড়া বাকিগুলি আগে প্রকাশিত হয়েছে। 'দশরূপক' বিষয়ক লেখাটি 'বহুরূপী'তে (১৯৬৮, অক্টোবর) এবং 'প্রাচীন ভারতীয় নাটমঞ্চ'-ও ওই পত্রিকাতেই (১৯৬৯, জুলাই) বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য বিষয়ক লেখাটি 'প্রমা'-তে (১৯৮০, অক্টোবর,) আর "অভিনয়, প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথ" 'বহুরূপী'-তে (১৯৬৭, অক্টোবর) প্রকাশিত হয়। তবে দ্বিতীয়টি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ' নামক সংকলনে (১৯৭৮) আরেকবার গৃহীত হয়েছিল। "ভারতের জাতীয় নাট্যরূপ" 'প্রমা'য় (১৯৭৯, অক্টোবর), আর থিয়েটার বিষয়ক লেখাটির একাংশ—প্রসোনিয়াম ও অঙ্গন মঞ্চের বিতর্ক—'থিয়েটার বুলেটিন' পত্রিকার 'থার্ড থিয়েটার বিশেষ সংখ্যা'য় (জুলাই-আগস্ট, ১৯৮০)। সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের এই উপলক্ষ্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। দুজনকে এসব জানানোর উপায় নেই। এক ৺গঙ্গাপদ বসু; দুই ওই 'অরণি'র সম্পাদক আমার প্রাক্তন ছাত্র তিমিরবরণ সিংহ। একটি বিশেষ রাজনীতি বেছে নেওয়ার অপরাধে বহরমপুর জেলে তিমিরের মুখটি অক্ষত রেখে দেহের বাকি অংশ ভেঙেচুরে দেওয়া হয়েছিল।

আগের লেখাগুলির প্রসঙ্গ নির্দেশ সবসময় পূর্ণাঙ্গ নয়—তখন এ সম্বন্ধে বোধই ছিল কাঁচা। গ্রুপ থিয়েটার বিষয়ক লেখাটি আবার একটু informal। তার ভাষারীতি ও বানানও অন্য প্রবন্ধগুলির চেয়ে সামান্য আলাদা। প্রুফ সংশোধন বিষয়ে লেখকের দীর্ঘদিনের অহংকার এ বইয়ে চূর্ণ হয়েছে, তাই একটি শুদ্ধিপত্র দিতেই হল।

থিয়েটারের বন্ধুরা এক সময় আমার কয়েকটি নাট্য সমালোচনা পড়ে সোৎসাহে অনুমোদন করেছিলেন। ভেবেছিলাম তার কয়েকটি জুড়ে দেব এ বইয়ে। স্থানাভাবে একটি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এ সমালোচনাটি শেষ মুহূর্তে হাতের কাছে পাওয়া গেল বলেই এটি দেওয়া, নইলে এটি আমার করা সবচেয়ে ভালো সমালোচনা, এমন দাবি করি না।

এ বই বেরোবে শুনে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন। রবীন্দ্র ভারতীর বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, অগ্রজস্থানীয় সহকর্মী

ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ড. মদনমোহন গোস্বামী এবং শঙ্খ ঘোষ, বন্ধুবর শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শেখর সমাদ্দার, শর্মিলা বসু ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। মৈত্রেয়ী সরকার এ বইয়ের নানা মুদ্রণের ত্রুটি খুঁজে বার করেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক···ইত্যাদি ইত্যাদি। রূপলেখা প্রেসের কর্মিবৃন্দের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

যে দুজন ব্যক্তি আমার সক্রিয় নাট্যজীবনের (১৯৬২-১৯৬৯) জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী সেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে এ বই উৎসর্গ করতে পেরে আমি কৃতার্থ বোধ করছি।

নববর্ষ, ১৩৮৮
গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

পবিত্র সরকার

সূচি

উত্তরাধিকার

স্বদেশ

দশরূপক, উপরূপক

আমরা 'নাটক' বলতে বাংলায় যা বুঝি, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে আরম্ভ করে সংস্কৃতে রচিত যাবতীয় নাট্যবিষয়ক গ্রন্থে[১] 'রূপক' বলতে তাই বোঝানো হয়েছে। এই নাট্যবিষয়ক বইগুলির সব সমান নির্ভরযোগ্য নয়।[২] এমন-কী ধনঞ্জয় রচিত যে-বিখ্যাত 'দশরূপক' বিজ্ঞাপিত-রূপেই দশ ধরনের 'রূপক' সম্বন্ধে আলোচনা করেছে, তার বিবৃতি এবং ব্যাখ্যাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সেজন্য আমরা মূলত নাট্যশাস্ত্র এবং কিয়দংশে 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' অবলম্বন করে সংস্কৃত নাট্যরূপের ওই দশ ধরনের বিকল্পের বর্ণনা দেব।[৩]

এখানে বলা দরকার, শুধু দশটি রূপক নয়, 'সাহিত্যদর্পণ'-এর মতে, আঠারো ধরনের 'উপরূপক'-ও ছিল সংস্কৃত নাট্যকলায়। শুইলার[৪] তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ভাণিকা, ছায়ানাটক, দুর্মল্লিকা, গোষ্ঠী, হল্লীশ, কাব্য, নাটিকা, নাট্য-রাসক, প্রস্থান, প্রেক্ষণক, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, সট্টক, শিল্পক, শ্রীগদিত, ত্রোটক, উল্লাপ্য—এই উপরূপকগুলির নাম ও সম্ভবক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি রূপকেরই আবার আছে একাধিক প্রকার, যেমন বীথীর আছে মোট তেরোটি শ্রেণী। কিন্তু উপরূপক বা রূপক-বিকৃতির উদাহরণ প্রায় কিছুই পাওয়া যায়নি। শুইলারও তাঁর দৃষ্টান্তগুলির অধিকাংশ নাট্যবিষয়ক সাহিত্যে কেবল উল্লেখিত হয়েছে বলে দেখিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রে সব উপরূপকের উল্লেখ নেই, কিন্তু রূপক-বৈচিত্র্যের বিবৃতি আছে। নাট্যশাস্ত্রে দশ 'রূপক'-এর আলোচনাই প্রায় সর্বাঙ্গীণ প্রাধান্য লাভ করেছে।

অঙ্কসংখ্যা, চরিত্রসংখ্যা, চরিত্রের গুণাগুণ, জীবনচিত্র ইত্যাদির বিচারে, অর্থাৎ content বা বস্তুর দিক থেকে রূপক দশটি হলেও অন্য এক দিক থেকে রূপকের চার রকমের ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ 'বৃত্তি' বা রচনাশৈলীর দিক থেকে। সমস্ত রূপকই নাকি মোট চার ধরনের বৃত্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে—'বৃত্তিবিনিষ্পন্নৌ কাব্যবন্ধৌ'।

ভরত নির্দেশ করেছেন চার ধরনের 'বৃত্তি'—এই বৃত্তি অনুসারে রূপকেরও

চারটি বড় বিভাজন হওয়ার কথা। 'ভারতী' বৃত্তির রূপক হল—যে-সব মূলত করুণ ও বিস্ময় রসের নাটকে সংলাপ বা কথার সংক্রম বেশি থাকে, আর থাকে প্রধানত পুরুষ চরিত্র—সেইসব রূপক। 'সাত্বতী' বৃত্তির নাটক হল সেইগুলি—যাতে নায়কের শৌর্য, উদারতা, করুণা, স্পষ্টবাদিতা, প্রসন্নতা ইত্যাদির আশ্রয়, যে-নাটকে দুঃখশোকের স্থান নেই। 'কৈশিকী' বৃত্তির নাটকে থাকে দৃষ্টিনন্দন ও শ্রুতিলোভন সৌন্দর্য—বর্ণাঢ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, নৃত্যগীত; পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ধরনের চরিত্রের অংশগ্রহণে এ জাতীয় নাটকে প্রেম, সুখভোগ, শৌর্য ও নারীদের মনোহরণ-কলার আখ্যান বিবৃত হয়। আর 'আরভটী' শৈলীর নাটকে থাকে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, থাকে ইন্দ্রজাল, বাগাড়ম্বর, ক্রোধোদ্গার, উল্লম্ফন, মল্লযুদ্ধ, মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে করুণ ও ভয়ংকর রসের নাটক এই শৈলীতে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন রূপকও আছে যা সব ক'টি বৃত্তিকেই ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহার করে, বিশেষত 'নাটক' ও 'প্রকরণ'—এই দুটি রূপক। এরা 'সর্ববৃত্তিনিষ্পন্ন'। সুতরাং এই দুটি রূপককে আমরা মিশ্র বৃত্তির রূপক বলতে পারি। সে-হিসাবে শৈলী বা বৃত্তির দিক থেকে রূপকের পাঁচটি শ্রেণী—'ভারতী' বৃত্তির রূপক, 'সাত্বতী' বৃত্তির রূপক, 'কৈশিকী' বৃত্তির রূপক, 'আরভটী' বৃত্তির রূপক, আর মিশ্র বৃত্তির রূপক। মনোমোহন ঘোষ সমবকার আর ঈহামৃগ ধরনের রূপককেও এই 'মিশ্র' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন।[৫] তাঁর এ কথা নির্ভুল যে, বৃত্তি অনুসারে রূপকগুলির ধরনকে স্পষ্ট চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে বৃত্তি আসলে নাটকের অংশবিশেষের লক্ষণ, বা বিশিষ্টতা (emphasis) মাত্র—তা থেকে স্পষ্ট চারটি শ্রেণী নির্ধারিত হয় না। তবে নাটকের বৈশিষ্ট্য বুঝতে বৃত্তিলক্ষণ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করে।

তাহলে 'দশরূপক' নামে যে-যে বস্তু পরিজ্ঞাত, সেগুলি কী কী? এ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি উদ্ধার করাই শ্রেয়—

> নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
> ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ॥
> ঈহামৃগশ্চ (বিজ্ঞেয়া দশেমে নাট্যলক্ষণে)।[৬]

অর্থাৎ 'দশরূপবিকল্পন' বা নাটকের (রূপকের) দশটি শ্রেণী হল নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম আর ঈহামৃগ (অতঃপর এই দশটির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বিবৃত করা হচ্ছে)।

এর পরের বর্ণনা খুবই ছকে-বাঁধা পথ অনুসরণ করে চলেছে। মনোমোহন

ঘোষের সংস্করণে 'নাটক' অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর রূপকটির বর্ণনা আছে ১০ থেকে ৪৭ নম্বর শ্লোকে,—সব চেয়ে বিস্তৃতভাবে নির্ণীত রূপক এটি। এর পরের রূপকগুলির বর্ণন-বিস্তার এইরকম—

প্রকরণ	৪৮—৫৮	শ্লোক
ঈহামৃগ	৭৮—৮২	„
ডিম	৮৪—৮৯	„
ব্যায়োগ	৯০—৯৩	„
অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক	৯৪—১০০	
প্রহসন	১০২—১০৭	
ভাণ	১০৭—১১০	
বীথী	১১২—১১৬	

এখানে লক্ষ করি, শ্লোকে যে-ক্রমে রূপকগুলির নাম সাজানো হয়েছে, সম্ভবত ছন্দের বিশেষ প্যাটার্নে ফেলতে হবে বলে, বর্ণনায় রূপকগুলি সেই ক্রমে আসেনি। দ্বিতীয়ত, তালিকা শ্লোকে নাট্যশাস্ত্রকার 'অঙ্ক' কথাটি ব্যবহার করলেও পরে 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক' নামটি সমার্থেই প্রয়োগ করেছেন। আবার রূপকের এই লক্ষণ-বিবরণের মধ্যে মাঝখানে ঘোষের সংস্করণে দু-একটি উপরূপকের বিবৃতিও ঢুকে পড়েছে। যেমন ৫৯—৬২ শ্লোকে 'নাটিকা' সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে ৬৩ শ্লোক পড়লে মনে হয় ভরত 'নাটিকা'-কে স্বাভাবিকভাবেই নাটকের একটি বিশেষ রূপ বলে গণ্য করেছেন। এ শ্লোকে তিনি বলছেন যে, নাটক আর প্রকরণের লক্ষণ তিনি সংক্ষেপে বললেন, এবার সমবকার নিয়ে কথা বলবেন।

যাই হোক, **নাটক** সম্বন্ধে ভরতের কথাগুলি এই—এর সবই 'প্রখ্যাত'—অর্থাৎ পরিচিত। এর বস্তু অর্থাৎ কথাভিত্তি প্রখ্যাত, অর্থাৎ শাস্ত্রীর টীকায় "মহাভারতাদি প্রসিদ্ধো গ্রন্থোঁ মেঁ জো বস্তু হোতা হৈ বহী বস্তু জিসকা বিষয় হৈ প্রতিপাদ্য হৈ।"[১] এর নায়কও প্রসিদ্ধ এবং উদাত্ত। ইনি রাজর্ষিবংশজাত হবেন, দেবতাদের আশ্রিত ও প্রিয় হবেন, এমন-কী এঁর দৈবী শক্তিও থাকতে পারে। নাটকের ঘটনার মধ্যে নায়কের বিভিন্ন কার্যে সাফল্য বা "ঋদ্ধি", প্রণয়লীলা বা "বিলাস" ইত্যাদি বিচিত্র উপাদান থাকবে, এর একাধিক অঙ্ক এবং একটি "প্রবেশক" বা অঙ্কশেষে যোজিত অতিরিক্ত দৃশ্যও থাকবে। এর রাজকীয় বা দৈবী নায়কদের নানা কর্ম বা "চেষ্টিত", ভাব, রস, দুঃখ-শোক নাটকে বর্ণিত হবে।

চারটি বড় বিভাজন হওয়ার কথা। 'ভারতী' বৃত্তির রূপক হল—যে-সব মূলত করুণ ও বিস্ময় রসের নাটকে সংলাপ বা কথার সংক্রম বেশি থাকে, আর থাকে প্রধানত পুরুষ চরিত্র—সেইসব রূপক। 'সাত্বতী' বৃত্তির নাটক হল সেইগুলি—যাতে নায়কের শৌর্য, উদারতা, করুণা, স্পষ্টবাদিতা, প্রসন্নতা ইত্যাদির আশ্রয়, যে-নাটকে দুঃখশোকের স্থান নেই। 'কৈশিকী' বৃত্তির নাটকে থাকে দৃষ্টিনন্দন ও শ্রুতিলোভন সৌন্দর্য—বর্ণাঢ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, নৃত্যগীত ; পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ধরনের চরিত্রের অংশগ্রহণে এ জাতীয় নাটকে প্রেম, সুখভোগ, শৌর্য ও নারীদের মনোহরণ-কলার আখ্যান বিবৃত হয়। আর 'আরভটী' শৈলীর নাটকে থাকে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ, থাকে ইন্দ্রজাল, বাগাড়ম্বর, ক্রোধোদ্‌গার, উল্লম্ফন, মল্লযুদ্ধ, মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে করুণ ও ভয়ংকর রসের নাটক এই শৈলীতে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন রূপকও আছে যা সব ক'টি বৃত্তিকেই ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহার করে, বিশেষত 'নাটক' ও 'প্রকরণ'—এই দুটি রূপক। এরা 'সর্ববৃত্তিনিষ্পন্ন'। সুতরাং এই দুটি রূপককে আমরা মিশ্র বৃত্তির রূপক বলতে পারি। সে-হিসাবে শৈলী বা বৃত্তির দিক থেকে রূপকের পাঁচটি শ্রেণী—'ভারতী' বৃত্তির রূপক, 'সাত্বতী' বৃত্তিব রূপক, 'কৈশিকী' বৃত্তির রূপক, 'আরভটী' বৃত্তির রূপক, আর মিশ্র বৃত্তির রূপক। মনোমোহন ঘোষ সমবকার আর ঈহামৃগ ধরনের রূপককেও এই 'মিশ্র' শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করেন।[৫] তাঁর এ কথা নির্ভুল যে, বৃত্তি অনুসারে রূপকগুলির ধরনকে স্পষ্ট চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে বৃত্তি আসলে নাটকের অংশবিশেষের লক্ষণ, বা বিশিষ্টতা (emphasis) মাত্র—তা থেকে স্পষ্ট চারটি শ্রেণী নির্ধারিত হয় না। তবে নাটকের বৈশিষ্ট্য বুঝতে বৃত্তিলক্ষণ আমাদের অবশ্যই সাহায্য করে।

তাহলে 'দশরূপক' নামে যে-যে বস্তু পরিজ্ঞাত, সেগুলি কী কী ? এ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি উদ্ধার করাই শ্রেয়—

নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ ॥
ঈহামৃগশ্চ (বিজ্ঞেয়া দশেমে নাট্যলক্ষণে)।[৬]

অর্থাৎ 'দশরূপবিকল্পন' বা নাটকের (রূপকের) দশটি শ্রেণী হল নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম আর ঈহামৃগ (অতঃপর এই দশটির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বিবৃত করা হচ্ছে)।

এর পরের বর্ণনা খুবই ছকে-বাঁধা পথ অনুসরণ করে চলেছে। মনোমোহন

ঘোষের সংস্করণে 'নাটক' অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর রূপকটির বর্ণনা আছে ১০ থেকে ৪৭ নম্বর শ্লোকে,—সব চেয়ে বিস্তৃতভাবে নির্ণীত রূপক এটি। এর পরের রূপকগুলির বর্ণন-বিস্তার এইরকম—

প্রকরণ	৪৮—৫৮	শ্লোক
ঈহামৃগ	৭৮—৮২	„
ডিম	৮৪—৮৯	„
ব্যায়োগ	৯০—৯৩	„
অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক	৯৪—১০০	
প্রহসন	১০২—১০৭	
ভাণ	১০৭—১১০	
বীথী	১১২—১১৬	

এখানে লক্ষ করি, শ্লোকে যে-ক্রমে রূপকগুলির নাম সাজানো হয়েছে, সম্ভবত ছন্দের বিশেষ প্যাটার্নে ফেলতে হবে বলে, বর্ণনায় রূপকগুলি সেই ক্রমে আসেনি। দ্বিতীয়ত, তালিকা শ্লোকে নাট্যশাস্ত্রকার 'অঙ্ক' কথাটি ব্যবহার করলেও পরে 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক' নামটি সমার্থেই প্রয়োগ করেছেন। আবার রূপকের এই লক্ষণ-বিবরণের মধ্যে মাঝখানে ঘোষের সংস্করণে দু-একটি উপরূপকের বিবৃতিও ঢুকে পড়েছে। যেমন ৫৯—৬২ শ্লোকে 'নাটিকা' সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে ৬৩ শ্লোক পড়লে মনে হয় ভরত 'নাটিকা'-কে স্বাভাবিকভাবেই নাটকের একটি বিশেষ রূপ বলে গণ্য করেছেন। এ শ্লোকে তিনি বলছেন যে, নাটক আর প্রকরণের লক্ষণ তিনি সংক্ষেপে বললেন, এবার সমবকার নিয়ে কথা বলবেন।

যাই হোক, **নাটক** সম্বন্ধে ভরতের কথাগুলি এই—এর সবই 'প্রখ্যাত'—অর্থাৎ পরিচিত। এর বস্তু অর্থাৎ কথাভিত্তি প্রখ্যাত, অর্থাৎ শাস্ত্রীর টীকায় "মহাভারতাদি প্রসিদ্ধো গ্রন্থোঁ মেঁ জো বস্তু হোতা হৈ বহী বস্তু জিসকা বিষয় হৈ প্রতিপাদ্য হৈ।"[৭] এর নায়কও প্রসিদ্ধ এবং উদাত্ত। ইনি রাজর্ষিবংশজাত হবেন, দেবতাদের আশ্রিত ও প্রিয় হবেন, এমন-কী এঁর দৈবী শক্তিও থাকতে পারে। নাটকের ঘটনার মধ্যে নায়কের বিভিন্ন কার্যে সাফল্য বা "ঋদ্ধি", প্রণয়লীলা বা "বিলাস" ইত্যাদি বিচিত্র উপাদান থাকবে, এর একাধিক অঙ্ক এবং একটি "প্রবেশক" বা অঙ্কশেষে যোজিত অতিরিক্ত দৃশ্যও থাকবে। এর রাজকীয় বা দৈবী নায়কদের নানা কর্ম বা "চেষ্টিত", ভাব, রস, দুঃখ-শোক নাটকে বর্ণিত হবে।

এর পরে "অঙ্ক" কথাটির আলোচনা এসেছে। এই অঙ্ক দশরূপক-এর বিশেষ শ্রেণী নয়, এটি নাটকের অংশ বিশেষ। পরিভাষার এই দ্ব্যর্থকতার জন্যই সম্ভবত ভরত পরে রূপক-বিশেষ বোঝাতে "উৎসৃষ্টিকাঙ্ক" কথাটা ব্যবহার করেছেন। আর "অঙ্ক" কথাটিতে বুঝিয়েছেন নাট্যাংশ। ভরত বলেছেন, (এখানে রূঢ়ি অর্থে ব্যবহৃত) অঙ্ক ভাব ও রসের ক্রমান্বয়ী বিস্তারের দ্বারা অর্থকে পুষ্ট করে। "বিন্দু" বা নাট্য-ঘটনার দিকপরিবর্তনকে অবলম্বন ও বিস্তার করেই অঙ্কের সৃষ্টি, তাতে থাকে একাধিক চরিত্র। তবে অঙ্কে নাট্যবীজের চূড়ান্ত পর্যবসান ঘটবে না, তা কেবল আখ্যানকে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আলোচনা থেকে অনুমান হয়, অঙ্কগুলি নাট্যঘটনার প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডও বটে—কারণ সেগুলি পরের অঙ্কে (কেবল পরম্পরা-সূত্রে? আরিস্ততলীয় কার্যকারণ সূত্রে?) প্রবাহিত হয়ে চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত বীজের "সংহার" বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়। অঙ্কেই নায়কের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শিত হয়, তাতে "দেবী" (=রানি)[৮], গুরুজন, পুরোহিত, অমাত্য, সেনাপতি প্রভৃতির অনুভব এবং কর্মচেষ্টা ইত্যাদিরও প্রদর্শন থাকে। নাটক আর প্রকরণে পাঁচ থেকে দশটি পর্যন্ত অঙ্ক থাকতে পারে। অঙ্কে কী দেখানো চলবে না (ঘোষের অনুবাদ) তার তালিকাটি চিত্তাকর্ষক—ক্রোধ, প্রসাদ (আনুকূল্য), শোক, অভিশাপদান, "বিদ্রব" বা পলায়ন, বিবাহ, কোনো অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য দৃশ্য ইত্যাদি[৯]। শাস্ত্রী কিন্তু এগুলিই দেখাতে হবে বলে জানাচ্ছেন—তাঁর সংস্করণে শ্লোকের (অষ্টাদশ, ২০) মধ্যে নিষেধবাচক শব্দ নেই। ঘোষ আরো দেখাচ্ছেন যে, যুদ্ধ, রাজ্যহানি মৃত্যু, নগরাবরোধ ("যুদ্ধং রাজ্যভ্রংশো মরণং নগরোপরোধনম্") অঙ্কে দেখানো চলবে না, তবে "প্রবেশক" অংশে দেখানো যেতে পারে।[১০] কিন্তু প্রবেশকেও নায়কের পরিচিত কোনো ব্যক্তির হত্যা দেখানো চলবে না। ঘোষের অনুবাদে আরও দেখি, নায়কের পলায়ন, সন্ধিস্থাপন বা বন্ধন কেবল কাব্যিক ভাষায় বর্ণিত হবে, প্রবেশকে উল্লিখিত হবে, কিন্তু (সম্ভবত) দেখানো হবে না। শাস্ত্রীতে এ সমস্ত শ্লোক নেই।

শাস্ত্রী ও ঘোষ দুজনের সংস্করণেই অঙ্কে বর্ণিত ঘটনার সময় (fictional time) সম্বন্ধে আলোচনা দেখি। অঙ্কে নাট্যবীজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একদিনের ঘটনার প্রদর্শন হবে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ভরতের এই "একদিবস" কথাটি নিয়ে আরিস্ততলের ব্যাখ্যাতাদের মতো বারো ঘণ্টা না চব্বিশ

ঘণ্টা—এই কূটতর্ক তৈরি হয়নি পরে,—তার কারণ সম্ভবত এই যে, ভারতীয় সংস্কারে এক দিবস চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ দিন ও রাত্রির সমাহারই বোঝায়। নাটকের অঙ্কে ঘটনা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলবে, এতে অত্যধিক ঘটনার সমাবেশ ঘটবে না, চরিত্রগুলির অঙ্কে প্রবেশ-প্রস্থানের মধ্যে তাদের ক্রিয়া ও ভাবাদির পরিস্ফুটনে নাট্যবীজের প্রকাশ ঘটবে—ইত্যাদি কথাও বলা হয়েছে।

এর পর আছে "প্রবেশক" অংশের আলোচনা। "প্রবেশক" হল সেই অংশ, যা অঙ্কে পাত্রপাত্রীদের 'সংবিধান' বা প্রবেশ করিয়ে দেয়—"প্রকরণনাটকবিষয়ে প্রবেশকঃ সংবিধাতব্যঃ।" "প্রবেশক" নাটকের আরম্ভে থাকে না, থাকে অঙ্কের শেষে। প্রবেশক খানিকটা শেক্সপিরীয় নাটকের পরিচিতি দৃশ্যের (Introductory Scene) মতো, যেখানে দাস-দাসী কঞ্চুকী বা নিম্নবর্গের চরিত্রদের কথাবার্তায় প্রধান চরিত্রদের অদর্শিত ক্রিয়াকলাপ বা মনোভাব সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায়। তবে শেক্সপিয়ারের নাটকে যেখানে এ ধরনের দৃশ্য নাটকের প্রথমেই থাকে, যেমন 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে স্যাম্‌সন আর গ্রেগরির কথাবার্তা—সেখানে সংস্কৃত নাটকের প্রবেশক অঙ্ক-শেষে যুক্ত হয়। তবে প্রবেশক বিষ্কম্ভকের[১১] মধ্যে ঠিক পার্থক্য-রেখাটি কোথায়, তা নিয়ে মতভেদ আছে, যেমন সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভের দৃশ্যগুলিকে রাঘবভট্ট প্রভৃতি টীকাকাররা বলেন "বিষ্কম্ভক", কিন্তু নরহরি বলেন প্রবেশক।[১২] যাই হোক, "নাটক"-এর আলোচনায় অঙ্ক বা প্রবেশকের আলোচনা অপরিহার্য ছিল না, কারণ এ দুয়েরই বিস্তারিত প্রসঙ্গ অন্যত্র আনা উচিত, নাট্যাঙ্গের বা নাটকের স্ট্রাকচারের আলোচনায়। প্রবেশক গৌণ চরিত্রের "প্রাকৃত" আলাপে কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দেবে, সময়ান্তর বোঝাবে, বিষ্কম্ভকে মধ্যশ্রেণীর চরিত্রের "সংস্কৃত বচন"-এ প্রায় একই কাজ করবে।

এর পর ঘোষ-এর সংস্করণে ৩৯ শ্লোক থেকে আলোচনা আবার নাটক ও প্রকরণে ফিরে আসে। এবার চরিত্রের সংখ্যা নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে, নায়কের সঙ্গীসাথিদের সংখ্যা চার-পাঁচ জনের বেশি যেন না হয়। ব্যায়োগ, ডিম, ঈহামৃগ ও সমবকার জাতীয় রূপকে দশ বারোটি চরিত্র থাকতে পারে। রথ হস্তী অশ্ব, প্রাসাদ ইত্যাদি মঞ্চে দেখানো চলবে না। বেশভঙ্গিমা আর "গতিবিচার" বা অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সে-সব বোঝাতে হবে। ছোট "পুস্ত" বা মডেল দিয়েও সেগুলির আভাস দেওয়া চলবে। ঘোষের সংস্করণে তেইশ

অধ্যায়ের ৬ থেকে ৯ শ্লোকে এই পুস্ত-এর নানা শ্রেণীনির্দেশ লক্ষ করি। সৈন্যদল যদি দেখাতেই হয় তবে পাঁচ ছ-টির বেশি সৈন্য মঞ্চে উপস্থিত থাকবে না। নাটকে সৈন্যবাহিনীর বিরাটত্ব প্রকাশের প্রয়োজন নেই। ওই সৈন্যরা ভ্রমণ আর অশ্বারোহণের সরঞ্জাম নিয়ে ধীরগতিতে চলাফেরা করবে।

নাটকের উপসংহার হবে গোপুচ্ছাগ্রের মতো, অর্থাৎ অর্থাৎ সমস্ত কিছুর পরিণাম ও পর্যবসান ঘটবে সেখানে। নাটকের শেষে অভাবনীয় ও আশ্চর্যকর ঘটনারও অবতারণা ঘটতে পারে। ঘোষ উদাহরণ দিয়েছেন ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা' নাটকের—যেখানে অবন্তিকাই যে বাসবদত্তা তা জানতে পারেন উদয়ন; কিংবা 'শকুন্তলা'য় শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের চমকপ্রদ পুনর্মিলন। মনে হচ্ছে এই চমৎকারজনক ঘটনাগুলি খানিকটা আরিস্ততলীয় 'আনাগ্নোরিসিস' বা আকস্মিক উন্মোচনের শর্ত মেনে তৈরি হবে।

২.

প্রকরণ নাটক থেকে পৃথক হয় প্রধানত কাহিনীর উৎসগত চরিত্রে এবং নায়ক ও নায়িকার সামান্য শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যে। নাটকের কাহিনী প্রদত্ত পরম্পরা-গত, অর্থাৎ কাব্য-পুরাণাদির প্রখ্যাত উৎস থেকে গৃহীত, কিন্তু প্রকরণের আখ্যান নাট্যকারের স্বোদ্ভাবিত ও মৌলিক—"আত্মশক্ত্যা বস্তুশরীরং চ নায়কং চ"। সেহেতু প্রকরণের নায়ক আর নায়িকাও আমাদের পূর্বপরিচিত নয়। এ কথাটিকেই আরেকটু পুনরুক্ত ও বিস্তারিত করে বলা হয়েছে যে, (শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়) পুরাণাদি, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, প্রাচীন কবিদের কাব্য ("আহার্য") ইত্যাদি থেকে প্রকরণের কাহিনী সংগৃহীত হবে না। তবে ভাব ও রসের বিন্যাস এবং অঙ্ক ও সন্ধির সংগঠনে প্রকরণ নাটকেরই মতো।

নায়কের ক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, নাটকের নায়ক যেমন দেব বা দেবর্ষিদের অংশজাত উদাত্ত রাজপুরুষ, প্রকরণের নায়ক সেখানে হবে কোনো ব্রাহ্মণ, বণিক, অমাত্য, পুরোহিত, রাজকর্মচারী, সেনাধ্যক্ষ—"বিপ্রবণিক্-সচিবানাং পুরোহিতা-মাত্যসার্থবাহানাং চরিতম্")। ঘোষ ইঙ্গিত করেন—যেহেতু এমনই সব চরিত্রের কীর্তিকলাপ দেখানোর কথা বলা হয়েছে, সেহেতু প্রকরণে শৃঙ্গার মূল বা একমাত্র রসবস্তু নাও হতে পারে, নাটকে যেমন হয়। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রকরণের নায়ক ঠিক প্রখ্যাত উদাত্ত শ্রেণীর হবে না—"নোদাত্তনায়ক-কৃতম্", আর সে দেবতা বা "দিব্যচরিত"ও হবে না। এতে থাকবে না রাজসম্ভোগের

আখ্যান—অর্থাৎ, আমাদের মতে, প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের পাটরানি বর্তমানেও নতুন প্রণয়লীলা ও স্ত্রীগ্রহণের আখ্যান, যে-আখ্যান সংস্কৃত নাটকে "ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত"[১৩]। প্রকরণে আরো নানা জাতীয় চরিত্রের সমাবেশ ঘটে—"দাসবিটশ্রেষ্ঠী" থাকবে তাতে, থাকবে "বেশস্ত্রী" অর্থাৎ বারাঙ্গনা, আর থাকবে ভ্রষ্টা বা মন্দ কুলস্ত্রী।

কিন্তু এবার নায়িকাদের উপর একটু জাতিভেদ-প্রথা চাপিয়ে দিয়েছেন নাট্যশাস্ত্রকার। প্রকরণের ওইসব নায়ক, অর্থাৎ "সচিবশ্রেষ্ঠিব্রাহ্মণপুরোহি-তামাত্যসার্থবাহ"—এদের যে-ই হোক, সে যখন তার স্ত্রীপরিজনদের সঙ্গে থাকবে, সে জায়গায় বেশ্যাঙ্গনাদের প্রবেশ নিষেধ। উলটোদিকে যদি নায়কটি বারাঙ্গনা-সাহচর্যে থাকে, তখন সে দৃশ্যে সম্ভ্রান্ত কুলস্ত্রীদের প্রবেশ নিষেধ। আমাদের মতে, এতে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে কমেডির (এবং ট্র্যাজেডির ?)—সম্ভাবনা নষ্ট করা হয়েছে, দুটি প্রতিপক্ষীয়া স্ত্রীলোকের পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার যে নাট্যিক আকর্ষণ—যা ইয়োরোপীয় কমেডিগুলিতে খুবই ব্যবহৃত হয়েছে, তা বাধিত হওয়ায় নাটক ও প্রকরণ মিলনান্তক হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যত গুরুগম্ভীর ধরনের নাটক হয়ে থেকেছে। বিদূষক ও 'বয়স্য' ধরনের মামুলি রসিকতা সব ক্ষেত্রে নাটককে ঋদ্ধ করেনি, তবে দু-একটি ক্ষেত্রে কয়েকটি উজ্জ্বল চরিত্র ('মৃচ্ছকটিক'-এ শর্বিলক ও জুয়াড়ি যেমন) ব্যতিক্রম হয়েই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। পরের শ্লোকে (ঘোষের অনুবাদে ৫৬ নম্বর, শাস্ত্রীর ৫৩) অবশ্য বলা হচ্ছে যে, যদি কারণবশত দুয়ের দেখা হয়েই যায়, তবে উভয়ের ভাষা যেন অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ শাস্ত্রীর ব্যাখ্যায়, কুলস্ত্রী কথা বলবে সংস্কৃতে, পণ্যাঙ্গনা কথা বলবে শৌরসেনী প্রাকৃতে। কিন্তু দুয়ের সাক্ষাতে কোনো নাটকীয় সম্ভাবনা তৈরি হবে কি না, ভরত সে সম্বন্ধে নিশ্চুপ।

সমবকারের বৈশিষ্ট্য হল—এতে দেবতা ও অসুরের (নায়ক-প্রতিনায়ক ?) অভীষ্ট ফললাভ দেখানো হবে—এরা দুজনই হবে প্রখ্যাত ও উদাত্ত। এতে থাকবে তিনটি অঙ্ক ("ত্র্যঙ্ক"), তিনটি প্রতারণার ঘটনা ("ত্রিকপট"), তিনটি শঙ্কাত্রাস-উত্তেজনার ঘটনা ("ত্রিবিদ্রব") এবং তিনটি প্রণয়াখ্যান ("ত্রিশৃঙ্গার")। বিদ্রব ঘটে অগ্নি, যুদ্ধ এবং নগরাবরোধের ফলে। এ ছাড়া এতে থাকবে বারোজন নায়ক (দ্বাদশনায়কবহুলঃ—ঘোষের অনুবাদে বারোটি চরিত্র)। শাস্ত্রী অন্য একটি মত উদ্ধৃত করে জানান—এই বারোজন হবে প্রতি অঙ্কে চারজন করে—এই চারজন নায়ক নাও হতে পারে—"নায়ক প্রতিনায়ক ঔর এক

এক উনকে সহায়ক হোতে হৈ"[১৪]... ।

সমবকারের অভিনয়কাল হল অষ্টাদশ নাড়িকা (বা 'নালিকা') । পরের শ্লোক (ঘোষ ৬৬, শাস্ত্রী ৬৪) থেকে জানতে পারছি এক নাড়িকা হল এক মুহূর্তের, অর্থাৎ ৪৮ মিনিটের অর্ধেক সময়, অর্থাৎ ২৪ মিনিট । তার অর্থ হল, সমবকারের মোট অভিনয়কাল হবে সাত ঘণ্টা বারো মিনিট । একে রূপক-শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘতম বলা যেতে পারে । ঘোষ বলছেন, অনেক চরিত্র আর ঘটনার ঘনঘটা থাকায় এ নাটক যাতে দীর্ঘ না হয়ে পড়ে, সেইজন্যই সময় বেঁধে দেওয়া ।[১৫] এই দীর্ঘ বিচিত্রস্বাদী জাঁকজমকপূর্ণ রূপককে লেবি spectacle আখ্যা দিয়েছেন । যাই হোক, ওই আঠারো নাড়িকার বারোটিই দখল করবে প্রথম অঙ্ক ; দ্বিতীয় অঙ্ক হবে চার নাড়িকাব্যাপী, তৃতীয় বা শেষ অঙ্ক দু নাড়িকার । প্রথম অঙ্কে থাকবে প্রহসন বা হাস্যজনক ঘটনা,[১৬] শঙ্কাত্রাস-উত্তেজনা ("বিদ্রব"), প্রতারণা ("কপট") এবং "বীথী" থাকবে—এ জন্য "নাটকলক্ষণরত্নকোশ'-এ এ অঙ্কটির নাম "বীথাঙ্ক"[১৭] । দ্বিতীয় অঙ্কের উপাদান প্রথম অঙ্কেরই মতো, কিন্তু পরে বলা হচ্ছে অঙ্কে অঙ্কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থাকবে—"অঙ্কো'অঙ্কস্ত্বন্যার্থ ঃ কর্তব্যঃ" । অঙ্কগুলির পরস্পরের যোগ শিথিলবদ্ধ হবে ।

এর পর যথাক্রমে বিদ্রব, কপট আর শৃঙ্গারের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে । সমবকারে তিন ধরনের বিদ্রবের (শঙ্কাত্রাস-উত্তেজনা) উদ্ভব হবে যুদ্ধ বন্যা বায়ু (=ঝড়) অগ্নি বা বৃহৎ হস্তী (পাগলা হাতি ?) থেকে । ত্রিকপটের তিনটি শ্রেণী—পরিকল্পিত, অপরিকল্পিত ("দৈববশাৎ") অথবা অন্য-(শত্রু) কল্পিত । এতে চরিত্রদের সুখ বা দুঃখের উপলব্ধি ঘটে । শৃঙ্গারও তিন রকমের—কর্তব্যের প্রতি রতি বা আসক্তি বা ধর্মশৃঙ্গার—ব্রত নিয়ম সাধন ইত্যাদিতে এর প্রকাশ ; বৈষয়িক লাভের প্রতি রতি বা অর্থশৃঙ্গার, এবং নারীতে আসক্তি এবং কুমারীর কৌমার্যহানি বা গোপন ও প্রকাশ্য কামক্রীড়ার নাম কামশৃঙ্গার ।

উষ্ণিক আর গায়ত্রী ছন্দের ব্যবহার সমবকারে অনুচিত । এ নাটকেও নানা রসের সৃষ্টি সম্ভব ।

ঈহামৃগ ধরনের রূপকে দেবতারাই নায়ক প্রতিনায়কের ভূমিকা নেয়, তারা দিব্যাঙ্গনাদের প্রণয়-প্রতিযোগিতায় পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় । এ রূপকের কাহিনী সুসংবদ্ধ হবে (সম্ভবত সমবকারের শিথিল-গ্রন্থিত আখ্যানের সঙ্গে এভাবেই এর পার্থক্য নির্দেশ করা হচ্ছে) এর নায়ক হবে উদ্ধত, স্ত্রীরোষের উপর গড়ে উঠবে এর আখ্যান, এবং তাতে সংক্ষোভ-বিক্ষোভ, শঙ্কা-ত্রাস-

উত্তেজনা বা বিদ্রব, আর ক্রুদ্ধ সংঘাত বা "সম্ফেট" থাকবে। এর কাহিনীতে আরো থাকবে অনুরাগ নিয়ে স্ত্রীদের মধ্যে কলহ, স্ত্রীচরিত্রের অপহরণ ও শত্রু-মর্দন। ব্যায়োগের যাবতীয় বস্তু (কার্য, চরিত্র, বৃত্তি) ঈহামৃগেও থাকবে, ব্যায়োগের রীতি ও রসও ঈহামৃগে লভ্য। কিন্তু ঈহামৃগের স্ত্রীচরিত্র কেবল দেবী বা দিব্যাঙ্গনারাই হবে। আর ঈহামৃগে হত্যার ইচ্ছা বা উদ্যোগ বিলম্বের দ্বারা বা অন্য কোনো বিশেষ কৌশলে নিবৃত্ত করতে হবে, হত্যাকাণ্ড কখনোই ঘটবে না।

ডিম আখ্যান আর নায়কের দিক থেকে 'নাটক'-এর মতো, অর্থাৎ দুইই প্রখ্যাত, এবং নায়ক উদাত্তও বটে। ডিম চারটি অঙ্কে নির্মিত হবে, এতে ছ-টি রসের প্রকাশ ঘটবে ("ষড়্‌রসলক্ষণযুক্ত-চতুরঙ্কঃ)। অর্থাৎ এ নাটকে শৃঙ্গার আর হাস্য—এই দুটি রসকে বর্জন করা হবে। এতে বীরত্ব ও উত্তেজনাব্যঞ্জক নানা ঘটনা থাকবে, এমন-কী থাকবে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ, যুদ্ধ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, আস্ফোট বা চ্যালেঞ্জ, আর সম্ফেট বা ক্রুদ্ধ সংঘাত। মায়া, ইন্দ্রজাল, বহু লোকের (পুতুলের?) চলাফেরা, ঝগড়াঝাঁটি। ডিমে চরিত্র-সংখ্যা ষোলোটি মোট—তাতে দেবতা, নাগ (ভুজগেন্দ্র), যক্ষ, ভূত-প্রেত-পিশাচাদি থাকবে। রচনার দুটি মাত্র রীতি এই নানাভাবাশ্রিত রূপকের জন্য বিধেয়—সাত্ত্বতী আর আরভটী।

ব্যায়োগ জাতীয় রূপকের নায়কও কথা বা ইতিহাসে প্রখ্যাত হবে, কিন্তু এর স্ত্রীচরিত্রের সংখ্যা হবে অল্প। ব্যায়োগ ডিমেরই মতো, তবে ডিমে দিব্য নায়ক, ব্যায়োগে মানবিক তথা রাজকীয় নায়ক। ব্যায়োগের ঘটনা হবে একটি-মাত্র দিনের। ব্যায়োগে নায়ক ছাড়া অন্যান্য পুরুষ চরিত্র কম নয়, সংখ্যায় তারা সমবকারের পুরুষ-ভূমিকার সঙ্গে তুল্য, কিন্তু ব্যায়োগ একাঙ্ক নাটক, সমবকার ত্র্যঙ্ক। এর নায়ক দেবতা নয়, রাজর্ষি গোত্রের—একথা আবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে এখানেও যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ("নিযুদ্ধ"); চ্যালেঞ্জ ("আকর্ষণ"), সংঘর্ষ ইত্যাদি থাকবে। এ নাটকের মূল অবলম্বন উদ্দীপনা, রৌদ্ররস।

উৎসৃষ্টিকাঙ্ক বা **অঙ্ক** শ্রেণীর রূপকের আখ্যান গ্রথিত হবে সাধারণভাবে প্রখ্যাত কথাবস্তুর সাহায্যে, কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এর পুরুষ চরিত্রের কেউ দেবতা হবে না, এবং করুণ হবে এর রসাশ্রয়। যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অন্তে স্ত্রীলোকের শোকোচ্ছ্বাস থাকবে এতে, থাকবে শোকবিহ্বলদের ব্যাকুলতা। এর রচনায় সাত্ত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী রীতি (বৃত্তি) বর্জিত হবে, অর্থাৎ এর

শৈলী হবে ভারতী। এতে নায়কের "অভ্যুদয়ান্ত" অর্থাৎ পতন বর্ণিত হবে। অঙ্ক প্রসঙ্গে "ভারতবর্ষ" নিয়ে অতঃপর কিছুটা অবান্তর উচ্ছ্বাস আছে।

প্রহসন দু ধরনের, শুদ্ধ আর মিশ্র বা "সংকীর্ণ"। শুদ্ধ প্রহসনে থাকে শৈব সম্প্রদায়ের গুরু বা ভগবৎ-দের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কৌতুকজনক বাদ-বিসংবাদ, কাপুরুষ ও দুশ্চরিত্র পুরুষদের ঠাট্টা-তামাশা,—তাদের নিজেদের অবিকৃত মুখের-ভাষায় ও ভাবে। আর মিশ্র বা সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসনে পাওয়া যাবে বেশ্যা, চেট, নপুংসক, বিট, ধূর্ত, অসতী ইত্যাদি বহুতর চরিত্রকে—তারা পোশাক-পরিচ্ছদ ভাবে ভঙ্গিতে তেমন ভদ্রস্থ হবে না। প্রহসনের অবলম্বন হবে কোনো জনপ্রিয় ও মুখরোচক বিষয় (কেচ্ছা-কেলেংকারি) বা দম্ভযুক্ত কাহিনী। তাতে ধূর্তদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ দেখানো হবে। প্রহসনে প্রয়োজন-ক্ষেত্রে উপযুক্ত কোনো একটি 'বীথী'-কে অন্তর্ভূত করা চলবে।

এবার **ভাণ**। একটিমাত্র চরিত্রের অভিনয়-সম্বলিত ভাণ দুধরনের—একটিতে চরিত্রটি নিজের অনুভব-অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, অন্যটিতে সে অন্যদের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে দেয়—"আত্মানুভূতশংসী" আর "পরসংশ্রয়বর্ণনা"। যেন উপস্থিত (কিন্তু মঞ্চে অদর্শিত) অন্য কারো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এবং কল্পিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সঙ্গে সংলাপ ("আকাশ-ভাষিত") চালাচ্ছে, এবং যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি ("রঙ্গবিকার") করে চলেছে—এভাবেই ভাণ প্রদর্শিত হবে।

ভাণের চরিত্রলিপিতে থাকবে ধূর্ত, বিট ইত্যাদির নানা অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ ("নানাবস্থান্তর")। ভাণ অবশ্যই এক অঙ্কের রূপক।

বীথী একটি বা দুটি চরিত্রের একাঙ্ক রূপক। এর চরিত্র উত্তম, মধ্যম বা অধম—যে-কোনো স্তরের হতে পারে, রসের ক্ষেত্রেও এর স্বাধীনতা আছে—যে-কোনো রসই এর আশ্রয় হতে পারে। বীথী সম্বন্ধে ভরত খুব বিস্তারিত শ্রেণী-নির্দেশ করেছেন—মোট তেরো ধরনের বীথীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, অবস্পন্দিত, অসৎপ্রলাপ, প্রপঞ্চ, নালী যা নালিকা, বাক্‌কেলি, মৃদব, অধিবল, ছল, ত্রিগত, ব্যাহার, গণ্ড। এগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম এবং অকিঞ্চিৎকর—এতে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রীদের দুর্ধর্ষ শ্রেণীভেদ-প্রবণতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ঘটেনি। শুধু এখানেই শেষ নয়, 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ'-এ 'গণ্ড' শ্রেণীর বীথীরও আরও শ্রেণীবিভাগ পাই—ব্যর্থগণ্ড, লেশগণ্ড ইত্যাদি। এখানে সেসবের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শেষোক্ত গ্রন্থে কিছু বিকল্প নামও আছে শ্রেণীগুলির—উদ্‌ঘাত্যক-এর বদলে উদ্‌ঘাতক, অবস্পন্দিত-র বদলে অবস্যন্দিত, প্রপঞ্চ-র বদলে অঞ্চিত, বাক্‌কেলি-র বদলে বাগ্‌বেণী।

৩.

উপরূপকগুলির সংখ্যা সব বইয়ে একরকম ছিল ছিল না। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে আছে মাত্র পনেরোটির উল্লেখ, তাতে, অন্তত শাস্ত্রীর সংস্করণে, নাটিকা প্রকরণী ত্রোটক আর হল্লীশ অনুল্লেখিত[১৮]। সিলব্যাঁ লেবি জানাচ্ছেন, অগ্নিপুরাণে আছে সতেরোটি উপরূপকের উল্লেখ। তিনি এও দেখাচ্ছেন যে, প্রদর্শকলার অন্যান্য উপাদান, যেমন মূকাভিনয়, নৃত্য, বাদ্য এবং সংগীত উপরূপক-গুলিতে আরো বেশি করে ব্যবহৃত হয়। আমরা উপরূপকের এই আলোচনায় প্রধানত লেবিরই অনুসরণ করছি[১৯]।

নাটিকা-র আখ্যান কবিকল্পিত, কিন্তু নাটকের মতো এর নায়ক প্রখ্যাত নৃপতি, ধীরললিত নায়ক তিনি। মূল রস শৃঙ্গার। নাটিকা চার অঙ্কের পর্যন্ত হতে পারে, কমও হওয়া সম্ভব। এতে নাটক ও প্রকরণ দুইয়েরই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মুখ্যত অন্তঃপুর-নির্ভর এই উপরূপকে সংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে, থাকে প্রচুর নারীচরিত্র, ললিত অঙ্গভঙ্গি, নাচ-গান-আবৃত্তি ও প্রণয়-সম্ভোগ। আরো অনেক রাজকীয় আদবকায়দার প্রদর্শন, ক্রোধপ্রকাশ, ক্রোধের উপশম, দম্ভ ও প্রতারণা। রাজনায়ক, তার রানি, দূতী, পরিকরদের নিয়ে নাটিকা। নাটিকার নামকরণ হয় নায়িকার নামে, ফলে নায়িকা-প্রধান এই উপরূপক। বড় নাটকের মতোই দেবী বা পাটরানি রাজার নতুন প্রণয়লীলার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে এবং নতুন নায়িকার সঙ্গে মিলনে বাধা তৈরি করে, তাকে শাস্তি দিয়ে রাজার মনোকষ্ট বাড়ায়। **প্রকরণী** বা **প্রকরণিকা** নামের উপরূপকের সঙ্গে নাটিকার তফাত এই যে, প্রকরণীতে প্রণয়ীযুগল আসছে বণিক সম্প্রদায় থেকে। তবে লেবি বলেন, প্রকরণী বলে কিছু ছিল না আদৌ, পণ্ডিতেরা ছক বজায় রাখতে এই শ্রেণী খাড়া করেছেন। নাটকের আছে নাটিকা, কাজেই প্রকরণের প্রকরণী থাকবে না কেন? লেবি ধনিক-এর সাক্ষ্য উদ্ধার করেন তাঁর মতের পক্ষে। লেবি-র মতে এমন কী **ত্রোটক**ও নাটকেরই রূপান্তর মাত্র। পাঁচ, সাত, আট বা ন-টি অঙ্ক হতে পারে এর, প্রতিটিতে রাজবয়স্য দেখা দেয়, শৃঙ্গার এর মূল রস—যার অবলম্বন কোনো স্বর্গের দেবীর জন্য একটি রাজকীয়

মানব চরিত্রের প্রেমার্তি। **গোষ্ঠী** শ্রেণীর উপরূপক একাঙ্ক, তাতে গর্ভসন্ধি আর বিমর্ষ-সন্ধি অনুপস্থিত। এতে আছে নয় বা দশটি পুরুষ আর ছ-টি নারীচরিত্র, প্রণয়লীলা এর মূল নির্ভর। **সট্টক** কেবল প্রাকৃতভাষায় রচিত, প্রবেশক-বিষ্কম্ভকহীন উপরূপক, বিস্ময় এর মূল রস। একাধিক অঙ্ক থাকে এতে, প্রতিটি অঙ্কের নাম "যবনিকা"। রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ও বীভৎস রসের এই উপরূপক মুখ্যত কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তিতে রচিত হয়। **নাট্যরাসক**-এ একটিমাত্র অঙ্ক। এর নায়ক প্রখ্যাত ও উদাত্ত, তার বন্ধু সহনায়ক। শৃঙ্গার-রঞ্জিত হাস্য এর মূল রস। নায়িকাকে তার প্রসাধনাগারে দেখানো হয় বলে লেবি জানাচ্ছেন। আর নাট্যারসকে "উদাত্ত নায়ক এবং পীঠমর্দ উপনায়ক, নায়িকা বাসকসজ্জা, বহু প্রকার তাল ও লয়ের প্রাধান্য।"[২০]

প্রস্থান-এর রীতি কৈশিকী, ঘটচেটী (নারী-সংগ্রহকারিণী) এর নায়িকা, দাস-ক্রীতদাস এর নায়ক, বিট উপনায়ক। এতে বহু বিচিত্র তাল ও লয়ের প্রয়োগ আছে, আছে সুরাপানের বহু দৃশ্য। লেবি জানাচ্ছেন, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তালিকায় 'প্রস্থান'-এর বদলে 'প্রকাশিকা' নামটি আছে। **উল্লাপ্য** বা **উল্লাপ্যক** লেবির মতে একাঙ্ক, 'রত্নকোশ'-এর মতে ত্র্যঙ্ক। গীতিময়, উজ্জ্বল-বেশভূষিত উদার ও দিব্য নায়ক-যুক্ত এই উপরূপকে হাস্য, করুণ ও শৃঙ্গার—এর যে-কোনো একটি প্রধান রস হতে পারে। কেউ কেউ এতে চারটি নায়ক থাকে এমনও বলেন। যুদ্ধের প্রাচুর্য, ত্রিতালবদ্ধ সংগীত বহু পুস্ত বা মডেলের ব্যবহার একে সমৃদ্ধ করে। **কাব্য** একাঙ্ক ও হাস্যরসাশ্রিত উপরূপক। এতে চারটি বৃত্তিই ব্যবহৃত হয়। মুখ, প্রতিমুখ ও নির্বহণ সন্ধিযুক্ত, কিন্তু গর্ভ ও অবমর্শ-সন্ধি বর্জিত, এতে শৃঙ্গার ও হাস্য প্রধান রস বলে 'রত্নকোশ' জানাচ্ছে। লেবি করুণ রসেরও উল্লেখ করেন। এতে তাললয়ের নানা বৈচিত্র্য থাকে। **প্রেঙ্খণ** বা **প্রেক্ষণও** একাঙ্ক, কাব্যের মতোই গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধি বর্জিত। নায়ক নিম্নজাতীয়, সব ক-টি বৃত্তিই ব্যবহৃত। এতে সূত্রধার থাকে না, নান্দী ও মঙ্গলাচরণ নেপথ্য থেকে উচ্চারিত হয়। দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ (চ্যালেঞ্জ) ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। **রাসক** এক অঙ্কের উপরূপক, কেবল মুখ ও অবমর্শ সন্ধিযুক্ত সূত্রধার-বর্জিত এ রূপকে "পাঁচটি পাত্র,···উদাত্ত নায়ক, বহুশ্রেণীর কলা সম্পর্কে উপদেশ ও তথ্য, মসৃণ এবং উদাত্ত ভাব, উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রাধান্য।"[২১] এতে বীথীর উপাদানও থাকে। নায়ক নির্বোধ, নায়িকা প্রখ্যাতা। উপসংহার যত কাছে আসে ততই এতে ভাবের সমুন্নতি ঘটে। নাস্তিক নায়ক সম্বলিত তিন বা চার অঙ্কের

উপরূপক হল **সংলাপক**। এতে করুণ ও শৃঙ্গার রস অব্যবহৃত, ভারতী ও সাত্ত্বতী বৃত্তি এর মুখ্য অবলম্বন। এতে ঘটনার ঘনঘটা—নগরাবরোধ, আকস্মিক আক্রমণ, সংঘর্ষ ইত্যাদির প্রাচুর্য।

প্রখ্যাত কথাবস্তু-নির্ভর **শ্রীগদিল** উপরূপক হল একাঙ্ক। এর নায়ক-নায়িকা দুজনেই প্রখ্যাত আর উচ্চকুলোদ্ভব। গর্ভ ও বিমর্শ সন্ধিরহিত এ উপরূপকে "শ্রী" কথাটি নাকি বারবার উচ্চারিত হয়। ভারতী বৃত্তি এর পক্ষে প্রশস্ত। 'রত্নকোশ' জানাচ্ছে—"ইহাতে নারী বসিয়া করুণভাবে পাঠ বলে।"[২২] সেখানে এর 'শ্রীগদিত' নাম পাই। **শিল্পক** চার অঙ্কের, এতে হাস্য আর শান্তরসের স্থান নেই। নায়ক ব্রাহ্মণ, অনুদাত্ত; সহনায়ক নিম্ন বর্ণের। সাতাশ রকমের সঞ্চারী ভাব ("অঙ্গ") এতে প্রকাশিত হয়। এতে চারটি বৃত্তিরই ব্যবহার ঘটে, সমস্ত রসের প্রকাশ হয়। **বিলাসিকা** বা **লাসিকা** শৃঙ্গাররসাশ্রিত একাঙ্ক, লাস্যের দশরকম অঙ্গের প্রকাশ ঘটে তাতে। বিদূষক বিট ইত্যাদি চরিত্রে পূর্ণ, এর নায়ক নিম্নকুলোদ্ভব। **দুর্মল্লিকা** চার অঙ্কের, ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তিতে রচিত। এর প্রথম অঙ্কে বিটের প্রধান ভূমিকা—এ অঙ্কের অভিনয়কাল তিন নাড়িকা বা ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট।[২৩] দ্বিতীয় অঙ্কে প্রাধান্য বিদূষকের, তার স্থায়িত্ব পাঁচ নাড়িকা; তৃতীয় অঙ্ক পীঠমর্দের, তার স্থিতি ছয় নাড়িকা; চতুর্থ অঙ্কের মূল চরিত্র নাগর-নায়ক। এ অঙ্কের স্থিতিকাল লেবিতে আট নাড়িকা। **হল্লীশ** বা **হল্লীশক** একাঙ্ক, এতে পুরুষ চরিত্র একটিমাত্র, আর নারী সাত, আট বা দশটি। উদাত্ত বচনহীন এই উপরূপক কৈশিকী বৃত্তি-প্রধান। এতে নৃত্য গীতের প্রাচুর্য, বহু তাল ও লয়ের প্রয়োগ ঘটে। **ভাণিকা**-ও একাঙ্ক, এতে সূক্ষ্ম বসন-সজ্জা, ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তির প্রাধান্য। নায়িকা উচ্চকুল-জাতা, নায়ক অনুচ্চ কুলের।

এ ছাড়াও 'রত্নকোশ' উল্লেখ করছে '**ভাণী**'-র—যা শৃঙ্গারাত্মক একাঙ্ক, বিট বিদূষক পীঠমর্দ ইত্যাদি ভূমিকা-সমন্বিত একাঙ্ক। লেবি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সূত্র থেকে আরো পনেরোটি উপরূপকের উল্লেখ করেন, সেগুলি হল হংসিকা, বিয়োগিনী, দীপিকা, কলোৎসাহতরা, জুগুপ্সিতা, বিচিত্রার্থা, বৃন্দক, ভীলুকী, তুম্বকী, সজ্জিতা, পরিবর্ত, চিত্র, মূর্তি, ঝাক্কি, প্রহেলিকা।

৪.

, শ্রেণী। বিভাগের আরো সূক্ষ্ম, আরো সূক্ষ্ম বিভাগ। মনে

হয়, কখনো একটিমাত্র নাটক থেকেই একটা শ্রেণী বানিয়ে ফেলেছেন নাট্যশাস্ত্রীরা। অনেকগুলি শ্রেণীর কোনো নিদর্শনই আর টিকে নেই। বিশেষ থেকে সামান্যীকরণের এই চেষ্টা বড় করুণ—তা শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যাপক তত্ত্বে পৌঁছে দেয় না, শ্রেণীবিভাগকে প্রায় নিরর্থক করে তোলে। যাই হোক, এবার আমরা শুইলার, 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ', ঘোষ ও শাস্ত্রী প্রভৃতির অনুসরণে বিভিন্ন রূপক ও উপরূপকের দৃষ্টান্ত দেব। এর মধ্যে বেশ কিছু কালগর্ভে নিমজ্জিত, ফলে যাচাই করে দেখার উপায় নেই তা কীরকম ছিল।

নাটক : 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' (কালিদাস), 'মহাবীরচরিত' (ভবভূতি), 'উত্তররামচরিত' (ভবভূতি), নাগানন্দ (শ্রীহর্ষ), বালরামায়ণ (রাজশেখর), 'খণ্ডকৌশিক' (ক্ষেমীশ্বর), 'হনুমন্নাটক' (হনুমান ?), সত্য হরিশ্চন্দ্র (রামচন্দ্র) ইত্যাদি।

প্রকরণ : মালতীমাধব (ভবভূতি), মৃচ্ছকটিক (শূদ্রক), পুষ্পদূষিতক (?), মল্লিকামারুত (উদ্দণ্ডী), বক্রতুণ্ডগণনায়ক (?)।

সমবকার : শক্রানন্দ (?)।

ঈহামৃগ : বীরবিজয় (কৃষ্ণমিশ্র), কুসুমশেখরবিজয় (?), মায়াকুরঙ্গিকা (?)।

ডিম : 'মন্মথোন্মথন' (রাম), 'ত্রিপুরাদাহ' (?)

ব্যায়োগ : 'মধ্যমব্যায়োগ' (ভাস), 'বিনতানন্দ' (গোবিন্দ), 'ধনঞ্জয়বিজয়' (কাঞ্চনাচার্য), 'প্রচণ্ডগরুড়' (?) 'নির্ভয়ভীম' (রামচন্দ্র মহাকবি), 'সভাপতিবিলাস' (ধর্মরাজ), 'ভীমবিক্রম' (মোক্ষাদিত্য)।

উৎসৃষ্টিকাঙ্ক : 'শর্মিষ্ঠাযযাতি' (?)।

প্রহসন : 'যোগানন্দ' (অরুণগিরিনাথ), ভগবজ্জুকীয়ম্ (?), 'হাস্যার্ণব' (জগদীশ্বর ভট্টাচার্য), 'ধূর্তসমাগম' (জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখর), 'হৃদয়-বিনোদ' (কবিপণ্ডিত), 'মুণ্ডিত প্রহসন' (শিব জ্যোতির্বিদ) 'বিনোদ-রঙ্গ' (সুন্দরদেব), 'মিথ্যাচার' (বৈদ্যনাথ), 'সান্দ্রকুতূহল' (কৃষ্ণদত্ত মৈথিল) ইত্যাদি।

ভাণ : 'শ্রীরঙ্গরাজ' (গোপালরায়), 'শ্রীরঙ্গমঞ্জরী' (গোপালরায়) 'হরিবিলাস' (হরিদাস), 'শৃঙ্গারসর্বস্ব' (কৌশিক নল্লবুদ্ধ), 'মুকুন্দানন্দ' (কাশীপতি), 'অনঙ্গসর্বস্ব' (লক্ষ্মীনৃসিংহ কবি), 'শৃঙ্গারতরঙ্গিণী' (রামভদ্র), 'শৃঙ্গার-তিলক' (রামভদ্র), 'সরসকবিকুলানন্দ' (রামচন্দ্র), 'মদনগোপবিলাস' (রাম কবি) ইত্যাদি।

বীথী : 'কলাবতী' (?) 'রামাভ্যুদয় (যশোবর্মন্)।

উপরূপকের উদাহরণ হিসেবে নানা বইয়ে এইসব নাম পাই—

ভাণিকা : রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী', 'কামদত্তা' (?)

নাটিকা : 'চন্দ্রপ্রভা' (?), মথুরাদাসের 'বৃষভানুজা', রাজশেখরের 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', বিহ্লণের 'কর্ণসুন্দরী', বৈদ্যনাথের 'কৃষ্ণলীলা', কৃষ্ণকবিশেখরের 'কুবলয়বতী' ইত্যাদি।

ছায়ানাটক : বিট্‌ঠলের 'ছায়ানাটক', সুভট-র 'দূতাঙ্গদ', 'হরিদূত' (?), রামদেবের 'পাণ্ডবাভ্যুদয়' এবং 'রামাভ্যুদয়' ইত্যাদি।

গোষ্ঠী : 'রৈবতমদনিকা' (?)

হল্লীশ : 'কেলিরৈবতক' (?)

কাব্য : 'যাদবোদয়' (?)

শিল্পক : 'কনকাবতীমাধব' (?)

শ্রীগদিত : মাধব ভট্টের 'সুভদ্রাহরণ', 'ক্রীড়ারসাতল' (?)

সংকল্পক : 'মায়াকপালিকা' (?)

সট্টক : 'আনন্দসুন্দরী' (?), রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' বিশ্বেশ্বরের 'শৃঙ্গারমঞ্জরী'।

ত্রোটক : 'স্তম্ভিতারম্ভ' (?), কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'।

উল্লাপ্যক : 'দেবীমহাদেব' (?)।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, এমন সংস্কৃত নাট্যবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এগুলি হল ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র (৩০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে), ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক' (৯৭৫-৯৫), অভিনবগুপ্ত রচিত নাট্যশাস্ত্রের টীকা 'অভিনবভারতী' (৯৮০-১০৩০), সাগর নন্দীর (অভিনব গুপ্তের সমসাময়িক) 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ', ভোজদেবের 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' (১০০৫-৫৪), রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণ' (১০৯৩-১১৭৫), শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' (১১৭৫-১২৫০), বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাহিত্যদর্পণ' (১৩০০-১৩৫০)।

২. এ বিষয়ে ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৮৫) 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' (সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা) গ্রন্থে তাঁর 'মুখবন্ধ'-এর ৩-৪ অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. আমরা নাট্যশাস্ত্রের দু-টি সংস্করণ ব্যবহার করছি—এক, মনোমোহন ঘোষ কৃত ইংরেজি সংস্করণের প্রথম খণ্ড (১৯৫০, কলকাতা, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল) এবং মধুসূদন শাস্ত্রী সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭৫, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়), যাতে অভিনবগুপ্তের সংস্কৃত টীকা, এবং সে-টীকার সঙ্গে শাস্ত্রীর নিজস্ব হিন্দি ভাষ্য দেওয়া আছে। দুটি বইয়ের খণ্ড ও অধ্যায়ের মধ্যে ঠিক সংগতি নেই। ঘোষ-এর বিংশতি অধ্যায় শাস্ত্রীতে অষ্টাদশ অধ্যায় ; প্রথমটি প্রথম খণ্ডে, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় খণ্ডে। স্থলবিশেষে আমরা সিলর্ভ্যা লেবি-র *The Theatre in India*, Vol I, (1980) (নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ, কলকাতার রাইটার্স ওয়ার্কশপের প্রকাশনা—১৯৭৮) বইটিও ব্যবহার করেছি।

৪. দ্র. Schuyler, Montgomery, 1906-1977, *A Bibliogrgphy of the Sanskrit Drama*, New Delhi, Asian Publication Services., pp. 101-5.

৫. পূর্বোল্লেখ, XLIX পৃ।

৬. মধুসূদন শাস্ত্রী (সম্পা) নাট্যশাস্ত্র ১ম, অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক, তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তি, ১৪৩৪-৩৫ পৃ।

৭. তদেব, ১৪৪২ পৃ।

৮. শাস্ত্রীর [অভিনবগুপ্তের অনুসারী] মতে "দেবী" অর্থে মহাদেবী বা রানি হতে পারে, আবার যোগিনী ইত্যাদিও হতে পারে। গুরুজন হল মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য ইত্যাদি। "সার্থবাহ" কথাটি মূলে আছে, তার অর্থ সেনাপতি বা বণিক দুইই হতে পারে।

৯. p. 358।

১০. তদেব। ঘোষ এবং শাস্ত্রী পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে পৌঁছেছেন সংস্কৃত ভাষার সন্ধির নিয়মের বিপরীত ব্যাখ্যার ফলে। ঘোষের ২৩ এবং শাস্ত্রীর ২০ নম্বর শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি হল "অদ্ভুতসম্ভবদর্শনমঙ্কে'-প্রত্যক্ষজানি স্যুঃ॥" এর "অঙ্কে' প্রত্যক্ষজানি" অংশটিকে রাঘবন্-এর অনুসরণে ঘোষ পড়েন "অঙ্কে'প্রত্যক্ষজানি" অর্থাৎ "অঙ্কে+অপ্রত্যক্ষ-জানি", কিন্তু শাস্ত্রী সোজাসুজি "অঙ্কে প্রত্যক্ষজানি" পড়ে ওই ইতিবাচক ব্যাখ্যা করেন। তবে শাস্ত্রীর ৩৮ শ্লোকে আবার ও সব না-দেখানোর কথাই আছে।

১১. "বিষ্কম্ভক" সাধারণভাবে দু অঙ্কের মধ্যবর্তী দৃশ্য, যাতে নায়কের সঙ্গে সম্পর্কহীন চরিত্র আখ্যানের কোনো একটি সূত্র ধরিয়ে দেয়।
ভবভূতির 'উত্তর-চরিত'-এর দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমে বিষ্কম্ভকটি প্রসিদ্ধ। কিথ (Keith) বিষ্কম্ভককে explanatory scene ও introductory scene হিসেবে অনুবাদ করেছেন, এবং তাঁর আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি প্রবেশক বিষ্কম্ভকেরই দ্বিতীয় একটি শ্রেণী। ঘোষ প্রবেশককে introdutory আর বিষ্কম্ভককে explanatory scene বলেছেন। প্রবেশকে কেবল প্রাকৃতভাষী গৌণ চরিত্ররা থাকে।

১২. 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ', (১৩৮৫), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৫২ পৃ।

১৩. ঘোষের অনুবাদে প্রকরণের নায়কও উদাত্ত (exalted) হতে পারে এমন দেখানো হয়েছে। পৃ. 363, 52 শ্লোকের অনুবাদ। ঘোষের পক্ষে এমন যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রকরণ "মৃচ্ছকটিক"-এর নায়ক চারুদত্ত উদাত্ত নায়ক ছাড়া আর কী ?

১৪. ১৪৮৭ পৃ।

১৫. p. 366, 65 শ্লোকের 3 নম্বর পাদটীকা। 'শারদাতনয়'-এর মতে অবশ্য এক নাড়িকা হল ১২ মিনিট।

১৬. শাস্ত্রীর মতে এ হাস্য হল শৃঙ্গারলীলাজাত।

১৭. পরে দেখুন।

১৮. আগ্রহী পাঠকেরা ঘোষ অনূদিত নাট্যশাস্ত্রের ১১৪-২৯ শ্লোক, শাস্ত্রীর ১১২-২৬ শ্লোক, এবং চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ'-এর ৩১৩-১৬ পৃষ্ঠা দেখবেন।

১৯. লেবি-র পূর্বোল্লেখ, 124-131 পৃ।

২০. 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ', ৩২২ পৃ।

২১. তদেব, ৩২১ পৃ।

২২. তদেব, ৩২০ পৃ।

২৩. লেবি ভুল করে নাড়িকাকে ৪৮ মিনিট ধরেছেন, তাঁর বইয়ে এই সময় ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট।

ধনঞ্জয় ও সংস্কৃত নাটকের ব্যাকরণ

'দশরূপক' গ্রন্থের রচয়িতা ধনঞ্জয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদের মানুষ। মালব তাঁর দেশ, সেখানে পরমারবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বাক্‌পতিরাজ বা মুঞ্জ-এর সভাসদ ছিলেন তিনি। মুঞ্জের শাসনকাল ৯৭৪ থেকে ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, এ থেকে ধনঞ্জয়ের সময়েরও একটা আভাস পাওয়া যায়। ধনঞ্জয়ের পিতার নাম বিষ্ণু। তিনি মালবের রাজধানী ধারার অধিবাসী ছিলেন।

ধনঞ্জয়ের নিজের সম্বন্ধে খুবই কম ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে পাই ধনিককে। এঁরও পিতার নাম বিষ্ণু এবং এই ধনিক 'দশরূপক'-এর আদি টীকাগ্রন্থ 'অবলোক'-এর রচয়িতা। তিনি নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে—নাটক এবং অন্যান্য রচনা থেকে—দৃষ্টান্তের সাহায্যে ধনঞ্জয়ের সূত্রগুলিকে বিশদ করেছেন, যদিও তাঁর অবলম্বিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' এবং ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'-কেই তিনি ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে বেশি। সব সংস্করণেই 'দশরূপক'-এর সঙ্গে এখন ধনিকের টীকা জুড়ে দেওয়া থাকে। ধনিক নিজেও মুঞ্জের সভাসদ, সম্ভবত মন্ত্রী, ছিলেন। কিথ ধনঞ্জয় এবং ধনিককে দু ভাই হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

'দশরূপক' লিখতে গিয়ে ধনঞ্জয় মূলত ভারতের নাট্যশাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগই মান্য করেছেন। নাটকের ঐ দশরকম ভাগ ভরতেরই, এগুলির সংজ্ঞা ও বিবৃতিও মূল নাট্যশাস্ত্রেই ছিল। তবে ধনঞ্জয় তাঁর বিষয়কে আলাদা করে এনে আরো সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করেছেন বলা চলে। নায়িকাদের রূপভেদ বর্ণনায় এবং আদিরসের ব্যাখানে ভরত থেকে তিনি সরে এসেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকত্ব যৎসামান্য। তাঁর শ্লোকগুলিকে কিথ বলেছেন 'কেঠো'(wooden) কিন্তু অনুবাদক Haas সাধারণভাবে এগুলিতে উৎকর্ষ লক্ষ করেছেন, বলেছেন, এগুলি ভরতের মূলগ্রন্থকে সফলতার দিক থেকে হারিয়ে দিয়েছে। সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ'-এর বাংলা অনুবাদক সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অবশ্য ধনঞ্জয়কে একদেশদর্শী, এবং যান্ত্রিক বলেছেন। বলেছেন, তাঁর বহু বিশ্লেষণ

যুক্তিসম্মত নয় ; এমন কি, হয়তো 'নাট্যশাস্ত্র'-এর সঙ্গে ধনঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয়ই ছিল না। "প্রথম পাঠার্থীর এই গ্রন্থপাঠে ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাই সৃষ্টি হয়।" এই জন্য আমরা পাশাপাশি অন্যদের মতও খানিকটা তুলে দিচ্ছি।

নিচের অনুবাদে ধনঞ্জয়ের বইয়ের চারটি অংশের প্রথম অংশটির অনুবাদ এবং মূলত ধনিকের 'অবলোক' নির্ভর করে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হল। এটি যাতে পাণ্ডিত্যের চেহারা না নেয়, তার চেষ্টা করা হয়েছে। দশরূপক-এর চারটি অংশ ঃ প্রথমটিতে নাটকের বিষয়, প্লট এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এটিই এখানে আমাদের আশ্রয় ; দ্বিতীয়টিতে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের ভেদনির্ণয় এবং নাটকের ভাষারীতি সম্বন্ধে কথন ; তৃতীয়তে পূর্বরঙ্গ ও নাটকের দশটি শ্রেণীর বিবৃতি ; সবশেষে ভাব ও রস সংক্রান্ত আলোচনা। অর্থাৎ বিশেষভাবে নাট্যের অঙ্গীভূত বিষয় নিয়েই তাঁর বক্তব্য।

প্রাথমিক সংজ্ঞা

নাট্য আর কিছুই নয়, তা অবস্থার (ঘটনার) অনুকরণ। একে রূপও বলা হয়, কারণ নাট্য মূলত দৃশ্য অর্থাৎ চোখে দেখবার জিনিস। একে রূপক বলে কেন ? এইজন্য যে, এতে অভিনেতারা যে ভূমিকায় অভিনয় করছেন তার ভান করে থাকেন অর্থাৎ নিজেরা অন্যদের চরিত্রকে প্রকাশ করেন। একজনের উপর আরেকজনের চরিত্র আরোপ করা হয় বলেই এর নাম রূপক।

নাট্য বা অভিনেয় নাটক দশরকমের, আর নাটকমাত্রেরই মূল আশ্রয় হল রস। এই দশ রকমের নাটকের নাম যে ১. নাটক, ২. প্রকরণ, ৩. ভাণ, ৪. প্রহসন, ৫. ডিম, ৬. ব্যায়োগ, ৭. সমবকার, ৮. বীথী, ৯. অঙ্ক (বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক) এবং ১০. ঈহামৃগ—তা আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি।

নাটকের সহায়ক অন্যান্য শিল্প : অভিব্যক্তি (Pantomime) ও নাচ

ধনঞ্জয় মূকাভিনয়কেই 'নৃত্য' নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে নৃত্য হল তাই, যা মানসিক অবস্থা বা ভাবকে প্রকাশ করে। নাট্য আর নৃত্য এক নয়, কারণ নাট্য প্রকাশ করে রসকে, আর নৃত্য প্রকাশ করে ভাবকে। আবার 'নৃত্ত' বা নাচও নাটক থেকে আলাদা, কারণ নৃত্ত রস বা ভাব কিছুকেই প্রকাশ করে না। ছন্দ ও তাল অনুসরণ করে যে-দেহভঙ্গি তারই নাম নৃত্ত। অনেকটা সাঁওতাল

বা অন্যান্য আদিবাসীদের নাচ যেমন। তাতে শৃঙ্গার, করুণ ইত্যাদি রস প্রকাশ করার চেষ্টা নেই, সুখদুঃখের মতো ভাবকেও ফোটানো হয় না ; কেবল দেহের সুনিয়মিত ভঙ্গিতে ছন্দ ও তালকে মূর্তি দেওয়া হয়। অর্থাৎ 'নৃত্ত' অনুকরণাত্মক বা mimetic নয়। ইদানীংকালে কেউ কেউ কথকের তাল ও লয়কারীতে, ওড়িশীয় 'তারিঝম্' অংশে 'নৃত্ত'-এর অধিকার লক্ষ করেছেন। 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত'-এর মধ্যে আরো তফাত এই—প্রথমটা 'মার্গ' বা শাস্ত্রীয়, অর্থাৎ একটি মার্জিত শিল্পকলা হিসেবে গড়ে উঠেছে, দ্বিতীয়টা 'দেশী' অর্থাৎ লোককলা হিসাবে জনসাধারণের মধ্যেই প্রচলিত। শারদাতনয়ের 'ভাব-প্রকাশন'-এ অবশ্য দুটোকেই এক জিনিস হিসেবে দেখানো হয়েছে।

এই নৃত্য ও নৃত্ত দুয়েরই আবার দুরকম রূপ হতে পারে। একটা মধুর, যার নাম লাস্য, আর একটা উদ্দাম—যার নাম তাণ্ডব। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম :
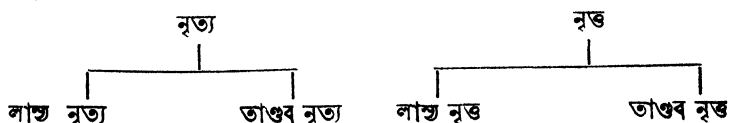
তবে 'নৃত্ত' যদি কেবল ছন্দোময় এবং অভিব্যক্তিহীন দেহভঙ্গিমা হবে, তাকেও 'লাস্য' ও 'তাণ্ডব'—এই দুভাগে কেন ভাগ করা হল তা বোঝা যাচ্ছে না। 'লাস্য' আর 'তাণ্ডব' কি অভিব্যক্ত ভাব নয়? যাই হোক, নৃত্য ও নৃত্ত—দুইই দশ রকমের নাটকের, অর্থাৎ দশ 'রূপকে'র সহায়তা করে, নাটকে এদের প্রচুর কাজে লাগানো হয়। কিন্তু তবু নৃত্য ও নৃত্ত নাটক নয়। সিলবাঁয় লেবি নৃত্তের অনুবাদ করেছেন dance, আর নৃত্যের অনুবাদ করেছেন mime। নাটক তাঁর কাছে drama বা dramatic form। এ তফাত তিনি বুঝেছেন এইভাবে—Dance is exclusively concerned with rhythm and beat ; mime is limited to the physical manifestations (*bhāvas*) of emotions, whereas the drama shows the emotions in the heart itself (*rasa*)। কাজেই নাটকের যে 'spiritual quality' আছে তা নৃত্য ও নৃত্তের নেই। এ দুটির উপর নির্ভর করে যে দৃশ্যাত্মক কলা গড়ে উঠেছে, 'সাহিত্যদর্পণ'-এ তার নাম 'উপরূপক' দেওয়া হয়েছে। উপরূপক-এ কাব্য গৌণ, নৃত্য ও নৃত্তই মুখ্য উপাদান। নাটক হল পুরোদস্তুর 'রূপক'।

বিষয়-বস্তু, নায়ক ও রস অনুযায়ী নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

বিষয়-বস্তুর শ্রেণীবিভাগ

বিষয়-বস্তু দু'রকমের : ১. প্রধান বিষয় বা 'আধিকারিক', ২. গৌণ বিষয় বা 'প্রাসঙ্গিক'। মূল কাহিনী এবং উপকাহিনী বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে যথাক্রমে আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিকের খুব একটা প্রভেদ নেই। আধিকারিক কী জানতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে 'অধিকার' আর 'অধিকারী' কী বস্তু। 'অধিকার' বলতে বোঝায় প্রার্থিত বস্তু হস্তগত হওয়া, অর্থাৎ অভীষ্টলাভ। আর যে ঐ ঈপ্সিত বস্তু পায় সে হল 'অধিকারী'। এই অধিকার, অর্থাৎ নায়ককে নিয়ে—নায়কের বাসনাপূরণকে নিয়ে যে মূল ঘটনা তারই নাম 'আধিকারিক'।

যদি অন্য কারো প্রয়াস বা ইচ্ছা প্রসঙ্গক্রমে নায়কের ইচ্ছাপূরণের সহায়তা করে তবে সেই সহায়ক প্রয়াস বা উদ্যমের নামই হল 'প্রাসঙ্গিক'। সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ'-এ একে 'আনুষঙ্গিক'ও বলা হয়েছে। সাগরনন্দীর মতে, ফলপ্রাপ্তির জন্য আধিকারিক বা 'অধিকৃত'ই প্রধান ; তা ছাড়া অন্য হলে 'প্রাসঙ্গিক'। এর উদাহরণ, রাবণ-বধ—এই প্রধান লক্ষ্যের জন্য রামের সুগ্রীবকে নিজের পক্ষে আনতে হবে, কাজেই 'আনুষঙ্গিক' বালীবধ ঘটল। কাজেই এমনও কেউ কেউ বলেন যে, প্রধান ঘটনার পরিপোষক বা সহায়ক ঘটনাই হল 'প্রাসঙ্গিক'।

যখন নাটকের এই আনুষঙ্গিক ঘটনা খানিকটা প্রাধান্য পায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলে তখন তার নাম 'পতাকা' ; যদি প্রাসঙ্গিক আখ্যানটি সংক্ষিপ্ত ও অল্প সময়ের ঘটনা হয়, তবে তার নাম 'প্রকরী'। অনেকে 'পতাকা' বলতে উপনায়কের চরিত্রটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু সেটা স্থূল ব্যাখ্যা। পতাকা আসলে episode বা উপকাহিনীরই নাম—পতাকাবৃত্ত। কিন্তু 'রত্নকোশ'-এ এও বলা হয়েছে যে, যার বৃত্ত অর্থাৎ অবস্থিতি পরের (অর্থাৎ এক্ষেত্রে নায়কের) প্রয়োজনে—যে প্রধানের বা নায়কের উপকারে আসবে আর সেই সঙ্গে পৌরুষের আতিশয্যে যে নিজেও প্রধানের অনুরূপ বলে কল্পিত হবে, সে-ই 'পতাকা'। যেমন ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'-এ কর্ণের চরিত্র একদিকে দুর্যোধনের উপকার করতে, অন্য দিকে নিজে পৌরুষ প্রকাশের জন্যও নিবদ্ধ হয়েছে। 'রত্নকোশ'-এ 'প্রকরীর' ব্যাখ্যাতে ঐ স্বল্পস্থায়িত্বের কথাটা বলা

হয়েছে।

নাটকের আখ্যানের বাইরের অন্য কোনো বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়ে আসন্ন ঘটনার আভাস দেওয়া হয়। যা দিয়ে ঐ আসন্ন ঘটনার আভাস দেওয়া হয় তাকে বলা হয় 'পতাকাস্থানক'। পতাকাস্থানকের মধ্যে কখনও পরবর্তী ঘটনার অনুরূপ ঘটনা বা অবস্থা দেখানো হয়, কখনও পরবর্তী ঘটনার গুণ বা স্বভাবের অনুরূপ গুণ বা স্বভাবসম্পন্ন কোনো ঘটনা দেখানো হয়। পাত্রপাত্রীরা হয়তো একটা বিষয়ে কথা বলছে, তখন নতুন একটি চরিত্র এসে পড়ল, সে এসে (বা অন্য কোনো ভাবে) যে-বিষয় চলছে তার বাইরে ভাবী কোনো ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে গেল। এই ব্যাপারটাই পতাকাস্থানক।

বিষয়-বস্তুর আরেকটি শ্রেণীবিভাগ

বিষয়-বস্তু আর এক হিসেবে তিন রকমের : ১. 'প্রখ্যাত' অর্থাৎ প্রচলিত কাহিনী—কাব্য, পুরাণ ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে যা তৈরি ; ২. 'উৎপাদ্য' —কবির নিজের উদ্ভাবিত বিষয়, আর ৩. মিশ্র—এ দুয়ের মিশ্রণে তৈরি এবং তাতে দেবতা মানুষ ইত্যাদি অনুযায়ী আবার ভাগ থাকবে। মাতৃগুপ্তের (এঁর মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত) দেওয়া নাটকের লক্ষণে—'ইতিবৃত্তং কথোদ্‌ভূতং কিঞ্চিদুৎপাদ্য বস্তু চ' কথাটিতে ঐ মিশ্র ধরনের বিষয়বস্তুরই হয়তো স্বীকৃতি আছে।

প্লট বা ঘটনাবৃত্তের উপাদান বা অর্থপ্রকৃতি

ঘটনার পরিণতির নাম 'কার্য'। এই কার্য অংশটির মূল আশ্রয় হল মানব-জীবনের তিনটি যে-অভীষ্ট [ধর্ম, অর্থ, কাম] অর্থাৎ ত্রিবর্গ, তার একটি। এই পরিণাম বা কার্যের যা কারণ, তাই হল কাহিনীর 'বীজ'। প্রথমে এই বীজ আভাসমাত্র থাকে, পরে তা পত্রেপুষ্পে বিকশিত হয়ে ফলের জন্ম দেয়। সাগরনন্দী অজ্ঞাতনামা একজনের মত উদ্ধার করেছেন, তাতে নাটকের পাঁচটা সন্ধিতে বীজকে যথাক্রমে উপ্ত, উৎপত্র, উদ্ধত, অন্বিষ্ট এবং ফলিত—এই পাঁচটি ক্রমবিকাশী পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে বলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিকাশ। নাটকের প্লটের আর একটি উপাদান হল 'বিন্দু'। তেলের ফোঁটা যেমন করে জলে ছড়িয়ে যায় নাটকের ঘটনায় বিন্দুর কাজও সেই রকম বিস্তারিত হওয়া। এই উপমা খুব যথাযথ নয়, কারণ বিন্দুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যদি কখনও কখনও নাটকের ঘটনা ব্যাহত হয়, তার পরে যে-ঘটনা থেকে আবার তা

নতুন প্রবর্তনা লাভ করে, তাই বিন্দু। মূল ঘটনা যদি অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে যে-ঘটনা ঐ বাধা অতিক্রম করে তাকে আবার জুড়ে দিয়ে মূল রাস্তায় চলতে সহায়তা করে, তাই বিন্দু। উদাহরণ হিসাবে দেখানো যায়, 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্কে মদনোৎসব একটি অবান্তর ঘটনা, নাটকের মূল ঘটনাতে তা একধরনের বিরতি এনেছে। যেই ঐ উৎসব শেষ হল, রত্নাবলী হঠাৎ আবিষ্কার করল যাকে সে এতক্ষণ মদনদেব ভেবেছিল তিনি আর কেউ নন, রাজা স্বয়ং—তাঁর অনুরাগের লক্ষ্য। তক্ষুনি নাটকের ঘটনা আবার সবল পদক্ষেপে চলতে শুরু করল। রত্নাবলীর ঐ আবিষ্কারই 'বিন্দু'। বিন্দু আসলে কাহিনীর ধারাবাহিকতার সূত্রটি ধরিয়ে দেয়। 'রত্নকোশ'-এ বিন্দু কথাটির আরো দুটি ব্যাখ্যা আছে।

তাহলে প্লটের অংশ, উপাদান বা 'অর্থপ্রকৃতি' দাঁড়াল এই পাঁচটি : ১. বীজ, ২. বিন্দু, ৩. পতাকা, ৪. প্রকরী, ৫. কার্য।

নাট্যঘটনার পাঁচটি পর্যায় বা অবস্থা

নাট্যঘটনার 'অবস্থা' বা পর্যায়ও পাঁচটি। যথাক্রমে সেগুলি হল : আরম্ভ, যত্ন বা প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম বা ফলযোগ।

আরম্ভ হল 'বীজ' বা প্রত্যাশিত বস্তু লাভের জন্য আগ্রহ বা ঔৎসুক্য যাতে প্রকাশিত হয়, সেই অংশ। যখন নায়ক বা অন্য কেউ আমাকে এই করতে হবে', 'এটা পেতে হবে' এই রকম কথা বলতে থাকে, ঐ সংকল্প-প্রকাশক অংশই হল 'আরম্ভ'। যখন সংকল্প বা প্রত্যাশা-পূরণের বাধা দেখা দেয়, তখন তা লাভের জন্য আরো আন্তরিক ও অধীর চেষ্টার নামই 'যত্ন' বা 'প্রযত্ন'। প্রযত্ন আসলে একটি উপায় বা কৌশল ছাড়া কিছু নয়, যা দিয়ে প্রার্থিত বস্তু দুর্লভ হলে তাকে পাবার প্রয়াস করা হয়। 'প্রাপ্ত্যাশা' হল প্রাপ্তির বা প্রার্থনাপূরণের আশা যখন সফল হতে চলেছে, অভীষ্ট হাতের কাছেই—এই রকম অবস্থা। এর সঙ্গে না-পাওয়ার ভয়ও মিশে থাকে। যে অভিব্যক্তি বা উক্তিতে এই আশা-নিরাশার আভাস, তারই নাম প্রাপ্ত্যাশা। 'রত্নাবলী' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আশাব্যাকুল রত্নাবলী প্রিয়মিলনের উপায় হিসেবে বেশ-পরিবর্তন করছে। তার মন উৎসুক, ওদিকে ভয়ও আছে, যদি মহারানি বাসবদত্তা হঠাৎ এসে নায়ককে সরিয়ে নেন। নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য 'প্রাপ্ত্যাশা'র জায়গায় আছে 'প্রাপ্তিসম্ভব' নামে অবস্থা। তার অর্থ : বাস্তবে

নয়, মনে মনে ফললাভ, খানিকটা wishful thinking বা দিবাস্বপ্নের মতো। 'নিয়তাপ্তি' বা 'নিয়তা ফলপ্রাপ্তি' হল ফললাভ যখন সুনিশ্চিত—সেই অবস্থার নাম। এখানে আর কোনো শঙ্কা বা সংশয় নেই। শকুন্তলার আংটি ফিরে পাওয়াতে যা ঘটল; ভরত এর নাম দিয়েছেন 'নিয়তা ফলপ্রাপ্তি'। 'রত্নকোশ'-এ সাগরনন্দী অশ্মকুট্টের (প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের আচার্য ভরতের শতপুত্রের অন্যতম ?) মত তুলেছেন, তাতে বলা হয়েছে, পর-পর শত্রুহানিই হল নিয়ত ফলপ্রাপ্তি। তার পরে আশঙ্কা বা উদ্‌বেগের কারণ সামান্যই থাকে। 'জানকী-রাঘব' নামে একটি লুপ্ত নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে লক্ষ্মণ রামকে বলছে, "বিশাল কুম্ভকর্ণ গাছটিকে আপনি কেটেছেন, ইন্দ্রজিৎ নামক কাণ্ডটিও ভূতলশায়ী, আর কুণ্ড (?) রূপী গহন ঝোপটিও পরিষ্কার করে দিয়েছেন আপনি। এখন বাকি আছে সুগম স্থানে রাবণরূপী একটিমাত্র জরাজীর্ণ গাছ, বিপদ-অরণ্য ধ্বংস হয়েছে। আর্য বৃথা দুশ্চিন্তা করছেন কেন ?" 'ফলাগম' বা 'ফলপ্রাপ্তি' বা 'ফলযোগ' সর্বকার্যসিদ্ধিরই অন্য নাম। যেমন 'রত্নাবলী'তে রাজার রত্নাবলী-লাভ ও সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া।

'রাঘবাভ্যুদয়' নামে লুপ্ত একটি নাটকের কাহিনী অবলম্বনে মাতৃগুপ্ত এই পাঁচটি অবস্থা এভাবে বিবৃত করেছেন—রাবণবধের চূড়ান্ত লক্ষ্যের জন্য খর ইত্যাদির নিধন হল 'প্রারম্ভ', 'প্রযত্ন'-এর অবতারণা ঘটিয়েছে শূর্পনখা—সীতাহরণের উপলক্ষ্য হয়ে; সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুত্বস্থাপনে এসেছে 'প্রাপ্তিসম্ভব' ('প্রাপ্ত্যাশা' ?), কুম্ভকর্ণ ইত্যাদির বধে 'নিয়তা ফলপ্রাপ্তি' এবং রাবণবধে 'ফলযোগ'।

পঞ্চসন্ধি

সন্ধি হল নাটকের সাংগঠনিক বিভাগ। একটানা প্রবাহিত ঘটনাক্রমের একটার সঙ্গে আর একটার সংযোগের নামই সন্ধি। নাটকের উপাদান বা অর্থ-প্রকৃতি পাঁচটি, কাজেই সন্ধিও পাঁচটি। এই পাঁচটি সন্ধির নাম : মুখ (the exposition), প্রতিমুখ, (the counter-exposition) গর্ভ, (the embryo) অবমর্শ (the deliberation) এবং নির্বহণ (the denouement)।

১. মুখসন্ধি এবং তার উপবিভাগ

মুখসন্ধিতে বীজের উদ্‌গম; এখান থেকেই আখ্যানের শুরু এবং এখান

থেকেই নানা প্রসঙ্গ ও ভাবের সূত্রপাত। মাতৃগুপ্তের মতে মুখসন্ধিতে থাকবে তিনটি জিনিস : প্রার্থনা, বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য ; আরম্ভ, কারণের অন্বেষণ ; বীজ অর্থাৎ যা সাধন করতে হবে তার উপস্থাপন। মুখসন্ধির বারোটি উপবিভাগ আছে—সব ক'-টিই বীজ-এর প্রকাশ বা সমুৎপত্তির জন্য প্রয়োগ করা হয়। মুখসন্ধি থেকেই 'আরম্ভ' অংশের অবতারণা ঘটে। মুখসন্ধির বারোটি উপবিভাগ বা পর্যায় হল :

> উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি বা উক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, ভেদ, এবং করণ।

উপক্ষেপ (Suggestion)

মুখসন্ধির যে অংশের নাম 'উপক্ষেপ' তাতে বীজের উল্লেখ করা হয় বা আভাস দেওয়া হয়। কাব্যার্থের উৎপত্তিই উপক্ষেপ। 'রত্নাবলী'র প্রথমাঙ্কে সূত্রধার বলছে, "দ্বীপান্তরে, সমুদ্রে বা দিগন্তে যেখানেই থাক না কেন, বিধি অনুকূল হলে মিলন ঘটবেই।" এই কথায় নায়কের রত্নাবলী লাভের সূক্ষ্ম আভাস দেওয়া হয়েছে। এই ইঙ্গিতই নাটকে নানা ঘটনার মধ্যে বিস্তারিত হবে, বীজ পল্লবিত হবে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এ "সসাগরা ধরণীর অধিপতি পুত্রলাভ করুন"—দুষ্মন্তকে সন্ন্যাসীর আশীর্বাদের পর থেকে রাজার উক্তি "তাহলে তাকে (শকুন্তলাকে) আমি দেখতে পাব" পর্যন্ত নাকি এই উপক্ষেপ।

পরিকর বা পরিক্রিয়া (Enlargement, Multiplicity, Intimation of coming events)

বীজের বেড়ে ওঠার প্রকাশ মুখসন্ধির যে-অংশে, তার নাম 'পরিক্রিয়া'। অথবা উপক্ষেপের বিস্তারই পরিকর। কিংবা, কাব্যার্থের উৎপত্তির পর অর্থের যে বাহুল্য তাই পরিকর। 'রত্নাবলী'তে উপক্ষেপে যৌগন্ধরায়ণের কথায় ঐ প্রসঙ্গ-বিস্তার ঘটছে।

পরিন্যাস (Establishment, Completion)

বীজের উল্লেখ সমাপ্ত হয় মুখসন্ধির যে-অংশে, 'পরিন্যাস' তাকেই বলে। পরে যৌগন্ধরায়ণ সূত্রধারের ঐ কথাকেই সমর্থন করে বলছে, "দৈব সহায়, সিদ্ধপুরুষের কথা ফলবেই" ইত্যাদি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এর প্রথমাঙ্কে শকুন্তলার সৌন্দর্যে

অভিভূত দুষ্মন্ত তাকে রানি করার কথা ভাবছে—"ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে বাধা নিশ্চয়ই নেই, আমি যখন এত আকর্ষণ বোধ করছি এর প্রতি। সজ্জনের সংশয় উপস্থিত হলে হৃদয়ের নির্দেশ অনেক সময় সে সংশয়ের নিরসন করে দেয়"। এতেই বীজের উল্লেখ সমাপ্ত।

বিলোভন (Allurement)

নায়ক ইত্যাদির বিবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করে মুখসন্ধির যে-অংশে নায়িকা প্রভৃতির (বা উল্‌টোপক্ষে নায়িকার প্রশংসা ক'রে নায়কের) চিত্ত আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়, সে অংশই 'বিলোভন'। 'রত্নাবলী'র প্রথম অঙ্কের শেষে একটি বৈতালিকের গানে এইরকম বলা হচ্ছে, "সূর্য অস্ত গেল, এখন সভায় নৃপসমাগম হচ্ছে। এখন উদয়নরূপ চন্দ্রের উদয়, রাজারা তাঁর পদ্মের চেয়েও সুন্দর চরণ সেবা করবে, অসামান্য শোভাশালী মুখ দেখে দৃষ্টি কৃতার্থ করবে"। সাগরিকা তা শুনে অভিভূত হচ্ছে এবং ফিরে উদয়নকে দেখে তার এই মুগ্ধতা প্রেমে রূপান্তর লাভ করছে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এর প্রথম অঙ্কে রাজার চার স্তবকে শকুন্তলার রূপপ্রশস্তি এবং সেই সঙ্গে প্রিয়ংবদার কৌতুক মিলে হল ঐ নাটকের বিলোভন। সিলর্ব্যাঁ লেবি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যে-কোনো প্রশংসাবাক্যই কিন্তু বিলোভন নয়। নাটকের বীজ-এর বা অভীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত গুণবর্ণনাই বিলোভন।

যুক্তি (Reason, Resolve, Deliberation)

উদ্দেশ্যের জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গ যে-অংশে, তার নাম 'যুক্তি'। অথবা অন্য একটি মতে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজের মনে যুক্তি-বিচারের অংশকেই যুক্তি নাম দেওয়া হয়েছে। লেবি বলছেন যুক্তি হল conception of a plan। 'রত্নাবলী'র প্রথম অঙ্কের 'বিষ্কম্ভক'-এ যৌগন্ধরায়ণের স্বগতোক্তিতে এই 'যুক্তি'র উদাহরণ আছে। সে রত্নাবলী ও রাজার মিলনের ষড়্‌যন্ত্র করছে। নানা ঘটনা তার সহায় হয়েছে—পাটরানির হাতে রত্নাবলীকে সঁপে দেওয়া হয়েছে, সিংহলরাজের মন্ত্রী ও কঞ্চুকী সমুদ্রে নিমজ্জনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, রুমণ্‌-বতের পক্ষে যোগ দিয়ে কোশলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে।—এইসব তার স্বগতোক্তিতে বিবেচনার আকারে প্রকাশিত, তাই তার নাম যুক্তি।

প্রাপ্তি (Success)

সুখলাভের নামই প্রাপ্তি, বা আনন্দজনক বিষয়ের যে-উপস্থাপন, তারই নাম 'প্রাপ্তি'। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের প্রথমাঙ্কে ভীম বলেছেন, "ক্রোধে কি হত্যা করব না একশ কৌরবকে এই যুদ্ধে? পান করব না দুঃশাসনের বুকের রক্ত? গদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করব না দুর্যোধনের দুই উরু? করুন-গে তোমাদের রাজা পণ দিয়ে সন্ধি, (আমার কাজ আমি করব)।" ভীমের রুদ্রক্রোধময় সংকল্প শুনে দ্রৌপদীর শান্তি হল। তিনি বললেন, "নাথ, এই কথাগুলি আর কেউ বলেনি, আমার মিনতি, আপনি আবার বলুন, আবার বলুন।" ভীমের ক্রোধের মধ্যে নাটকের 'বীজ'-এর ইঙ্গিত, দ্রৌপদীর এই কথার মধ্যে মুখসন্ধির 'প্রাপ্তি' অংশ।

সমাধান (Setting)

'বীজ'-এর আবির্ভাব বা প্রকাশ মুখসন্ধির যে-অংশে, তারই নাম 'সমাধান'। 'রত্নাবলী'তে বাসবদত্তা সাগরিকাকে রাজার চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। প্রথম অঙ্কে এই উদ্দেশ্যে মদনোৎসবের দিন তিনি তাকে উৎসবস্থলে থাকতে মানা করেন। সাগরিকা কৌতূহলবশত সকলের অলক্ষ্যে থেকে রাজাকে দেখে ফেলে এবং অনুরাগবতী হয়। বাসবদত্তার উক্তি থেকে সমাধান অংশের সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ এখানেই রত্নাবলী-বৎসরাজের মিলনের 'বীজ' প্রকাশিত হয়েছে।

বিধান (Conflict of feelings)

মুখসন্ধির সেই পর্যায়ের নাম 'বিধান', যে-পর্যায়ে নায়ক বা নায়িকার চিত্তে সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়। ভবভূতির 'মালতীমাধব'-এর প্রথম অঙ্কে মালতীকে দেখে মাধবের প্রাণে এইরকম অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল : মুহূর্তের দেখা, তাতেই হৃদয় যেমন আনন্দময় অমৃতের প্লাবন বয়ে গেছে, তেমনি অদর্শনে মনে হল হৃদয় জ্বলন্ত অঙ্গারের চুম্বন পেয়েছে—সে এক বিষামৃতময় অনুভূতি।

পরিভাব, পরিভাবনা (Surprise)

মুখসন্ধিতে বিস্ময়ের বা কৌতূহলের উপাদানকে 'পরিভাবনা' (ছন্দের খাতিরে শুধু 'পরিভাব' কথাটা প্রয়োগ করা হয়েছে) বলা হয়। যেমন,

'রত্নাবলী' নাটকে, সাগরিকা মদনদেবের পূজা করছে, দেবতা সে পূজা স্বহস্তে গ্রহণ করছেন দেখে সাগরিকার বিস্ময়। আসলে নায়ক বৎসরাজ উদয়ন নিজেই যে মদনদেব সেজে আছেন সাগরিকা তা জানে না, তাই সে বিমূঢ় বোধ করছে।

উদ্ভেদ (Disclosure)

কোনো গোপন বা অগোচর তথ্য প্রকাশ করা হয় মুখসন্ধির যে অংশে, তার নাম 'উদ্ভেদ'। 'রত্নাবলী' নাটকে যখন রত্নাবলী হঠাৎ জানতে পারলে যে, মদনদেব আর কেউ নয়, স্বয়ং ছদ্মবেশী বৎসরাজ উদয়ন, তখনই 'উদ্ভেদ' ঘটল। হঠাৎ 'বীজ'-এর আবির্ভাব হল আবার, সুতরাং পুরোনো মেটাফর টেনে এ পর্যায়টিকে 'উদ্ভেদ' বলা হয়েছে। মতান্তরে বীজার্থের অঙ্কুরোদ্‌গমই উদ্ভেদ। 'রত্নকোশ'-এ বলছে, "মারীচাদি বধের মাধ্যমে অমিততেজা রাম রাবণবধরূপ বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটাইয়াছেন।"

করণ (Activity, Beginning of the action)

মূল বৃত্তান্তের আরম্ভ হয় মুখসন্ধির 'করণ' অংশে। 'বেণীসংহার'-এর প্রথম অঙ্কে যখন পাণ্ডবভ্রাতারা কৌরবদের ধ্বংসের উদ্যোগ আরম্ভ করল, তখনই 'করণ' অংশের অবতারণা। সহদেব ভীমকে বলছে, "আর্য, এখন আমরা গুরুজনদের অনুজ্ঞা পেয়েছি, এখন আমাদের বিক্রমের যোগ্য কাজে আমরা প্রবৃত্ত হব।" তারপর ভীম বলছে, "আমরা চললাম এখন কুরুকুল ধ্বংস করতে।" তারপর সংগ্রামের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির আরম্ভ অংশই 'করণ'।

ভেদ (Incitement, encouragement, assurance)

উৎসাহ বা প্রবর্তনা বা অনুপ্রেরণা দেওয়া হয় মুখসন্ধির যে-অংশে, তারই নাম 'ভেদ'। ধনঞ্জয়ের মত এই, কিন্তু ভরত বা 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথের মত অন্যরকম। তাঁরা বলেন (ভেদ-এর ধাতুগত অর্থ ধরে), ভেদ হল বিচ্ছেদ। 'বেণীসংহার'-এর প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ভীম অন্য ভাইদের থেকে আলাদা হওয়ার কথা বলছে, কারণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দীর্ঘ বিচার-বিবেচনা, হিতাহিতচিন্তা তার আর সইছে না। যুধিষ্ঠির কৌরবদের সঙ্গে যে-সন্ধি করেছিল, ভীম তা মানবার জন্য প্রস্তুত নয়, ফলে সহদেবকে সে বলছে, "আজ থেকে আমি তাহলে আমার পথ দেখছি, তোমাদের সঙ্গে আর থাকছি না।" অন্যদিকে

ধনঞ্জয় 'ভেদ' এর যে-অর্থ ধরেছেন তার নিদর্শনও আছে 'বেণীসংহার'-এ। প্রথম অঙ্কের একেবারে শেষে দ্রৌপদী বলছে—"নাথ! দ্রোপদীর অপমানে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে, দেখো যেন রণক্ষেত্রে আপন শরীরের প্রতি উদাসীন হোয়ো না—কেন না, শুনতে পাই নাকি, শত্রুসৈন্যের মধ্যে অতি সাবধানে বিচরণ করতে হয়।" একথা শুনে ভীমের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। সুতরাং এই ব্যাপারটাই ধনঞ্জয়ের মতে ভেদ।

মুখসন্ধির এই বারোটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছ-টি অর্থাৎ উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, যুক্তি, সমাধান এবং উদ্ভেদ—এগুলিকে নাটকে রাখতেই হবে, এইরকম একটি নির্দেশ আছে। মনে রাখতে হবে, মুখসন্ধির এই বারোটি লক্ষণ পর্যায়ক্রমী নয়, অর্থাৎ একটার পর আর একটা—এভাবে আসে না, অঙ্কের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। 'বেণীসংহার'-এর প্রথম অঙ্ক খুললে দেখা যাবে, সেখানে 'ভেদ' আগে ঘটছে, 'প্রাপ্তি' তার পরে, 'করণ' তারও পরে। সেক্ষেত্রে 'রত্নকোশ'-এর অনুবাদে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'অভিনবভারতী' অবলম্বনে 'ভেদ'-এর এই ব্যাখ্যা দাঁড়ায় না যে, "নিজ নিজ প্রয়োজন উপস্থাপিত করিয়া একত্র মিলিত পাত্রগণের যে নিষ্কাশন তাহাই ভেদ।" তিনি বলছেন 'ভেদ' আসবে অঙ্কের একেবারে শেষে, exeuent omnes-এর উপলক্ষ্য হিসাবে। ড. চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করছেন, 'নাট্যদর্পণ' প্রত্যেক (?) অঙ্কের শেষে 'ভেদন' অঙ্গটিকে আবশ্যিক বলে ফতোয়া দিয়েছে।

২. প্রতিমুখসন্ধির নানা অংশ

মুখসন্ধিতে যে বীজটি ন্যস্ত হল প্রতিমুখসন্ধিতে কখনও সে-বীজকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়, কখনো তা আবার লুকিয়ে পড়ে। যেমন 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কের 'বীজ' অর্থাৎ বৎসরাজ ও সাগরিকার পরস্পরের জন্য অনুরাগ একটু প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কারণ সুসঙ্গতা আর বিদূষক সেকথা জেনেছে, আর বাসবদত্তাও একটু অনুমান করেছেন। অর্থাৎ নাটকের মূল লক্ষ্য কখনো গোচর, আবার হয়তো বা পরমুহূর্তেই অগোচর হচ্ছে এ সন্ধিতে—
কখনো উজ্জ্বল কখনও নিস্তেজ হচ্ছে। 'বিন্দু' এবং 'প্রযত্ন' প্রতিমুখসন্ধিরই অন্তর্গত। প্রতিমুখের অঙ্গ তেরোটি : বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, শমন বা শম, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমণ, নিরোধ, পর্যুপাসনা, বজ্র, পুষ্প, উপন্যাস, বর্ণসংহার।

বিলাস (Amorousness)

প্রার্থিত বিষয়ের উপভোগের জন্য অধীর বাসনারই অন্য নাম 'বিলাস'। 'রত্নাবলী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই যেখানে প্রেমাসক্তা সাগরিকা নিজের হৃদয়কে বলছে—"হৃদয়! শান্ত হ! শান্ত হ! দুর্লভ যে, তাকে এরকম করে চাইলে কী করে হবে, এ চাওয়া তো পণ্ডশ্রম!" তারপর বৎসরাজ উদয়নের ছবি এঁকে বলছে, "কিন্তু ততক্ষণ আমি আমার প্রিয়তমের ছবি দেখে আমার মনের সাধ মেটাই।" এই কথাগুলি নিঃসন্দেহে বিলাসের উদাহরণ। 'রত্নকোশ'-এ সাগরনন্দী বলেছেন রতিসম্ভোগ বাসনা বা রতিসম্ভোগই বিলাস। তাঁর এ ব্যাখ্যা খুব অভিনব, নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।

পরিসর্প (Pursuit, search)

যে প্রিয় দেখা আবার আড়াল হয়, তার অনুসন্ধানের কথা প্রতিমুখসন্ধির যে-ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারই নাম 'পরিসর্প'। লেবিতে ক্রমটি উলটে দিয়ে প্রথমে সন্ধান, তারপরে সাক্ষাৎ, তারপরে প্রাপ্ত বিষয়কে হারানো। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'-এর তৃতীয় অঙ্কে সখীপরিবৃতা শকুন্তলার খোঁজে দুষ্মন্তর মালিনীতীরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিসর্পের দৃষ্টান্ত।

বিধূত (Unrequitedness)

প্রেম প্রতিদান না পেলে যখন স্বভাবত সুখকর বস্তুগুলির প্রতিও উদাসীনতা আসে—সেই অবস্থার নাম 'বিধূত'। 'রত্নাবলী'তে মদনপীড়িতা সাগরিকাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সখী সুসঙ্গতা পদ্মপাতায় তার শয্যা পাতছে, সাগরিকা রেগে বাকিগুলি ছুঁড়ে দিল। সুসঙ্গতাকে সে বলছে—"সখী, নিয়ে যাও এখান থেকে এই পদ্মপাতা আর মৃণালের বলয়, কী হবে ও দিয়ে? কেন তুমি মিথ্যে কষ্ট করছ? আমি যাকে চাই, সে দুর্লভ। এ বিষম প্রণয়ের চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো ছিল।" এই অবস্থার নাম 'বিধূত'। এ অবস্থায় সখী বা সহায়কদের সেবার প্রত্যাখ্যান ঘটে, হয়তো "কৃত অনুনয়ের প্রথম অস্বীকার"ও (সাগরনন্দী) ঘটে।

শম (Alleviation)

'বিধূত' অবস্থায় 'অরতি' অর্থাৎ বিরাগ যখন শান্ত হয় সেই অবস্থার নামই 'শম'। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার কারণ নেই, বরং যথেষ্ট আশ্বাসের কারণ আছে। 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা নিজের এবং সাগরিকার

ছবি দেখে যখন হৃষ্ট হয়েছেন এবং বিদূষক ও সুসঙ্গতার কাছে আপন মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন তখন সাগরিকা কদলীকুঞ্জের আড়ালে থেকে সুখে-আশ্বাসে রোমাঞ্চিত। একটু আগে সে যে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেছিল তা আর তার মনে নেই। এরই নাম শম। 'সাহিত্যদর্পণ'-এ এর জায়গায় যে-অঙ্গটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার নাম 'তাপন'। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে 'বিধৃত' অবস্থার মিল দেখানো হয়েছে।

নর্ম (Joke)

হাস্য-কৌতুকই 'নর্ম'। 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কে সাগরিকা চিত্রফলক খোঁজবার ছলে রাজা যেখানে বয়স্যকে নিয়ে আছেন তার কাছাকাছি এসে লুকিয়ে আছে। সহচরী সুসঙ্গতা দেখতে পেয়ে ঠাট্টা করছে: "সখী, যার জন্যে তুমি এখানে এসেছ সে তোমার সামনেই।" সাগরিকা ছদ্ম কোপে বলছে —"কী যে বল? আমি আবার কার জন্যে এখানে এলাম, আর কেই বা আছে এখানে?" সুসঙ্গতা হেসে বলছে—"সে কী, তুমি না ছবির ফলকটা খুঁজতে এসেছ, তাই না? তা সেটা এবার খুঁজে নাও!" (ছবিটা তখন রাজার হাতেই ধরা)। সাগরিকা তাতে একটু রেগে উঠছে। এই হল নর্মের উদাহরণ।

নর্মদ্যুতি বা দ্যুতি (Amusement)

ঐ নর্ম বা ঠাট্টা-তামাশার ফলে যে প্রসন্নতা বা পরিতোষের উদ্ভব, তারই নাম 'নর্মদ্যুতি'। ভরতের মতে কিন্তু দোষ ঢাকবার জন্যে যে হাসি, তাই হল নর্মদ্যুতি। যাই হোক, ধনঞ্জয় বা বিশ্বনাথ নর্মদ্যুতি বলতে ওই প্রসন্নতাই বুঝিয়েছেন। যেমন 'রত্নাবলী'তে সুসঙ্গতা দ্বিতীয় অঙ্কে বলছে: "সখী, তুমি বড় নিষ্ঠুর; মহারাজ এমন করে তোমাকে ধরে আছেন তবু তোমার রাগ পড়ল না।" সাগরিকা ভঙ্গিসহ ঈষৎ হাস্য করে বলল, "হয়েছে, তুই থামবি এখন?" একেই নর্মদ্যুতি বলা যায়।

প্রগমণ (Response)

প্রশ্নোত্তর-ক্রমে সংলাপ বা কথার উত্তরকেই 'প্রগমণ' বলে, অথবা প্রিয়-বাচনকেই বলে 'প্রগমণ'। দ্রষ্টব্য, 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক কদলীকুঞ্জের দৃশ্যে একজায়গায় রাজাকে বলছে: "মহারাজ, দারুণ কপাল আপনার; বলিনি আপনার ছবিই এতে আঁকা? নইলে আর কার ছবি মদনদেবের ছবি বলে সহজে চালানো যায় বলুন না।" এখান থেকে শুরু করে বিদূষকের কিছু

প্রিয়বাক্য প্রগমণের অন্তর্গত। নাট্যশাস্ত্র এবং লেবিতে শব্দটি প্রগমণ নয়, 'প্রগয়ণ'।

নিরোধন বা নিরোধ (Frustration)

যে বাধা হিতের জন্য, তারই নাম 'নিরোধ'। অন্য ব্যাখ্যায়, যা মঙ্গল বা সুখকে আটকে দেয়, তাই 'নিরোধ'। 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা যখন উদ্যানে সাগরিকার হাত ধরে আছেন, তখন পাশে দাঁড়ানো বিদূষক মুগ্ধভাবে বলে উঠল,—"আহা! ইনি যেন দ্বিতীয় বাসবদত্তা!" রাজা ঘাবড়ে গিয়ে সাগরিকার হাত ছেড়ে দিলেন। কারণ বাসবদত্তা তাঁর পাটরানি, তাঁকে লুকিয়েই সাগরিকার প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছেন এবং প্রণয় নিবেদন করেছেন, ধরা পড়লে বিপদ হবে। সাগরিকাও তখন ভয় পেয়ে কদলীকুঞ্জ থেকে সুসঙ্গতাসহ দ্রুত প্রস্থান করল। সমাগত দুটি নরনারীর সুখে এই যে বাধা, তা শেষ পর্যন্ত মঙ্গলেরই কারণ হয়েছে, কারণ পরমুহূর্তে বাসবদত্তাকে আসতে দেখা গেল ওই দিকে। 'সাহিত্যদর্পণ'-এ এ প্রসঙ্গে 'বিরোধ' কথাটার প্রয়োগ দেখা যায়, তার অর্থ বিপদে পড়া।

পর্যুপাসনা (Courtesy)

সৌজন্যের বা অনুনয়ের নাম পর্যুপাসনা (পর্যুপাস্তি, পর্যুপাসন)। যেমন 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কে বাসবদত্তার রাগ শান্ত করবার জন্য উদয়নের বিনয়বচন, এক ধরনের কুশলী চাটুকারিতা: "তুমি যদি রাগ না করো, তাহলে আমার 'শান্ত হও' এই মিনতি করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আবার যদি বলি, 'এ কাজ আর করব না, তাহলে স্বীকারই করা হল দোষ করেছি। যদি বলি 'দোষ করি-নি', তাহলে তুমি ভাববে মিথ্যে কথা বলছি। কী করি বলো তো, প্রিয়তমে?" ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে অনুনয়ের আরেক দৃষ্টান্ত দশরথের পরশুরামের প্রতি এই কথাগুলিতে; "হে ভার্গব, বালক রামের সঙ্গে আপনার যুদ্ধস্পৃহার কী প্রয়োজন? চূতপাদপ কি কখনো হস্তীর ভটা-ঘাত সহ্য করতে পারে?" 'রত্নকোশ'-এর এ দৃষ্টান্তের উৎস সম্ভবত লুপ্ত 'জানকী-রাঘব' নাটক।

পুষ্প (Gallantry)

যে বাক্য বা অনুচ্ছেদে চরিত্রের (নায়ক বা নায়িকার) অসামান্য গুণাবলির মুগ্ধ বিবৃতি থাকে, প্রতিমুখসন্ধির সেই অংশের নাম 'পুষ্প'। 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয়

অঙ্কে রাজা উদয়ন সাগরিকার হাত ধরে সুখসৌভাগ্যে বিহ্বল। তখন বিদূষক বলছে: "মহারাজ, আজ আপনি স্বয়ং শ্রীকে (অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে) লাভ করেছেন।" রাজা বললেন, "বয়স্য, তা সত্য। ইনি স্বয়ং শ্রী, এঁর করযুগ পারিজাতপল্লবের মত। এঁর স্বেদবিন্দুগুলি যে ছদ্ম-অমৃত, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।" এই হল পুষ্প। সাগরনন্দীর মতে 'পুষ্প' বিশেষ বচন মাত্র, আর লেবি নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে বলছেন পুষ্প হল সেই উক্তি, যাতে চরিত্রের কোনো লক্ষণ ধরা পড়ে। লেবির দৃষ্টান্ত: 'শকুন্তলা'র তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার ছেড়ে যাওয়া পুষ্পশয্যার দিকে তাকিয়ে রাজা বলছে, "তার দেহে পিষ্ট কুসুমচয়, অস্পষ্ট হয়ে আসা প্রণয়পত্রিকা, হাত থেকে পড়া লীলাকমলের মৃণাল—সবই তার কথা উচ্চারণ করছে।"

উপন্যাস (Intimation, Means)

'উপন্যাস' হল সফলতার (বিশেষত প্রণয়ে) উপায় নির্দেশ—কোনো বাক্যে বা মন্তব্যে। আবার 'রত্নাবলী'র শরণ নেওয়া যাক। এই দ্বিতীয় অঙ্কেই রাজা সাগরিকার আঁকা একটি তাঁর নিজের ছবি এবং সখী সুসঙ্গতার আঁকা একটি সাগরিকার ছবি—এই দুটি ছবি বিদূষককে নিয়ে উদ্যানে বেড়ানোর সময় কুড়িয়ে পেয়েছেন। কামনারূপিণী সাগরিকার ছবি দেখে তিনি অভিভূত। কিন্তু দয়িতার দর্শন পাবেন কী করে? এমন সময় সুসঙ্গতা, যেন ছবি খুঁজতে এসেছে, হঠাৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এভাবে বলছে: "এই ফলকে সখীর ছবি এঁকেছি বলে সখী আমার ওপর রাগ করে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজ, এখন আপনি গিয়ে ওঁর হাত ধরে যদি ওঁকে একটু শান্ত করেন, আমি বেঁচে যাই।" বলা বাহুল্য মহারাজের এতে আপত্তি হওয়ার কথা নয়, কারণ এই ইঙ্গিতেই তাঁর বাঞ্ছিতজনের সান্নিধ্যলাভের উপায় বলে দেওয়া হল। সাগরনন্দীতে কিন্তু 'উপন্যাস' হল যুক্তিযুক্ত বিষয়ের উপস্থাপনা।

বজ্র (Harsh words)

কারও মুখের উপর নিষ্ঠুর কথা বলা হলে তারই নাম 'বজ্র'। 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কে মহারাজের কাছে সাগরিকার ছবি দেখে পাটরানী বাসবদত্তা অপ্রসন্ন, বলে উঠল—"মহারাজ, এই ছবি দেখতে দেখতে আমার মাথা ধরে গেল—আমি যাই।" এই অপ্রিয়ভাষণেরই নাম বজ্র।

বর্ণসংহার (Combination of Castes)

যে-জায়গায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের সমাবেশের উল্লেখ করা হয় তারই নাম 'বর্ণসংহার'। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ জানাচ্ছেন, অভিনবগুপ্ত বর্ণ বলতে 'চরিত্র' বুঝিয়েছেন ; ফলে তাঁর মতে বর্ণসংহার হল চরিত্রগুলির সম্মেলন। ধনঞ্জয়ের মতের উদাহরণ আছে ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে। তাতে বশিষ্ঠ যজ্ঞসভায় সমবেত ব্যক্তিদের উল্লেখ করেছেন রামের কাছে। চতুর্বর্ণের কথা সেখানে কিছুই নেই, কিন্তু 'সহ নৃপতিরমাত্যোলোমপাদশ্চ বৃদ্ধঃ' ইত্যাদি শ্লোকটিকেই 'বর্ণসংহার' এর দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. গর্ভসন্ধি (Development) এবং তার বিবিধ অঙ্গ

'বীজ'-এর অনুসন্ধান নাটকের যে অংশে, তারই নাম 'গর্ভসন্ধি'। এই বীজ এখানে কখনো গুপ্ত, কখনো প্রকাশিত—এখানেই বীজের পুনঃপুনঃ সন্ধান চলে। গর্ভসন্ধিতে একটি উপাখ্যান (episode) থাকতে পারে। এই উপাখ্যানেরই আগে নাম দেওয়া হয়েছে পতাকা। এ অংশে প্রাপ্ত্যাশা বা প্রাপ্তিসম্ভব অর্থাৎ সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে না। কেন না গর্ভ হল গল্পের মধ্যভাগ মাত্র। এর বারোটি অংশ :

অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, তোটক, অধিবল, উদ্‌বেগ, সম্ভ্রম, আক্ষেপ। এদের মধ্যে অভূতাহরণ, মার্গ, তোটক, অধিবল এবং আক্ষেপই প্রধান। ভরত এবং পরে 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ তেরো নম্বর আর একটি জুড়েছেন গর্ভসন্ধির অংশ হিসেবে, তার নাম 'প্রার্থনা'।

অভূতাহরণ (Mistrust, Deceit)

প্রবঞ্চনার বা কোনো খবর বা ভাবনা গোপন রাখার নামই 'অভূতাহরণ'। 'শকুন্তলা'র চতুর্থ অঙ্কে দুর্বাসার অভিশাপের খবরটা আত্মবিস্মৃত শকুন্তলার কাছে গোপন রাখার জন্য অনসূয়ার প্রস্তাবটি যেমন। আরও দৃষ্টান্ত, 'রত্নাবলী' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সুসঙ্গতার কৌশলে বাসবদত্তার ছদ্মবেশে সাগরিকা বৎসরাজের কাছে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এই প্রতারণা বাসবদত্তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। 'রত্নকোশ'-এ আছে 'অভূতোদাহরণ',—যার অর্থ কপটতাপূর্ণ বাক্য। যুধিষ্ঠিরের 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' উক্তিটি সাগরনন্দীর দেওয়া অভূতোদাহরণ-এর দৃষ্টান্ত।

মার্গ (Indication)

সত্য কথা বা উদ্দেশ্য অকপটে জানিয়ে দেওয়ার নামই 'মার্গ'। মার্গ-এর দৃষ্টান্ত 'দশরূপক'-এর টীকায় খুব স্পষ্ট নয়। 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে রাজার সঙ্গে সাগরিকার মিলনসাধনের জন্য বিদূষক একটি কৌশল করেছে। তোরণ-মণ্ডপের দৃশ্যে তাই সে রাজাকে আশ্বাস দিচ্ছে। রাজা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলে সে তাঁর কানে কানে তার গোপন ব্যবস্থার কথা জানাচ্ছে। এরই নাম নাকি মার্গ, কারণ সে সত্য কথাই ফাঁস করে দিচ্ছে। আবার অভীষ্ট কীভাবে পূর্ণ হবে 'মার্গ'-এ তারই খবর থাকে—এ হল আরেকটি মত। 'শকুন্তলা'র চতুর্থ অঙ্কে প্রিয়ংবদার কথায় দৈববাণীর খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, শমীবৃক্ষ যেমন অগ্নিধারণ করে, তেমনি শকুন্তলা দুষ্মন্তের বীজ ধারণ করবে।

রূপ (Supposition)

যে-উক্তিতে একটি অনুমান বা বিচার থাকে, যার মধ্যে নিজের মনে মনে যুক্তিতর্ক করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা বা সংশয় থাকে, তারই নাম 'রূপ'। যেমন 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে মাধবীলতা-মণ্ডপের দৃশ্যে রাজার স্বগত-কথন চলছে, মনে মনে চিন্তা করছেন, কেন কামীরা নিজের ঘরনি ছেড়ে নব-রমণীর প্রতি আসক্ত হয়। কারণও বলছেন একটি শ্লোকে—তার সারাংশ—সেই নতুন নায়িকা সঙ্কেতস্থানে এসেও সলজ্জিত থাকে, মুখ তুলে তাকায় না, আলিঙ্গনে সম্ভ্রম রাখে, বারবার উৎকণ্ঠায় নায়ককে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। তাদের সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না, তবু তাদের লজ্জা ও ভয় বাসনাকে আরো দুর্বার করে তোলে। কোনো বিষয় সম্বন্ধে এই আত্মগত চিন্তনের, নিজের মনে মনে বিতর্কের, নাম রূপ। তবে সাগরনন্দী বলছেন, বিস্ময়কর বিষয় সম্পর্কিত বিতর্কই রূপ।

উদাহৃতি, উদাহরণ (Exaggeration)

অত্যুক্তিপূর্ণ বিবৃতির নাম 'উদাহরণ'। যখন কোনো ব্যক্তির মহিমা বা গুণাবলির চূড়ান্ত এবং প্রায়শই অতিরঞ্জিত প্রশংসা করা হয়, বা কোনো ঘটনা সম্বন্ধে খুব বাড়িয়ে বলা হয়, গর্ভসন্ধির সেই অংশের নাম 'উদাহৃতি' বা 'উদাহরণ'। এতে নায়ক বা নায়িকার মনের আশা-আশ্বাস আগের চেয়েও বেড়ে ওঠে। 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে তোরণ-মণ্ডপের দৃশ্যে রাজা বিদূষক

বসন্তককে সাগরিকার সংবাদ নিতে পাঠিয়েছেন। বসন্তক খুশি-মুখে ফিরতে ফিরতে বলছে : "হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ, আমার খবরটা পেলে প্রিয়সখার যতটা আহ্লাদ হবে, সমস্ত কৌশাম্বী রাজ্য পেলেও ততটা হবে কি না সন্দেহ"। এই অতিবাদের নামই 'উদাহরণ'। ভরত ও বিশ্বনাথ আবার 'উদাহরণ' বলতে অলৌকিক কোনো ঘটনা বোঝেন।

ক্রম (Progress, Attainment)

যে-বিষয়ে সোৎকণ্ঠ হয়ে চিন্তা করা হচ্ছিল, তা লাভের নামই 'ক্রম'। 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে মাধবীলতা-মণ্ডপের দৃশ্যে রাজা সাগরিকার প্রতীক্ষা করতে করতে ভাবছেন, "এখনই প্রিয়ার সঙ্গে মিলন হবে, তবু আমার মনের উৎকণ্ঠা কেন শমিত হচ্ছে না ? কিংবা হয়-তো, মদনতাপ প্রথমে যেমনই থাক, মিলনকাল নিকটে এলে তা দুর্বহ হয়ে পড়ে। বর্ষার দিনে বৃষ্টি হওয়ার আগেকার মুহূর্তগুলি যেমন, গ্রীষ্মের চেয়ে তারা তাপ বেশি বিকিরণ করে।" এরপর বিদূষক সাগরিকাকে নিয়ে এল। 'ক্রম' সম্বন্ধে অন্য মতের কথাও ধনঞ্জয় উল্লেখ করছেন। প্রথমে নাট্যশাস্ত্রে এবং পরে সাহিত্যদর্পণে এই মত প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। এতে বলা হয়েছে, অন্যের মনোভাব জ্ঞাত বা অবহিত হওয়ার নামই 'ক্রম'। ভাবজ্ঞানই ক্রম। তারও দৃষ্টান্ত আছে 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে। ঐ মাধবী-লতামণ্ডপের দৃশ্যেই রাজা অগ্রসর হয়ে সাগরিকার, আসলে ছদ্মবেশী বাসবদত্তার, আশ্লেষ প্রার্থনা করে বলছেন : "অনঙ্গ-সন্তাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হচ্ছে। আলিঙ্গন দিয়ে সেই তাপ তুমি নির্বাপণ করো।" পরে আরো স্তুতি করছেন, "তোমার ঐ চন্দ্রবদন পদ্মের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয়, জগতের চিত্তকে সুখী করে। তোমার দর্শনে মদন উদ্দীপিত হয়। চাঁদ যদি এই বলে অহংকার করে যে, তার দখলে আজ অমৃত, তুমিই বা কম কিসে, তোমার বিম্বাধরেই তো অমৃতের প্রতিষ্ঠা।" এতে রাজার মনোভাব বাসবদত্তা জেনে ফেলেছে, কিন্তু এই দৃষ্টান্ত খুব সংগত বলে মনে হয় না। সিলভ্যাঁ লেভি 'ক্রম' বলতে 'ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান'ও বুঝিয়েছেন। ভরতের মত এইরকম। 'রত্নকোশ'ও বলছে ভবিষ্যৎ-তত্ত্বের জ্ঞানই ক্রম।

সংগ্রহ (Propitiation)

'সংগ্রহ' হল কাউকে উপহার দিয়ে খুশি করার সময় যে প্রিয়ভাষণ, তাই। 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে তোরণ-মণ্ডপের দৃশ্যে বিদূষক এসে রাজার কানে কানে

সাগরিকার সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য সে কী কৌশল করেছে তাই জানাচ্ছে। রাজা তখন পরিতুষ্ট হয়ে বলছেন, "সাধু, বয়স্য, সাধু! এই নাও তোমার পুরস্কার।"—বলে নিজের হাতের সোনার বলয় তাকে দিচ্ছেন। উপহার-সমর্থিত ঐ সন্তোষবিধায়ক উক্তিটিই 'সংগ্রহ'।

অনুমান (Deduction)

কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ দেখে ('রত্নকোশ'-এ রূপ দেখে) কিছু জানা বা অনুমান করাকেই পারিভাষিকভাবেও 'অনুমান' বলা হয়েছে। 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে যখন সাগরিকার ছদ্মবেশপরা বাসবদত্তার কাছে প্রণয় জানিয়ে রাজা তার রোষভাজন হয়েছেন এবং বিমূঢ়ভাবে ভাবছেন, এই ছলনার পর বাসবদত্তা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবেন, কারণ প্রেমের উচ্চতম প্রতিষ্ঠা থেকে এই পতন কোন্ নারীর সহ্য হয়? তখন বিদূষক বলছে: "দেবী কী করবেন জানি না, কিন্তু আমার যদ্দুর ধারণা সাগরিকার পক্ষে এর পর বেঁচে থাকা খুবই মুশকিল হবে।" এতে রাজা সাগরিকাকে ভালোবেসেছেন, এই লক্ষণ থেকে বাসবদত্তার আত্ম-হত্যার সম্ভাবনা 'অনুমান' করা হয়েছে। বাসবদত্তা আত্মহত্যা করেননি, সংস্কৃত নাটকে ওসব বিয়োগান্ত ঘটনা নেই বললেই চলে।

অধিবল (Outwitting)

গর্ভসন্ধির 'অধিবল' অংশে কোনো ছলনা বা চালাকির প্রসঙ্গ আসে। 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে মহারানি বাসবদত্তা নিজে সাগরিকা সেজেছেন এবং দাসী কাঞ্চনমালাকে সাজিয়েছেন সাগরিকার সহচরী সুসঙ্গতার বেশে। চিত্র-শালার দরজায় বসন্তক চাদরমুড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে সাগরিকাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবে বলে। সাগরিকা এল না, এলেন কাঞ্চনমালাকে নিয়ে সাগরিকারূপিণী বাসবদত্তা। এই দৃশ্যে ওই ছলনা দর্শকের কাছে ধরা পড়ছে।

তোটক (Quarrel)

উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ উক্তি বা বাগ্‌বিতণ্ডার নাম 'তোটক'। 'বেণীসংহার' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কুরুক্ষেত্রে কর্ণ ও অশ্বত্থামার মধ্যে কটূক্তির বিনিময় এই তোটকের দৃষ্টান্ত। এইখানেই অশ্বত্থামা কর্ণকে "রাধাগর্ভজাত অধম ছুতোর" বলে গাল দেয় এবং কর্ণ বলে, "আমি নিজে সূত বা সূতপুত্র যাই হই না কেন, তাতে কী? কুলে জন্ম দৈবের ব্যাপার, কিন্তু পৌরুষ তো নিজের হাতে।"

'শকুন্তলা'র পঞ্চম অঙ্কে রাজার প্রতি শার্ঙ্গরবের তিরস্কার-বচন তোটকের আরেক দৃষ্টান্ত।

কারো কারো মতে অধিবল তোটকেরই (বা ত্রোটকের) রূপান্তর মাত্র। কারো মতে তোটকের বিপরীত ব্যাপারই অধিবল।

উদ্বেগ (Dismay)

শত্রুজনিত ভয় অথবা শত্রুর ভীতিজনক কার্যকলাপেরই নাম 'উদ্বেগ'। যেমন 'বেণীসংহার'-এর চতুর্থ অঙ্কে প্রথমেই ভয়মূর্ছিত দুর্যোধনকে নিয়ে সারথি রথ চালিয়ে আসছে। ভীমের প্রবেশ ও সদর্প আস্ফালন, তখন সারথি তা শুনে ভয় পেয়ে বলে উঠছে, "পালাই, ওই এল সেই দুরাত্মা যে কৌরবপুত্রদের অরণ্যে ভয়ঙ্কর ঝড়ের মতো।"

সম্ভ্রম (Consternation)

আতঙ্ক ও ত্রাসে কম্পনের ব্যাপার যে-উক্তিতে প্রকাশিত তারই নাম 'সম্ভ্রম'। 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কে বাসবদত্তার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে সাগরিকা মনোদুঃখে গলায় মাধবীলতার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। তার পরনে তখনও বাসবদত্তার বেশ। বিদূষক বসন্তক তাই দেখতে পেয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠছে : "মহারাজ, বাঁচান, বাঁচান, দেবী বাসবদত্তা গলায় দড়ি দিচ্ছেন।" রাজা ছুটে এসে বলছেন, "কই, কোথায় তিনি?" এরই নাম সম্ভ্রম।

আক্ষেপ (Revelation)

'বীজ' বা উপসংহারের কারণ গর্ভসন্ধিতে উন্মোচিত হয়। এই উন্মোচনের প্রকাশ হয় যে-উক্তিতে তারই নাম 'আক্ষেপ'। যেমন 'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে রাজা বলেছেন, "দেবীকে খুশি করতে না পারলে আর উপায় নেই।" তৃতীয় অঙ্কের শেষেও বলছেন, "দেখি, দেবীকে যদি আবার প্রসন্ন করতে পারি।" এই সব উক্তি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বাসবদত্তাকে খুশি করার উপরেই সাগরিকা-লাভের 'বীজ' আছে। এরই নাম আক্ষেপ।

ভরত ও সাহিত্যদর্পণে 'প্রার্থনা' বলে গর্ভসন্ধির আর একটি উপবিভাগ আছে। এর অর্থ হল 'উৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান'। 'রত্নকোশ' অনুসারে গর্ভ-সন্ধির তেরোটি অঙ্গ হল : অভূতোদাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, উৎক্ষিপ্ত, তোটক, অধিবল, উদ্‌বেগ এবং বিদ্রব।

৪. অবমর্শসন্ধি (The Pause) ও তার অঙ্গ

নাটকের 'চতুর্থ পর্যায়ের নাম 'অবমর্শ' ; অন্য নাম 'বিমর্শ' (আক্ষরিকভাবে এর অর্থ হল চিন্তন বা ধ্যান (deliberation)। ক্রোধ বা আবেগজনিত অধীরতা বা প্রলোভন থেকে যে পর্যালোচনার জন্ম হয়, তারই নাম 'অবমর্শ'। 'রত্নকোশ'-এ বিমর্শ সন্ধিতে আখ্যানে একটা বাধা বা বিপত্তি ঘটে—এরকম ইঙ্গিত আছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এ দুর্বাসার শাপ ও শকুন্তলার প্রত্যাখ্যাত হওয়া যেমন। অবমর্শের বিষয় হল সেই 'বীজ' যা গর্ভসন্ধিতে ঈষৎ উন্মোচিত হয়েছে; অবমর্শে সাফল্যের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয় এবং 'বীজে'র পরিণাম সূচিত হয়। 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্ক (এই অঙ্কেই নাটক শেষ হয়েছে) অবমর্শের দৃষ্টান্ত। এখানে অলীক অগ্নিকাণ্ডের ফলে আতঙ্ক এবং শেষে বাসবদত্তার প্রসন্ন হয়ে রাজার হাতে সাগরিকাকে সমর্পণের ঘটনা আছে। 'বেণীসংহারে'র ষষ্ঠ বা শেষ অঙ্কও এই অবমর্শসন্ধির নিদর্শন। এর অঙ্গ তেরোটি :

অপবাদ, সংফেট বা সম্ফেট, বিদ্রব, দ্রব, শক্তি, দ্রুতি, প্রসঙ্গ, ছলন, ব্যবসায়, বিরোধন, প্ররোচনা, বিচলন, আদান।

অপবাদ (Censure)

কারও দোষত্রুটির বিবৃতি অবমর্শসন্ধির যে-অংশে, তারই নাম 'অপবাদ'। যেমন 'রত্নাবলী'তে চতুর্থ অঙ্কে সাগরিকাকে দেখতে না পেয়ে সখী সুসঙ্গতা কাঁদতে কাঁদতে বিদূষককে বলছে, "সাগরিকাকে দেবী (বাসবদত্তা) উজ্জয়িনীতে পাঠিয়েছেন"…। তখন বিদূষক বলছে, "ওঃ, দেবী কী নিষ্ঠুর কাজই না করলেন।" কিংবা বেণীসংহার'-এ যুধিষ্ঠির বলেছেন ষষ্ঠ অঙ্কে, "পাঞ্চালক, সেই দুরাত্মা কৌরব-কুলাঙ্গারের কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে ?" দুর্যোধন সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসায় তাঁর নিন্দনীয়তা উল্লিখিত হয়েছে—সুতরাং এটি 'অপবাদ'-এর দৃষ্টান্ত।

সংফেট (Altercation)

'সংফেট' হল ক্রোধোক্তি, রেগে তর্জন-গর্জন গোছের ব্যাপার। 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কে গদাযুদ্ধের আগে ভীম ও দুর্যোধনের পরস্পরের প্রতি কটূক্তি-বর্ষণের উল্লেখ আছে। এই দুবার্ক্যধারার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই না, কেবল দূত পাঞ্চালের মুখে এর খবর পাই। তবে তার আগে দুর্যোধনকে হ্রদে লুকিয়ে থাকতে দেখে ভীম অনেক আস্ফালন ও বিদ্রূপ করে, দুর্যোধনও তার

চোখা চোখা জবাব দেয়। এও আমরা পাঞ্চালের reporting থেকে জানি। এগুলি সংকেটের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতে পারে। পরে 'বিরোধন' ও 'বিচলন' দ্রষ্টব্য।

বিদ্রব (Tumult)

হত্যা বা বন্দী করার সংবাদ, বা কোনো প্রধান চরিত্র সম্বন্ধে কোনো ভয়ংকর সংবাদ যে-অংশে আছে, অবমর্শের সে অংশের নাম 'বিদ্রব'। যেমন 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্কে বাসবদত্তা দৌড়ে এসে রাজাকে প্রাসাদে আগুনের তাণ্ডবের কথা বলছে এবং হয়তো সাগরিকা তাতে পুড়ে মরছে, এইরকম ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছে। সে নিজেই সাগরিকাকে প্রাসাদের মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। রাজা তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের মতো ছুটে গেলেন। এই ভয়ংকর সংবাদ 'বিদ্রব'-এর নিদর্শন। 'রত্নকোশ'-এ 'বিদ্রব'-র উল্লেখ নেই।

দ্রব (Contempt)

জ্যেষ্ঠদের বা মাননীয়দের প্রতি উপেক্ষা বা অসম্ভ্রম দেখানোর নাম 'দ্রব'। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকে চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যুদ্ধের আগে লব রামচন্দ্র সম্বন্ধে শ্লেষ করে বলছে (সে জানে না রামই তার পিতা)। "ওঁরা জ্যেষ্ঠ, আমার ওঁদের বিচার করা সাজে না। বিশ্রুত রামচন্দ্রের কীর্তি কে না জানে? তিনি সুন্দের স্ত্রী তাড়কাকে বধ করে অক্ষয় যশ অর্জন করেছেন। খরের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যদিও পশ্চাদপসরণ করেছিলেন, তবু জিত তো তাঁরই হল। বালীকে গুপ্ত শর নিক্ষেপ করে তিনি মেরেছেন—এসব তো জগৎসুদ্ধ লোক জানে!" (পঞ্চম অঙ্ক)।

শক্তি (Placation, Removal of Hostility)

'শক্তি' বলতে বিরোধের শান্তি বা নিবৃত্তি বোঝায়। ঐ 'উত্তররামচরিত'-এই দেখি (ষষ্ঠ অঙ্কে) লব রামচন্দ্রকে দেখে ভাবছে, "আশ্চর্য। এঁকে দেখে আমার বিরোধ বিদ্বেষ শান্ত হয়ে গেল, ঔদ্ধত্য চলে গিয়ে বিনীত হতে ইচ্ছে করছে এঁর কাছে। মনে হচ্ছে পায়ে লুটিয়ে পড়ি। কেন এরকম হচ্ছে?......"

দ্যুতি (Rebuke, Threatening)

তর্জন আর কটু ভাষণের নাম 'দ্যুতি'। 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কে দুর্যোধন যখন হ্রদের জলে লুকিয়ে ছিল, তখন তাকে উত্তেজিত করে বার করে আনার জন্য

ভীম যে গালাগাল বর্ষণ শুরু করে, তা 'দ্যুতি'র দৃষ্টান্ত। 'রত্নকোশ-এ দ্যুতি নির্বহণ-সন্ধির অঙ্গ, সেখানে এর অর্থ 'ঈর্ষ্যা ও ক্লেশের নিবৃত্তি'।

প্রসঙ্গ (Reverence)

জ্যেষ্ঠ বা পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে উল্লেখ বা বিবৃতির নামই 'প্রসঙ্গ'। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'-এ যেমন চণ্ডালেরা চারুদত্তকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পথে ঢ্যাঁডরা পিটিয়ে সবাইকে রাজার আদেশ শোনাচ্ছে—"শুনুন সবাই! এই যে বণিক বিনয়দত্তের নাতি, সাগরদত্তের ছেলে চারুদত্ত। এ শূন্য পুষ্পকরণ্ডক বাগানে ঢুকে গণিকা বসন্তসেনাকে খুন করেছে। তাই এর প্রাণদণ্ড হবে।......" (দশম অঙ্ক)।

ছলন (Humiliation, Contempt)

কারো প্রতি অসম্মান দেখানো হলে তার নাম 'ছলন'। যশোবর্মণের 'রামাভ্যুদয়' নাটকে (এ নাটক আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয়নি) রাম যে সীতাকে বর্জন করলেন, তাতে তাঁর প্রতি অবমাননা দেখানো হল—এই হল 'ছলন'।

ব্যবসায় (Assertion)

নিজের শক্তি সম্বন্ধে দম্ভোক্তির নামই 'ব্যবসায়'। 'রত্নকোশ'-এ 'বিবৃতি ও তার হেতুযুক্ত বাক্য'ই ব্যবসায়। 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্কে এক ঐন্দ্রজালিক এসে নিজের ক্ষমতা নিয়ে প্রচুর বাগাড়ম্বর করে বলছে: "বলুন কী করতে হবে। চাঁদকে মাটিতে নামিয়ে আনব? হিমালয়কে উড়িয়ে দেব আকাশে? জলের ওপর আগুন জ্বালাব? দুপুরবেলায় গোধূলির অন্ধকার ডেকে আনব?" এরই নাম 'ব্যবসায়'।

বিরোধন (Opposition)

আবার যখন কেউ খুব রেগে বা উত্তেজিত হয়ে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে বড়াই করে, তখন 'বিরোধন' দেখা দেয়। 'বেণীসংহার'-এর পঞ্চম অঙ্কে ভীমের এ-ধরনের প্রচুর আস্ফালন আছে। ভীম ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণামই করছে এই বলে যে, "অসংখ্য কৌরবকে যে মেরেছে, দুঃশাসনের রক্ত পান করে যে উল্লসিত, দুর্যোধনের ঊরু যে ভাঙবে—সেই ভীম প্রণাম করছে, প্রণাম গ্রহণ করুন।" 'রত্নকোশ'-এর মতে কাজ পণ্ড হওয়ার উপক্রমই বিরোধন। যেমন 'বেণীসংহার'-এর কঞ্চুকী

বলছে, “দুরাত্মা, কৌরবাধম, বসন যার শোণিতে পাটল, উদ্যত কালদণ্ডপাণি যমের মতো রক্তবর্ণ বজ্রতুল্য ভয়ংকর গদা তুলে মাননীয়া পাঞ্চাল-নন্দিনীকে ইতস্তত খোঁজ করতে করতে এই-যে এদিকেই আসছে।”

প্ররোচনা (Foresight)

সফলতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-পূর্বজ্ঞান, বা ভবিষ্যতের সাফল্য সম্বন্ধে পূর্বাভাস যাতে প্রকাশিত, তারই নাম ‘প্ররোচনা’। ‘বেণীসংহার’-এর ষষ্ঠ অঙ্কে পাঞ্চালক যুধিষ্ঠিরকে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সংবাদ দিতে এসে বলছে, “কৃষ্ণ আমাকে বললেন,…ভীমসেনের সঙ্গে দুর্যোধনের দেখা হয়েছে, এইবার দেখো, জগৎ নিষ্কণ্টক হবে। এখন তোমরা নানা শুভকার্যের অনুষ্ঠান শুরু করো, আর সংশয় কোরো না।” এখানেই ‘প্ররোচনা’র অবতারণা ঘটছে।

বিচলন (Boastfulness)

মৌখিক বাগাড়ম্বর ও বড়াই, যাকে লৌকিক ভাষায় ‘বাড়ফট্টাই’ বলা চলে, তারই নাম ‘বিচলন’। যেমন ‘বেণীসংহার’-এর পঞ্চম অঙ্কে অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করতে গিয়ে বলছে, “রাধা-তনয় কর্ণকে যে বধ করেছে সেই অর্জুন প্রণাম করছে।” বলা বাহুল্য, ব্যবসায়, বিরোধন ও বিচলনের মধ্যে তফাত খুব স্পষ্ট নয়। এর পরে ভীম ধৃতরাষ্ট্রকে যে সম্ভাষণ করছে, তাই উপরে বিরোধনের দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত করা-হয়েছে। ‘সংফেট’-এর দৃষ্টান্তও আগে আছে, তাও অনেকটা এই জিনিসই।

আদান (Summary)

কারো কৃতকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির নামই ‘আদান’ (‘রত্নকোশ’—“প্রধান ফলের উপগমন’)। ‘বেণীসংহার’-এ যেমন: (ষষ্ঠ অঙ্ক) দুর্যোধনকে নিহত করে ভীম রক্তাপ্লুত দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী প্রভৃতিও তাকে খুঁজছে। দুপক্ষে দেখা হল, কিন্তু রক্তস্নাত ভীমকে চিনতে না-পারায়, অন্যদিকে ভীমও অন্যদের চিনতে না-পারায়, সংকটের সৃষ্টি হল। পাণ্ডবরা মনে করল ভীম আসলে দুর্যোধন, ভীম নিহত হয়েছে। ভীম এদের মনে করছে সৈনিক, তাই ধমকে জিজ্ঞেস করছে, “আমাকে দেখে ভয় পাবার কী আছে? আমি না রাক্ষস, না প্রেত। আমি সেই ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয় যে দুস্তর প্রতিজ্ঞাসমুদ্র

পার হয়েছে। যুদ্ধের আগুন নিবেছে, তা তোমরা কেন হাতি-ঘোড়ার মৃতদেহগুলোর আড়ালে লুকোচ্ছ ?" এই কথার মধ্যে সংক্ষেপে ভীমের নিজের কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে, তাই এ 'আদান'।

'রত্নকোশ' অনুসারে 'বিমর্শ' সন্ধির বিকল্প কয়েকটি অঙ্গ হল 'খেদ' (মানসিক বা কায়িক শ্রম), 'প্রতিষেধ' (ঈপ্সিত অর্থের ব্যাঘাত), 'সাদন' (অপমানকর বিষয়ের উল্লেখ)। সে বইয়ে 'ছলন', 'বিচলন' ও 'বিদ্রব' এই তিনটি অঙ্গ উল্লিখিত হয়নি।

৫. নির্বহণসন্ধি (Conclusion), পরিণতি এবং তার অঙ্গাবলি

পঞ্চসন্ধির শেষ 'সন্ধির' নাম 'নির্বহণ'। এতে মুখসন্ধি ও অন্যান্য সন্ধিগুলিতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে এবং 'বীজ'-এ যে-ঘটনার সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল—তার সবই যথাযথ পরিণতি লাভ করে এবং শেষে সমস্ত কিছুই একসূত্রে এনে সেগুলির মধ্যে সংগতি দেওয়া হয়। নির্বহণ সন্ধির চৌদ্দটি অঙ্গ, সেগুলি হল :

সন্ধি, বিরোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, কৃতি, ভাষা বা ভাষণ, উপগূহন, পূর্বভাব, উপসংহার বা কাব্যসংহার, এবং প্রশস্তি।

সন্ধি (Junction)

এখানে 'সন্ধি' বলতে বোঝায় আবার বীজের উল্লেখ, উত্থাপন বা উপগম। এই সন্ধি নাটকের পঞ্চসন্ধি নয়, একথা মনে রাখতে হবে। সন্ধির দৃষ্টান্ত আছে 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্কে। সিংহলরাজের অমাত্য বসুভূতি সাগরিকাকে দেখে সিংহলের হারানো রাজকন্যা বলে চিনতে পারছে। তার সন্ধান এবং মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে উদয়নের সঙ্গে তার বিবাহ সংঘটনের পরিকল্পনাই ছিল নাটকের 'বীজ'-অংশে নিহত। বসুভূতির জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে সাগরিকার পরিচয় জানা যাচ্ছে এবং পরিণামে রাজা তাঁকে লাভ করছেন। সুতরাং এখানে আবার বীজের উল্লেখ ঘটেছে। 'রত্নকোশ'-এ 'সন্ধি' অনুপস্থিত। তার জায়গায় আছে 'অর্থ' বা 'মূল বিষয়ের পরোক্ষ উল্লেখ'।

বিরোধ (Vigilance)

পরিণামের বা 'কার্য'-এর জন্য সন্ধান বা সচেষ্টতার নামই 'বিরোধ' ('রত্নকোশ'-এ অনুল্লিখিত)। 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্কে ঐ 'সন্ধি' অংশের পরেই

বসুভূতি জিজ্ঞেস করছে, "মহারাজ এ কন্যাটি কোথাকার ?" রাজা বললেন, "দেবী জানেন"। বাসবদত্তা বললেন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাঁর কাছে সাগরিকাকে গচ্ছিত রেখেছিল। এই সব কথার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বসুভূতির ওই খোঁজখবর বিরোধের দৃষ্টান্ত।

গ্রথন (Hint))

ঐ পরিণতির আভাসের, 'রত্নকোশ'-এ 'বহু অভীষ্টের উল্লেখ'-এর, নাম 'গ্রথন'। 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণ সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলীকে সাগরিকা নাম দিয়ে উদয়নের অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখেছিল, রাজাকে না জানিয়ে। পরে সেকথা বলে রাজার কাছে ক্ষমা চাইছে এবং কী উদ্দেশ্যে সে এমন করেছিল তা জ্ঞাপন করছে। এ থেকে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে রাজা শেষ পর্যন্ত রত্নাবলীকে লাভ করবেন। যৌগন্ধরায়ণের উক্তি এখানে 'গ্রথন'-এরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'রত্নকোশ'-এ দৃষ্টান্ত 'জানকী-রাঘব' নাটকের শেষ অঙ্কে লক্ষ্মণের উক্তি— "খর-দূষণ ইত্যাদি সেই রাক্ষসেরা নিহত হয়েছে, মুনিদের তপশ্চর্যা এখন বিঘ্ন-রহিত, ইন্দ্রের শত্রু এই রাবণ নিহত, আর তার সম্পদ আপনি বিভীষণকে অর্পণ করেছেন"।

নির্ণয় (Narration)

অনুভব বা অভিজ্ঞতার বর্ণনাই 'নির্ণয়'। 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলছে, "দেব, আর ভয় নেই, আপনি শত্রুহীন হয়েছেন। ভাবছেন দুর্যোধন বেঁচে আছে? মোটেই না।" এই বলে সে কী করে দুর্যোধনকে নিহত করল এবং এখন পাণ্ডবেরা কীভাবে মর্ত্যের উপর অসপত্ন অধিকার লাভ করল তার বিবরণ দিচ্ছে। এখানে তার আত্ম-অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে, তাই এ 'নির্ণয়'।

পরিভাষা, পরিভাষণ (Conversation)

কথোপকথন বা উক্তি-প্রত্যুক্তির নামই 'পরিভাষা'; 'রত্নকোশ'-এ 'অপমান বা অপরাধের উল্লেখ' হল পরিভাষা বা 'পরিভাষণ'। 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্কে রত্নাবলী বলছে বাসবদত্তাকে, "দেবীর কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই, আমার মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে।" বাসবদত্তা তার উত্তরে বলছেন, "ছিঃ বোন, আমি কত নিষ্ঠুরতা করেছি তোমার ওপর, সেসব ভুলে যাও, আমাকে বড় বোন বলে মনে করো।" এই পারস্পরিক সংলাপ 'পরিভাষণ'-এর নিদর্শন।

প্রসাদ (Graciousness)

সেবা, সৌজন্য বা বিনয়প্রকাশের নামই 'প্রসাদ'। 'বেণীসংহার'-এর ষষ্ঠ অঙ্কে ভীম দ্রৌপদীকে বলছে, "পাঞ্চালতনয়া, তোমার শত্রুকুল নিহত, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো।" এই সৌজন্যপ্রকাশ 'প্রসাদ'-এর দৃষ্টান্ত।

আনন্দ (Bliss)

বাসনার চরিতার্থতা হল 'আনন্দ'। 'রত্নাবলী'র ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা উদয়ন, "দেবী যেমন আদেশ করেন" বলে রত্নাবলীকে গ্রহণ করছেন। আকাঙ্ক্ষার এই সন্তর্পণেরই নাম 'আনন্দ'।

সময় (Deliverance)

দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের হাত থেকে মুক্তির, 'রত্নকোশ'-এ 'বিরোধের শান্তির', নাম 'সময়'। 'রত্নাবলী'তে ঐন্দ্রজালিকের মায়া-আগুনে অন্তঃপুরে বন্দিনী সাগরিকা কাতর হয়েছিল, রাজা দৌড়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনার পর সে চেতনা লাভ করে এবং "মা তুমি কোথায়, বাবা তুমি কোথায়" বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে আবার মূর্ছিত হয়। তখন বাসবদত্তা, "শান্ত হও বোন, শান্ত হও" এই বলে তাকে আলিঙ্গন করে। অর্থাৎ বিপদ কেটে গেছে, এখন অস্থির হওয়ার কিছুই নেই। এরই নাম 'সময়'।

কৃতি (Confirmation)

যে-ফল হাতে এসেছে, তার সমর্থন বা স্বীকৃতিই 'কৃতি'। 'রত্নাবলী'র চতুর্থ অঙ্কে রত্নাবলীকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে বাসবদত্তা যখন বললেন, "মহারাজ এর জ্ঞাতিকুটুম্বরা সব কত দূরে আছেন, আপনি আপনার ব্যবহার দিয়ে এর আত্মীয়দের কথা ভুলিয়ে দেবেন"—তখন বোঝা গেল যে, রাজার সুখে আর কোনো বাধা রইল না। এ অঙ্গ 'রত্নকোশ'-এ অনুল্লেখিত।

ভাষণ (Expression of Satisfaction)

কাম্য ফল হাতে আসার পর চিত্তের সন্তোষ যে-কথায় প্রকাশ পায়, তারই নাম 'ভাষণ'। ভাষণ অংশে নতুন সম্মান ও গৌরবলাভের উল্লেখ থাকে। 'রত্নাবলী'তে (চতুর্থ অঙ্ক) রাজা যেমন পরিতুষ্টচিত্তে বলেছেন, "এমন প্রিয়তর কার্য নেই যা অসিদ্ধ রইল। সিংহলরাজ বিক্রমবাহু আমার আত্মীয় হলেন, জগতের অলংকারস্বরূপ প্রিয়া লাভ করলাম" ইত্যাদি।

পূর্বভাব (Anticipation)

'কার্য' বা পরিণামের পূর্বজ্ঞানই হল 'পূর্বভাব'। ভরত নাট্যশাস্ত্রে ও বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে একেই বলেছেন 'পূর্ববাক্য'। 'রত্নাবলী'তে শেষে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ যখন বাসবদত্তাকে বললেন, "এখন বোনের প্রতি আপনার কর্তব্য করুন", বাসবদত্তা মৃদু হেসে বললেন, "অমাত্যমশাই স্পষ্টই বলুন না যে, রত্নাবলীকে এবার রাজার হাতে সঁপে দিন!" এই কথায় অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে আগে থেকেই আভাস দেওয়া হচ্ছে, ফলে এরই নাম 'পূর্বভাব'। 'রত্নকোশ' 'পূর্ববাক্য' বলতে বুঝেছে কাহিনীর মূল বিষয়ের উল্লেখ। যেমন 'বেণী-সংহার'-এ ভীম বলছে, "বুদ্ধিমতিকা, কোথায় সেই ভানুমতী? এখন সে পাণ্ডববধূর অপমান করুক দেখি একবার!"

উপগূহন (Unforeseen Circumstanee)

কোনো অলৌকিক ঘটনার সংঘটন বা অলৌকিক বস্তুর প্রাপ্তিই 'উপগূহন'। 'বেণীসংহার'-এর শেষে হৃষ্টকামা দ্রৌপদী যখন আবার বেণী বাঁধছিলেন তখন স্বর্গবাসী সিদ্ধগণ তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এই অলৌকিক ঘটনা বা স্বর্গবাসী সিদ্ধদের আশীর্বাদস্বরূপ অলৌকিক বস্তুর প্রাপ্তিই এ নাটকের 'উপগূহন'।

কাব্যসংহার (Termination)

আশীর্বাদ বা পরমকাম্যের প্রাপ্তিই হল উপসংহার বা 'কাব্যসংহার'। প্রায় সব নাটকের শেষেই একটি চরিত্র এইরকম কথা বলে থাকে, "বলুন, আপনার জন্য আর কী করতে পারি!" এতেই বোঝা যায় যে, নাটক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে, আর কোনো ঘটনা ঘটবে না। এখানেই 'কাব্যসংহার' হচ্ছে।

প্রশস্তি (Benediction)

সুখ-সৌভাগ্যদায়ক বস্তুর জন্য প্রার্থনাই 'প্রশস্তি' বলে আখ্যাত হয়েছে। 'রত্নকোশ'-এর মতে প্রশস্তিতে রাজা, ব্রাহ্মণ আর গবাদির মঙ্গলকামনা থাকতেই হবে। 'মৃচ্ছকটিক'-এর 'প্রশস্তি' অর্থাৎ ভরত-বাক্যটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে তুলে দিচ্ছি।

গাভী হোক দুগ্ধবতী শস্যপূর্ণা বসুমতী মেঘ কালে করুক বর্ষণ।
সকল জনের চিত করিয়া গো হরষিত বহে যেন মধুর পবন॥
বৈধ অনুষ্ঠানে রত হোন বিপ্র অবিরত লক্ষ্মীবন্ত হোন সাধুগণ।
রিপু করি প্রশমন নৃপ ধর্মপরায়ণ পৃথিবীরে করুন পালন॥

পঞ্চসন্ধির চৌষট্টি অঙ্গের বর্ণনা শেষ হল।

এই অঙ্গগুলির মুখ্য কাজ কী কী? ধনঞ্জয়ের মতে এগুলির মূল কাজ ছ'টি, অর্থাৎ ছ'টি কারণে এগুলি নাটকে দরকার হয়। সেগুলি এই:

১. উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘটনাগুলিকে পরপর সাজাতে হবে;
২. যা দেখানো চলে না তাকে বাদ দিতে বা গোপন করতে হবে;
৩. যা ঘটনাকে সমৃদ্ধ করে এমন ব্যাপার যোগ করতে হবে—মূলে তা থাক আর নাই থাক;
৪. অভিনয়ে ভাবপ্রকাশ করতে হবে;
৫. বিস্ময়কর ও চমৎকারজনক বিষয় দেখাতে হবে,—এবং
৬. নাটক যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে তার জন্য অবহিত থাকতে হবে।

'বস্তু'র (Subject-matter-এর) দুরকম বিন্যাস

নাটকে কথাবস্তুর অবতারণা করা হবে দুভাবে। প্রথমত কিছু কিছু জিনিস আছে যা কেবল জ্ঞাপন করা হবে, সংবাদের মতো; অর্থাৎ সামনে দেখানো হবে না। আবার 'বস্তু'র কিছু অংশ দেখাশোনার মধ্যেই উপস্থাপিত করতে হবে।

বস্তুর যে জিনিসগুলি অত্যন্ত detail বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপার, কাজেই ততটা প্রাসঙ্গিক নয়; যেগুলি ভাবমূল্যের দিক থেকে দরিদ্র, অথবা নীরস, বিরক্তিকর বা অনুচিত,—সেগুলি পরোক্ষ সংবাদ হিসেবে জানানো হবে, সামনে দেখানো হবে না। কিন্তু যে-জিনিসগুলি মধুরস্বাদী বা মহদ্‌ভাব-প্রকাশক (উদাত্ত-গুণবাচক), যা রসাশ্রিত—সে সবই দর্শনশ্রবণের আওতায় আনতে হবে।

পরে বইয়ের তৃতীয় অংশে কী কী মঞ্চে দেখানো হবে না তার একটা তালিকা দিয়েছেন ধনঞ্জয়। সেগুলি এই: দূর পথে দীর্ঘ যাত্রা, হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধ, রাজ্যে বা প্রদেশে রাজদ্রোহ, সংরোধ (Siege), খাওয়াদাওয়া, স্নানের দৃশ্য, সহবাস, দেহে অঙ্গরাগের লেপন, পোশাক পরা ইত্যাদি। তাছাড়া সাহিত্য-দর্পণ-এ 'দূরাহ্বান' অর্থাৎ দূর থেকে হাঁকডাকও দেখাতে মানা করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় নিষেধ: মঞ্চে কক্ষনো প্রধান চরিত্র অর্থাৎ—নায়ক-নায়িকার মৃত্যু দেখানো চলবে না। তবে যা না দেখালেই নয় ('আবশ্যকম্') তা দেখাতেই হবে। কিন্তু এ নিষেধ হয়তো কালিদাসের আগে চাপানো হয়নি। ভাসের 'ঊরুভঙ্গম্' একাঙ্ক নাটিকাটি বিয়োগান্ত, সেখানে এ নিয়মের কোনো স্বীকৃতি নেই।

পাঁচ রকমের বিরতি-দৃশ্য

বস্তুর যে-সমস্ত ব্যাপারগুলি পরোক্ষ সংবাদ হিসেবে জানতে হবে—সেগুলি বিরতির মধ্যে অর্থাৎ দুটি অঙ্কের মধ্যে (অঙ্কের শেষে বা প্রথমে) পাঁচটি উপায়ে নাটকে আনতে হবে। অর্থাৎ এই পাঁচটি বিরামনির্দেশক দৃশ্য থেকে বোঝা যাবে যে, মাঝখানে কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিছু ঘটনা ঘটেছে যা দৃশ্যহিসাবে অবান্তর, ইত্যাদি।

১. বিষ্কম্ভ, বিষ্কম্ভক (Explanatory Scene)

কোনো অঙ্কের আগে একটি বা দুটি মাঝারি ধরনের চরিত্র নিয়ে 'বিষ্কম্ভক' দৃশ্যটি অভিনীত হয়। এ দৃশ্যে যে-ঘটনা ঘটে গেছে (এবং যা দেখানো হয়নি), অথবা যা ঘটতে যাচ্ছে, তারই সংক্ষিপ্তসার বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এ তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে একটি প্রসিদ্ধ বিষ্কম্ভক আছে। এর চরিত্র তমসা ও মুরলা, দণ্ডকারণ্যের দুটি নদী। প্রথম অঙ্কে সীতানির্বাসনের পর বারো বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে রামচন্দ্র শম্বুকবধের জন্য দণ্ডকারণ্যে এসেছেন (দ্বিতীয় অঙ্ক), সুতরাং সীতার সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হওয়ার কথা। তমসা ও মুরলা সীতাবিরহে রামের বিপুল শোকের খবর, সীতার যমজ পুত্রলাভ ইত্যাদি সংবাদ দিচ্ছে এবং রামের সঙ্গে সীতার দেখা হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলছে। এ নাটকে আরো বিষ্কম্ভক আছে।

বিষ্কম্ভক দুরকম—১. শুদ্ধ, ২. সংকীর্ণ। যখন ঐ মাঝারি ধরনের একজন বা একাধিক চরিত্রের দ্বারা অভিনীত হয় তখন তা শুদ্ধ, কিন্তু যখন মাঝারি এবং নিচুদরের (হীনশ্রেণীর) এক বা একাধিক চরিত্রের দ্বারা তৈরি হয় তখন তা হয় সংকীর্ণ। অর্থাৎ শুধু মধ্যপাত্রদের নিয়ে যে বিষ্কম্ভক তৈরি তা শুদ্ধ, আর মধ্য ও নীচ পাত্রদের মিশ্রণে যেটি তৈরি তা সংকীর্ণ।

২. প্রবেশ, প্রবেশক (Introductory Scene)

প্রবেশক অনেকটা বিষ্কম্ভকের মতোই, তবে এ দৃশ্যটি কেবল নীচপাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয়। স্বভাবতই এ দৃশ্যে সংলাপের ভাষা লৌকিক ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত। এ দৃশ্যেও যে-সমস্ত বিষয় বর্জিত হয়েছে (দুটি অঙ্কের মধ্যে) সেগুলি সম্বন্ধে খবর বা বিবরণ পাওয়া যায়। তার মানে প্রথম অঙ্কে প্রবেশক দৃশ্য থাকে না। শ্রীহর্ষের ('রত্নাবলী'র রচয়িতা) 'প্রিয়দর্শিকা' নাটকে চতুর্থ অঙ্কের

গোড়ায় একটি 'প্রবেশক' আছে—তাতে দুজন দাসী বা সহচরী—মনোরমা ও কাঞ্চনমালা কথা বলছে। এদের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃত। বিষ্কম্ভকে মধ্য-স্তরের চরিত্ররা সংস্কৃতে কথা বলে, কিন্তু প্রবেশকে কেবল প্রাকৃত ভাষায় কথা চলে। আগের প্রবন্ধেও আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

৩. চূলিকা (Intimation Scene)

যে-দৃশ্যে নেপথ্য থেকে কোনো অভিনেতা ঘটনার বিবৃতি দেয়, তারই নাম 'চূলিকা'। সংস্কৃত নাটকে প্রায়ই নেপথ্যে কিছু কথাবার্তা বা হাঁকডাক থাকে। ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে ও মধ্যে গোটা তিনেক চূলিকা দৃশ্য আছে। প্রথমটিতে ইন্দ্র প্রভৃতি বিমানচারী দেবতারা রামের স্তুতিপাঠ করছে, দ্বিতীয়টিতে সীতা ঋষিদের প্রণামসম্ভাষণ করছেন, তৃতীয়টিতে লক্ষ্মণ হেঁকে বলছে যে, কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা রামের দর্শনের জন্য অযোধ্যায় এসেছে।

৪. অঙ্কাস্য (Anticipatory Scene)

যদি এক অঙ্কের শেষ অংশে অন্য অঙ্কের ঘটনাবলির উল্লেখ বা প্রসঙ্গ থাকে তাহলে সেই অংশের নাম 'অঙ্কাস্য'। ভরত এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী একেই বলেন 'অঙ্কমুখ'। অর্থাৎ পরবর্তী অঙ্কের ঘটনার একটি মুখবন্ধ বা প্রতীক্ষা যেন এই অঙ্কাস্যে থাকে। 'মহাবীরচরিত' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সুমন্ত্র সারথির কথাগুলি নাকি অঙ্কাস্যের অন্তর্গত—এইরকম বলা হয়েছে।

৫. অঙ্কাবতার (Continuation Scene)

যখন কোনো অঙ্কের শেষের ঘটনা অব্যাহতভাবে পরবর্তী অঙ্কে প্রবাহিত হয়, মাঝখানে 'বিষ্কম্ভক' বা 'প্রবেশক'-জাতীয় কোনো ছেদ পড়ে না, তখন ঐ অঙ্কের শেষের ঘটনাকে (যা পরবর্তী অঙ্কেও চলবে) বলে 'অঙ্কাবতার'। ধনিক কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক থেকে 'অঙ্কাবতার' দৃশ্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে)। এর প্রথম অঙ্কের শেষে হরদত্ত ও গণদাস—এই দুজন নাট্যাচার্য রাজার কাছে নিজের নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য নেপথ্যে গান রচনা করতে গেল। অঙ্ক শেষ হতে না হতেই গান রচনা শেষ হয়ে সংগীত শুরু হল মৃদঙ্গধ্বনির সঙ্গে। অঙ্কের শেষে দেখি রাজা, বিদূষক এবং মহারানি ওই

দিকে চলেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে দেখি সংগীতশালায় এসে তাঁরা আসন নিচ্ছেন।

এই দৃশ্যান্তর-পর্যায়ের সাহায্যে যা জানাবার তার জ্ঞাপন বা বর্ণনা করতে হবে এবং যা দেখানোর তা দৃশ্য ও অভিনেয়রূপেই দেখাতে হবে।

স্বগতোক্তি, জনান্তিক ভাষণ ইত্যাদি

উপরে যে-বস্তুর বিশ্লেষণ করে দেখানো হল, তাকে আরো তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে দেখানো যায়। প্রথমত, যে-বস্তু সকলে শুনবে (অর্থাৎ উপস্থিত সব অভিনেতার দ্বারা শ্রাব্য), আবার যে-বস্তু সকলে শুনবে না।

যা সকলে (মঞ্চে উপস্থিত সকল অভিনেতা) শুনবে তার নাম 'প্রকাশ', আবার যা অন্য অভিনেতারা শুনবে না (কিন্তু সমস্ত দর্শককে শুনতেই হবে) তার নাম 'স্বগত'। 'স্বগত'-কে 'আত্মগত' নামও দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া আর একটা নাটকীয় রীতির নাম হল 'জনান্ত' বা 'জনান্তিক'। এতে অন্যদের না শুনিয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির আলাপ চলে। বলা বাহুল্য এও দর্শকরা শুনছে, কেবল বাকি অভিনেতারা শুনছে না। এই জনান্তিকের সময় অভিনেতাকে হাতের 'ত্রিপতাকা' মুদ্রা করতে হবে, অর্থাৎ হাতের তিনটি আঙুল খাড়া থাকবে, বুড়ো আর আঙটির আঙুল ভিতর দিকে বেঁকে থাকবে। তাহলে ব্যাপারটা যে গোপনীয় তা বোঝা যাবে।

'অপবারিত' (Confidence) প্রায় জনান্তিকের মতোই, তবে এক্ষেত্রে আর একজনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গোপন কথা বলা হয়। এই গোপন কথা অন্যদের সম্পর্কে। এ কেবল যাকে বলা হবে সেই বুঝবে।

আর একটি নাটকীয় রীতি হল 'আকাশভাষিত'। এর মানে হল, মঞ্চে একাকী কোনো অভিনেতার কোনো কাল্পনিক ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলা। সামনে কেউ নেই, অথচ যদি সে বলে, 'কী বললেন ?' এবং এমন ভাব করে যেন সে তার প্রশ্নের উত্তরও শুনছে—তাহলে 'আকাশভাষিত'-র উদাহরণ ঘটে। 'ভাণ' জাতীয় আত্মভাষণপ্রধান একাঙ্কে আকাশভাষণের প্রচুর ব্যবহার ঘটে। রবীন্দ্রনাথের 'বিনি পয়সার ভোজ' বা চেখফের 'তামাকুসেবনের অপকারিতা' বিষয়ক মনোলগ্ দুটির কথা এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়বে। 'মুদ্রারাক্ষস'-এর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে জীর্ণবিষ নামক সাপুড়ে আকাশে তাকিয়ে ভাবভঙ্গি করে বলছে—"আমি কে জিজ্ঞেস করছেন ? আজ্ঞে আমি একজন সাপুড়ে, নাম

জীর্ণবিষ। আপনার কী করা হয়? কী বললেন? আপনি রাজকুলসেবক? তবে আপনিও তো সাপ খেলানোর ব্যাবসাই করেন দাদা"…ইত্যাদি। অনুবাদক Haas মেতারলিঙ্কের The Blue Bird-এর তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য (tableau) থেকে ইউরোপীয় আকাশভাষণের উদাহরণ দিয়েছেন।

এখানেই দশরূপক-এর প্রথম পর্যায় সমাপ্ত।

'দশরূপক' যখন লেখা হয় তার বেশ আগেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররা এসে গেছেন, শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিও লেখা হয়ে গেছে। কাজেই নাটক লেখার ম্যানুয়াল হিসেবে ইতিহাসে 'দশরূপক'-এর কোনো মূল্যই দাঁড়ায়নি। বলা বাহুল্য, আগে শ্রেষ্ঠ নাটক, পরে তার শাস্ত্র—কালানুক্রমের এই সম্পর্ক গ্রিক নাট্যকলা এবং আরিস্তোতলের 'পোয়েটিক্স'-এর ক্ষেত্রেও দেখি। কিন্তু পোয়েটিক্স যেখানে তার অব্যবহিত উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে সাহিত্য-সমালোচনায় কিছু সর্বকালীন ও সার্বভূমিক তত্ত্ব এবং সমস্যা তৈরি করতে পেরেছে, বিবৃতি হয়েছে বিধান—, সে দিক থেকে 'দশরূপক'-এর দৈন্য চোখে পড়ার মতো। এর বিবৃতিও গাছ দেখতে গিয়ে বনের চেহারাটা ভুলিয়ে দেয় মাত্র।

প্রশ্ন উঠবে, এসব অনেক কথা তো আগে স্বয়ং ভরতই বলে গেছেন, ভরতের শাস্ত্র তো আগে, পরে এসেছেন মহৎ নাট্যকারের দল—ভরত কেন কৃতিত্ব দাবি করবেন না তার জন্য? এই কারণে করবেন না যে, পৃথিবীর কোনো দেশেই নাট্যশাস্ত্র মহৎ নাটক সৃষ্টির হেতু হয়েছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। মহৎ নাটক মহৎ নাট্যকারের হাত থেকে বেরোয়, সময়ও তার জন্য খানিকটা দায়ী থাকে, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা সেখানে থাকে যৎসামান্য। ভাস তো মানেনইনি ভরতের অনেক কথা, প্রায় সমসাময়িক বলেই হোক, আর যে-কারণেই হোক। কালিদাস না-হয় অল্পবিস্তর মেনেছেন। তাতে এটা প্রমাণ হয় না কালিদাসের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব ঐ নাট্যশাস্ত্র মেনে চলার জন্য। তাহলে শ্রীহর্ষ এবং ভট্ট-নারায়ণ—যাঁদের নাটক 'দশরূপক'-এর প্রচুর বেশি উদাহরণ জুগিয়েছে—তাঁদের কালিদাসের চেয়েও অনেক বড় নাট্যকার বলতে হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অতিবিশ্লেষণ-প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে—দশরূপক-এর এ অংশও তার উদাহরণ।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ও রঙ্গালয়

১.

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্থায়ী নাট্যগৃহ ছিল কি না এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। উইলসন[১] যাকে 'পাবলিক থিয়েটার' বলা হয় ভারতবর্ষে তার অভাবের কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন দেশাচার ও জলবায়ুর বিরূপতা, কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্ট নয়। রাঘবন্[২] প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষে সাধারণ রঙ্গালয় না থাকলেও স্থায়ী রঙ্গালয় ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষে নাট্যশালা বলতে হঠাৎ-দরকারে গড়ে তোলা 'some sort of architectural structures' ছিল না, 'well planned, well built, decorated, beautiful theatres'-ই ছিল। বেশির ভাগ বিদেশী গবেষকের মতে ওই নাট্যাগারের জন্য আলাদা কোনো বাড়ি তৈরি হত না। রাজপ্রাসাদে যে-সংগীতশালা থাকত, তাতেই অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়ে নাটক দেখানোর সাময়িক ব্যবস্থা করা হত। কারণ নাট্যাভিনয় তখন একটা আনুষ্ঠানিক ও সাময়িক ব্যাপারই ছিল। ধর্মীয় বা রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠানে, তীর্থে যাত্রীসমাগমে, জাতীয় পরবে, অভিজাত সমাজের পারিবারিক কল্যাণ-অনুষ্ঠান বা বিবাহেই কেবল অভিনয়ের আয়োজন করা হত। বসন্ত-উৎসবে গীতি-প্রহসন বা comic opera অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। এই উৎসবে নাটকের প্রথম অভিনয় বা first-night-ও যে হত, সে খবরও ঐতিহাসিকেরা দিয়েছেন[৩]। সুতরাং নাট্যাভিনয় যখন অস্থায়ী ও আনুষ্ঠানিক ঘটনা মাত্র, তখন তার জন্য স্থায়ী নাট্যগৃহ নির্মাণের কোনো অর্থ হয় না—বিদেশী পণ্ডিতদের যুক্তির ধাঁচ এইরকম। রাজপ্রাসাদের সংগীতশালা বা সভাগৃহ (throne-room, court room), মন্দির সংলগ্ন বড় হল্—যাকে নাটমন্দির বা নাটমণ্ডপ এখনও বলা হয়—এগুলিতেই অস্থায়ী প্রেক্ষাগার নির্মাণ করা হত। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ মন্দিরে দেবতার মুখোমুখি এইরকম নাটমন্দির আছে, তাতে সেদিন পর্যন্ত দেববিগ্রহের সামনে দেবদাসীরা ভরতনাট্যম্ ইত্যাদি নাচ নাচত। বাংলা-

দেশের মন্দিরেও নাটমন্দির খুব দুর্লভ নয়। সুতরাং বিদেশী পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত মোটামুটি এই যে, রাজপ্রাসাদ বা অভিজাত-গৃহের সংলগ্ন বড় হল্‌ঘর, সম্ভবত সংগীতশালা, নৃত্যশালা বা মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দির (এখানেও নাচই হত প্রধানত) নাটকের দরকারে সাময়িকভাবে প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তরিত করা হত।

কিন্তু অন্যদিকে নানা নাটক, শাস্ত্র এবং গ্রন্থের সাক্ষ্য বলছে, স্থায়ী রঙ্গালয় অবশ্যই ভারতবর্ষে ছিল। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে 'প্রেক্ষাগার' কথাটির উল্লেখ আছে [প্রথম অঙ্ক], যদিও দ্বিতীয় অঙ্কে যখন সেখানে মালবিকাকে 'চলিত' নামক নৃত্যনাট্য অভিনয় করতে দেখি তখন 'প্রেক্ষাগার' আর 'সংগীতশালা'র তফাত ঠিক বোঝা যায় না। রাঘবন্ অবশ্য এই প্রেক্ষাগারকে 'perfect natyasala' বলতে চান, কারণ এতে নেপথ্য এবং যবনিকার উল্লেখ আছে। প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনি হয়েছে এবং দ্বিতীয় অঙ্কে সংগীতশালায় এসে মালবিকার প্রণয়ে উন্মত্ত রাজার যবনিকা বা 'তিরস্করণী' ভেদ করে ঐ সুন্দরী যুবতীকে দেখার ইচ্ছা জাগছে! তা ছাড়া ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', শারদাতনয়-এর 'ভাবপ্রকাশ', নারদের 'সংগীতমকরন্দ', রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা', এবং 'বিষ্ণুধর্মোত্তর', 'শিল্পরত্ন', 'সংগীতরত্নাকর' ইত্যাদি গ্রন্থে নাট্যশালা নির্মাণ ও স্থাপত্য-প্রকরণের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বহু বিতর্কিত দ্বিতীয় অধ্যায়ই মোটামুটিভাবে আর সব বইয়ের মূল আদর্শ, ভরতের বর্ণনাই একটু-আধটু হেরফের করে আর সকলে ব্যবহার করেছেন। ফলে প্রাচীন ভারতের নাট্যাগারের স্থাপত্য জানতে হলে আমাদের শেষ পর্যন্ত ভরতমুনিরই শরণাপন্ন হতে হবে। ভরত অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে soil test বা মাটি-যাচাই থেকে শুরু করে নাট্যশালা নির্মাণের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মনে হয়, স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ যদি না থাকবে তাহলে এত কাণ্ডের দরকার কী ছিল? পরে আমরা দেখব, ভরত বলছেন কীভাবে ভিত তৈরি করতে হবে, কীভাবে মেঝে সমান করতে হবে, কীভাবে নানা কাঠের মূর্তিওয়ালা থাম, বেদিকা, গবাক্ষ তৈরি করতে হবে, কীভাবে সোপানাকৃতি বা গ্যালারি ধরনের আসন বসাতে হবে (কিংবা দোতলা বানাতে হবে), কীভাবে দেয়ালে নানা ছবি আঁকতে হবে, ইত্যাদি। এই বিশদ ব্যবস্থা কেবল অস্থায়ী নাটমঞ্চের জন্য? কিংবা 'সংগীতশালা' বা 'নৃত্যশালা'র জন্য? ভরত তাহলে 'সংগীতশালা'র কথাই বললেন না কেন, কেন তিনি 'প্রেক্ষাগৃহ-লক্ষণম্'ই বর্ণনা

করলেন এত করে? তাঁর ব্যবহৃত 'নাটমণ্ডপ', 'নাট্যবেশ্ম', 'প্রেক্ষাগৃহ', 'নাট্যগৃহ', 'রঙ্গপীঠ', 'রঙ্গশীর্ষ', 'নেপথ্যগৃহ' ইত্যাদি শব্দ কি তাহলে শুধু 'সংগীতশালা' বা 'নৃত্যশালা' বা এসবের অংশবিশেষ বোঝায়? স্থায়ী মঞ্চ ছিল না—এই সিদ্ধান্ত ধরে নিলেই উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির সদুত্তর পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া স্থায়ী নাট্যশালার একটি ঐতিহাসিক উল্লেখও পাওয়া যায় জে. সি. জৈন-এর লেখা *Life in Ancient India as Depicted in the Jaina Canons* গ্রন্থে, তবে তাঁর উৎস আধুনিক বলে অনেকে ওই উল্লেখকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করতে চান না[8]। একথা ঠিক যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে নাচ-গান আর অভিনয়ের যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, তবু নাটক মূলত রসাভিনয়-নির্ভর এবং তা নৃত্য (যা 'ভাবাভিনয় নির্ভর'), এবং 'নৃত্ত', (যা শুধু তাললয়াশ্রিত) থেকে যে আলাদা একথা ধনঞ্জয় বুঝিয়ে বলবার জন্য বিশেষ যত্ন নিয়েছেন[5]। তাছাড়া নাট্যশাস্ত্রে ভরত এক-এক ধরনের নাটকের জন্য, বিষয়ভেদে এক-এক রকম নাট্যগৃহের ব্যবস্থা দিয়েছেন। বিষয় অনুসারে নাটক-ভেদে যদি এক-একরকম নাট্যগৃহের নির্দেশ থাকে তাহলে নাটক নামক স্বাধীন শিল্পটির জন্য আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা থাকবে না, তাকে 'সংগীতশালা' বা 'নৃত্যশালা'তে ঠাঁই ভিক্ষা করতে হবে, এ কেমন কথা? সুতরাং Palace Theatreই হোক, আর Temple Theatreই হোক, নাটকের জন্য স্থায়ী মঞ্চ থাকা খুবই সম্ভব। মন্দিরে তো দেবমাহাত্ম্যসূচক নাটক-অভিনয়ের রেওয়াজই ছিল। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' বছরে একবার করে কালপ্রিয়নাথের 'যাত্রা' উৎসবে অভিনীত হত—নাটকের প্রস্তাবনায় এরকম সংবাদ আছে। এলোরার কৈলাস গুহায় একটি নাটমন্দির আছে। কোনারকের মন্দিরেও একটি নাটমন্দির লক্ষ করা যায়। এগুলিতে সংগীত নৃত্য ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয় যে হত না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও প্রাচীন ভারতবর্ষে স্থায়ী নাট্যাগারের অভাব সম্বন্ধে ম্যাকডোনেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন। একটি 'সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী পত্রিকায়' ছাপানো তাঁর সেই প্রবন্ধটি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু জনৈক বাঙালি লেখক[6] তাঁর দু-একটি ঐতিহাসিক যুক্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন এভাবে: "তিনি বলিয়াছেন,—ষাট বৎসরের কিছুদিন অধিক হইল, কর্নেল উজ্‌লে মারগুজা প্রদেশে রামগড় পাহাড়ে দুইটি গুহা আবিষ্কার করেন। উহাতে অশোকাক্ষরে খোদিত লিপিও আছে। এই লিপিতে যাহা উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা কোনও ঐতিহাসিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় কথা নহে।

কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার ব্লক এই গুহাগুলি দেখিতে যান, তিনি এই লিপিগুলির নূতন প্রতিলিপি আনিয়া পাঠ করিয়া তাহাদিগকে নাট্যসম্বন্ধীয় লিপি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনুমান করিয়াছেন, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে হিন্দুর এই বিরাট নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়াছিল।"[৭] একথা কিন্তু বার্জেস্ গ্রহণ করেননি, বাঙালি অসিতকুমার হালদার, শরৎচন্দ্র ঘোষাল—এঁরাও এ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করার মতো কোনো প্রমাণ পাননি।

২.

যাই হোক, নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় নাট্যগৃহের বিস্তৃত প্রসঙ্গই রয়েছে। ভরতের এই বর্ণনাকে আদ্য রঙ্গাচার্য যে 'repetitive, conflicting and confusing'[৮] বলেছেন, তা অকারণ গালাগাল নয়। এ বস্তুটি থেকে আমরা তো দূরের কথা, স্বয়ং অভিনবগুপ্ত (১০ম-১১শ শতাব্দী) পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট বক্তব্যে পৌঁছতে পারেননি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ভট্ট-শঙ্কুক, ভট্ট-উপাধ্যায় প্রভৃতি অজস্র ব্যক্তির মতামত উদ্ধার করেছেন, কিন্তু নিজে কোনো সুনির্দিষ্ট মত তৈরি করে বলতে পারেননি যে, "হ্যাঁ, ঠিক এরকমই ছিল"। অর্থাৎ অভিনবগুপ্তের সময়েই সংস্কৃত নাটকের অভিনয় প্রায় কিংবদন্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। বলা বাহুল্য তার বহু আগে থেকে (বলা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে) সংস্কৃত লোকমুখের ভাষা থেকে ক্রমশ দূরবর্তী হতে শুরু করেছে। আর সর্বজনীন জীবনযাত্রার সঙ্গে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত নাটকের যোগ কোনোকালেই খুব-একটা ছিল না, কাজেই দিন দিন সংস্কৃত নাটক নাটকের 'ব্লু-প্রিণ্ট' মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, শুষ্ক পাঠ্য মাত্র, যা থেকে তার দেশ-কাল-পটভূমিকার একটা অস্পষ্ট আভাস হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু আর কোনোদিন তার জীবন্ত বাস্তবকে উদ্ধার করা যাবে না। সুতরাং অভিনবগুপ্তের পক্ষে যে-গোলোক-ধাঁধার মর্ম ভেদ করা সম্ভব হয়নি, তা আমাদের পক্ষে কতটা সম্ভব হবে কে জানে? আর অভিনবগুপ্তের পুথি যে-অবস্থায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তা থেকে যে-কোনো সত্য উদ্ধারই খুব দুরূহ ব্যাপার।

ভরতের মতে, দেবস্থপতি বিশ্বকর্মা মোটামুটিভাবে তিন ধরনের নাট্যগৃহের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১. 'বিকৃষ্ট' বা আয়তক্ষেত্রাকার, ২. 'চতুরস্র' বা বর্গক্ষেত্রাকার, ৩. 'ত্র্যস্র' বা ত্রিভুজাকৃতি। এগুলির আবার বড় ['জ্যেষ্ঠ'], মাঝারি ['মধ্য'], এবং ছোট ['অবর' / 'কনীয়স্'] এই তিন রকমের ভেদ

ছিল। তাহলে ঐ তিন ধরনের থিয়েটার আর তাদের তিনটি করে উপবিভাগ নিয়ে দাঁড়ালো মোট (৩×৩) অর্থাৎ নয় ধরনের থিয়েটার :

১. বিকৃষ্ট	২. চতুরস্র	৩. ত্র্যস্র
বিকৃষ্টজ্যেষ্ঠ	চতুরস্রজ্যেষ্ঠ	ত্র্যস্রজ্যেষ্ঠ
বিকৃষ্টমধ্য	চতুরস্রমধ্য	ত্র্যস্রমধ্য
বিকৃষ্টাবর	চতুরস্রাবর	ত্র্যস্রাবর

কারো কারো মতে অবশ্য বিকৃষ্ট অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রাকার প্রেক্ষাগৃহ=জ্যেষ্ঠ; চতুরস্র=মধ্যম এবং ত্র্যস্র=অবর বা কনীয়স্[৯]। কিন্তু অভিনবগুপ্ত এই অতি-সরল বিভাগে আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে থিয়েটার ছিল ওই নয় রকমের। কিন্তু ওই ন-রকম বলেই অভিনবগুপ্ত শেষ করতে পারেননি। আবার মাপও ছিল দুরকমের—হাতের[১০] আর দণ্ডের। তাহলে দাঁড়াল, হাতের মাপের ন'রকম নাট্যগৃহ আবার দণ্ডের [চার হাতে একদণ্ড] মাপের ন'রকম নাট্যগৃহ—মোট আঠারো রকমের নাট্যগৃহ। অভিনবগুপ্ত নিজেই বলেছেন যে, এত রকমের থিয়েটার কী কাজে লাগত তা বুঝে ওঠা মুশকিল।[১১] এখনকার পণ্ডিতেরা দণ্ডের মাপের উল্লেখই করেন না কেউ। ভরত নিজেই হাতের মাপকে আশ্রয় করেই যা বলবার বলেছেন। সুতরাং দণ্ডের মাপের কথা ভুলে গেলে বাড়তি ন'ধরনের থিয়েটারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শুধু হাতের মাপে আমরা পাই ন'ধরনের থিয়েটার—উপরের তালিকার মতো। ভরত বলেছেন, জ্যেষ্ঠের মাপ হবে ১০৮, মধ্যের মাপ ৬৪, অবর বা কনীয়সের মাপ ৩২। মাপের একক (Unit) যদি হাত ধরি তাহলে ওই ন-শ্রেণীর থিয়েটারের আয়তন এইরকম খাড়া হয় :

		দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
১. বিকৃষ্ট		
	বিকৃষ্টজ্যেষ্ঠ	১০৮ × ৬৪ বর্গহাত
	বিকৃষ্টমধ্য	১০৮ × ৩২ (৬৪ × ৩২ ?) „
	বিকৃষ্টকনীয়স্ বা বিকৃষ্টাবর	৬৪ × ৩২ (৩২ × ১৬ ?) „
২. চতুরস্র		
	চতুরস্রজ্যেষ্ঠ	১০৮ × ১০৮ বা ৬৪ × ৬৪ বর্গহাত
	চতুরস্রমধ্য	৬৪ × ৬৪ বা ৩২ × ৩২ „
	চতুরস্রকনীয়স্ বা চতুরস্রাবর	৩২ × ৩২ বা ১৬ × ১৬ „

৩. ত্র্যস্র

ত্র্যস্রের কোনো আলাদা মাপের বিস্তারিত উল্লেখ ভরতে নেই। তবে ত্র্যস্র আসলে সমবাহু ত্রিভুজের মতো ছিল, এই অনুমান করে এইরকম ভেবে নেওয়া যায় যে[১২]

ত্র্যস্রজ্যেষ্ঠ-র একটি বাহুর মাপ ১০৮ হাত
ত্র্যস্রমধ্য-র " " " ৬৪ "
ত্র্যস্রাবর বা ত্র্যস্রকনীয়সের " " " ৩২ "

কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিকাংশ স্থান জুড়ে যে-নাট্যগৃহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার মাপ ৬৪ হাত × ৩২ হাত। একেই ভরত বলেছেন বিকৃষ্ট। কোন্ বিকৃষ্ট—জ্যেষ্ঠ, মধ্য, না অবর? অধ্যাপক মাঁকড়[১৩] বলছেন বিকৃষ্টমধ্য। তার কারণ ভরতের এক জায়গায় আছে—জ্যেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ হল দেবতাদের যোগ্য, মধ্য প্রেক্ষাগৃহ রাজারাজড়ার যোগ্য, আর অবর মাপের প্রেক্ষাগৃহ ইতরজনের জন্য। অভিনবগুপ্ত এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যে-নাটকে দেবতারা নায়ক ['ডিম' শ্রেণীর নাটক[১৪]] তার জন্য দরকার বড় মাপের প্রেক্ষাগার,—সম্ভবত এই কারণে যে, সেখানে দেব-দানবের যুদ্ধ দেখানোর জন্যে বেশি পরিসর দরকার হতে পারে; আর যে নাটকে রাজা বা রাজপ্রতিম পুরুষ নায়ক ['নাটিকা' 'প্রকরণ'[১৫] ইত্যাদি] তার জন্যে মধ্য আয়তনের প্রেক্ষাগৃহই যথেষ্ট। আর যেখানে সাধারণ মানুষ প্রধান চরিত্র ['ভাণ' বা 'প্রহসন'[১৬] জাতীয় নাটকে], সেখানে ছোট নাট্যাগার হলেই চলবে। এ সম্ভবত এক ধরনের পারিবারিক বা গার্হস্থ্য থিয়েটার ছিল। ভরত মধ্যম মাপের প্রেক্ষাগৃহকেই মর্ত্যমানবের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে বর্ণনা করেছেন। আর ভরত 'বিকৃষ্ট' বলে যে নাট্যাগারের বর্ণনা করেছেন, তার মাপ তিনি নিজেই দিয়েছেন—৬৪ × ৩২ বর্গহাত; এবং চতুরস্র বলে যে নাট্যাগারের বর্ণনা দিয়েছেন তারও প্রকাশ্য মাপ ৩২ × ৩২ বর্গহাত। সমস্ত বিরোধকে মিলিয়ে অধ্যাপক মাঁকড় নিম্নলিখিত সংশোধিত মাপ নির্ণয় করেছেন[১৭] :

১.

ক.	বিকৃষ্ট	১০৮ × ৬৪ বর্গহাত
খ.	বিকৃষ্টমধ্য	৬৪ × ৩২ "
গ.	বিকৃষ্টাবর	৩২ × ১৬ "

২. চতুরস্র

ক.	চতুরস্রজ্যেষ্ঠ	৬৪ × ৬৪	"
খ.	চতুরস্রমধ্য	৩২ × ৩২	"
গ.	চতুরস্রাবর	১৬ × ১৬	"

ত্র্যস্রর মাপ নিয়ে ভরতের মতো অধ্যাপক মাঁকড়ও ব্যতিব্যস্ত হননি দেখা যাচ্ছে। মাঝারি মাপের থিয়েটারকেই ভরত মর্ত্যমানবের পক্ষে যথাযথ বলেছেন যে, তা এই কারণে: প্রথমত, দেবতাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মানুষের উচিত নয়, দ্বিতীয়ত ঘর বেশি বড় হলে দর্শকদের দেখা ও শোনার অসুবিধা হবে। অভিনেতার কণ্ঠস্বর দূরে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসবে, আর মুখের অভিব্যক্তিও বহুদূর থেকে চোখে পড়বে না। সুতরাং মধ্য মাপের প্রেক্ষাগৃহই ভালো। এর মধ্যে বিকৃষ্টমধ্য ও চতুরস্রমধ্যের স্পষ্ট মাপ পাচ্ছি—আমরা ধরে নিচ্ছি যে, বিকৃষ্টের মধ্যে বিকৃষ্টমধ্য ও চতুরস্রের মধ্যে চতুরস্রমধ্যই ভরতের অনুমোদিত। বিকৃষ্টমধ্য আয়তক্ষেত্রাকার, চতুরস্রমধ্য বর্গাকার।

কিন্তু যে-মাপই হোক, এ রঙ্গালয় খুব বড় ছিল না, চারশোর মতো দর্শক তাতে বসতে পারত। সেখানে আথেন্সের নাট্যশালায় বসত হাজার পনেরো দর্শক। মনোমোহন ঘোষের এই তুলনা[১৮] থেকেও আমরা বুঝতে পারি, জনগণের রঙ্গালয় হিসাবে এ নাট্যশালা পরিকল্পিত হয়নি।

৩.

বিকৃষ্টমধ্য বা আয়তক্ষেত্রাকার প্রেক্ষাগৃহ

আগেই বলা হয়েছে, এ ধরনের থিয়েটারের মাপ হল—লম্বায় ৬৪ হাত, চওড়া ৩২ হাত। মনে রাখতে হবে, সব থিয়েটারই হবে পুবমুখো, অর্থাৎ নাট্যগৃহ পুবে-পশ্চিমে ছড়ানো থাকবে, প্রবেশপথ থাকবে পুবে। মঞ্চও হবে পশ্চিমাভিত্তিক, stage opening পুবদিকে। দর্শক পশ্চিমের দিকে মুখ করে বসে অভিনয় দেখবে।

এবার প্রেক্ষাগৃহের মূল পরিকল্পনাটি লক্ষ করি। পুরো ৬৪ × ৩২ বর্গহাত আয়তনকে আড়াআড়ি ঠিক সমান-সমান দুভাগে ভাগ করতে হবে। পুবদিকের অর্ধাংশ হবে 'প্রেক্ষাগার' বা 'রঙ্গশালা' বা 'রঙ্গমণ্ডপ' বা 'রঙ্গমণ্ডল' অর্থাৎ auditorium, দর্শকদের বসবার জায়গা। দর্শকের বসবার জায়গা তাহলে হল

৩২ হাত×৩২ হাত। বাকি অর্ধাংশ হল (আবার ওই ৩২ হাত×৩২ হাত) 'রঙ্গভূমি' বা stage—যদিও stage কথাটি আসলে অনেক ব্যাপক অর্থে নিতে হবে, কারণ গ্রিনরুম, উইংস্ ইত্যাদি এই রঙ্গভূমিরই অংশবিশেষ। এই 'রঙ্গ-ভূমি'কে আবার আড়াআড়ি সমান-সমান দুভাগে ভাগ করতে হবে [১৬×৩২ বর্গহাত করে]। শেষ অর্থাৎ একেবারে পশ্চিমের ভাগটি রাখতে হবে 'নেপথ্যগৃহ' বা গ্রিনরুম-এর জন্য। এখন নেপথ্যগৃহ আর অডিটোরিয়ামের মধ্যে যে ১৬×৩২ বর্গহাত পরিমাণ জায়গা বাকি রইল তাকে আবার আড়াআড়ি সমান দুভাগে ৮×৩২ বর্গহাত করে—ভাগ করতে হবে। নেপথ্যগৃহের সঙ্গে লেগে রইল যে-চিলতেটি—সেখানে উঠবে 'রঙ্গশীর্ষ' অর্থাৎ স্টেজের শেষ দিকে একটু উঁচু প্ল্যাটফর্ম, যদিও এটা সাধারণত বড় স্টেজেই থাকত। আর সামনের ৮×৩২ বর্গহাত আয়তনের ভাগটায় উঠবে 'রঙ্গপীঠ' অর্থাৎ আসল স্টেজ—যেখানে মূল অভিনয় হবে। কিন্তু রঙ্গপীঠের পুরো ৮×৩২ বর্গহাত জায়গা জুড়েই যে অভিনয় হবে তাও নয়। এরও দুপাশে ৮ হাত×৮ হাত মাপের দুটো চৌকো অংশ কেটে নিয়ে তাতে দুটি 'মত্তবারণী' তৈরি করা হবে। তাহলে কেটেছেঁটে 'রঙ্গপীঠ' বা স্টেজের জন্যে সাকুল্যে ৮ হাত×১৬ হাত জায়গা বাকি রইল। তার depth ৮ হাত, opening ১৬ হাত। এখানেই অভিনেতাদের এসে যা-কিছু বলার এবং নর্তন-কুর্দন করবার, তা করতে হবে। অভিনবগুপ্ত অবশ্য আর একটি মত উল্লেখ করেছেন যাতে রঙ্গপীঠ অর্থাৎ stage proper-এর গভীরতা ১৬ হাত এবং প্রস্থ ৮ হাত বলা হয়েছে। কিন্তু এ মাপ কেউ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না।

রঙ্গশীর্ষ

নেপথ্যগৃহ থেকে প্রথমে আসতে হবে রঙ্গশীর্ষে। রঙ্গশীর্ষ পার হয়ে রঙ্গপীঠে বা মঞ্চে। নেপথ্যগৃহ থেকে মঞ্চে তথা রঙ্গশীর্ষ এবং রঙ্গপীঠে আসার দুটি দরজা[১৯],—মাঝখানে দেয়াল আছে বলেই দুটি দরজার দরকার। রঙ্গশীর্ষ বলতে রাঘবন্ বুঝিয়েছেন রঙ্গপীঠের ঠিক পিছনে ৮×৮ বর্গহাত জায়গা, নেপথ্যের দেয়ালের গায়ে লাগা। ওই দেয়ালের ঐ জায়গাটায় অলংকৃত কাঠের প্যানেল থাকবে, ঠিক তার সামনেই অর্কেস্ট্রা[২০] অর্থাৎ গায়ক-বাদকের দল বসবে। কাঠের ওই প্যানেলের নাম মাঁকড়ের মতে 'ষড়্দারুক[২১]। 'ষড়্দারুক'-এর সামনেকার ৮×৮ বর্গহাত পরিমাণ জায়গাকেই রাঘবন্ 'রঙ্গশীর্ষ' বলেছেন।

কিন্তু রঙ্গশীর্ষ যদি এত ছোট হয় তাহলে গায়ক-বাদকেরা বসলেই তো পুরো ভর্তি হয়ে যাওয়ার কথা। অন্যদিকে বলা হয়েছে যে, রঙ্গশীর্ষে অভিনেতারা অপেক্ষা বা বিশ্রাম করে—যখন যার অভিনয় তখন সে রঙ্গপীঠে এগিয়ে গিয়ে অভিনয় করে, শেষ হয়ে গেলে পিছিয়ে রঙ্গশীর্ষে এসে জিরোয়—সেখানে তারা নাট্যারম্ভের আগে পুজোও দেয় এবং ওখান থেকে প্রম্ট্ করে, স্টেজের প্রপার্টি জমা রাখে, নানা effect দেয়। রঙ্গশীর্ষ যদি মাত্র ৮×৮ বর্গহাত হবে, সেখানে গায়ক-বাদক জায়গা নেওয়ার পর বাড়তি লোক ধরবে কী করে? তাই মাঁকড় মনে করেন নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গপীঠ এবং দুটো মত্তবারণীর পিছনদিককার সীমানার মধ্যবর্তী পুরো ৮×৩২ বর্গহাত জায়গাটাই 'রঙ্গশীর্ষ' ছিল। মাঁকড়ের মতে মত্তবারণী দুটির পিছনে অভিনেতারা এসে অপেক্ষা করত বা বিশ্রাম করত অভিনয়ের আগে-পরে।

বিকৃষ্টমধ্য ধরনের থিয়েটারে রঙ্গশীর্ষ রঙ্গপীঠের চেয়ে দেড় হাত পরিমাণ উঁচু ছিল বলে জানা যায়। কোনো স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায়, কেবল রঙ্গশীর্ষের কেন্দ্রে ওই অর্কেস্ট্রা বসার ৮×৮ বর্গহাত পরিমাণ স্থান উঁচু ছিল বলে মাঁকড়ের ধারণা। আর দুপাশের জায়গা নেপথ্য ও রঙ্গপীঠের সমতলেই ছিল।

যবনিকা

রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠের মধ্যে সম্ভবত ১৬ হাত লম্বা একটি পর্দা থাকত, যার নাম 'প্রতিশীরা', 'যবনিকা', 'তিরস্করণী', 'পটী', 'অপটী' ইত্যাদি। এই যবনিকার পিছনেও কিছু করণীয় কাজ ছিল, সেগুলি নাটক আরম্ভের আগে। সেগুলি 'পূর্বরঙ্গে'র অন্তর্ভূত—১. বাদ্যযন্ত্র গুছিয়ে রাখা, ২. বাদকদের ঠিক জায়গায় এসে বসা, ৩. সুর ধরা, ৪. বাদ্য পরীক্ষা, ৫. কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যন্ত্রস্বরের মিল, ৬. তারযন্ত্রের সঙ্গে গলার পর্দা মেলানো, ৭. বিবিধ যন্ত্রে বাদকদের হস্তসংযোগ, ৮. ঐকতান শুরু, ৯. তাল বিধান ও ১০. ঈশ্বরের স্তোত্র গান। এগুলি যবনিকার আড়ালেই করতে হবে। তারপর একপাশ থেকে যবনিকা সরিয়ে [হাত দিয়ে ঠেলে] সূত্রধার ঢুকবেন, দশ দিক প্রদক্ষিণ করে দশ দিক্‌পালকে প্রণাম করবেন। তারপর নান্দীপাঠ এবং কয়েকটি স্তোত্রপাঠের পর যথার্থ অভিনয় আরম্ভ। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও যে যবনিকার আড়ালে এসে অপেক্ষা করত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে তার ইঙ্গিত পাই—আগে তার উল্লেখ করা হয়েছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর সাক্ষ্য

থেকে মনে হয় যবনিকা পাতলা কাপড়ের হত, যার আড়ালে আভাসরূপে সবই চোখে পড়ে—এমন সূক্ষ্মবস্ত্রের। তবে তাতে সূচীকার্যের নানা অলংকরণ থাকত। নাটকের মূল রস অনুযায়ী যবনিকার রঙেরও বৈচিত্র্য হত বলে বলা হয়েছে—প্রণয়রসের নাটকে তার রঙ শাদা, বীররসের নাটকে হলুদ, করুণরসের নাটকে ফিকে ধূসর, প্রহসনে বহুবর্ণ। শোক ও ভয়ের দৃশ্যে কালো যবনিকার ব্যবহার ছিল, খুনজখম, মারামারি, যুদ্ধ ইত্যাদির দৃশ্যে লাল।[২২] অনেকে আবার বলেন, যবনিকার রঙ সবসময়েই লাল হবে।[২৩] যবনিকা দুদিকের মত্তবারণীকে ঢেকে রাখত, মত্তবারণীতে গিয়ে অভিনেতারা পোশাক বদলে নিত—সময় কম থাকলে আর নেপথ্যগৃহে ফিরে যেত না—এমনও কেউ বলেছেন। দুটি মেয়ে—তাদের অসামান্য সুন্দরী ও সুদেহিনী হতে হবে—রঙ্গপীঠের পিছনে দুধারে এই যবনিকার দুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকত, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঢোকবার বা বেরুবার সময় তারা এটি তুলে ধরত। কখনও কখনও নাটকে বেগে প্রবেশের ব্যাপার থাকলে অভিনেতা নিজেই পর্দা ঝপাৎ করে তুলে ঢুকে পড়ত। নাটক আরম্ভ হলে কি যবনিকা সম্পূর্ণ খুলে নেওয়া হত? ভারতীয় থিয়েটারের একেবারে আদিযুগে রঙ্গশীর্ষ আর রঙ্গপীঠের মধ্যে হয়তো দেয়ালই ছিল, দুটো দরজাওয়ালা, পরে দেয়াল অপসৃত হয়ে সেখানে যবনিকা আসে।

মত্তবারণী

মত্তবারণী দুটি কী বস্তু তা নিয়ে অনেক তর্ক আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতই মত্তবারণীর অবস্থান সম্বন্ধে একমত,—প্রায় সকলেই বলছেন রঙ্গপীঠের দুধারে দুটি বর্গক্ষেত্রাকার [৮ হাত × ৮ হাত] জায়গায় থাকবে দুটি মত্তবারণী। তাদের দুপ্রান্তের দেয়াল মূল নাট্যগৃহের দেয়াল, তাদের চার কোণে চারটি করে থাম। রাঘবনের মতে মত্তবারণী দুটি বারান্দা মাত্র—স্টেজের সঙ্গে এক লেভেলে, কিন্তু মূল স্টেজের বাইরে। মাঁকড়ের মতে মত্তবারণীর পিছনে এবং বাইরের [উত্তর-দক্ষিণের] দু প্রান্তে দেয়াল থাকত। তারই ফলে রঙ্গশীর্ষের ওই জায়গায় অর্থাৎ মত্তবারণীর পিছনকার দেয়ালের আড়ালে গিয়ে অভিনেতারা অপেক্ষা বা বিশ্রাম করত, দর্শকরা তাদের দেখতে পেত না। মাঁকড় আরও বলছেন যে, মূল স্টেজ অর্থাৎ রঙ্গপীঠ আর মত্তবারণীর মধ্যে কোনো আড়াল ছিল না, অন্যদিকে মত্তবারণীর সামনেটায়, অর্থাৎ দর্শকের দিকটাতেও কোনো দেয়াল ছিল না। তাহলে জিনিসটা এই দাঁড়ায় যে, মত্তবারণীর দুদিকে দেয়াল ছিল—উত্তরে/

দক্ষিণে আর পিছনে,—দুদিকে ছিল খোলা, স্টেজের দিক আর দর্শকদের দিক। মত্তবারণী আর রঙ্গপীঠ একই লেভেলে—এবং এদের লেভেল অডিটোরিয়ামের মেঝে থেকে দেড়হাত উঁচু। মাঁকড় এবং চন্দ্রভান গুপ্তের মতে মত্তবারণী রঙ্গপীঠেরই "special portions" মাত্র, কারণ ঐ দু-জায়গাতেও অভিনয় হত। অর্থাৎ, মাঁকড়ের কথায়—মত্তবারণী দুটি "were in a sense distinct from the Rangapitha and yet formed a part of it"। উত্তরভারতের 'স্বাঙ্গ' নামক লোকনাট্যে ওই ধরনের প্রান্তিক অংশ উত্তেজিত বক্তৃতা বা তর্জন-গর্জনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। চন্দ্রভান গুপ্ত অবশ্য ভরতের প্রচলিত বয়ান অনুসরণ করে মত্তবারণী দুটিকেই মূল স্টেজের চেয়ে দেড়হাত উঁচু বলেছেন। অভিনবগুপ্তেরই উদ্ধৃত একটি মত এই। দ্বিতীয় মত, উভয়েই সমতল। এটাই অধিকাংশের মত। মত্তবারণীকে কেউ কেউ 'উইংস' বলেছেন, কিন্তু তা সম্ভবত ঠিক নয়। জিনাইন ওবোয়ার তাঁর *'Daily Life in Ancient India* গ্রন্থে মত্তবারণীকে 'উইংস' বলে নির্দেশ করেছেন, এবং সেখানে সময় কম থাকলে অভিনেতৃবর্গ পোশাক বদলাত বলেছেন—কিন্তু তাঁর সংবাদের উৎস ও প্রামাণিকতা আমার অজ্ঞাত। অধিকাংশেরই মত হল, মত্তবারণী রঙ্গপীঠেরই সম্প্রসারিত দু প্রান্ত। মনোমোহন ঘোষ মত্তবারণীকে 'a side room' হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।[২৭] মত্তবারণীর পিছনদিকের দেয়াল দুটিতে সম্ভবত দুটি দরজা ছিল, যাতে রঙ্গশীর্ষ থেকে সেখানে ঢুকে পড়া যায়।

কেউ কেউ অবশ্য মত্তবারণীকে [মত্তবারিণীয়ম্] রঙ্গপীঠের ভিত্তিতে দর্শকের সম্মুখবর্তী অংশের ভাস্কর্য-কৌশল বলে জ্ঞাপন করেছেন—"The front of the raised stage platform was treated with a decorative frieze of rows of elephants in rut (Mattavariniyam)"[২৮] ...এটি অধিকাংশের মত নয়। তবে এই দলে আছেন পি. কে. আচার্য,—Dictionary of Hindu Architecture গ্রন্থের প্রণেতা—যাঁর মতে মত্তবারণী হয় স্তম্ভের নাম, না হয় মঞ্চভিত্তির থামের অংশবিশেষের নাম।

রঙ্গপীঠ

এবার মূল রঙ্গমঞ্চ, অর্থাৎ রঙ্গপীঠ-এ আসা যাক। রঙ্গপীঠ-এর জন্য জায়গা রইল ৮×১৬ বর্গহাত—৮ হাত গভীর, ১৬ হাত প্রশস্ত। রঙ্গালয়ের বা অডিটোরিয়ামের মেঝে থেকে তা কারো কারো মতে দেড়হাত পরিমাণ উঁচু।
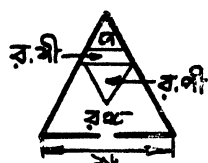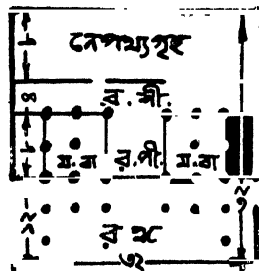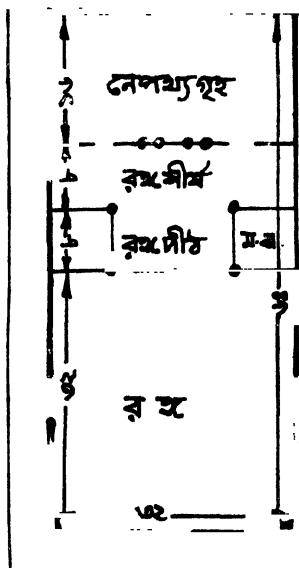
তিন ধরনের নাট্যগৃহের ভূমি-নকশা। এখানে মত্তবারণীকে উইংস-এলাকা হিসাবে নির্দেশ করা আছে।

ত্র্যস্র নাট্যগৃহ
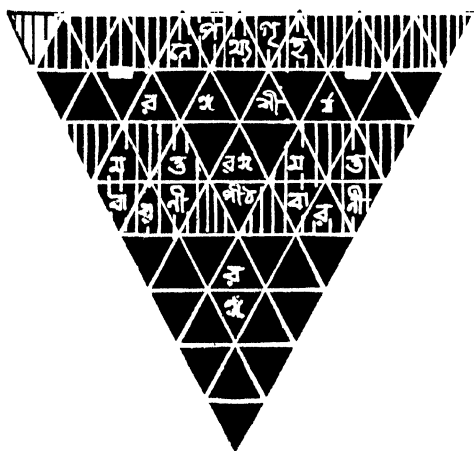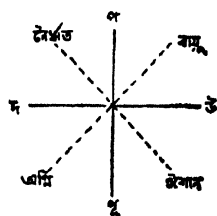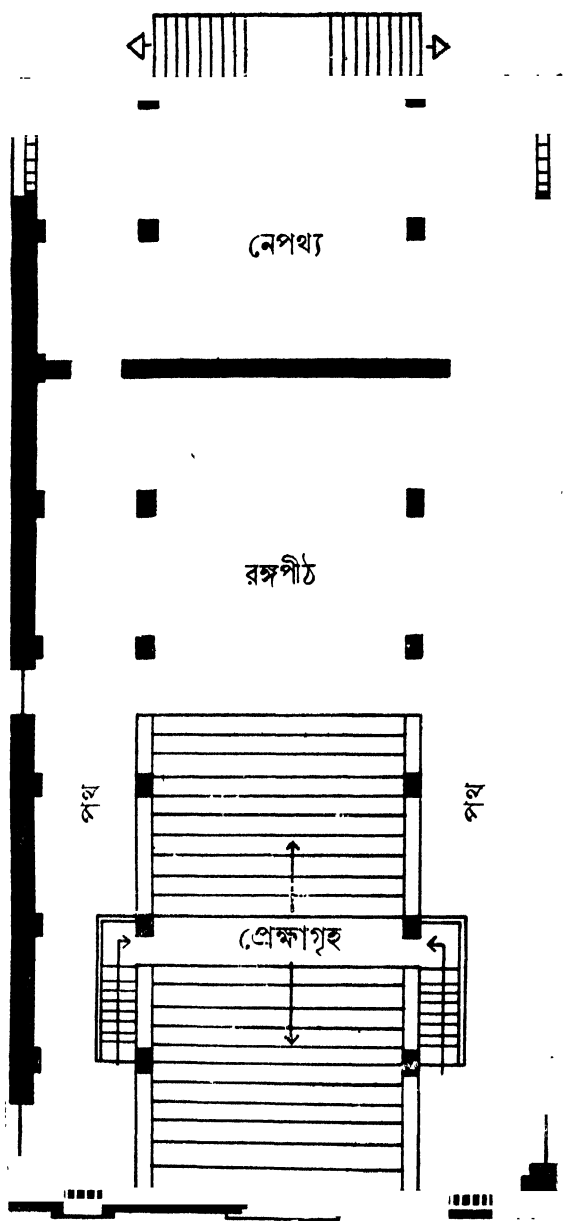
বিকৃষ্টমধ্য নাট্যগৃহের বিস্তৃত ভূমি-নকশা
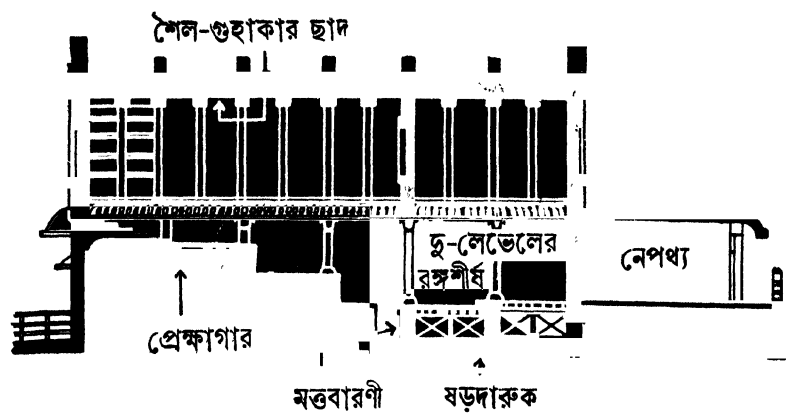
বিকৃষ্টমধ্য নাট্যগৃহের পার্শ্বিক নকশা।
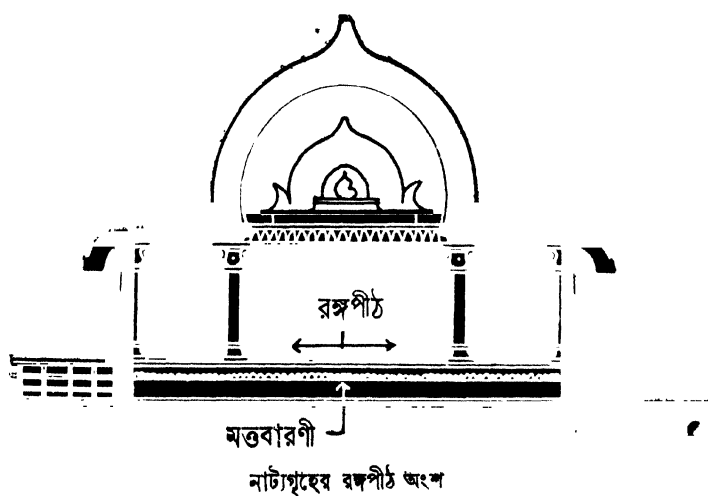
নাট্যগৃহের রঙ্গপীঠ অংশ

চতুরস্রমধ্য নাট্যগৃহের থাম বসানোর ক্রম

আছোয়ালের মতে রঙ্গপীঠ সেগুনকাঠের থামের উপর তৈরি করা হত, তার ভিতরটা ফাঁপা থাকত। মনোমোহন ঘোষ 'রঙ্গশীর্ষ' আর 'রঙ্গপীঠ'-এর মধ্যে কোনো তফাত আছে বলে মনে করেননি, তাঁর মতে দুটো একই স্থানকে বোঝায়। আর কোনো পণ্ডিতই এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত হননি। এখন 'কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ'—ভরতের এই কথাটি নিয়ে সংশয় জেগেছে। এ থেকে কেউ কেউ মনে করছেন [চন্দ্রভান গুপ্ত একজন] যে, স্টেজই দোতলা ছিল এলিজাবেথীয় স্টেজের মতো। মাঁকড় একটি কষ্টকল্পিত অনুমানের দ্বারা আধুনিক celler-এর সঙ্গে তুলনা দেবার চেষ্টা করেছেন। রাঘবনের মতে আবার দ্বিভূমি বলতে বোঝায় একটি সহজ বন্দোবস্ত—উঁচু স্টেজের ভূমি আর নিচু অডিটোরিয়ামের মেঝের ভূমি—ব্যস্, এই দ্বিভূমি।[২৬] চন্দ্রভান গুপ্তের মতে রঙ্গপীঠ অর্থাৎ স্টেজই দ্বিস্তর ছিল। দোতলাতে বা উপরের স্তরে স্বর্গের ঘটনাবলি দেখানো হত, একতলায় বা নীচের স্তরে পৃথিবীর ঘটনাবলি। এ প্রসঙ্গে মধ্যযুগে ইংলণ্ডের গির্জার ভিতরে মিস্ট্রি প্লে অভিনয়ের কথা পাঠকের মনে পড়তে পারে। যেখানে যিশুর দিকটায় অভিনয় হত স্বর্গ-লোকের আর তার উলটোদিকে নরকের দৃশ্যের। দোতলা বাড়ির দৃশ্যে ওঠানামা দেখানোর জন্য এই দ্বিস্তর রঙ্গপীঠ হত।[২৭] 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্কে যৌগন্ধরায়ণের উক্তিতে মহারাজের ছাদে ওঠা এবং ছাদ থেকে নেমে আসার সংবাদ আছে, 'মৃচ্ছকটিক'-এর দশম অঙ্কে সংস্থানক দোতলা থেকে লাফিয়ে নামছে—এও দেখা যায়। এসব দৃশ্যে সম্ভবত দ্বিস্তর রঙ্গপীঠ কাজে আসত। এর সবই অবশ্য অনুমান। কারণ নাট্যশাস্ত্রের ১৩শ অধ্যায়ে ['গতিপ্রচারঃ] আবার এমন কথাও আছে যে, উপরে ওঠার ভঙ্গি হল 'অতিক্রান্তচারী' অর্থাৎ শরীর উঁচু রেখে পা উঁচু করে ফেলে উপরে ওঠবার কল্পিত প্রকাশ। নামবার সময় 'অতিক্রান্ত' ও 'অঞ্চিত'—দুপায়ে এই দুরকম 'চারী' বা চলন দেখাতে হবে।[২৮] অভিনবগুপ্ত নিজে স্টেজের সঙ্গে 'দ্বিভূমি' কথাটার যে কোনো সম্পর্ক আছে তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, ওটা বলা হয়েছে অডিটোরিয়াম বা প্রেক্ষাগার সম্বন্ধে। সে কথায় পরে আসছি। স্টেজের সামনে ভিত অংশে এবং প্রসেনিয়ামে কাঠের নানা কারুকার্য করা থাকত। নানা ডিজাইন খোদাই করা নানা মূর্তি (হাতি, বাঘ, সাপ ও মানুষের) ইত্যাদি সাজানো থাকত।

কক্ষা

এ প্রসঙ্গে 'কক্ষা' বা 'কক্ষ্যা'[২৯]—এই পারিভাষিক শব্দটিকে একটু অনুধাবন করা দরকার। 'কক্ষা' হল স্টেজের অঞ্চল বিভাগ বা zonal division। দৃশ্যপট না থাকায় তখনকার মঞ্চকে কয়েকটি বিভাগে কাল্পনিকভাবে ভাগ করা হত এবং ঐ এক-একটি বিভাগ বা 'কক্ষা' একটি স্থান বোঝাত। এখনকার দিনে আমরা স্টেজকে যেমন UR (Up Right), UC (Up Centre), UL (Up Left), DR (Down Right), DC, DL, ইত্যাদিতে ভাগ করি খানিকটা সেইরকম, কিন্তু আধুনিক স্টেজের এই অংশবিভাগগুলিতে তেমন কোনো প্রতীকী অর্থ নেই। 'কক্ষা'-তে প্রতীকী অর্থ ছিল। কোন্ কক্ষাতে চরিত্রেরা দাঁড়িয়ে আছে তা থেকে বোঝা যেত তারা ঘরে আছে, না শহরে আছে, না বাগানে আছে, না কুঞ্জে আছে; জায়গাটা নদী, না তপোবন, না অরণ্য, না পৃথিবী, না সমুদ্র, না ত্রিভুবনের বিশেষ অংশ, না সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কোনো জায়গা, না কোনো পর্বত, না অদৃশ্যজগৎ, না রসাতল, না দৈত্যভূমি, না সর্পলোক ইত্যাদি। কক্ষা তা-ছাড়া বোঝাবে জায়গাটা কীরকম—শহর, না অরণ্য, না মহাদেশের অংশ, না পার্বত্যভূমি। কক্ষাবিভাগ থেকেই ভিতর-বাহির বোঝা যবে। কক্ষা তিন রকম ছিল—অভ্যন্তর কক্ষা, মধ্য কক্ষা, বাহ্য কক্ষা। অভ্যন্তর কক্ষা ছিল নেপথ্যের কাছাকাছি। রঙ্গপীঠের সামনে বাহ্য কক্ষা, আর ভিতরে অভ্যন্তর কক্ষা। দূর-নিকট সবই কক্ষাবিভাগে বোঝাতে হবে। 'মৃচ্ছকটিক'-এর তৃতীয় অঙ্কে সম্ভবত কক্ষাবিভাগের সাহায্য নেওয়া হত। চারুদত্ত ও বিদূষক বাইরে থেকে আসছে, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে "এই আমাদের বাড়ি" বলে চারুদত্ত চাকর বর্ধমানককে ডেকে দরজা খুলে দিতে বলছে। বর্ধমানক দরজা খুলে দেবার পর দুজনে ঘরে ঢুকছে। এই বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে পড়া সম্ভবত এক কক্ষা থেকে আর এক কক্ষাতে যাওয়া দেখিয়েই ব্যঞ্জিত করা হত। 'মৃচ্ছকটিক'-এ বিচারের দৃশ্যেও এই কক্ষা দিয়ে বিভিন্ন অংশ বোঝানো হত, এমন অনুমান করা হয়েছে। মাঁকড় বলেছেন, মত্তবারণী সম্ভবত এই 'কক্ষা' রূপেই ব্যবহৃত হত। মাঁকড় অবশ্য দেখিয়েছেন যে, কক্ষা-বিভাগ সবসময় মানা হয়নি, রঙ্গপীঠে পরিক্রমণ করেই দৃশ্যান্তর বোঝানো হত। তা ছাড়া যখন বলা হয়েছে যে, রঙ্গপীঠে যারা আগে ঢুকবে তারা ভিতরের ঘরে বা ভিতরে আছে ধরে নিতে হবে, আর যারা পরে ঢুকবে তারা বাইরের ঘরে ইত্যাদি, তাহলে কক্ষাবিভাগের দরকার কী ছিল? শেষ পর্যন্ত তিনি এই মতে

পৌঁছেছেন যে, মত্তবারণী দুটিই সম্ভবত কক্ষার কাজ করত।[৩০]

ড্রপ কার্টেন

রঙ্গপীঠের সামনে কি মোটা পর্দা, আমরা যাকে 'ড্রপসীন' বলি, সেই ড্রপ কার্টেন, ছিল? সকলেই বলেন, ছিল না। আমাদের নাটকের অঙ্কগুলি যেরকম ঘটনাহীনভাবে শেষ হয়, তা থেকে এই অনুমানই করা হয়েছে।

ষড়্দারুক

এবার একটু পিছিয়ে নেপথ্যগৃহে যাওয়া যাক। 'নেপথ্যগৃহ' প্রেক্ষাগারের একেবারে পিছনের অংশ, ১৬×৩২ বর্গহাত আয়তনের ঘর। এখান থেকে রঙ্গশীর্ষে আসার দুটি দরজা, কারো মতে তিনটি। নেপথ্যগৃহের দেয়ালের যে দিকটা এপাশে, অর্থাৎ রঙ্গশীর্ষের দিকে, তার ঠিক মাঝখানটায় আট হাত পরিমাণ জায়গা জুড়ে কাঠের অলংকৃত প্যানেল থাকবে (যার সামনে মেঝেয় গায়কবাদকেরা বসবে), একথা আগেই বলা হয়েছে। এই কেন্দ্রস্থ প্যানেলিঙের দুপাশে কাঠের থাম বসাতে হবে। এই থাম দুটোর দুহাত ভিতর দিকে আবার একটি করে মোট দুটো থাম বসবে। মাঝখানের দুটো থামের পরস্পরের দূরত্ব হল চার হাত। অভিনবগুপ্তের দেওয়া আর একটা মাপ আছে। মাঝখানের দুটো থামের নিজেদের মধ্যে দূরত্ব ৮ হাত। প্রান্তের ওই দূরত্ব ১৪ হাত। এই মোট চারটে থাম, আর এদের উপরে-নীচে একটা করে কাঠের কড়ি—এই মোট ছ'-টা কাঠ নিয়ে তৈরি হল 'ষড়্দারুক'[৩১]—এরই সামনে কাঠের প্যানেলে নানা চিত্রবিচিত্র করা থাকবে। ওই দুটো প্রান্তিক থামের পাশে থাকবে নেপথ্যগৃহে প্রবেশ-নিষ্ক্রমণের জন্য দুটি দরজা—খানিকটা ক্লাসিকাল চীনা স্টেজের ধরনে। এই দুটি দরজার মধ্যবর্তী অংশে গায়কবাদকেরা বসছে।

নেপথ্যগৃহ

নেপথ্যের কাজ ছিল এখনকার নেপথ্যের মতোই। তবে সংস্কৃত নাটকে 'নেপথ্যে' যে-সব নাট্যনির্দেশ থাকে, ম াঁকড় অনুমান করেছেন সেগুলি যবনিকা প্রচলনের আগেকার রীতি। তখন নেপথ্যগৃহ থেকেই কোলাহল, চিৎকার ও নানা স্বরক্ষেপ করা হত। দৈববাণী ও আকাশভাষণও হত নেপথ্য থেকে। 'মৃচ্ছকটিক'-এর প্রথমেই সূত্রধারের সঙ্গে নেপথ্যবর্তী ব্রাহ্মণের কথাবার্তা হচ্ছে,

ব্রাহ্মণ মৈত্রেয় সূত্রধারের ভোজনের নেমন্তন্ন অস্বীকার করছে। 'রত্নাবলী'তেও নেপথ্যে আগুন লাগার চিৎকার আছে। মাঁকড়ের মতে রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠের মধ্যে যবনিকা ঝোলানোর আগে নেপথ্যের এইরকম ব্যবহার ছিল[৩২]—এগুলি সেই সময়কার স্মৃতি যখন যবনিকা রঙ্গভূমিতে আসেনি। যবনিকা ব্যবহারের পর থেকে নিশ্চয়ই যবনিকার ভিতরকার আড়াল (সম্ভবত মত্তবারণীর পিছনের পরিসরটুকু) এসব কাজে লাগানো হত। মাঁকড় অনুমান করেছেন নেপথ্যে পুরুষ ও মেয়েদের রূপসজ্জার জন্য দুটি কক্ষ ছিল, তাই রঙ্গশীর্ষে আসার দুটি দরজা।

রঙ্গ বা অডিটোরিয়াম

নেপথ্যগৃহ, রঙ্গশীর্ষ, দুপাশে মত্তবারণীসহ রঙ্গপীঠ-এগুলি পার হয়েই আমরা এসে পৌঁছুলাম রঙ্গমণ্ডপ বা অডিটোরিয়ামে—যেখানে দর্শকরা বসবে। রঙ্গমণ্ডপ স্টেজের চেয়ে নিচু—তাই একে 'অধোভূমি' বলা হয়েছে। আবার ভরতে এমন কথাও আছে যে, রঙ্গ মত্তবারণীর সমান উঁচু—রঙ্গপীঠের চেয়ে দেড় হাত উঁচু। এ জায়গাটা কী রকম ছিল—সমতল না গ্যালারি করা ? এই নিয়ে অজস্র তর্ক আছে—তার মূলে ভরতের সেই কথাটি—'দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ'। অভিনবগুপ্ত বলেন, দ্বিভূমি মানে হচ্ছে ধাপ-বসানো, দ্বিস্তর বা দোতলা নয়, আর রঙ্গপীঠ বা স্টেজের সঙ্গে ও কথাটার কোনো সম্পর্ক নেই—ওটা বলা হয়েছে 'প্রেক্ষাগৃহ' বা 'রঙ্গমণ্ডপ' সম্বন্ধে। অভিনবগুপ্তের মতে রঙ্গপীঠের সামনে থেকে ইঁট অথবা কাঠে তৈরি দর্শকের বসবার গ্যালারি শুরু হত, শেষ হত একেবারে নাট্যগৃহে ঢোকবার প্রধান দরজার কাছে গিয়ে। ভরতে এ প্রসঙ্গে 'সোপানাকৃতি' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এক-একটা ধাপ ছিল দেড় হাত উঁচু। তা চওড়াও যদি ওই রকম হয়, তাহলে ৩২ হাত জায়গায় ১৮-২০টার বেশি ধাপ ছিল না নিঃসন্দেহে। বরোদার স্থপতি আছোয়াল[৩৩] এই ধরনের রঙ্গমণ্ডপই ছিল বলে অনুমান করেছেন, তাঁর আঁকা প্ল্যানটি দেখলেই বোঝা যাবে। তবে ধাপের কথা মেনে নিলে বেশি দরজার সংখ্যা মেনে নিতে হয়। সমগ্র 'নাট্যবেশ্ম' বা থিয়েটারে কটা দরজা ছিল তা নিয়েও বিবাদ আছে। নেপথ্য থেকে রঙ্গশীর্ষে দুটো বা তিনটে দরজা থেকে থাকলে রঙ্গমণ্ডপ বা অডিটোরিয়ামে নিশ্চয়ই অন্তত তিনটে দরজা ছিল, তার বেশিও থাকা সম্ভব। কারো মতে দুটি দরজা ছিল অডিটোরিয়ামে। আছোয়াল পাঁচটি দেখিয়েছেন।

গ্যালারির সামনের দিকে রঙ্গপীঠের দুপাশে দুটো exit door, গ্যালারির পিছন দিকে নাট্যগৃহের দুপ্রান্তে দুটো, এবং গ্যালারির পিছনে, ঠিক মাঝখানে নাট্যগৃহে প্রবেশের main gate। কিন্তু ভরত আবার দরজার মুখোমুখি দরজা রাখতে নিষেধ করেছেন[১৪]। মাঁকড় যে-প্ল্যান দিয়েছেন তাতে অডিটোরিয়ামে তিনটে দরজা ছিল। রঙ্গপীঠের দিক ছাড়া বাকি তিন দিকের দেয়ালের ঠিক মাঝখানে একটি করে। মাঁকড় কিন্তু বলেন বিকৃষ্টমধ্য অডিটোরিয়ামে ধাপ ছিল না, মেঝে সমতল, তবে ঢালু ছিল। ৩২ হাত জায়গা পরিমাণ যে-মেঝে তা এক হাত পরিমাণ ঢালু হয়ে রঙ্গপীঠের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে।

স্তম্ভের রং অনুযায়ী দর্শকদের বসবার আসন নির্দিষ্ট করা হত। ব্রাহ্মণরা বসবে সর্বাগ্রে, তাদের আসনের পাশে অগ্নিকোণে, অর্থাৎ পুব-দক্ষিণে ছিল শাদা রঙের থাম। নৈঋর্ত কোণে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে বসবে ক্ষত্রিয়রা, তাদের থামের রঙ লাল। এদের বসবার ব্যবস্থা ঠিক আগে পিছনে ছিল না, এক-একটা কোণ ভাগ করা থাকত এক-এক বর্ণের জন্য। বৈশ্যদের ছিল হলদে থাম, তারা বায়ু কোণে, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে বসত। শূদ্ররা বসত ঈশান কোণে বা উত্তর-পুবে, তাদের ঘন নীল থাম। অন্যদেরও জায়গা থাকত। তবে এই বর্ণভেদ যে সব-সময় খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মানা হত সেরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। রাজা বা রাজপুরুষ, যাঁর আদেশে অভিনয় হচ্ছে, তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সকলের সামনে বসতেন। 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে রাজসভায় সংগীতশালায় আসন বণ্টনের একটি বর্ণনা আছে, তা থেকে সভার অভিনয়ে আসন-বিন্যাসের অনেকটা আঁচ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ থেকে প্রেক্ষাগৃহের আসনব্যবস্থা ঠিক বোঝা যাবে কিনা সন্দেহ। মনে রাখতে হবে, ভরতের নাট্যগৃহে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না, পুরুষই শুধু দর্শক। এ ব্যাপারে গ্রিক থিয়েটারের সঙ্গে এর রীতির মিল নেই, সেখানে নারীদের যাবার অধিকার ছিল। আরও যারা নাট্যালয়ে ঢোকবার অনুমতি পেত না তারা হল নিরক্ষর এবং অরসিক ব্যক্তি, বিদেশী, অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজবর্ণ এবং নাস্তিক। বিকৃষ্টমধ্যতে লোক বসতে পেত ৫০০ থেকে ৬০০।

নাট্যমণ্ডপ (অডিটোরিয়াম) কারও কারও মতে দোতলা ছিল, —সেই 'দ্বিভূমি' কথাটাকে এখানেও টেনে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। নাট্যালয়-এর গড়ন ছিল অনেকটা চৈত্যের মতো। চারপাশে দেয়াল নিশ্চয়ই ছিল, ভরত দরজা-জানলা খুব বেশি না-বসাবার নির্দেশ দিয়েছেন—তাহলে বাইরের

হাওয়ার দাপটে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর হারিয়ে যাবে। ভরত সাবধান করেছেন, দরজার ঠিক মুখোমুখি যেন কোনো স্তম্ভ, নাগদন্ত (ঘুলঘুলি বা সাপের ফণার মতো জানালা), কোণ বা দরজা না থাকে। যেহেতু দিনের আলোয় অভিনয় হত [সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হত], সেহেতু স্থায়ী ছাদ ছিল না সম্ভবত, কিন্তু ভরতের থাম বসানোর এত বিচিত্র নির্দেশ থেকে মনে হয় নাট্যমণ্ডপের মাথার উপরে নিশ্চয়ই এক ধরনের ছাউনি কিছু ছিল। 'মণ্ডপ' কথাটিতেই ছাদের অস্তিত্ব প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করা হয়েছে। অভিনবগুপ্ত নাট্যশালা খুব চওড়া বা খুব সংকীর্ণ না করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, তার গঠন এমন হতে হবে যেন তাতে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বরের অনুরণন (resounding) সম্ভব হয়। এ থেকেও অনুমান করা হয় যে, নাট্যগৃহের ছাদ-জাতীয় কিছু ছিল। মনোমোহন ঘোষ বলেছেন, দোচালা-গোছের খড়ের বা ওইরকম কিছু ছাউনি—ভরত সম্ভবত একেই বলেছেন 'শৈলগুহাকার'—পাহাড়ের গুহার মতো। আচোয়ালের মতে সেগুন কাঠের অর্ধবৃত্তাকার 'rib' তৈরি করে থামের উপর সেগুলি বসিয়ে তার উপর ছাউনি দেওয়া হত।[৩৫] নাট্যমণ্ডপের দেয়ালে ছোট জানালা থাকত, তবে খুব বেশি সংখ্যায় নয়। দেয়ালে পলেস্তারা লাগানোর পর চুনকাম করা হত, তার কাঠের অংশ পালিশ করা হত। দেওয়াল মসৃণ ও ঝকঝকে হয়ে উঠলে তার উপর নানা ছবি—লতাপাতা, নরনারীর প্রণয়লীলা ইত্যাদির ছবি—আঁকতে হত। কাঠের স্তম্ভগুলিতেও নানা শিল্পকার্য করা হত। কাঠের কারুকার্যের একটি লিস্টিও পাই—উহ (থামের সবচেয়ে উপরের অংশ) প্রত্যূহ (থামের সর্বনিম্ন অংশ), সঞ্জবন (আয়তক্ষেত্রাকার প্যাটার্ন), ব্যাল, শালভঞ্জিকা, নির্ষূহ, কুহর, বেদিকা, যন্ত্র, জাল (জাফরিওলা জানালা), গবাক্ষ, পীঠ, ধারণী, কপোতালি (পায়রার খোপ), কুট্টিম, স্তম্ভ, নাগদন্ত (সাপের ফণার মতো জানালা), বাতায়ন, কোণ, প্রতিবার, দ্বার ইত্যাদি। অধিকাংশই দারুশিল্পের পরিভাষা, কিছু কিছু শব্দের অর্থ এখন অস্পষ্ট। এই অলংকরণগুলি নাট্যমণ্ডপের জন্য না রঙ্গশীর্ষের জন্য তাও ভরত থেকে উদ্ধার করা মুশকিল।

৪.

বিকৃষ্টমধ্য প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণকালে করণীয় অনুষ্ঠান

প্রথমে মাটি যাচাই করতে হবে। যেখানে নাট্যগৃহ নির্মাণ করা হবে

সেখানকার মাটি হওয়া চাই সমতল, শক্ত এবং কালো রঙের। অন্তত শাদা নয়। জায়গাটা প্রথমে সাফ করতে হবে, তারপর লাঙল চালিয়ে তার ভিতর থেকে হাড়, পেরেক, মাটির হাঁড়ি-কলসির টুকরো, আর উপরকার ঘাস ও গাছ-গাছড়া তুলে ফেলতে হবে। তারপর পুরো জায়গাটা মেপে নিতে হবে। মাপবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি শাদা দড়ি চাই—সে দড়ি তৈরি হবে কাপাস তুলো, পশম, মুঞ্জা ঘাস বা কোনো গাছের বাকল দিয়ে। দড়ি যেন শক্ত হয়, তা ছিঁড়লেই অমঙ্গল—নাটকের পৃষ্ঠপোষকের নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে। যদি তা তিন-টুকরো হয়ে ছেঁড়ে, তাহলে রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য। আর যদি চার টুকরো হয় তাহলে নাট্যাচার্যের আর রক্ষা নেই। হাত থেকে ফসকে গেলেও অন্যরকম ক্ষতির আশঙ্কা আছে। সুতরাং দড়ি শক্ত হওয়া চাই, আর তাকে ধরেও রাখতে হবে বেশ যত্নের সঙ্গে। আকাশে যখন পুষ্যা নক্ষত্র থাকবে, কেবল তখনই এই মাপ নেওয়া চলবে। একটি ভালো তিথি দেখে, তার শুভলগ্নে ব্রাহ্মণদের যথোচিত দাক্ষিণ্য দিয়ে তুষ্ট করার পর, জমিতে শান্তিজল ছিটিয়ে মাপজোকে নেমে পড়তে হবে।

রঙ্গপীঠ-রঙ্গশীর্ষ-নেপথ্য এবং প্রেক্ষাগৃহে ৬৪ × ৩২ বর্গহাত জায়গাকে সমান দুভাগে ভাগ করবার পর 'নাট্যবেশ্ম' বা নাট্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করতে হবে। তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব ইত্যাদি বেজে উঠবে। এই সময় ও-জায়গা থেকে নাস্তিক, শ্রমণ, গাঢ় লালরঙের (কাষায়) পোশাক-পরা লোক এবং দৈহিক খুঁতওয়ালা লোকদের বার করে দেওয়া দরকার। রাত্রে দশদিকের দিক্‌পালদের পুজো দেওয়া চাই। পুজোর অর্ঘ্য হল গন্ধদ্রব্য, ফুলফল এবং নানা ভোজ্যবস্তু। প্রধান চারদিক পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের দিকপালদের উদ্দেশ্যে যে-ভোজ্য নিবেদন করা হবে, তার রঙ যথাক্রমে শাদা, নীল, হলুদ এবং লাল হওয়া চাই। দশদিকের দেবতাদের উদ্দেশ্যে যথাযথ মন্ত্র উচ্চারণের পর অর্ঘ্যদান করতে হবে। ভিত স্থাপনের সময় ব্রাহ্মণদের ঘি ও পায়েস দান করতে হবে, রাজাকে দিতে হবে মধুপর্ক, আর নাট্যাচার্যকে দিতে হবে গুড় দিয়ে মাখানো ভাত। আকাশে যখন মূলা নক্ষত্র থাকবে, তারই কোনো শুভ তিথি দেখে ভিত্তি বসাতে হবে।

থাম বসানোর সময়ও অনেক পালনীয় ব্যাপার আছে। ভিত-বসানোর পর প্রথমে দেয়াল তুলতে হবে। দেয়াল তোলা হলে তিথি ও শুভক্ষণ দেখে থাম বসাতে হবে। থাম বসানোর অনুকূল সময় হল রোহিণী আর শ্রবণা নক্ষত্রের কাল। ভোর বেলায় ওই থাম বসাবেন স্বয়ং নাট্যাচার্য, তার আগে তিনদিন-

তিনরাত্রি তিনি উপোস করে থাকবেন। ব্রাহ্মণস্তম্ভ বসানোর সময় অনুষ্ঠানের সমস্ত উপকরণগুলি শাদা হতে হবে এবং সেগুলিকে ঘি আর সর্ষে দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দধি ও পায়েস বিতরণ করা বিধেয়। ক্ষত্রিয়স্তম্ভ স্থাপনের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য এবং অনুলেপন ইত্যাদি সমস্তই লালরঙের হবে। এই অনুষ্ঠানেও ব্রাহ্মণদের গুড়-মাখানো ভাত দিতে হবে। বৈশ্যস্তম্ভ তোলবার অনুষ্ঠানে সমস্তই হলুদ রঙের উপকরণ ব্যবহার করা উচিত, এতে ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য ঘি-মাখা ভাত। শূদ্রস্তম্ভ বসানোর অনুষ্ঠানের উপকরণ ঘন নীল রঙের। এতে ব্রাহ্মণগণ পাবেন দুধ, ভাত আর তিল দিয়ে রান্না-করা খিচুড়ি ('কৃসর')। এই স্তম্ভগুলির নিচে নানারকম ধাতু রেখে দিতে হবে। যেমন ব্রাহ্মণস্তম্ভের গোড়ায় দিতে হবে শাদা মালা ও অনুলেপন, কর্ণাভরণ থেকে কেটে-নেওয়া সোনার টুকরো। ক্ষত্রিয়স্তম্ভের নিচে তামা, বৈশ্যস্তম্ভের নিচে রুপো ; শূদ্রস্তম্ভের বেলায় লোহা। বাকি সমস্ত থামের নিচেও সোনার টুকরো ছুঁড়ে দেওয়া দরকার। থামগুলি বসানোর আগে সেগুলিকে সবুজ পাতার মালা দিয়ে সাজাতে হবে আর 'স্বস্তি' 'পুণ্যাহ' (এই দিন শুভ হোক) ইত্যাদি কথা উচ্চারণ করতে হবে। ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন, গোরু এবং কাপড়চোপড় দিয়ে খুশি করবার পর থামগুলি এমনভাবে বসাতে হবে যেন সেগুলি এতটুকু নড়বড়ে না হয়। যদি বসানোর পর থাম নড়ে তাহলে দুর্ভিক্ষ ঠেকায় কার সাধ্য। যদি ঘুরে যায় তাহলে মৃত্যুভয়, আর যদি কাঁপে তাহলে কোনো শত্রুরাজ্যের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা জাগে। ব্রাহ্মণস্তম্ভ স্থাপনের বেলায় ব্রাহ্মণকে গো-দক্ষিণা দিতে হবে, আর অন্যগুলির ক্ষেত্রে মিস্ত্রিমজুরদের ভালো করে খাইয়ে নিতে হবে। ঐ খাদ্যদ্রব্যকে নাট্যাচার্য প্রথমে মন্ত্রে শোধন করে পরিবেশন করবেন। পুরোহিত আর রাজাকে মধু ও পায়েস খাইয়ে আপ্যায়ন করা উচিত, আর মজুররা খাবে ওই দুধ-ভাত-তিলের খিচুড়ি আর নুন। এই সব পালনের পর বাদ্যভাণ্ড সহকারে স্তম্ভ বসানো হবে। তার মন্ত্র এই

যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ।
জয়াবহো নরেন্দ্রস্য তথা ত্বমচলো ভব॥

মত্তবারণী দুটি নির্মাণের সময় মালা, ধূপ, গন্ধদ্রব্য, নানাবর্ণের বস্ত্র—যা ভূতদের প্রিয়—সেসব পূজায় অর্ঘ্য দিতে হবে। মত্তবারণীর চারকোণের চারটি থাম যাতে শক্তসমর্থ হয় তার জন্য ব্রাহ্মণদের পায়েস ও 'কৃসর' দান করতে হবে।

এই সব বিবরণ দেখে মনে হয়, শাসকশ্রেণীর বিনোদনের জন্য নির্মিত নাট্যগৃহের নির্মাণ থেকে পুরোহিতশ্রেণীও তাদের লভ্যাংশ তুলে নিতে বেশ তৎপর ছিল। সামন্ত প্রথা এবং ধর্মীয় শাসন-শোষণের সম্পর্কটি ছিল নিবিড়।

রঙ্গশীর্ষের ভিত তৈরি করার পক্ষে কালো মাটিই সবচেয়ে উপযুক্ত। এই মাটি থেকে ঘাস আর ইটকাঠের টুকরো পরিষ্কার করতে হবে। তারপর লাঙলে দুটি শাদা বলদ জুড়ে তাদের দিয়ে জমিটা চষে ফেলতে হবে। বলদ দুটি এবং লাঙল-চালক ব্যক্তিটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাটি বইবার জন্য নতুন ঝুড়ি লাগাতে হবে, আর মাটি যারা বইবে তাদেরও শরীরে যেন খুঁত না থাকে। রঙ্গশীর্ষের মেঝে তৈরিতে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার, তা যেন কচ্ছপের পিঠের মতো বা মাছের পিঠের মতো না হয়—একেবারে আয়নার মতো ঝকঝকে সমতল হওয়া চাই। এই মেঝের পুবধারে হীরে বসানো থাকবে, দক্ষিণে বৈদূর্যমণি, উত্তরে প্রবাল এবং মধ্যিখানে সোনা। এর পরে আগের তালিকামতো কাঠের নানা অলংকরণ করতে হবে। তারপর দেয়াল তৈরি ও দরজা বসানো। অডিটোরিয়াম যে পাহাড়ের গুহা ধরনের হবে তা তো আগেই জানানো হয়েছে। এই হল বিকৃষ্টমধ্য নাট্যগৃহ [সম্ভবত এটাই ভরতের সময় standard theatre ছিল] তৈরির প্রকরণ।

৫.

চতুরস্রমধ্য নাট্যগৃহ

ভরত ৩২×৩২ বর্গহাত মাপের চতুরস্রের কথাই বলেছেন। মাঁকড়ের সংশোধিত হিসেব থেকে আমরা দেখেছি, এই মাপ খুব সম্ভব চতুরস্রমধ্য ধরনের 'নাট্যবেশ্মের' অর্থাৎ নাট্যগৃহের ছিল। এই পুরো বর্গক্ষেত্রটিকে প্রথমে পুব-পশ্চিমে দুটি ঠিক সমান টুকরো করে ফেলতে হবে। এক একটি অংশের মাপ তাহলে দাঁড়াচ্ছে ১৬×৩২ বর্গহাত করে। পশ্চিমের অর্ধাংশটিতে নেপথ্য, রঙ্গশীর্ষ আর মত্তবারণীযুক্ত রঙ্গপীঠ বসবে, পুবের অর্ধাংশে নাট্যমণ্ডপ বা অডিটোরিয়াম। এই থিয়েটারের দেয়ালগুলি খুব ঘন করে বসানো শক্ত ইটের হওয়া উচিত। এতে নেপথ্যগৃহ, যা সবচেয়ে পরে তৈরি করার কথা, হবে ৮×৩২ বর্গহাত মাপের। রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠ হবে ৮×৩২ বর্গহাত, রঙ্গমণ্ডপ বা অডিটোরিয়াম হওয়ার কথা ১৬×৩২ বর্গহাত। কিন্তু এই সরল হিসাব অভিনবগুপ্ত একটু গণ্ডগোল করে দিয়েছেন আচার্য শঙ্কুকের মত উদ্ধার

করে। শঙ্কুক বলেছেন ও রকম অর্ধেক, তারপর অর্ধেক, তারপর অর্ধেক— এইরকম শাদা ছক মেনে এ নাট্যগৃহ তৈরি করা চলবে না। তাঁর মত হল, ওই ৩২×৩২ বর্গহাত জায়গাকে দাবার ছকের মতো ঠিক সমান মাপে ৬৪টি বর্গক্ষেত্রে প্রথমে ভাগ করে ফেলতে হবে। এক একটা বর্গক্ষেত্র হবে ৪×৪ বর্গহাত। ঠিক মাঝখানের চারটে বর্গক্ষেত্র নিয়ে হবে রঙ্গপীঠ বা মূল স্টেজ। রঙ্গপীঠের আয়তন তাহলে দাঁড়াচ্ছে ৮×৮ বর্গহাত। রঙ্গপীঠের পিছনে ১২×৩২ বর্গহাত আয়তনের যে-জায়গা পড়ে রইল, তার প্রথম ৪×৩২ বর্গহাত স্থান নিয়ে হবে সেই 'ষড়্দারুক'-সুদ্ধ রঙ্গশীর্ষ—রঙ্গপীঠের ঠিক পিছনেই। তার পিছনকার ৮×৩২ বর্গহাত জায়গা নির্দিষ্ট নেপথ্যগৃহের জন্য। চন্দ্রভান গুপ্তের বইয়েতে শঙ্কুকের মত বলে যা উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে দেখছি রঙ্গশীর্ষের মাপ ৮×৩২ বর্গহাত, আর নেপথ্যের আয়তন ৪×৩২। রঙ্গপীঠের দুপাশে দুটি মত্তবারণী—রঙ্গপীঠের মতোই মাপে, অর্থাৎ ৮×৮ বর্গহাত করে। এখানে অবশ্য মত্তবারণীর দুপ্রান্তের দেয়াল (উত্তর-দক্ষিণে) নাট্যালয়ের প্রান্তিক দেয়াল দুটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না, মত্তবারণীর দুপাশে ৪×৮ বর্গহাত করে দু-চিলতে জায়গা থাকছে। সেখানে কী হত তার কোনো স্পষ্ট নির্দেশ পাই না। আদ্য রঙ্গাচার্য অনুমান করেছেন দর্শক মত্তবারণীসহ রঙ্গপীঠের তিনদিক ঘিরে বসত, কিন্তু চতুরস্র থিয়েটারেও তো দর্শকের গ্যালারির কথা আছে। সেক্ষেত্রে মত্তবারণীর দু-পাশে কি অন্য ধরনের আসনের ব্যবস্থা হত? চতুরস্রের ক্ষেত্রে রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠ এক লেভেলে[৩৬]—এখানে রঙ্গপীঠকে 'বেদিকা'ও বলা হয়। মত্তবারণীর চারকোণে চারটি স্তম্ভ থাকবে আগের মতোই।

তবে চতুরস্রমধ্য নাট্যবেশ্মতে থাম বসানোর অনেক হিসেব আছে। শঙ্কুক বলেছেন [অভিনবগুপ্ত শঙ্কুকের মত উদ্ধার করেছেন], প্রথমে রঙ্গপীঠের চার-কোণে চারটি থাম বসবে। ধরা যাক তাদের নম্বর ১, ২, ৩, ৪। অগ্নি-কোণ (দক্ষিণ-পুব) এবং নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম) কোণের দুটি থামের চার হাত দূরে দক্ষিণে আবার দুটি থাম বসবে। এ দুটির নম্বর হল ৫ ও ৬। বায়ু (উত্তর-পশ্চিম) ও ঈশান (উত্তর-পূর্ব) কোণের থাম দুটি থেকে চার হাত উত্তরে আবার দুটি (৭, ৮)। রঙ্গপীঠের অগ্নি ও ঈশান কোণের থাম দুটির পুবে চার হাত দূরে আরো দুটি, ৯ ও ১০ নম্বর থাম। তাহলে রঙ্গপীঠের ওই কাছাকাছি অঞ্চলে মোটা দশটা থাম হল। আরও চোদ্দটা থাম বসাতে হবে অডিটোরিয়ামের এধারে-ওধারে। প্রথমে ছটা ও তারপরে আটটা। ৫ ও ৬

নম্বর থাম থেকে চার হাত দক্ষিণে আরো দুটি—১১ ও ১২, এদের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব ৮ হাত। আবার ৭ ও ৮-এর উত্তরে চার হাত দূরে আরও দুটি—১৪ ও ১৫—এদেরও নিজেদের মধ্যে দূরত্ব ৮ হাত। ৫ ও ৮ নম্বর স্তম্ভ থেকে চার হাত পুবে আবার দুটি স্তম্ভ—১৩ ও ১৬ নম্বর, এদের পরস্পরের মধ্যবর্তী দূরত্ব ১৬ হাত।

১১ ও ১৫ নম্বর থাম থেকে চার হাত পুবে আবার দুটি থাম বসবে—১৭ ও ১৮ নম্বর। এগুলি উত্তর ও দক্ষিণের দেয়াল থেকে চার হাত করে দূরে। পুবের দেয়াল থেকে দুপাশে চার হাত করে ভিতরে এবং ৯ ও ১০ নম্বর স্তম্ভ থেকে চার হাত করে পুবে দুটি থাম—১৯ ও ২০ নম্বর। ২০ থেকে চার হাত উত্তর এবং ১৯ থেকে চার হাত দক্ষিণে আবার দুটি থাম ২১ ও ২৩ এবং এ দুটির যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরে চার হাত দূরে দুটি স্তম্ভ, ২২ ও ২৪ নম্বর। এই থাম দুটি উত্তর-দক্ষিণের দেয়াল থেকে চার হাত ভিতরে। উপরিলিখিত ক্রমাঙ্ক অনুযায়ী থামগুলি বসাতে হবে। থামগুলি যেন উপরের মণ্ডপধারণের পক্ষে যথেষ্ট মজবুত হয়। সেই সঙ্গে থামের মাথার কাছে যেন শালভঞ্জিকা মূর্তি (গাছের ডাল ধরে দাঁড়ানো যুবতী) খোদাই করা হয়।

এত থাম কী করে বসানো যেত কে জানে? দর্শকদের দেখার অসুবিধার কথা কোনো গবেষকই বিবেচনা করেননি, সকলেই অন্ধভাবে একটা-না একটা ব্যাখ্যা করেছেন। অভিনবগুপ্ত থাম বসানোর ব্যাপারে বার্তিককার ও উপাধ্যায়ের একটু অন্যরকম মতামতের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট বলে তা থেকে স্পষ্ট অর্থোদ্ধার রীতিমতো কষ্টকর। উপাধ্যায়ের মত হল, নাট্যগৃহকে প্রথমে তিনভাগে ভাগ করতে হবে, 'অধোভূমি', 'রঙ্গপীঠ' ও 'রঙ্গ'। 'অধোভূমি'তে প্রথম দশটা থাম বসবে। তার পরের ছটা 'রঙ্গপীঠ'-এ, চারকোণে চারটে, আরো দুটো। এই ছটি ৮ হাত দূরে দূরে বসবে। (এ কথার মানে কী?) তারপর রঙ্গশীর্ষে দুটি 'তুলা' নির্মাণ করে ('তুলা' হল কাঠের বিম দিয়ে তৈরি 'arch' গোছের জিনিস, যার উপর দুপাশে ঢালু ছাউনি বসানো চলে) তাদের নিচে চারটি করে থাম খাড়া করতে হবে। এই হল ৮টা, এগুলির (নিকটতম যে কোনো দুটির মধ্যে?) পারস্পরিক দূরত্ব ৮ হাত।

এই থামের বাইরে অডিটোরিয়ামের জন্য যে-জায়গাটা রইল তাতে আবার গ্যালারি ধরনের ব্যবস্থা। একটা ধাপ থেকে আর একটা ধাপ এক হাত করে উঁচু। সিট হয় কাঠ না হয় ইটের হবে। একেবারে নিচের যে ধাপ, তা মেঝে

থেকে এক হাত উঁচু হবে। সিট থেকে স্টেজ যেন নিচু হয়—এই নির্দেশ থেকে একবার সন্দেহ হয় যে, রঙ্গপীঠ সম্ভবত মেঝের সমতলেই ছিল। কিন্তু তাও সম্ভবত ঠিক নয়, কারণ রঙ্গপীঠ-এর এক নাম 'বেদিকা'—এই নামকরণে একটা উচ্চতা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এদিকে রঙ্গমণ্ডপ বা অডিটোরিয়ামকে 'অধোভূমি'ও বলা হয়েছে, সেটাও স্মরণীয়। ভিতরের থামগুলি সম্ভবত কাঠের হত, বাইরের গুলি ইঁটের।

থাম বসানোর পরেই অবশ্য নেপথ্যগৃহ তৈরি করার কথা। নেপথ্যগৃহের দুটি দরজা থাকবে—একটি রঙ্গপীঠে ঢোকবার জন্য; সেই সঙ্গে আরও একটি, রঙ্গে দর্শকের ঢোকার জন্য। এখানে নাট্যশাস্ত্রের বিবৃতি দুর্বোধ্য বলে মাঁকড় অভিনবগুপ্তের মতামত তুলে দিয়েছেন। অভিনবের মতে চতুরস্রে (আসলে চতুরস্রমধ্যতে) চারটি দরজা ছিল সবসুদ্ধ। নেপথ্যগৃহের দেয়ালে দুটি; আর একটি নটদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রবেশের জন্য। চতুর্থটি অডিটোরিয়ামে ঢোকার প্রধান দরজা। তবে আর একটি মতে সব মিলিয়ে তিনটি মাত্র দরজাই ছিল। নেপথ্যগৃহে দুটি, অডিটোরিয়ামে দর্শকের ঢোকার (এবং তা থেকে বেরোবার) জন্য একটি।

এই মতামতের গোলকধাঁধাতে উত্ত্যক্ত হয়ে মাঁকড় নিজে একটা সমাধান বার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে নেপথ্যগৃহ থেকে রঙ্গশীর্ষে আসার দুটো দরজা তো ছিলই। কিন্তু চতুরস্রতে রঙ্গপীঠে আসার জন্য ও-দুটো দরজা অভিনেতারা বিশেষ কাজে লাগাত না। তারা স্টেজে ঢুকত মত্তবারণী দুটির পিছনের দেয়ালে (যে-দেয়াল রঙ্গশীর্ষ ও মত্তবারণীর মধ্যে—রঙ্গশীর্ষ থেকে মত্ত-বারণীকে আলাদা করে,—যার পিছনে অভিনেতাদের অপেক্ষা ও বিশ্রাম করার কথা) অবস্থিত দুটি দরজা দিয়ে। নাট্যশাস্ত্রে যে উত্তরের দরজা দক্ষিণের দরজা দিয়ে নটের রঙ্গপীঠে ঢোকার কথা আছে—তা এই দুটি দরজাকেই সম্ভবত নির্দেশ করছে। এতে বোঝা যায় যে, 'কক্ষা' হিসাবে মত্তবারণীকে কাজে লাগানো হত। যারা তিন-দরজা-পন্থী, মাঁকড়ের মতে তারা ভারতীয় থিয়েটারের সেই আদিযুগের লোক, যখন যবনিকার প্রচলন হয়নি। তখন নেপথ্যগৃহের দরজা দুটি দিয়েই সোজা রঙ্গপীঠে এসে পৌছানো যেত। আর রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠের মাঝ-খানে যবনিকা প্রচলিত হওয়ার পরে নিশ্চয়ই আরও দুটো দরজা বানিয়ে নিতে হয়েছিল, মত্তবারণীর পিছনের দেয়াল ফুটো করে। কাজেই পাঁচ-দরজা-ওয়ালা থিয়েটারই অভিনবের মতে পরবর্তীকালের স্বাভাবিক চতুরস্র থিয়েটার।

চতুরস্র নাট্যগৃহের নির্মাণের সময় পালনীয় অনুষ্ঠানগুলি বিকৃষ্ট নাট্যগৃহের বেলায় যা ছিল তাইই আছে।

৬.

ত্র্যস্রমধ্য নাট্যগৃহ

যে ত্র্যস্র থিয়েটারকে কোথাও কোথাও গার্হস্থ্য রঙ্গালয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই নাট্যগৃহটির জন্য ভরত মাত্র তিনটি শ্লোক ব্যয় করেছেন। প্রথমে নাট্যগৃহের তিনটি কোনা নির্মাণ করতে হবে। এর স্টেজ বা রঙ্গপীঠটিও ত্রিকোণাকার হবে। এর এক কোণে একটি দরজা থাকবে, আর একটি দরজা থাকবে রঙ্গপীঠের পিছনে। থাম বসানোর ব্যাপারে চতুরস্রের আইনকানুন এক্ষেত্রেও খাটবে।

ভরতে বা অভিনবভারতীতে ত্র্যস্রের মাপজোক বিস্তৃত করে দেওয়া নেই। নাট্যশাস্ত্রে যা আছে তার অর্থও তত পরিষ্কার নয়। তবে চন্দ্রভান গুপ্ত ত্র্যস্রের একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন, সেটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুমান হিসাবে এখানে উপস্থিত করা চলে। তা এই, ত্র্যস্র থিয়েটার একটি সমবাহু ত্রিভুজের মতো, এবং ত্র্যস্রমধ্যের মাপ হল—প্রতিটি বাহু ৬৪ হাত করে। প্রত্যেকটি বাহু থেকে উলটোদিকে সমদূরত্ববিশিষ্ট সাতটি করে সমান্তরাল রেখা টানতে হবে, এতে প্রত্যেকটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে দূরত্ব থাকবে আট হাত করে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাহুকে সমান ভাগ করে উলটোদিকে সমান্তরাল রেখা টানতে হবে। এতে মোট ৬৪টি ত্রিভুজ তৈরি হবে ঐ ত্রিকোণ ক্ষেত্রটির মধ্যে। এগুলির একেবারে মাঝখানের চারটে ত্রিভুজ নিয়ে তৈরি হবে এ থিয়েটারের রঙ্গপীঠ বা stage। রঙ্গপীঠের দুপাশে ৮টি করে ত্রিভুজ নিয়ে তৈরি হবে দুটি মত্তবারণী। রঙ্গপীঠ ও মত্তবারণীর পিছনকার ১৩টি সারবন্দী ত্রিভুজ নিয়ে তৈরি হবে রঙ্গশীর্ষ, এবং তার পিছনকার ১৫টি ত্রিভুজের দ্বারা অধিকৃত ভূমিখণ্ডে নেপথ্যগৃহ বসাতে হবে।

৭.

এই গেল সেকালে প্রচলিত তিন ধরনের থিয়েটারের কথা। শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে অবশ্য চতুরস্র, ত্র্যস্র এবং বৃত্ত—এই তিন ধরনের প্রেক্ষাগৃহের কথা আছে। পি. কে. আচার্য *Dictionary of Hindu Architecture*

গ্রন্থে আবার বিকৃষ্টকেই বৃত্ত বলে ধরেছেন। পণ্ডিতেরা কিন্তু বৃত্তাকার কোনো নাট্যমঞ্চের অস্তিত্ব মেনে নেননি। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' নামক গ্রন্থে আয়তক্ষেত্রাকার এবং বর্গক্ষেত্রাকার—দুরকম থিয়েটারের কথা বলা হয়েছে, বর্গাকার থিয়েটারের মাপ দেওয়া হয়েছে ৩২ × ৩২ হাত—যা আমাদের চতুরস্রমধ্যের মাপ। নারদ-কৃত 'সঙ্গীতমকরন্দ' গ্রন্থে কিন্তু বর্গক্ষেত্রাকার থিয়েটারের মাপ ৯৬ × ৯৬ হাত। এ 'জ্যেষ্ঠ' মাপের অনেকটা কাছাকাছি।

বস্তুতপক্ষে এই মাপজোকের অনেকটাই চতুর অনুমান মাত্র। এই অনুমানের সঙ্গে কখনও কখনও দেশপ্রেমের উত্তাপ মেশানোতে কল্পনা একটু-আধটু বেহিসেবি যে হয়নি, এমন নয়। যে-থিয়েটারগুলির বর্ণনা করা হল, সেগুলি সম্ভবত প্রাসাদ বা মন্দিরের নাট্যাগার নয়, প্রাচীন ভারতের সাধারণ রঙ্গালয়—যেখানে প্রায় সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, এগুলি রাজা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবানদের পৃষ্ঠপোষণেই গড়ে উঠত। সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের যে-রকম আসন বণ্টন ভরত করেছেন তা কতটা অবশ্যপালনীয় ছিল তা নিয়ে সংশয় জাগে। মহিলাদের কোনো আলাদা আসনের ব্যবস্থা নেই, তা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, এইসব থিয়েটারে মহিলারা ঢুকতেন না। কিন্তু প্রাসাদের নাট্যগৃহে যে তাঁরা এসে বসতেন, তা আমরা সঙ্গীতরত্নাকর-এর প্ল্যানটি থেকেই বুঝতে পারি। এসব নিয়ে অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন ও সন্দেহ সব কিছুর শেষেও থেকে যায় বলে অস্বস্তি লাগে। যাই হোক, প্রাচীন ভারতের নাট্যগৃহের বিষয়টি খুবই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট—নানা মুনির নানা মত এই সমস্যাকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। এর মধ্যে থেকে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত বার করে আনা সহজ কর্ম নয়। সম্ভবত পণ্ডিতদের চেয়ে নাটকের লোকেরা জিনিসটা সম্বন্ধে বেশি আঁচ করতে পারবেন।

সংযোজন

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গ সাম্প্রতিককালে একবার উঠেছিল এই কলকাতায়, অনামিকা নাট্যগোষ্ঠীর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সেমিনারে। শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এর রিপোর্ট করেছিলেন 'প্রমা' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৮০ (দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয়) সংখ্যায় (৫১-৫৬ পৃষ্ঠা)—কৌতূহলী পাঠককে তা দেখে নিতে অনুরোধ করি। খুব খণ্ডিতভাবে এই সেমিনারে উপস্থিত থেকে বর্তমান লেখকের মনে হয়েছিল যে,

উত্তর ভারতের নাট্যশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞরা একদিকে এবং কলকাতার নাট্য-প্রযোজকেরা অন্যদিকে—দুটি দূরবর্তী এবং পরস্পরের কাছে বিদেশী পক্ষ তৈরি হয়ে গেছে, কেউ কারও ভাষা বুঝছেন না। শমীকও সেটা তাঁর রিপোর্টে দেখিয়েছেন। ধরা যাক শ্রীমতী প্রেমলতা শর্মার বক্তৃতা। তাতে বোঝা গেল, তাঁরা রঙ্গশীর্ষ, মত্তবারণী ইত্যাদি আচার মেনে তৈরি করানোতে যত ব্যস্ত ছিলেন, ভরতের নির্দেশের লিস্টিতে টিক মার্ক দিয়ে বিধান মেনে নাটক নামানোর দিকে যত মন দিয়েছিলেন, নাটক আজকের দর্শকের কাছে পৌছুল কি না, তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। এঁরা আচার-পালনকেই সর্বসাধ্যসার বলে মনে করেছেন, অন্যদিকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুদ্রারাক্ষস'-এ বা কুমার রায় 'মৃচ্ছকটিক'-এ যে আধুনিক দর্শকদের সম্ভাষণ করতে পেরেছেন প্রাচীন নাটক দিয়ে—এ ব্যাপারটাতে তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কুমার রায়ের কাছে শ্রীমতী প্রেমলতা শর্মার একটি প্রশ্ন, 'মত্তবারণী বিষয়ে কী করেছিলেন?' থেকেই বোঝা যায় তাঁর কৌতূহলের মূল বিন্দু কী ছিল। ফলে মনে হয়েছিল, ওই সেমিনারে ভক্তি, বশ্যতা ও নিষ্ঠা একদিকে, আর সাহস এবং দর্শকের কাছে পৌছানোর আগ্রহ অন্যদিকে—সমান্তরালভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মণিপুরের তরুণ ও প্রতিভাবান প্রযোজক রতন থিয়মের কথা থেকেই প্রথম এ ঘটনা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

আমার নিজেরও মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় নাট্যগৃহ সম্বন্ধে আমাদের অ্যাকাডেমিক কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আর কিছু করার নেই। এই নাট্যালয় সামন্ততন্ত্রের একটি বিশেষ স্তরের সঙ্গে যুক্ত; এর পরিকল্পনা, নির্মাণ, স্থাপত্য, ভিতরকার ব্যবস্থা—কোনো কিছুই আধুনিক অভিনয়কলাকে সাহায্য করে না। উনিশ-শো ছেষট্টিতে দিল্লিতে আন্তর্জাতিক নাট্য সেমিনারে অন্ধের কুড়িয়ত্তম্ দেখার সময় জেনেছিলাম, ওই নাটক নাকি অভিনয় উপস্থাপনার দিক থেকে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সবচেয়ে কাছাকাছি। ভাষার বাধা ছিল, কিন্তু তাকে গৌণ করে দেখেও মনে হয়েছিল এ নাটক যারই কাছাকাছি হোক, আমার সমসাময়িক নয়, যে-অর্থে সোফোক্লেসের নাটক আমার সমসাময়িক। দু-চারটি ছাড়া সংস্কৃত নাটকের অধিকাংশের গল্প একটি বিশেষ শ্রেণীর ইচ্ছাপূরণের গল্প, একটি বিশেষ শ্রেণীর চিত্র—ক্লাসিক নাম দেওয়া হলেও তা আমার ব্যবহারের বস্তু হয়ে উঠবে না। ভরতের নাট্যমঞ্চ এবং নাট্যালয়ও সেইরকম। অ্যাকা-ডেমিক থিয়েটার হিসাবে নাটকগুলি তবু অভিনয় করা চলে প্রাচীন অভিনয়-

রীতি, মুদ্রাপ্রকরণ ইত্যাদি মেনে, কিন্তু নাটমঞ্চ ও প্রেক্ষাগার এযুগে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়। নেহাৎ পড়াশোনা করে তার সম্বন্ধে জানার বাইরে তার প্রাসঙ্গিকতা কম।[৩৭]

টীকা ও উৎসনির্দেশ

১. H. H. Wilson, *Drama*, Page 1. উইলসনের বিখ্যাত *Hindu Theatre* গ্রন্থের ভূমিকা অংশটি 'Drama' নাম দিয়ে একটি চটি বইয়ের আকারে বার করা হয়েছে।

২. Dr. V. Raghavan, "Theatre Architecture in Ancient India," *Triveni*, (Madras), Vol iv, No. 6, Nov.-Dec., 1931. p. 69. Reproduced, slightly revised, in *The Theatre of the Hindus*, by Wilson, Raghavan, Pisharoti and Vidyabhushan, Calcutta 1955, p. 156.

৩. Jeannine Auboyer, *Daily Life in Ancient India*, see Ch. "City Life and Fashionable Existence".

৪. তদেব।

৫. ধনঞ্জয়, 'দশরূপক', শ্লোক সংখ্যা ১-১২/১৩।

৬. দ্রষ্টব্য "ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি" (নাট্য-কলা-কুশল বিশেষজ্ঞের লিখিত) 'নাট্যমন্দির', দ্বিতীয় বর্ষ, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১৮, ২য় ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৯২।

৭. কিথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে রামগড়ের ঐ গুহা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সেখানে খুব সম্ভবত নাট্যাভিনয়ও হত। A. B. Keith, *The Sanskrit Drama*, p.358। রামগড় পাহাড় সম্পর্কে ব্লকের বিবরণের জন্য Bloch, *Arch. Survey of India Report*, 1903-4, pp. 123 ff. দ্রষ্টব্য।

৮. Adya Rangacharya, *Introduction to Bharata's Natya Sastra*, p. 13.

৯. 'নাট্যশাস্ত্র'-এর বরোদা সংস্করণে এবং J. Grosset সম্পাদিত সংস্করণে এরকম শ্লোকই আছে :

কনীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রং চতুরস্রং চ মধ্যমম্।
জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ং নাট্যবেশ্ম (বেদ) প্রয়োক্তৃভিঃ॥

১০. হাতের মাপ এখনকারই মতো। তবে নাট্যশাস্ত্রে তারও মাপ দেওয়া আছে। সবচেয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাপ হল অণুর। সেই ৮ অণু=১ রজ; ৮ রজ=১ বাল; ৮ বাল=১ লিক্ষা; ৮ লিক্ষা=১ যুকা; ৮ যুকা=১ যব; ৮ যব=১ অঙ্গুল; ২৪ অঙ্গুল=১ হাত।

১১ *Abhinava Bharati I*, pp. 50-51।

১২. আন্থ রঙ্গাচার্য তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে ত্র্যস্রের এই মাপ নির্দেশ করেছেন।

১৩. D. R. Mankad, *Ancient Indian Theatre*, p. 27।

১৪. প্রথম প্রবন্ধে এর আলোচনায় 'ডিম'-এর বিবরণ দ্র. ১১ পৃ।

১৫. 'নাটিকা'-র বিবরণের জন্য এ বইয়ের ১৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

১৬. 'ভাণ' monologue ধরনের নাটক, সচরাচর একাঙ্ক। তাতে একটি চতুর পরান্নভোজী ধূর্তের চরিত্র বর্ণনা করা হয়। 'প্রহসন' তিন রকমের: 'শুদ্ধ' প্রহসনের চরিত্র নাস্তিক, ব্রাহ্মণ, ভৃত্য, পরিচারিকা, বিট ইত্যাদি। এর সংলাপ ও ঘটনা হাস্যরসাত্মক। 'বিকৃত' প্রহসনে থাকবে পরিষদ, গণিকা, কঞ্চুকী এবং ব্রহ্মচারী [যে ব্রহ্মচারী প্রেমে হাবুডুবু খায়]—এই ধরনের চরিত্র। 'সংকীর্ণ' প্রহসনে 'বীথী' ধরনের নাটকের খানিকটা আদল আসে। এ জাতীয় প্রহসন ধূর্তব্যক্তিতে পরিপূর্ণ।

১৭. D. R. Mankad, *Ancient Indian Theatre*, p. 29

১৮. 1950, *The Natya Sastra*, Vol I, Calcutta, The Royal Asiatic Society of Bengal, P. LVII

১৯. অধ্যাপক চন্দ্রভান গুপ্ত তাঁর *The Indian Theatre*, গ্রন্থের Places of Performance অধ্যায়ে যে মানচিত্র দিয়েছেন, তাতে নেপথ্য থেকে রঙ্গশীর্ষে পৌঁছাবার তিনটি দরজা দেখিয়েছেন।

২০. ঐ অর্কেস্ট্রায় দশজনের মতো লোকের থাকার কথা। দুটো দরজার ঠিক মাঝখানে মৃদঙ্গবাদক পুবমুখো হয়ে, দুজন পণবিক (ছোট ঢোল-বাজিয়ে) তার বাঁয়ে, দুজন গায়ক রঙ্গপীঠের দক্ষিণে বা ডানদিকে, উত্তরমুখো হয়ে বসবে, গায়িকাদের বাঁয়ে বসবে একজন বীণ-বাদক, তাদের ডাইনে দুজন বাঁশিওয়ালা এবং কমপক্ষে তিনজন গায়িকা, এরা বসবে গায়কের সামনে। এদের কমপক্ষে ছজন লোক ষড়্‌দারুকের ঠিক সামনেটায় বসবে। ষড়্‌দারুকের সামনে ঐ গায়কবাদকদের বসবার জায়গাটায় আয়তন হবে ৮×৮ বর্গহাত, কখনও শুধু এই অংশটুকুকেই,

অর্থাৎ রঙ্গশীর্ষের কেন্দ্রস্থ এই বর্গক্ষেত্রাকার জায়গাটুকুকেই 'রঙ্গশীর্ষ' বলা হয়। আসলে সম্ভবত রঙ্গপীঠ ও দুটি মত্তবারণীর পিছনে সমস্ত জায়গাটাই (নেপথ্যগৃহের সামনে) রঙ্গশীর্ষ।

২১. 'ষড়্দারুক' বলতে বরোদার স্থপতি M. B. Achwal আবার বুঝেছেন মঞ্চভিত্তির জন্য ছ'টি কাঠের ঠেকা-কে। কাঠের মঞ্চের Support হিসেবে কাঠের চৌকো ফ্রেম করে, তাতে কোনাকুনি দুটি কাঠ বসিয়ে যে একাধিক ঠেকা বা base তৈরি করা যায়, তাই তাঁর মতে ষড়্দারুক। দ্রষ্টব্য : "A Note on Ancient Indian Theatre" ***Natya,*** Theatre Architecture Number, Winter 1959-60, p.23.

২২. Jeannine Auboyer ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩. A. B. Keith, ***The Sanskrit Drama,*** p. 359.

২৪. ***The Natyasastra,*** Vol. 1, II-63-65, p. 27 ff.

২৫. দ্রষ্টব্য : "A Note on Ancient Indian Theatre", by M. B. Achwal, in ***Natya,*** Theatre Architecture Number, Winter, 1959-60, p. 23.

২৬. Dr. V. Raghavan, ২ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য, p. 159...."the real import of that term seems to be that the house contains two bhumis, the raised platform of the stage and the pit for the audience."

২৭. C. B. Gupta, ***The Indian Theatre,*** p. 37.

২৮. নাট্যশাস্ত্র ১৩, ৯৬-১০৪।

২৯. নাট্যশাস্ত্র ১৪, ১-৮, বরোদা সংস্করণে ১৩, ১-৮।

৩০. D. R. Mankad, ***Ancient Indian Theatre,*** p. 22.

৩১. তদেব, p. 35.

৩২. তদেব p. 20.

৩৩ ***Natya,*** Theatre Architecture Number, Winter 1959-60 facing p. 22.

৩৪. নাট্যশাস্ত্র ২, ৭৫-৮০।

৩৫. ৩২ নং টীকায় উল্লিখিত প্রবন্ধ, p. 23.

৩৬. মাঁকড়, পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকা, p. 34.

৩৭. সুরজিৎ ঘোষ সম্পাদিত 'প্রমা'র তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (অক্টোবর ১৯৮০) প্রকাশিত প্রখ্যাত নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিটি (১৮১-৮৮ পৃষ্ঠা) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুর অবশ্যপাঠ্য। তাঁর পুরো চিঠিটিই উদ্ধৃতিযোগ্য, স্থানাভাবে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে দিই।

"চিরন্তন নাট্যধারা বলে কিছু ছিল না এবং প্রাচীন ভারতের অনেক ধারার মাঝে একটি ধারাকে চিরন্তন মেনে তাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকার প্রচেষ্টা অর্থহীন।…নাট্যশাস্ত্রেই বহু ধারার সংমিশ্রণ পাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশৈলী সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ,—সেখান থেকে আহৃত জ্ঞান যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আধুনিক থিয়েটারে কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে তাকে, অর্থাৎ তার একটা ব্যাখ্যাকে সনাতন বলে মেনে নিয়ে একেবারে সেখানে ফিরে যাওয়ার প্রয়াস শুধু অর্থহীন নয়, অসম্ভব।" (১৮৮ পৃ.)

বিদেশ

অ্যারিস্টটলের শিল্পচিন্তা

ভূমিকা

দার্শনিকদের গুরুশিষ্য-পরম্পরায় সবচেয়ে বিখ্যাত তিনটি নাম হল সক্রেটিস (সোক্রোতেস, ৪৭০—৩৯৯ খ্রিঃ পূঃ) প্লেটো (প্লাতো, ৪২৮—৩৪৮ খ্রিঃ পূঃ) এবং অ্যারিস্টটল (আরিস্তোত্‌ল, ৩৮৪—৩২২ খ্রিঃ পূঃ)। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম নামটি তেমন প্রাসঙ্গিক নয়। বাকি দুটি নাম অপরিহার্য। অ্যাথেন্সে প্লেটোর আকাদেমি নামের বিদ্যালয়ে ৩৬৮ খ্রিঃ পূঃ থেকে প্রায় কুড়ি বছর ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টটল। স্কুলের (আসলে এক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়) উজ্জ্বলতম এবং সবচেয়ে ধীমান্ ছাত্রও ছিলেন তিনি। গুরুর পরে স্কুলের অধ্যক্ষ তাঁরই হওয়া প্রত্যাশিত ছিল ; কিন্তু ভাবনা ও মেজাজের দিক থেকে গুরু ও শিষ্য ছিলেন দুই গোলার্ধের মানুষ। প্লেটো ঈশ্বরবিশ্বাসী, ভাবুক, আবেগপ্রবণ এবং যুক্তির চেয়ে আপ্তবাক্যে বেশি অনুরক্ত ; আর অ্যারিস্টটল সংশয়ী, জীবনে একটি কবিতা লিখে ফেলা সত্ত্বেও মূলত যুক্তিবাদী, বিচারপ্রবণ, মাথা-ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। একজন অবরোহী (ডিডাকৃটিভ্) পদ্ধতিতে কথা বলেন, অর্থাৎ আগেই কিছু সূত্র ও সিদ্ধান্ত খাড়া করে পরে তার ব্যাখ্যা করেন ; অন্যজনের অবলম্বন আরোহী বা ইনডাক্-টিভ পদ্ধতি—অজস্র তথ্য ও যুক্তির সমর্থন ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই করেন না। একজন আসতে চান ধ্যানে উপলব্ধ সত্য থেকে ঘটনায়, অন্যজন প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে এগোতে চান সত্যের দিকে। উইল ডিউর‍্যাণ্ট বা ইডিথ হ্যামিলটনের সরল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—প্লেটো ছিলেন মূলত দার্শনিক, আর অ্যারিস্টটল প্রধানত বৈজ্ঞানিক[১]। পরবর্তী জীবনে প্লেটোর মানসিক প্রবণতার পরিবর্তন ঘটলেও এই ছক খুব একটা বিচলিত হয় না। শোনা যায়, 'পলিটিক্স' বইটি লেখার সময় গ্রিসের ১৫৮টি রাজ্যের শাসনতন্ত্র অ্যারিস্টটলের হাতের কাছে মজুত ছিল। লোকে বলে, এক সময় গ্রিসে লোকে হয় প্লেটো-পন্থী হত, না হয় অ্যারিস্টটল-পন্থী হত—দুয়ের মাঝামাঝি কিছু হওয়ার উপায়

ছিল না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অনেক আগেই নিশ্চয়ই এই বিরোধের সূচনা দেখা গিয়েছিল। তাই গুরু মৃত্যুর আগে শিষ্যকে স্কুলের ভার দিয়ে যাননি। সে দায়িত্ব দিয়ে যান ভাইপো প্‌সেউসিপ্প্‌স্‌-কে। এতে অ্যারিস্টটল খুবই দমে গিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি। গুরু-শিষ্যের এই বিরোধের কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

অ্যারিস্টটলের শিল্পতত্ত্বের মূলগ্রন্থ

পরে ৩৩৪ খ্রিঃ পূঃ থেকে আথেন্সে নিজের স্কুল লুকেআম্‌ বা লাইসিয়াম্‌ গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন অ্যারিস্টটল। এই স্কুলে ছাত্রদের পড়ানোর জন্যই ৩৩০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ তাঁর 'কাব্যতত্ত্ব'[২] বা পোয়েটিক্‌স বইটি রচনা করেন। 'রচনা করেন' বলাটা সম্ভবত ভুল হল। বইটি মনে হয় ক্লাস-নোটের খসড়া, পড়ানোর সময় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতেন। তবে কোথাও কোথাও খুব সাধারণ কথাও যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন ('সাত' অধ্যায়ে প্লট্‌-এর 'আরম্ভ', 'বিকাশ' বা 'পরিণতি'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যেমন), তাতে এই অনুমান প্রায়ই ব্যাহত হয়। প্রায় দশ হাজার শব্দের ২৬টি অধ্যায়ের এবং তিরিশ পৃষ্ঠার মতো এ বইয়ের সম্ভবত আরেকটা অংশ ছিল, যার নাম ছিল 'কবিদের বিষয়ে' —সে অংশ আমাদের হাতে পৌঁছোয়নি। যাই হোক, ভালো করে পড়লে প্রায়ই দেখা যায় যে, অ্যারিস্টটল বেশ যত্ন নিয়েই যুক্তি খাড়া করেছেন, প্রতিটি জিনিসের সবগুলি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন, অন্যান্য শিল্প, অধিকাংশত চিত্রকলা থেকে সমান্তরাল দৃষ্টান্ত তুলেছেন, নানাবিধ তথ্য দিয়েছেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে, তাঁর বিপক্ষে কী যুক্তি হতে পারে তার বিচার করছেন। এমন তীক্ষ্ণ ও সর্বব্যাপ্ত নজর যেখানে সেখানে বইটিকে নিছক ক্লাস-নোট ভেবে নিতে অসুবিধা হয়।

এই পুস্তিকাই ইয়োরোপের শিল্প ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম স্বাধীন আলোচনা। তার পর থেকে প্রায় তেইশ-শ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে—অ্যারিস্টটল সম্বন্ধে বেন্‌ জনসনের "the first accurate criticke and truest judge" কথাটি আক্ষরিকভাবে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নয় এখন আর—তা সত্ত্বেও এই বইকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে, যদি বা অ্যারিস্টটলের দেওয়া উত্তরগুলিকে বাতিল করা সম্ভব হয়, তিনি যে-প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন সে-প্রশ্নগুলি আজও মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক।

আর কে না জানে যে, সঠিক উত্তরদানের চেয়ে সঠিক প্রশ্ন তোলার গৌরব এতটুকু কম নয়, বরং বেশি। সুতরাং এই দু হাজার বছর ধরে 'জ্ঞানীদের প্রভু' (Il maestro di color che sanno—"যারা জানে তাদের প্রভু"—ইনফেরনো চতুর্থ সর্গ, দান্তে)[৩] এই মানুষটির এই বইটি নিয়ে পণ্ডিতদের বিতর্ক শেষ হয়নি।

আর পুরো বইটিও ঠিক কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নয়। শিল্পতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রশ্নগুলি অ্যারিস্টটল তুলেছেন প্রথম তিন-চারটি অধ্যায়ে। পরে চলে গেছেন বিশেষ ধরনের শিল্প—কবিতা বা সাহিত্যের বিবর্তনের আলোচনায়। সেখান থেকে বিশেষ ধরনের সাহিত্য অর্থাৎ নাটকের, এবং তারপরে ৬ অধ্যায় থেকে বিশেষ ধরনের নাটকের, অর্থাৎ ট্রাজেডির, আলোচনায়। বাকি অংশে প্রায় সবটাই সংজ্ঞা থেকে শুরু করে ট্রাজেডির নানা দিকের আলোচনা। অর্থাৎ নির্বিশেষে শিল্প থেকে বিশেষ শিল্পের দিকে এগিয়ে এসেছেন অ্যারিস্টটল, বড় এলাকা থেকে ছোট এলাকায় পৌঁছে আজকের ভাষায় যাকে in-depth study বলে—তাই করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে শিল্প কী এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু হলেও, এবং 'পোয়েটিকস্' নাম হলেও, এ বইয়ের মূল বিষয় ট্রাজেডি। যেখানে শিল্পবিশেষের আলোচনা ও বর্ণনাই মুখ্য, সেখানে কি শিল্পের 'তত্ত্ব' খুঁজে পাওয়া যাবে? একটু লক্ষ করলে দেখব, ওই বিশেষের আলোচনাতেও নির্বিশেষ বা সমগ্রভাবে শিল্পের তত্ত্ব কিছু কিছু জড়িয়ে আছে। সেগুলি আমরা যথাস্থানে নির্দেশ করব।

আর যে-কথাটি মনে রাখা দরকার, তা এই যে, অ্যারিস্টটলের এই বইটি 'নাট্যবেদ' গোছের কিছু নয় যে, এর সূত্র মন্ত্রের মতো শিরোধার্য করতে হবে। যদিও ওয়ালটার কফম্যান অ্যারিস্টটলের ভারিক্কি চালে ট্রাজেডির মূলসূত্র ব্যাখ্যার মধ্যে 'ট্রাজেডির লেখকদের তুলনায় আমার জ্ঞানবুদ্ধি বেশি' গোছের একটা আত্মবিশ্বাস লক্ষ করেছেন[৪], তবু এখন আর ও বইটিকে 'নাট্যশাস্ত্র' হিসাবে দেখা হয় না। তাঁর সময়কার এবং তাঁর সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মধ্য থেকে জাত নাটক দেখে প্রত্যক্ষ বা 'এমপিরিক্যাল' পদ্ধতিতে শিল্প ও ট্রাজেডি সম্বন্ধে তিনি কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তা থেকে রোমের হোরেস প্রমুখ সমালোচকেরা তাঁকে মন্ত্রদাতা ঠাউরে মাথায় বসিয়েছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি ও ইংরেজ নব্য-ক্লাসিক নাট্যকার এবং সমালোচকেরাও শুধু যে তাঁর কথা বেদবাক্যের মতো মেনেছেন তাই নয়, তাঁর কথার অতিব্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা

লক্ষ করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, অনেক গ্রিক নাটকই অ্যারিস্টটলের শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করেছে। ইংরেজ কবি-সমালোচক জন ড্রাইডেনই (১৬৩১-১৭০০) সম্ভবত প্রথম প্রশ্ন তোলেন, অ্যারিস্টটলের মানদণ্ডে পরবর্তী নাট্যকলার বিচার সংগত কি না। 'অফ ড্রামাটিক পোয়েজি' নিবন্ধের পাতায় পাতায় তাঁর 'পোয়েটিক্স' নিয়ে এ প্রশ্ন ছড়িয়ে থাকে। ফলে এই বই আইনের বই নয়। ফ্রানসিস ফার্গুসন বইটিকে রান্নার বইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন[৫]। এতে কতকগুলি মূল নীতি দেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিরুচি অনুযায়ী প্রত্যেক নাট্যকার সেগুলিকে ব্যবহার করবেন।

শিল্পজিজ্ঞাসা : প্রথম প্রশ্ন

শিল্পের মৌলিক বিষয়ে এ বইয়ে অ্যারিস্টটলের প্রথম প্রশ্ন : "শিল্প কী, শিল্প কাকে বলব?" আর *Physics, Meteorologica* এই দুটি বইয়ে তাঁর একই উত্তর : "হে তেখ্‌নে মিমেইতাই তেন্‌ ফুসিন্‌"—শিল্প স্বভাবের অনুকরণ করে (Art imitates Nature)[৬]। অ্যারিস্টটলের মান্যতম ইংরেজি অনুবাদক বুচার 'স্বভাব' বা Nature কথাটির অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন[৭]; আমাদের মনে হয়, ঐ দুরূহ ব্যাখ্যায় না গিয়েও খুব সহজবুদ্ধিতে আমরা বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নিতে পারি যে, এই পৃথিবীতে যা-কিছু মানুষের অনুকরণের ফলে জাত বা সৃষ্ট নয়, তা-ই স্বভাব বা 'নেচার'-এর অন্তর্গত। গাছ প্রকৃতির, কিন্তু গাছের ছবি অনুকরণের ফলে সৃষ্ট, কাজেই তা শিল্প। এমন-কী চেয়ার-টেবিল বাড়িঘরও শিল্প নয়, কারণ কোনো কিছুর অনুকরণে সেসবের সৃষ্টি হয়নি। প্লেটো হলে এসবকেও অনুকরণ বলতেন, কিন্তু অ্যারিস্টটল তা বলতে সম্মত নন। অ্যারিস্টটলের মতে এগুলি প্রকৃতিরই অভাব পূরণ, প্রকৃতিরই সম্প্রসারণ। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি—শীতের আচ্ছাদন হিসেবে পশুর গায়ে ভারী যে-লোম আছে তা প্রকৃতিরই অংশ। মানুষের গায়ে ওই ঘন দীর্ঘ লোমরাজি নেই, কাজেই মানুষকে জামাকাপড় তৈরি করে নিজেকে ঢাকতে হয়। এই জামাকাপড় প্রকৃতির শূন্যতাকেই পূর্ণ করছে, তার এলাকাই বাড়াচ্ছে। ফলে ওই চেয়ার-টেবিল বাড়ি-ঘর জামা-কাপড়কে শিল্প বলা সম্ভব নয়, কারণ তা অনুকরণের ফলে জাত নয়। বুচার ইঙ্গিত করেছেন যে, অ্যারিস্টটলের মনে চারুশিল্প (fine arts, imitiative arts) ও কারুশিল্প (useful arts, applied arts)—এ দুয়ের ভেদ স্পষ্ট ছিল[৮]। চেয়ার-টেবিল

ইত্যাদি কারুশিল্পের উৎপাদন, কিন্তু ছবি গান কাব্য চারুশিল্পের অধিকারে। বুচারের ইঙ্গিত ছাড়াও—ওই বইয়েরই আরেকটা সূত্র দিয়েও চারু ও কারুশিল্পের ওই তফাতটিকে বার করে আনা যায়। পোয়েটিক্‌সের 'চার' অধ্যায়ে (Book IV) অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, অনুকরণ আনন্দদায়ক[৯]। এখন চেয়ার-টেবিল-বাড়িঘর ইত্যাদি কি সে অর্থে আনন্দদায়ক ? তা যখন নয়—তখন এগুলিকে ঐ চারুশিল্প বা ললিতকলা বলে গণ্য করা যাবে না। ললিতকলা হল তাই যা অনুকরণলব্ধ। এগুলির এক নাম তাই অনুকরণাত্মক শিল্প বা imitative arts (মিমেতিকাই তেখনাই)।

যাঁরা আদি যুগের গ্রিক চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি দেখেছেন, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন কেন ওই মতবাদের উদ্ভব হয়েছে চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্ব শতকের গ্রিসে। আজকের পৃথিবীর বিমূর্ত শিল্পকলার হদিশ তখন ছিল না, তখনকার সমস্ত শিল্পই প্রতিরূপসূচক—কোনো আদল দেখে বা ভেবে নিয়ে তার সৃষ্টি। গ্রিক মৃৎপাত্রে তাদের জীবনযাত্রার সজীব অনুকরণাত্মক ছবি ছিল বলেই তা কিটসের কাছ থেকে কবিতার উচ্ছ্বাস উপার্জন করতে পেরেছিল। সুতরাং শিল্প যে অনুকরণাত্মক—তার প্রমাণ দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রিসে আগেই উপস্থিত ছিল। পরে তা তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হল প্লেটো-অ্যারিস্টটলের লেখায়।

অনুকরণ কাজটা ভালো না মন্দ ?

শিল্প স্বভাবকে অনুকরণ করে—চারুশিল্পের এই সংজ্ঞা অ্যারিস্টটল নির্দেশ করলেন। কিন্তু অনুকরণ সংক্রান্ত সকল তর্কের তাতে নিরসন হল না। একটা তর্ক তো চলছিলই যে, অনুকরণ জিনিসটা ভালো, না মন্দ ? অনুকরণ করা উচিত, কি উচিত না ? এই তর্কে গুরু প্লেটো এবং শিষ্য অ্যারিস্টটলকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা গেল। তাঁরা মুখোমুখি হননি। প্লেটো অনুকরণের, বিশেষ করে কাব্যকলার প্রতি তাঁর তীব্র সমালোচনা করে গেছেন তাঁর 'দ রিপাবলিক' এবং শেষতম ডায়ালগ 'দ ল'জ' (The Laws) বই দুটিতে। অ্যারিস্টটল পোয়েটিকস্‌ লিখলেন গুরুর মৃত্যুর প্রায় আঠারো বছর পরে, সুতরাং এ নিয়ে তাঁদের সাক্ষাৎ সঙ্ঘর্ষ হয়নি। নিজের বইয়ে তিনি গুরুর নামও করেননি কখনো। কিন্তু বইয়ে অনুকরণ সম্বন্ধে প্লেটোর বিরূপতার পরিষ্কার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এটা বেশ বোঝা যায়।

অনুকরণ সম্বন্ধে প্লেটোর আপত্তির কারণ

তার আগে, একটি কথা মনে রাখলে প্লেটোর আপত্তির একটি পটভূমিকা পাওয়া যাবে। প্লেটো শিল্পকে দেখেছিলেন শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে, যে-শিক্ষা আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তি ও স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ শিল্পকে শুধু শিল্প হিসেবে না বিচার করে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণ ও পরিপোষণে শিল্পের কার্যকরতার দিকটিই বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ প্লেটোর লক্ষ্য ব্যাবহারিক। কিন্তু অ্যারিস্টটল শিল্পকে স্বাধীন ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন, ফলে তাঁর উদ্দেশ্য ও বিচারের মাত্রা নন্দনতাত্ত্বিক, যদিও কাথারসিস-এর ধারণায় সামাজিক স্বস্থতা ও মঙ্গলের বিষয়টি একটু উঁকি দেয়[১০]।

প্লেটোর অনুকরণ সংক্রান্ত আপত্তিকে এখানে সংক্ষেপে আমরা দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করতে পারি। এক, অনুকরণ হল মিথ্যাচরণ, এবং দুই, অনুকরণ দুর্নীতিমূলক কর্ম।

আপত্তি এক : অনুকরণ মিথ্যাচার

প্রথম আপত্তির নাম দিতে পারি দার্শনিক বা নৈয়ায়িক আপত্তি। এর মূল কথা হল, অনুকরণ মানে মিথ্যাচার। কবিরা আসলে মিথ্যাবাদী। কেন? না, তারা নকলের নকল করে। একবার নকলেই আসলের অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হয়—একটি কানাডি প্রবাদে যেমন বলা হয়েছে ছবির ইক্ষু চিবুলে মিষ্টি লাগে না, ছবির রমণীকে আলিঙ্গন করা যায় না। নকলে আসলের বা মূলের অনেক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় বলতে প্লেটো সম্ভবত এইরকমই কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। একবার নকলেই যদি এই দশা হয়, দুবার নকলে তবে মূলের আর কী খুঁজে পাব? ফলে কবিদের অনুকরণে সত্য শেষে মিথ্যার আকার নেয়, মূল আদল থেকে দুবার (প্লেটোরই ভাষ্যে কখনও তিনবার) সরে এসে।

কিন্তু সত্য তাহলে কী? সত্য বলতে প্লেটো কী বুঝেছেন যে তা থেকে ভ্রষ্টতার জন্য তিনি কবিদের উপর ক্ষুব্ধ? প্লেটোর মতে আমরা যা দেখছি শুনছি ছুঁচ্ছি, যার গন্ধ পাচ্ছি ইত্যাদি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর এই জাগতিক বস্তুনিচয়—এসব সত্য নয়, এগুলিও অনুকরণ করে তৈরি। কে অনুকরণ করেছেন? স্বয়ং ঈশ্বর। কী থেকে অনুকরণ করলেন? না প্রত্যেকটি বস্তুর

একটি মূল ধারণা বা রূপ (আইডিয়া বা ফর্ম) থেকে। ঐ মূল ধারণা বা রূপ আছে ঈশ্বরের চিত্তে, তারই আদলে তিনি জগৎচরাচরের সব কিছু তৈরি করেছেন। ঐ আইডিয়াগুলিই মূল সত্য, তার অনুকরণে জগদ্‌বস্তু তৈরি করতে গিয়ে মূলের অনেক কিছু নিশ্চয়ই বাদছাদ দিয়েছেন ঈশ্বর। তারপর কবিরা কী করবেন? তাঁরা ঈশ্বরের ওই যে নকল, তার আবার নকল করলেন। চিত্রশিল্পীরাও তাই। গাছের 'আইডিয়া' থেকে ছাঁচ নিয়ে ঈশ্বর তৈরি করলেন পৃথিবীর গাছ, চিত্রশিল্পী আবার তাকে অনুকরণ করলেন রঙে রেখায়—ক্যানভাসের উপর। দ রিপাবলিক-এর 'দশ' অধ্যায়ে তাই দেখি, এই মানুষ-অনুকরণকারীর দল, অর্থাৎ কবি-শিল্পীরা, এঁরা হয়ে গেলেন 'Twice removed from Truth',[১১] ফলত মিথ্যাবাদী।

শুধু প্লেটো কেন, ঐ সময় আরো বহু গ্রিক মনীষীও প্রায় একই কথা বিশ্বাস করতেন যে, কবি আর অভিনেতারা মিথ্যাবাদী সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু নয়। সক্রেটিসের পূর্ববর্তী দার্শনিক জেনোফানেস বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, মানুষেরা ভাবে তাদেরই মতো দেবতারাও জন্মায়, তাদেরই মতো জামাকাপড় পরে, কথা বলে মানুষের গলায়, চেহারাও মানুষের মতো। কিন্তু ঘোড়ারা যদি লিখতে পারত বা ছবি আঁকতে পারত, তাহলে ঘোড়াদের দেবতারা হত ঘোড়াদেরই আদলে, ষাঁডদের দেবতারা ষাঁড়দেরই মতো। নিগ্রো ইথিও-পীয়দের দেবতাদেরও সেজন্য গায়ের রং কালো, নাকও থ্যাবড়া। দেবতারা যে ঠিক কীরকম তা কোনো মানুষ কি জানে, না কখনো জানতে পারবে? এফে-সাসের হেরাক্লিটাস দেবতাদের নিয়ে লেখার (অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণের) অপরাধে হোমারকে বেত্রাঘাত করার বিধান দিয়েছেন[১২]। তাই প্লেটো তাঁর 'দ্য রিপাবলিক'-এর 'দুই' অধ্যায়ে হোমার হেসিয়োদ প্রভৃতি কবিদের প্রধান অপরাধ এই বলে নির্দেশ করেছেন—"The fault of telling a lie, and, what is more, a bad lie."[১৩]

'ব্যাড লাই' কেন, সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, অভিনেতাদেরও (মনে রাখতে হবে প্রধান অভিনেতা কথাটির মূল গ্রিক 'হিপোক্রিতস্'—যা থেকে ইংরেজি হিপোক্রিট) মিথ্যাবাদী মনে করা হত গ্রিসে—তাঁরাও তো নকলের কারবারি। প্লুতার্ক তাঁর জীবনীসংগ্রহে এই মজার ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন: অ্যাথেন্সে থেসপিসের নাটক দেখতে এসেছিলেন বৃদ্ধ সেনেটর সোলোন। নাটক শেষ হলে ব্যাকস্টেজে এসে

বললেন, "তুমি কী দারুণ মিথ্যেবাদী হে! অন্যের সাজ পরছ, অন্যের কথা নিজের মুখে বলছ, লজ্জা করে না?" থেসপিস বললেন, "নাটকে ওসবে দোষ নেই।" শুনে সোলোন রাগে মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "এসব নাটককে প্রশ্রয় দিলে শাসন-টাসনের সর্বনাশ হবে।"[১৪] প্লেটোর আদেশ ছিল আরো চিত্তাকর্ষক। তাঁর মতে, একজন অভিনেতার সারা জীবন একটিমাত্র ভূমিকাতেই অভিনয় করে যাওয়া উচিত। তাতে অন্তত মিথ্যাচারের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে!

যাই হোক, প্লেটোর জগৎ-সংস্থানের চেহারাটি অনেকটা এভাবে দেখানো যেতে পারে—

১. সর্বোচ্চ সত্যবস্তু : 'ফর্ম' বা 'আইডিয়া'র সমষ্টি
২. দ্বিতীয় স্তরের বস্তু : গাণিতিক সংখ্যা ও পরিমাপ
৩. তৃতীয় স্তরের বস্তু : ইন্দ্রিয়গোচর জগতের বস্তুসমূহ
৪. চতুর্থ স্তরের বস্তু : ছায়া, জলের প্রতিবিম্ব ইত্যাদি

'দ রিপাবলিক'-এর ৬ ও ৭ অধ্যায়ে তাঁর রিয়ালিটির এই চারটি স্তর তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু ১০ অধ্যায়ে আবার ছকটি এরকম:

১. ফর্ম বা আইডিয়া : যেমন 'বিছানা'র ধারণা
২. তার অনুকরণে তৈরি বস্তু : ছুতোরের তৈরি বিছানা
৩. তার অনুকরণ : শিল্পীর আঁকা বিছানার ছবি[১৫]।

৩ নম্বরের বস্তুটি—যা 'অনুকরণের' ফলে সৃষ্ট—তা প্লেটোর মতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তা মিথ্যাচারের নামান্তর মাত্র, কারণ বিছানার আইডিয়ার সঙ্গে বিছানার ছবির যোগ প্লেটোর মতে খুবই সামান্য। ঐ ১০ অধ্যায়েই ট্রাজেডির রচয়িতা সম্বন্ধে প্লেটোর ধিক্কার শুনি—"the tragic poet is an imitator, and therefore, like all other imitators, he is thrice removed ...from the truth."[১৬]

'শিল্পীরা মিথ্যাবাদী'—এই অভিযোগের কোনো সাক্ষাৎ প্রতিবাদ অ্যারিস্টটল করেননি। কিন্তু পোয়েটিক্‌সের চতুর্থ অধ্যায়ে 'অনুকরণ' সম্বন্ধে দুটি মূল কথা বলেছেন। প্রথমত, শৈশব থেকেই অনুকরণ করে মানুষ, অনুকরণ করেই সে জীবনের প্রথম পাঠগুলি গ্রহণ করে; কাজেই অনুকরণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়ত, অনুকরণপ্রসূত আনন্দও সর্বজনীন। যিনি অনুকরণকে স্বাভাবিক এবং আনন্দদায়ক বলে গ্রহণ করেন আমরা ধরে নিতে

পারি তিনি শুরুতেই অনুকরণ যে মিথ্যাচরণ এই অভিযোগকে অগ্রাহ্য করেন। প্লেটোকে প্রত্যাখ্যান করেই অনুকরণ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের আলোচনা শুরু হয়।

আপত্তি দুই : শিল্পীরা দুষ্কৃতকারী

অনুকরণ সম্বন্ধে প্লেটোর যে দ্বিতীয় অভিযোগ—যে অভিযোগ খানিকটা নীতিগত বা এথিক্যাল—তার মূল কথা এই : কবিরা সামাজিক অমঙ্গলকে প্রশ্রয় দেয় এবং সমাজের ক্ষতি করে। অর্থাৎ তারা শুধু lie সৃষ্টি করছে না, তারা bad lie-এর স্রষ্টা। তারা দেবতাদের সম্বন্ধে অসংগত কথাও লেখে। দেবতাদের হিংসা, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার—এসব বিষয়ে ফলাও করে বলতে কবিদের ক্লান্তি নেই। রূপক হোক যাই হোক, তরুণরা রূপক আর আক্ষরিক বর্ণনার মধ্যে তো তফাত করতে পারে না, তাদের পক্ষে এসব বর্ণনা বিষের মতো ক্ষতিকর। ২ অধ্যায়ে (দ রিপাবলিক) সক্রেটিস আদেইমান্তস্‌কে বলেছেন, "You and I,...at this moment are not poets, but founders of a State."[১৭] সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে যে দুটি জিনিস সবচেয়ে বেশি করে দরকার—সেই আনুগত্য ও সমাজ-সংহতির ভিত্তিকে যখন কবিরা দেবতাদের সম্বন্ধে এই সব লিখে দুর্বল করে দিচ্ছে, তখন তাদের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এ সব পড়ে তরুণদের মনে দেবতাদের সম্বন্ধে ভয়ভক্তি হ্রাস পাবে। তার ফলে রাষ্ট্রশাসকদেরও তারা আর বিশেষ পরোয়া করবে না, অন্যদিকে দেবতাদের এই সব রসালো কুৎসা তাদের মনের গোপনীয় প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলে তাদের স্বেচ্ছাচারের প্ররোচনা দেবে। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই কবিদের রচনা ক্ষতিকর। তাছাড়া ট্রাজেডির নায়কদের আত্মবিস্মৃত শোকোচ্ছ্বাস ও অসংবৃত আবেগের প্রকাশ দেখে দেশের লোকে সংযমপূর্ণ বীরত্ব এবং ধৈর্যের আদর্শ ভুলে যাবে, এমন ভয়ও আছে। সেদিক থেকেও কবিদের রচনা বিপজ্জনক।

শিল্পের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে প্লেটোর এই নীতিনির্ভর আপত্তির জবাব অ্যারিস্টটল দিয়েছেন এইভাবে : তিনি 'চার' অধ্যায়ের প্রথমেই বলেছেন শিল্প অনুকরণ, এবং অনুকরণ স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক। তাঁর ইঙ্গিত যেন এই যে, যা স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক, তা কেন ক্ষতিকর হবে? অবশ্য ৬ অধ্যায়ে ট্রাজেডির সংজ্ঞাতে ট্রাজেডির প্রতিক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে 'কাথারসিস'

কথাটি ব্যবহার করেছেন অ্যারিস্টটল। মূল গ্রিকে দশটি মাত্র শব্দে (দি এলেয়ৌ কাই ফোবৌ পেরাইনৌসা তেন্ তন্ তোইঔতন্ পাথেমাতন্ কাথারসিন্)[১৮] যা বলেছেন তা আর পরে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাননি। তবে তার খানিকটা অর্থ এইরকম : ট্রাজেডির নায়কের দুঃখদুর্গতির ঘটনা দেখে দর্শকের মনে করুণা বা অনুকম্পা ('এলেওস্') এবং আতঙ্কের ('ফোবোস্') আলোড়ন ঘটে, এবং পরে এদুটি অনুভূতির আতিশয্যজনিত মোক্ষণ (release) ঘটার ফলে তার চিত্তে প্রশান্তি ও ভারসাম্য আসে। এই কথার ঠিক অর্থ কী, তা নিয়ে বিতর্কে যাবার সুযোগ নেই। কিন্তু ওই 'all passion spent' গোছের প্রশান্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন উপকারী তেমনই সমাজের পক্ষেও নিশ্চয়ই উপকারী—সমাজ যেহেতু ব্যক্তিরই সমষ্টি। তা সামাজিক সংস্থিতি এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে। সুতরাং সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের দিক থেকেও একভাবে প্লেটোর কথার জবাব দেওয়া হল। আর ৯ অধ্যায়ে কাব্যকে ইতিহাসের চেয়ে উন্নততর এবং ব্যাপকতর (অধিকতর 'সর্বজনীন') বলে গণ্য করেছেন তিনি[১৯]। তাতেই স্পষ্ট হয় যে, অ্যারিস্টটল কাব্য বা শিল্প সম্বন্ধে প্লেটোর মতো একদেশদর্শী ছিলেন না।

অনুকরণ কি হুবহু প্রতিবিম্বন ?

এর পরের যে প্রশ্ন, তা হল : অনুকরণ বলতে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বুঝিয়েছেন ? মাছিমারা কেরানির মতো নকল করা ? 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' রচনা ? —যাকে বুচার বলেন অনুকরণের vulgar ধারণা ? না কি কবির বা শিল্পীর কোনো একটা স্বাধীনতা থাকে কল্পনা ও উদ্ভাবনের, নিজস্ব সৃজনের ? এ নিয়েও প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু 'পোয়েটিকস্' বইটি ভালো করে পড়লে এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না যে, অ্যারিস্টটল অনুকরণ কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে কখনোই বোঝাতে চাননি। তাঁর 'অনুকরণ'-কে বুচার 'a creative act' হিসেবেই দেখেছেন[২০]। তবে বুচারের সহায়তা না নিয়েই আমরা লক্ষ করি যে, বইটিতেই অসংখ্য ইঙ্গিত আছে—অ্যারিস্টটল অনুকরণ-কর্মের মধ্যে স্রষ্টার কল্পনা ও সৃজনের যথেষ্ট স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন। এই ইঙ্গিতগুলিকে পর পর সাজিয়ে দিই :

১. সংগীতকেও তিনি অনুকরণাত্মক শিল্প বলে গণ্য করেছেন (১ম

অধ্যায়)। এখন চিত্র, কাব্য বা ভাস্কর্য যে-অর্থে অনুকরণ, সংগীত কি সে-অর্থে অনুকরণ? চিত্রে, ভাস্কর্যে, কাব্যে যার অনুকরণ করা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার মূলটিকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। অর্থাৎ সেখানে অনুকরণের পরিণাম এবং অনুকরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও সাযুজ্য থাকে। কিন্তু সংগীতে সে-সাদৃশ্য কীভাবে খুঁজব? যদি আক্ষরিক সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও সংগীত অনুকরণাত্মক শিল্প হয়, তাহলে অনুকরণ কাজটি কিছুতেই নকলনবিশের কাজ হতে পারে না।

২. ২য় অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন,[২১] "we must represent men (in action) either as better than in real life, or as worse or as they are." ১৫ অধ্যায়ে প্রায় একই ধরনের যে-কথা বলা হয়েছে তাতে বুঝতে পারি, যেমন আছে তার চেয়ে একটু উন্নত করে দেখানোর কথাই অ্যারিস্টটল বলেছেন, স্বভাব-উন্নত মানুষকে যথাযথভাবে আঁকার কথা বলছেন না[২২]। এখানে স্রষ্টার স্বাধীনতাই স্বীকার করা হল। এখনকার উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, মহৎ রাষ্ট্রশাসককে ট্রাজেডির নায়ক হিসেবে কেউ দেখতে পারে, আবার কেউ করে তুলতে পারে কার্টুনের বিষয়বস্তু। এখানে উন্নত বা লঘু করে দেখানোরই ব্যাপার।

৩. ৭ম-৮ম অধ্যায়ে অনুকরণের বিষয়কে একটি form বা সংগঠনের অধীন করার কথা বলা হয়েছে। অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন ও অবয়বহীন বিষয়বস্তুর উপর যখন অবয়ব বা structure আরোপ করা হয় তখন তা আর নিছক অনুকরণ থাকে না। তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়, আগের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা আগে আনা হয়, বৃহৎ ঘটনাকে গৌণ এবং গৌণ ঘটনাকে বৃহৎ করে দেখানো হয়, ঘটনাকে গ্রহণ এবং বর্জন করা হয়। এই সব স্বাধীনতা নিলেই এলোমেলো পুঞ্জীভূত ঘটনাতে আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি আনা যায়, আর অংশ ও অঙ্গগুলিকে কার্যকারণ ও অনিবার্যতার সূত্রে বাঁধা যায়। অ্যারিস্টটল-প্রার্থিত organic form-এর শর্ত মানতে হলে এইসব স্বাধীনতা শিল্পীকে নিতেই হবে।

৪. অনুকরণের এই ব্যাপকতর ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড়ো সমর্থন পাই ৯ অধ্যায়ে। এখানেই তিনি বলেছেন, ইতিহাস অনুকরণ করে what has happened-এর, আর কবিতা অনুকরণ করে what may happen[২৩], অর্থাৎ কার্যকারণ ও বিশ্বাস্যতার সূত্র অনুযায়ী যা সম্ভব তার। তাই কবিতাকে তিনি

a more philosophical and a higher thing than history বলে ঘোষণা করেছেন। তার কারণ, poetry tends to express the universal, history the particular." অনুকরণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ যদি অ্যারিস্টটলের অভিপ্রেত হবে, তাহলে ইতিহাসের চেয়ে কবিতাকে উঁচু সম্মান কেন দেবেন তিনি? ইতিহাস তো ঘটনার অনেক বিশ্বস্ত অনুকরণ—ঘটনা যেভাবে ঘটছে, যেরকম গুরুত্ব পাচ্ছে ঠিক সেই ক্রমে সেই গুরুত্বে তাকে বিন্যাস করতে হবে। কবির অনুকরণ তো অনেক বেশি স্বাধীন। অয়দিপৌস বা ঈডিপাসের ইতিহাস এবং তাকে নিয়ে লেখা নাটক—এ দুয়ের তুলনা করলেই বোঝা যাবে কোন্‌টি আক্ষরিক অর্থে অনুকরণ। অবশ্য ইতিহাসও যে আক্ষরিক অনুকরণ হতে পারে না, আউয়েরবাখ তা বারবার বলেছেন। কিন্তু কবিতার চেয়ে তার মূলানুগত্য সব সময়েই বেশি। তা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল কবিতাকেই বেশি মূল্য দিচ্ছেন।

৫. এই অধ্যায়েই চূড়ান্ত এবং মোক্ষম কথাটি বলেছেন এ সম্বন্ধে। আগাথন নামক ট্রাজেডিকারের 'আন্‌থেউস' নাটকটি সম্বন্ধে বলছেন. তার ঘটনা এবং চরিত্র,—সবই ছিল কল্পিত, and yet they give nonetheless pleasure তা হলে যা কোনো অর্থেই অনুকরণ নয়, অর্থাৎ পুরোটাই কল্পিত, তাও 'অনুকরণ' বলে গণ্য হচ্ছে, এবং তা আনন্দদায়কও হতে পারছে[২৪]। অনুকরণের সংকীর্ণ আক্ষরিক অর্থ ধরলে এ কথা বলা অ্যারিস্টটলের পক্ষে সম্ভব হত কি?

অর্থাৎ, বাইরে কোথাও যাবার দরকার নেই, কোনো পণ্ডিতের শরণাপন্ন হওয়ারও কিছু নেই—পোয়েটিকস্‌ বইটি থেকেই অজস্র প্রমাণ ও ইঙ্গিত উদ্ধার করা যায়, যার সাহায্যে বোঝা যায় অনুকরণ বলতে অ্যারিস্টটল কখনোই আলোকচিত্রধর্মী নকলের কথা বলেননি।

শিল্পের নানা শ্রেণী : শ্রেণীবিভাগের মাপকাঠি

অনুকরণ=শিল্প, প্রায় এই সমীকরণটি নির্দেশ করলেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু অনুকরণ তো শিল্পের সাধারণ লক্ষণ, বিশেষ বিশেষ শিল্প আমরা চিনব কী করে? শিল্পের শাখাপ্রশাখা ভাগ হবে কিসের ভিত্তিতে? এই উদ্দেশ্যে অ্যারিস্টটল তিনটি মাত্রা বা মাপকাঠি গড়ে তুললেন—

১. অনুকরণের বাহন (medium of imitation)। ২. অনুকরণের

বিষয় (object of imitation) এবং ৩. অনুকরণের প্রকার (manner of imitation)। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে এই তিনটি মাত্রার সাহায্যেই শিল্পের শ্রেণীবিভাগ এবং উপবিভাগ করেছেন অ্যারিস্টটল। আমি নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে ওই তিনটি মাত্রাকে এইভাবে সাজাই : অনুকরণের বাহন, অনুকরণের প্রকার, অনুকরণের বিষয়।

কারণ আর কিছুই না, আমাদের এখনকার হিসেব অনুসারে শিল্পের বড় বিভাগ থেকে ছোট বিভাগে যেতে হলে অ্যারিস্টটলের ক্রম অনুযায়ী মাত্রা-গুলিকে সাজালে চলবে না। অনুকরণের বাহন অনুযায়ী আমরা চিত্রকলা, সাহিত্য, বাঁশির ও বীণার সংগীত, নৃত্যকলা ইত্যাদি প্রধান-প্রধান শিল্পগুলিকে পাই। এর ফর্মূলা হল : ভিন্ন বাহন, কাজেই ভিন্ন শিল্প। চিত্রকলার বাহন রঙ ও রূপ (colour and form), কাব্য বা সাহিত্যের বাহন ভাষা ও ছন্দ, মেষপালকের বাঁশি ও বীণার সংগীতের বাহন সুর ('হারমনি') ও তাল।

কিন্তু যদি আরো সূক্ষ্ম ভাগ চাই ? তাহলে এবার শরণ নিতে হবে অন্য একটি মাত্রার—অনুকরণের প্রকার ও প্রকরণের ; ধরা যাক কাব্য বা সাহিত্য। প্রধানত দুটি প্রকারে সাহিত্য পরিবেশিত হতে পারে। এক শ্রেণীর কাব্যকে গায়ক বা চারণ বর্ণনা করে। অর্থাৎ আবৃত্তি করে বা গেয়ে শোনায়। তাতে যে-ঘটনার কথা লেখা তা শ্রোতারা চোখে দেখে না। আরেক শ্রেণীর কাব্য সামনে অভিনয় করে বা ঘটিয়ে দেখানো হয়। সেখানে দর্শকরা কাব্যের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখছে। তাহলে আবৃত্তি বা narration-এর প্রকরণের ফলে সাহিত্যের একটি ভাগ তৈরি হল, যাকে নিছক কাব্য বলতে পারি। তা শ্রুতিগ্রাহ্য। অন্যদিকে ওই অভিনয় বা representation-এর প্রকরণ সাহিত্যের আরেকটি ভাগ নির্দেশ করল—তার নাম নাটক। শিল্পের বড় ভাগ যে সাহিত্য, তার দুটি উপবিভাগ পাওয়া গেল—কাব্য আর নাটক। ওই 'প্রকার'-এর মাত্রাটির সহায়তায়।

যদি আরো সূক্ষ্ম ভাগ করতে চাই ? তাহলে আমাদের সাজানো অনুযায়ী ঐ শেষ মাত্রাটির সাহায্য নিতে হবে। এবার বিষয়বস্তু বলে দেবে নাটকের মধ্যে আবার কোন্‌টা ট্রাজেডি, কোন্‌টা কমেডি। মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ট্রাজেডির উপাদান, লঘু বিষয়বস্তু কমেডির। এইভাবে সামগ্রিক ও নির্বিশেষ শিল্প থেকে বিশেষ শিল্পে, এবং বিশেষ শিল্প থেকে তার শাখাপ্রশাখায় পৌঁছোবার উপায় নির্দেশ করেছেন অ্যারিস্টটল।

একটি ছকের সাহায্যে এই শিল্পবিভাজন বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব :

	অনুকরণের বাহন	অনুকরণের প্রকার	অনুকরণের বিষয়
বাঁশি ও বীণার সংগীত	সুর ও ছন্দ		
নৃত্য	(সুরবর্জিত) ছন্দ		
চিত্রকলা	রঙ ও রূপ		
সাহিত্য	ভাষা ছন্দ. (সুর)	বর্ণনীয়=কাব্য	
		অভিনেয়=নাটক	সমুন্নত=ট্রাজেডি
			লঘু=কমেডি

শিল্পের উদ্দিষ্ট

শিল্পের লক্ষ্য যে আনন্দ, তা অ্যারিস্টটল বারবার বলেছেন। প্লেটোর সঙ্গে এখানে তাঁর বড় বিরোধ। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে প্রত্যেক শিল্পের উপভোগের আনন্দ আলাদা। এই আনন্দের উৎস সম্পর্কে কফ্‌ম্যান অর্থ করেছেন অভিনয় বা ভান করা[২৫]। কিন্তু কাথারসিসের যে-আনন্দ তার উৎস যে অন্য রকম, এই নিয়ে প্রচলিত বিতর্ক আমরা পরিহার করব। তবে শিল্প হল উপভোগের বিষয়, এই থেকেই যে পরবর্তীকালে 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদ হয়েছে এটা বেশ অনুমান করা যায়।

এই হল মূল কথা। তাঁর ট্রাজেডি সম্পর্কে নানা সিদ্ধান্তকে চেঁচেছুলে আরও দুচারটে কথা যে বের করা যায় না তা নয়। শিল্পের আয়তন, ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর কথাগুলি স্পষ্টও নয়, স্ববিরোধও আছে। যেমন ৭ম অধ্যায়ে অনুকরণের আকৃতিকে বেশ বড় হতে বলেছেন, আবার ২৬ অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের যে-ট্রাজেডি তাকে মহাকাব্যের চেয়ে শ্রেয় বলেছেন। তাঁর 'ঐক্য' সম্পর্কিত ধারণাকে পরে হোরেস প্রমুখরা যতটা ফাঁপিয়ে বলেছেন,

তিনি নিজে অত জোর দেননি। কারণ সোফোক্লিসের 'আইয়স' (Ajax) ছাড়াও অনেক গ্রিক নাটক তাঁর ঐক্যের ধারণাকে লঙ্ঘন করেছে। কাজেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে কেবল অ্যারিস্টটলের মূল কথাটাই এই প্রবন্ধে বলার চেষ্টা করলাম।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্র. Durant, Will, 1939, *The Life of Greece* [The Story of Civilisation], New York, Simon and Schuster, p. 526 ; এবং Hamilton, Edith, 1957, *The Echo of Greece*, New York, W. Norton Company, Inc., p. 97.

২. 'কাব্যতত্ত্ব' 'সাহিত্যতত্ত্ব', কখনও 'নাট্যতত্ত্ব'—ইত্যাদি নামে 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটির নামের অনুবাদ করা হয়েছে বাংলায়। ইংরেজিতে বুচার 'অ্যারিস্টট্‌লজ্‌ থিয়োরি অফ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড ফাইন আর্ট' হিসেবে নামকরণ করে তাঁর গ্রন্থের ব্যাপকতম সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। অন্যদিকে L. J. Potts তাঁর অনুবাদের নাম দেন *Aristotle on the Art of Fiction.* (Cambridge University Press, 1953).

৩. Carlyle-Wicksteed-এর 'দ ডিভাইন কমেডি'-র অনুবাদে (মডার্ন লাইব্রেরি পেপারব্যাক্স, নিউ ইয়র্ক, র‍্যানডম হাউস, ১৯৫০), অনুচ্ছেদটি এইভাবে পাওয়া যাচ্ছে—"When I raised my eyelids a little high, I saw the Master of those that know, sitting amid a philosophic family." p. 29।

৪. দ্র. Kaufmann, Walter, 1969, *Tragedy and Philosophy,* New York, Doubleday & Company [Anchor Books], p. 34. কফম্যান অ্যারিস্টটলের যুক্তির অভাবও (!) লক্ষ করেন।

৫. Ferguson, Francis, (ed), 1961, *Aristotles Poetics,* New York, Hill and Wang, p. 3.

৬. Butcher, S. H, 1951, *Aristotles Theory of Poetry and Fine Art,* New York, Dover Publication, Inc. pp 116-7, [পরে অ্যারিস্টটলের যাবতীয় উদ্ধৃতি আমরা এ বই থেকে দেব]।

৭. তদেব, pp. 113-20.

৮. তদেব, p. 121.

৯. তদেব, p. 15. [...no less universal is the pleasure felt in

things imitated.]

১০. কারও কারও মতে অ্যারিস্টটলের পুরো বইটিই প্লেটোর উত্তর। J.W.H. Atkins তাঁর *Literary Criticism in Antiquity,* [Vol. I [Cambridge, 1934] বলেন, "Plato had complained of the disturbing, debilitating effects of the drama; Aristotle's defence is that the effects are really hygienic, curative in kind." (p.86).

১১. *The Republic,* Bk. X, [Tr. by B. Jowett], New York, Random House, p. 371 [এ গ্রন্থের পরবর্তী সমস্ত উদ্ধৃতি এই সংস্করণ থেকে]।

১২. দ্র. কফ্‌ম্যান, পূর্ববৎ, p. 4.

১৩. তদেব, p. 73.

১৪. দ্র. Nagler, A. M., 1952. *A Source Book in Theatre History,* New York, Dover Publications, Inc. p. 3.

১৫. কফ্‌ম্যান, পূর্ববৎ, pp. 19-21.

১৬. 'দ রিপাবলিক', p. 364.

১৭. তদেব, p. 74.

১৮. বুচার, পূর্ববৎ, p. 22.

১৯. "দিও কাই ফিলোসোফোতেরন্ কাই স্পৌদাইওতেরোন্ পোইএসিস্ হিস্তোরিয়াস্ এস্তিন্," বুচার, p 34.

২০. তদেব, p. viii.

২১. তদেব. p. 154.

২২. তদেব, p. 11.

২৩. ট্রাজিক চরিত্র বা নায়কের আলোচনায় অ্যারিস্টটলের বক্তব্য, মূলের আদলটির নিজস্ব ধরন (distinctive form) বজায় রেখেও, তাকে উন্নততর করে দেখানো দরকার—কবি, "should preserve the type and yet ennoble it." বুচার, p. 57.

২৪. বুচার, pp. 34-35.

২৫. কফ্‌ম্যান, p. 43.

একাঙ্ক নাটক : বিস্তার ও প্রকরণ

১.

প্রত্যেক জঁার (genre) বা সংরূপের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, তার আরম্ভের আগেও একটা আরম্ভ, ইতিহাসের আগে একটা প্রাগিতিহাস থাকে। ফলে একটা সুনির্দিষ্ট আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত রূপের আরম্ভ কবে হল, তার ঠিক দিনক্ষণ নির্ধারণ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। একাঙ্ক নাটকের কুলজী খুঁজলেও লক্ষ করি, তার সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক রূপটি নির্ধারিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই পৃথিবীর নাট্য-ঐতিহ্যে ছোট নাটক বা একাঙ্ক-ধর্মী নাটকের অভ্যুদয় ঘটেছে। যেমন জাপানে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই দুটি 'নো' নাটকের মাঝখানে একটি করে হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাট্যদৃশ্য 'কিয়োগেন'-এর অভিনয় রীতির সূত্রপাত হয়ে যায়।[১] ভারতবর্ষে আরো অনেক আগে থেকেই ছোট নাটকের একটি সংগত রূপ স্বীকার করা হয়েছ। কিথ[২] ভাসের (আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী ?) 'মধ্যমব্যায়োগ' 'ধাতুঘটোৎকচ', 'কর্ণহার' এবং 'উরুভঙ্গম্' এই চারটি নাটকই একাঙ্ক বলে নির্দেশ করেছেন। সিলবাঁ লেবি 'নাট্যশাস্ত্র' ও আরো নানা সূত্র থেকে ভারতীয় নাট্য-প্রকরণে অনেকগুলি একাঙ্ক রূপের উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাট্যরূপের প্রাথমিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত 'ভাণ', 'প্রহসন', 'বীথী', 'অঙ্ক' সবই একাঙ্ক ; এবং গৌণ রূপগুলির অন্তর্গত 'গোষ্ঠী' 'নাট্যরাসক', 'উল্লাপ্য' 'কাব্য, 'প্রেঙ্খণ' বা 'প্রেক্ষণ', 'রাসক', 'শ্রীগদিল', 'বিলাসিকা', 'হল্লীশ', 'ভাণিকা' ইত্যাদি সবই একাঙ্ক। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দেওয়া তালিকা থেকে 'হংসিকা', 'বিয়োগিনী' ইত্যাদি আরো সব একাঙ্ক নাট্যরূপের নাম তুলেছেন লেবি।[৩]

শুধু ভারতবর্ষে কেন, ইয়োরোপেও একাঙ্কের বহু প্রাগ্-রূপ বা pre-form যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রিক সাতুর (Satyr) নাটক—যা তিনটি ট্র্যাজেডির একটি 'ট্রিলজি'-র শেষে অভিনীত হত, কিংবা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এট্রুস্কানদের মধ্যে জনপ্রিয় 'সাতুরা' নাটক, অথবা ইতালির কোম্মেদিয়া

দেল্ল' আর্ত্-এর অনেক নাটক, বা ইংলণ্ডের বড় নাটক থেকে মজার দৃশ্য কেটে বার করে এনে অভিনীত সপ্তদশ শতাব্দীর 'ড্রোল' (droll) নাটক, 'ইণ্টারলিউড' নামে নাট্যদৃশ্য—সবই একাঙ্কের লক্ষণাক্রান্ত। ইংরেজি রূপক 'এভরিম্যান'-কে একাঙ্কই বলা চলে।

কিন্তু 'একাঙ্ক' কথাটি এখন একটি পৃথক নাট্যরূপের পরিভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা ছোট নাটকও নয়, বড় নাটকের খণ্ডিত বা সংক্ষিপ্ত রূপান্তরও নয়।[৪] তার আরম্ভ যেভাবেই হোক না কেন, তার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য এখন আর অস্পষ্ট নয়। ফলে 'একাঙ্ক' কথাটি এখনও পর্যন্ত short play বা 'নাটিকা' কথাটির সঙ্গে তুল্যভাবে ব্যবহৃত হলেও 'একাঙ্ক' নামটিই বেশি গ্রাহ্যতা লাভ করছে।[৫] এই নামের মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত আছে—যে নাটক পঞ্চাঙ্ক নয়, চার বা তিন অঙ্কের নয়, এমন কী দু-অঙ্কেরও নয়—তাই একাঙ্ক। এই contrastive অর্থটি 'ছোট নাটক', 'ক্ষুদ্র নাটক,' ইত্যাদি নামে তেমন স্পষ্ট হয় না, এর প্রকরণ ও নির্মিতির বিশেষ ধরনটিও ওসব নাম থেকে ধরা যায় না। ফলে 'একাঙ্ক' বা 'one-act' কথাটিই এখন প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠছে।

২.

ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ফর্ম হিসেবে একাঙ্কের উদ্ভব খুব বেশি দিনের নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একাঙ্কের অভিনয় পেশাদার মঞ্চের চৌহদ্দিতে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। সে স্বীকৃতি সম্মানের নয়, আবশ্যকের। লণ্ডনের বা প্যারিসের থিয়েটারগুলিতে গত শতাব্দীর শেষ দিকে একাঙ্ক ব্যবহৃত হচ্ছিল মূলত curtain raiser বা মূল নাটকের আগে একটা প্রারম্ভিক পরিবেশন হিসেবে। দর্শকেরা ডিনার সেরে থিয়েটারে আসতে প্রায়ই দেরি করে ফেলত[৬], ফলে মূল নাটক আরম্ভ হয়ে যেত, প্রায় খালি অডিটোরিয়ামে অভিনয় শুরু করতে হত। এই অবস্থায় দর্শক ও কর্তৃপক্ষ কেউ খুশি হচ্ছিল না, তাই প্রথম দিককার সময় কাটানোর জন্য ছোট নাটকের ব্যবহার হতে লাগল। ওই নাটক চলার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে দর্শকেরা এসে পড়ত, তাদের টিকিট কাটা, সিট খুঁজে বসে পড়া, বন্ধুদের সাক্ষাতে সম্ভাষণ—ইত্যাদির মধ্যেই ওই 'কার্টেন রেইজার' ধরনের নাটিকাটি চলতে থাকত। কিংবা ছোট নাটকের ব্যবহার হত after-piece বা অন্তিম নাট্য

হিসেবে। আফটার-পিস বড় নাটক হয়ে যাবার পর অভিনীত হত। জার্মানির থিয়েটারে তার নাম ছিল nachspiel বা পরের নাটক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হাস্যরসাত্মক বা প্রহসনধর্মী নাটিকা—গুরুগম্ভীর বা শোকাবহ নাটকের শেষে দর্শকেরা যাতে মুখ গোমড়া করে বাড়ি না ফেরে, সেই জন্য হাসির ছোট্ট নাটকের আয়োজন, প্রচুর ভাঁড়ামো-টাড়ামো করে দর্শকদের খানিকটা হালকা চিত্তে বিদায় দেওয়া। প্রাচীন আথেন্সে ট্রাজেডির ট্রিলজি বা ত্রয়ীর পর সেই একটি সাতুর (satyr) নাটক অভিনয়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। এ অবস্থায় একাঙ্কের শিল্পগত উৎকর্ষ যে উন্নত হতে পারে না, তা সহজেই অনুমানযোগ্য। যা কেবল সময় কাটানো এবং লোক-হাসানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, তা শিল্পের স্বতন্ত্র মহিমায় উত্তীর্ণ হবে কী করে। কেবল প্যারিসের 'গ্রঁা গুঞিয়োল' (Grand Guignol) থিয়েটারেই দীর্ঘদিন ধরে শুধু একাঙ্ক অভিনীত হওয়ার কথা শোনা যায়। সারা সন্ধেয় সেখানে একগুচ্ছ একাঙ্কের অভিনয় হয়েছে, বড় নাটকের ভূমিকা বা লেজুড় হিসেবে নয়, স্বাধীন নাট্যরূপ হিসেবে। কিন্তু সে সব একাঙ্কও ছিল রক্ত জমিয়ে দেওয়া মাথার চুল খাড়া করা খুব রোমহর্ষক বিষয়বস্তু নিয়ে। এই 'গ্রঁা গুঞিয়োল আইডিয়া'র প্রভাব নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তা ১৯১০ নাগাদ অনুভূত হয়, কিন্তু সেখানে গত শতাব্দীতে শহরের বাঁধা পেশাদার মঞ্চে একাঙ্কের জায়গা কোথাও ছিল না। তবে 'ভোদবিল্'-এর ভ্রাম্যমাণ নাটুয়া ও ভাঁড়ের দল এ শহর থেকে ও শহরে একাঙ্কের অভিনয় করে বেড়াত। ভোদ্‌বিল-এর চরিত্র অনুযায়ী সেসব একাঙ্কও ছিল ভাঁড়ামোতে ভর্তি, দম-ফাটা হাসির। যাঁরা পাশ্চাত্যের Punch and Judy গোছের নাটক দেখেছেন তাঁরা ওইসব একাঙ্কের চরিত্র খানিকটা অনুধাবন করতে পারবেন।

আলাদা শিল্পরূপ হিসেবে একাঙ্কের জন্মের জন্য বিশেষ কয়েকটি আয়োজনের দরকার ছিল। এক, পেশাদার মঞ্চে তার অনাদর। ইয়োরোপে রেপার্টরি থিয়েটার (ম্যাঞ্চেস্টারের 'গেইটি থিয়েটার' রেপার্টরির ভাবনা নিয়ে ১৯০৮-এ প্রতিষ্ঠিত হয়), এবং মার্কিনদেশে লিট্‌ল থিয়েটার আন্দোলনের জন্ম ও বিস্তার—এরকম আরও দুটি আয়োজন। দুয়েরই উদ্ভব পেশাদার থিয়েটারের প্রমোদকেন্দ্রিক, বিনোদনমুখ্য লাভসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে সিরিয়াস নাটকের জন্য ভিন্ন নাটক ও নাট্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকে। সে নাটক কেবল অলস ও নির্লিপ্ত দর্শকের অবসর-যাপনের উপলক্ষ্যমাত্র হবে না, তা

দর্শককে ভাবিত, পীড়িত, উত্তেজিত, উদ্দীপিত ও প্রবর্তিত করবে। সমাজের যেসব বাস্তব পেশাদার মঞ্চের নাট্যবিলাস থেকে নির্বাসিত থেকে গেছে সে বাস্তবের জায়গা হবে রেপার্টরির নাটকে, যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পেশাদার মঞ্চে অনুপস্থিত তার সম্পূর্ণ আমন্ত্রণ থাকবে এই নতুন রঙ্গালয়ে। ১৮৮৭ থেকে ১৯১১-র মধ্যে রুশদেশ, বেলজিয়াম, জার্মানি, সুইডেন, হাঙ্গারি, ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, আমেরিকা সর্বত্রই লিট্‌ল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটে। আয়ার্ল্যাণ্ডের 'অ্যাবি' থিয়েটারের (Abbey Theatre) প্রতিষ্ঠা এই নতুন লক্ষ্য থেকে। অ্যাবি থিয়েটার হওয়ার আগে তা যখন আইরিশ লিটারারি থিয়েটার ছিল, তখন কবি ইয়েট্‌সের 'কাউণ্টেস ক্যাথলীন' নামে একাঙ্কটিই এর প্রথম উপহার হিসেবে প্রস্তুত হয়। এবং এই প্রথম নাটকটি নিয়েই বিতর্কের ঝড় ওঠে। ফলে বোঝা যায়, একাঙ্কের মধ্যে একটা শক্তি ও দুর্ধর্ষতা আছে, পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেয়ে তার ক্ষমতা কম নয়। বস্তুতপক্ষে, সৌন্দর্যের মামুলি বিবেচনাকে তুচ্ছ করে দিয়ে এই Power বা শক্তিই একাঙ্ক নাটকের সবচেয়ে দামি ভরকেন্দ্র। আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণে ইয়েট্‌স, লেডি গ্রেগরি, শন ও' কেসি, জে এম সিঙ্ প্রভৃতির নাটক কী অসামান্য মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছিল সে ইতিহাস কারও অজ্ঞাত নয়। লেডি গ্রেগরির 'The Rising of the Moon' (১৯০৭) একাঙ্কটি অ্যাবি থিয়েটারেই অভিনীত হয় ৩১৮ বার। বাংলায় সলিল চৌধুরী কৃত তার রূপান্তর 'অরুণোদয়ের পথে' যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন একাঙ্ক নাটক বিপ্লবের ও বিদ্রোহের কত মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। ইয়েট্‌সের 'ক্যাথলীন নি হুলিহান' (১৯০২) অনুরূপভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ১৮৪ বার অভিনীত হয়ে যায়।[৭]

প্রমোদসন্ধান ও প্রমোদ বিতরণ থেকে বেরিয়ে এসেই একাঙ্কের মুক্তি ঘটল, একাঙ্ক স্বাধীন শিল্পরূপ হয়ে উঠল। পেশাদার মঞ্চ তার ধাত্রী ছিল, জননী হয়ে ওঠেনি কখনও। জনজীবনের লৌকিক বলিষ্ঠতা থেকে যার উদ্ভব তা যখন ফের ব্যবসায়ীর নাগাল থেকে সাধারণ মানুষের হাতে ফিরে এল তখনই তা পরিণত ও সুনির্দিষ্ট পরিসংজ্ঞা লাভ করল।

৩.

পাশ্চমদেশের একাঙ্কের ইতিহাস সময়দৈর্ঘ্যের দিক থেকে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু

সৃষ্টির প্রাচুর্যে পরিমাণহীন। আর একাঙ্কের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ভালো একাঙ্ক শুধু প্রধান নাট্যকারের লেখনীর অপেক্ষা রাখে না, তুলনায় গৌণ নাট্যকারও শিল্পগুণের দিক থেকে চমৎকার একাঙ্ক লিখে ফেলতে পারেন। বড় নাটক লিখে তেমন বিশাল কোনো খ্যাতি পাননি, কিংবা এক সময় খ্যাত ও জনপ্রিয় ছিলেন এখন তার কিছুই নেই—এমন নাট্যকারের একাঙ্ক স্থায়ী হয়ে আছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আরউইন শ'-এর 'Bury the Dead' এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। বড নাটকের নাট্যকার হিসেবে ব্যর্থ কিন্তু একাঙ্কের রচয়িতা হিসেব সফল, কিংবা একাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই লেখেননি, এমন নাট্যকারেরও অভাব নেই। ফলে পাশ্চাত্যদেশের একাঙ্কের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার জন্য বিশাল পরিসর দরকার। সব উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক দূরের কথা, সব নাট্যকারেরও উল্লেখ করা সম্ভব কিনা সন্দেহ।

পিটার প্যান্-এর স্রষ্টা জেম্‌স ম্যাথিউ ব্যারি-ই (১৮৬০-১৯৩৭) সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে একসঙ্গে পরিবেশনের জন্য একাঙ্ক রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। ব্যারির 'শ্যাল উই জয়েন দ লেডিজ' এবং অন্যান্য হাস্যময় একাঙ্ক পরিজ্ঞাত ও জনপ্রিয়, কিন্তু তাঁর অনেক আগেই ইয়োরোপে বড় নাট্যকারেরা একাঙ্ক নাটকের উৎকৃষ্ট সব নমুনা তৈরি করে দিয়েছেন। একাঙ্কের মূল প্রবর্তনাটি নিশ্চয়ই এসেছিল তথাকথিত 'ফার্স'—প্রহসন বা রঙ্গনাট্য থেকে। ওই 'কারটেন-রেইজার' বা 'আফটার-পিস' যে কৌতুকময় নাট্যদৃশ্য ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না—তা বাণিজ্যিক মঞ্চের বিশেষ মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানবেন। দর্শক আসতে আসতে, সিট দেখে বসতে বসতে যে নাটকের অভিনয় হবে, কিংবা ভারি একটা নাটকের শেষে চাটনি হিসেবে যে নাটক পরিবেশন করা হবে—তা ফার্স জাতীয় হতেই হবে। সে ক্ষেত্রে ফরাসিদেশে স্বয়ং মলিয়ের (১৬২২-১৬৭০) প্রহসনের একটি উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, পরবর্তীকালে 'হাই কমেডি' লেখার আগে মলিয়ের অসংখ্য 'ফার্স' রচনা করেছিলেন, যার দুটিমাত্র শেষ পর্যন্ত অক্ষত আছে। তবে বাইরে বিভিন্ন শহরে দল নিয়ে ঘুরে এসে প্যারিসে ফেরবার পর তাঁর সবচেয়ে সফল প্রদর্শন একটি একাঙ্ক—'লে প্রেশ্যুকে র‍্যাদেক্যুলে' ('গরবিনীদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা', ১৬৫৮)। কিংবা মলিয়ের নিজেই হয়তো স্পেনের লোপে দে বেগা (Vega)-র অসংখ্য ফার্স থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। লোপে দে বেগা (১৫৬২-১৬৩৫) প্রায় দু হাজারের

মতো নাটক লিখেছিলেন বলে শোনা যায়, তাঁর মধ্যে পনেরো শো-ই লুপ্ত হয়েছে। ইতালি বা স্পেন থেকে ফার্সের ওই ঐতিহ্য ফরাসিদেশের মাটিতে এসে গভীরে মূল বিস্তারিত করে দেয়। মলিয়ের-এর 'বিদুষী মহিলারা' ('লে ফেম্-এ সাবাঁৎ-এ', ১৬৭২) নামে একাঙ্কটিও বেশ জনপ্রিয় হয়। তার পরেই আমরা ফরাসিদেশে রঙ্গরসিকতাময় একাঙ্কের একটি শক্তিশালী ঐতিহ্য গড়ে উঠতে দেখি। তার একটা বড় কারণ বোধ হয় এও ছিল যে, সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ইয়োরোপের মধ্যে ফরাসিদেশের নাট্যচর্চাই ছিল সবচেয়ে প্রবল ও জনপ্রিয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে (১৭৯১) জন্মে ১৮৬১ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তথাকথিত well-made play বা piece bien fait জাতীয় নাটকের নাট্যকার ইয়ুজিন স্ক্রাইব। তাঁর ২১৬টি 'ভোদ্‌বিল্' কমেডির অধিকাংশই একাঙ্ক নাটক। মাঝখানে ইয়ুজিন লাবিশ্ (Labiche, ১৮১৫-১৮৮৮)-এর অসংখ্য ভোদ্‌বিল, ফার্স ও 'পোশাদ' বা স্কেচ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ফ্রান্স থেকে সরে গিয়ে আমরা যখন রুশদেশে মহৎ নাট্যকার আন্তন চেখফের (১৮৬০-১৯০৪) প্রথম দিকের রচনা একাঙ্ক বা ফার্সগুলির কথা পড়ব, তখন লক্ষ করব যে, চেখফ তাঁর 'বর্বর' বা The Brute নামে একাঙ্কটি লিখেছিলেন পিয়ের বেরৃতঁ (Berton) নামে এক ফরাসি নাট্যকারের একাঙ্ক প্রহসন 'লে জুরোঁ দ কাদিয়াক' (Les Jurons de Cadillac, ১৮৬৫) থেকে। সুতরাং ইতালি ও স্পেনের লোকনাট্য থেকে যে সংস্কৃত ও মার্জিত ফার্সের অভ্যুদয় হল, তা ফরাসিদেশে সবচেয়ে প্রচুর শস্য উৎপাদন করার পর আবার ওই দেশ থেকেই রুশে বা নরওয়েতে বা জার্মানি ও ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। হাস্যময় ও প্রহসনধর্মী একাঙ্ক বা খুন-জখম-মারপিটের রোমহর্ষক একাঙ্ক থেকে সিরিয়াস বক্তব্য নির্ভর একাঙ্কে বিবর্তনের একটি ধারাবাহিকতাও লক্ষ করা যায়। ফলে যা ছিল 'থিয়েটারের সিণ্ডারেলা', অর্থাৎ নাটমঞ্চের অবহেলিত রূপ, তা ক্রমশ একটি সম্ভ্রান্ত নাট্যরূপ হয়ে ওঠে। তার বড় কারণ ব্যাবসায়িক মঞ্চ থেকে একাঙ্কের মুক্তি, স্কুলে কলেজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের তৈরি গ্রুপ থিয়েটারে ও রেপার্টরিতে তার স্থান গ্রহণ এবং শেষ পর্যন্ত তার জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের, এবং রাজনৈতিক দল বা শাসনকর্তৃপক্ষের বক্তব্য-বিস্তারের সমর্থ অস্ত্র হয়ে ওঠা। সোবিয়েতে 'অ্যাজিট-প্রপ্' (agitation-propaganda) নাটক, এবং মার্কিনদেশে তিরিশের দশকে 'লিভিং-নিউজ-পেপার' জাতীয় নাট্যকর্ম মূলত একাঙ্ক-রূপকেই যে গ্রহণ

করেছিল তার কারণ একাঙ্ক খুব কম আয়োজনে করে ফেলা যায়। ব্যাবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিঁড়েছে বলেই একাঙ্কের বিষয় ও প্রকরণে এমন অগাধ বৈচিত্র্য এসেছে, তা জীবনে ও প্রাচুর্যে উচ্ছ্বসিত। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্ত রকমের সম্ভাবনাই মুক্ত ও চিহ্নিত হয়েছে একাঙ্কের ক্ষেত্রে।

৪.

চেখফ প্রভৃতির প্রাথমিক একাঙ্কগুলি যখন দেখি, তখন তাতে প্রথানুসরণ ও অনুবর্তনই বেশি লক্ষ করি। অবশ্য কমিক রসে চেখফের মৌলিক ও দুর্দমা প্রতিভা সব ক্ষেত্রেই তাঁর একাঙ্কগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯১-এর মধ্যে চেখফ সাতটি একাঙ্ক লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'সোয়ান সং' (বাংলায় 'নানারঙের দিন') ছাড়া আর সবই মূলত হাস্যরসাত্মক। 'অন দ হাই রোড' নাটিকাটি আবার একটু ভাবপ্রবণ মেলোড্রামা। 'তামাকুসেবনের অপকারিতা' (১৮৮৬-তে প্রাথমিক রূপ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন ঘোষের দুটি বাংলা অনুবাদ আছে)। 'সোয়ান সং' (১৮৮৭, ওই), 'দ ব্রুট' (১৮৮৮), 'আ ম্যারিজ প্রোপোজাল' (১৮৮৮-৮৯), 'সামার ইন দ কানট্রি' (১৮৮৯), 'আ ওয়েডিং (১৮৮৯-৯০), 'দ সেলেব্রেশন' ('দ অ্যানিভার্সারি' নামেও চলে, ১৮৯১, বহুরূপী কর্তৃক অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের রূপান্তরে 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' নামে অভিনীত) শৌখিন অভিনয়ের জন্য নিত্যকালের সম্পদ হয়ে আছে। বাংলায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনেকগুলিই অনুবাদ করে গেছেন।

চেখফ যখন তাঁর এই একাঙ্কগুলি লিখছেন ঠিক সেই মুহূর্তেই ফ্রান্সে আঁদ্রে আতোয়ান তিয়েৎর লিব্‌র (The Theatre Libre) প্রতিষ্ঠা করছেন (১৮৮৭)। আতোয়ানের নাট্যালয় পৃথিবীর আদিতম লিট্‌ল থিয়েটার বা অন্তরঙ্গ নাটমঞ্চের অন্যতম। ১৮৮৭ থেকে ১৯১১-র মধ্যে রুশদেশে, বেলজিয়ামে, জার্মানিতে, সুইডেনে, হাঙ্গারিতে, ইংল্যাণ্ডে, আয়ারল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে অসংখ্য 'লিট্‌ল থিয়েটার' স্থাপিত হয়ে যায়। আমেরিকায় ১৯১১ থেকে লিট্‌ল থিয়েটার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। শুধু বড় শহরে বা রাজধানীতে নয়, ছোট শহরেও অসংখ্য অব্যাবসায়িক ক্ষুদ্র মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে খুব যথার্থভাবেই বলা হয়েছে যে, লিট্‌ল থিয়েটার ও একাঙ্ক নাটক একে একে অন্যের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়—"The Little theatre and the one-act

play have developed each other reciprocally"...৮। ছোট থিয়েটারে একাঙ্কের স্থানটি স্বাভাবিক, কারণ শৌখিন ও অপেশাদার, অনেক সময় অনভিজ্ঞ, অভিনেতাদের পক্ষে অল্প আয়াসে একাঙ্ক নাটকই করা বেশি সম্ভব, আর এর জন্য উদ্‌যোগ-আয়োজনও খুব বিশাল হবার দরকার নেই।

যাই হোক, চেখফের পরে একাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টা হিসেবে মরিস মেতারলিংক্-এর উল্লেখ করা যায়। মেতারলিংক্ (১৮৬২-১৯৪৯) জন্মসূত্রে বেলজিয়ান, রচনাসূত্রে ফরাসি। তাঁর দুটি অসাধারণ নাটিকা L'intruse (The Intruder) এবং Les Aveugles (The Blind) অভিনীত হয় ১৮৯১ সালে। ১৮৯৪-এ বেরোয় তাঁর শ্বাসরোধকর নাটিকা-ত্রয়ী 'little plays for marionettes'—L'Interior ('অভ্যন্তর') Le Mort de Tintagiles ('তিন্‌তাজিলে-র মৃত্যু') এবং Alladine et Palomide. ('আলাদিন ও পালোমিদ')। বাইরের অভিজ্ঞতাকে ভিতরে নিয়ে যান মেতারলিংক, বাইরের নাটককে অন্তরের নাটক করে তোলেন। এখানেই অন্যদের তুলনায় তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুইডেনের ইয়োহান আউগুস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২) মেতারলিংকের চেয়ে বয়সে বড়, নাট্যদৃষ্টিতেও ভিন্ন। স্ট্রিণ্ডবার্গ ইয়োরোপের প্রথম স্বভাববাদীদের অন্যতম হলেও তিনি এক সময় স্বভাববাদ (ন্যাচারালিজম্) পরিত্যাগ করে এক্‌সপ্রেশনিজ্‌মে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন, একথা সকলেই জানেন। তাঁর নাট্যজীবনের আরম্ভই হয় I Rom (রোম-এ) নামক নাটিকাটি দিয়ে। তার 'মিস্ জুলি' (১৮৮৮) মূলত একাঙ্ক নাটক—ধর্মে স্বভাববাদী, পরিণামে ট্র্যাজেডি। 'ক্রেডিটর্স' (১৮৮৮) ট্র্যাজি-কমেডি, 'দ স্ট্রেঞ্জার' (১৮৮৮-৮৯) দুটি চরিত্রের নেহাৎ সংলাপনির্ভর দ্বন্দ্বে অসামান্য টেনশন তৈরি করে। 'প্লেয়িং উইথ ফায়ার' (১৮৯২) এক অঙ্কের কমেডি। এক্‌সপ্রেশনিস্ট পর্বে তিনি মেতারলিংকের প্রভাবেও পড়েছিলেন খানিকটা। এই পর্যায়ে স্ট্রিণ্ডবার্গ যে-সব 'চেম্‌বার প্লে' লেখেন তার মধ্যে 'স্টর্ম' (১৯০৭) এবং 'গোস্ট সোনাটা' (১৯০৮) তাঁর ওই সময়কার মানসিক আর্তির ছবি ফুটিয়ে তোলে। তাঁর নিজের পরিকল্পিত অন্তরঙ্গ থিয়েটারের (১৯০৭-১০) জন্য লেখা এই নাটকগুলি আয়তনে সামান্য বড় হলেও চরিত্রে একাঙ্কের মতোই; তবে মেজাজের দিক থেকে কাব্য ছাড়া আর কিছু নয়। স্ট্রিণ্ডবার্গের পর পার লাগের্কভিস্ট এবং হিয়ালমার বের্গমান কিছু একাঙ্ক রচনা করেছেন, কিন্তু একাঙ্কের তেমন বড়

প্রতিভা আর উদ্ভূত হয়নি সেখানে।

স্পেনে 'জেনেরো চিকো' বলতে বোঝাত এক বা দুই অঙ্কের ছোট নাটক। ১৮৮০ সালে মাদ্রিদে আপোল্লো থিয়েটারে সন্ধ্যার অভিনয় দু-ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। দু-অঙ্কের নাটকের নাম হয়ে যায় dobles বা জোড়া অভিনয়। এই রীতি সমস্ত স্পেন জুড়েই চালু হয়ে যায়। আজকাল স্পেনের অধিকাংশ নাট্যালয়ে এক সন্ধ্যার অভিনয়ে চারটি বা পাঁচটি নাটকও দেখানো হয়ে থাকে। মজার কথা এই যে, প্রতিটি নাটকের জন্য আলাদা আলাদা টিকিট কিনতে হয়। এই প্রথা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় স্পেনের প্রতিটি প্রধান নাট্যকার এই জেনেরো চিকো ধরনের নাটক লিখেছেন। বেনাবেন্তে (Jacinto Benavente, 1866-1954), কিন্তেরোস ভ্রাতৃদ্বয় (Serafin এবং Joaquin Alvarez Quinteros), কিউবাবাসী এদুয়ার্দো জামাসোয়া (Zamacois প্রভৃতি অনেকেই এ ধরনের ক্ষুদ্র নাটিকা লিখেছেন, প্রায় সবই ফার্স বা কমেডি ধরনের। এমন-কী ফ্রেদেরিকো গার্থিয়া লোরকার (১৮৯৯-১৯৩৬) মতো অসামান্য কাব্যময় কৃষকজীবন-নির্ভর ট্র্যাজেডির স্রষ্টাও ফার্স ধরনের একাঙ্ক রচনা করেছেন, যেমন 'প্রজাপতির খারাপ সময়', 'মুচির প্রতিভাশালিনী পত্নী' এবং 'উদ্যানে দোন পেরলিম্প্লিন ও বেলিজার প্রণয়' ('লা জাপাতেরা প্রোদিজিয়োসা')। তিনি পুতুলনাটকও রচনা করেছিলেন একটি।

ইংলণ্ডে জন গল্সওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩) যখন 'স্ট্রাইফ' (১৯০৯), 'দ লিট্‌ল ম্যান' বা 'জাস্টিস' ধরনের নাটিকা লিখছেন তখন আয়ার্ল্যাণ্ডে অ্যাবি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। তার শুরু হয়েছিল আইরিশ লিটারারি থিয়েটার হিসেবে, ১৮৯৯-এ। পরে ১৯০৪-এ ডাবলিনের অ্যাবি স্ট্রিটে বাড়ি পাওয়ায় তার নাম হয়ে গেল অ্যাবি থিয়েটার।

এই অ্যাবি থিয়েটার কিছু অসাধারণ একাঙ্কের এবং একাঙ্ক রচয়িতার উদ্ভব ঘটায়। লেডি গ্রেগরি (লেডি ইসাবেলা অগাস্টা গ্রেগরি, ১৮৫২-১৯৩২) বড় নাটক দু একটি লিখলেও একাঙ্কের শক্তিময়ী রচয়িত্রী হিসেবেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, ইয়েট্সকে তাঁর প্রথম একাঙ্ক 'ক্যাথলীন নি হুলিহান' লিখতে সহায়তাও যে তিনি করেছিলেন—ইয়েট্স তা কৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করেছেন। লেডি গ্রেগরির 'স্প্রেডিং দ নিউজ' (১৯০৪) এবং 'দ রাইজিং অব দ মুন' (১৯০৭) ইংরেজি ভাষার দুটি শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক হিসেবে গণ্য। তাঁর অন্য একাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ ওয়ার্কহাউজ ওয়ার্ড (১৯০৮),

'দ গ্যাওল গেট' (১৯০৬)।

কবি ইয়েট্স (উইলিয়াম বাট্লার ইয়েট্স, ১৮৬৫-১৯৩৯) মুখ্যত লেডি গ্রেগরিরই উৎসাহে নাটক লিখতে শুরু করেন, অ্যাবি থিয়েটারের প্রয়োজনের কথা ভেবে। ইয়েট্সের নাটকের চরিত্রগুলির আইরিশ গ্রাম্যভাষা শুধরে দিতেন লেডি গ্রেগরি—একথা আগেই বলা হয়েছে। জাতীয় দেশপ্রেমের প্রেরণা থেকে আয়র্ল্যাণ্ডের লোককথাকে অবলম্বন করে 'ক্যাথলীন নি হুলিহান' ইয়েট্স রচনা করেন ১৮৯২-এ। কিন্তু একাঙ্কে বিস্ময়কর কাব্যময়তা আনার জন্য খ্যাত হয়ে আছে তাঁর শোকপরিণামী তিনটি নাটিকা—'অন বেইলস স্ট্র্যাণ্ড' (১৯০৪), 'ডেইর্‌ড্র্' এবং 'পারগেটরি'। 'অ্যাট দ হক্‌স ওয়েল্' (১৯১৯)-এ লোককথার কাছে ফিরে গিয়ে জীবনের শেষ দিকে অলৌকিক বিষয় নিয়ে একাধিক একাঙ্ক লিখেছিলেন ইয়েট্স। তার মধ্যে 'দ ড্রিমিং অব বোনস' (১৯১৯), 'দ ক্যাট অ্যাণ্ড দ মুন' (১৯২৬), 'দ রেজারেকশন' (১৯৩১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আয়র্ল্যাণ্ডের আরো দুই প্রতিভাবান নাট্যকার সিঙ্ (John Millington Synge ১৮৭১-১৯০৯) এবং শন ও'কেসিও (Sean O'casey, ১৮৮০-১৯৬৪) দেশের প্রতি সম্মোহন এবং অনুরাগ থেকে একাঙ্ক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সিঙ্-এর অ্যাবি থিয়েটারের জন্য লেখা 'রাইডার্স টু দ সী' (১৯০৪), 'দ শ্যাডো অব দ গ্লেন' (১৯০৪)—নাটিকা দুটির প্রথমটি সারা পৃথিবীর একাঙ্ক সাহিত্যেই বিশিষ্ট হয়ে আছে। 'ডেইর্‌ড্র্ অব দ সরোজ' সিঙ্ শেষ করে যেতে পারেননি। 'দ ওয়েল অব দ সেইণ্টস' এবং 'দ টিংকার্স ওয়েডিং' তাঁর আর দুটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক। মূলত লোককথা ও লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ, মমতাময় ছবির মধ্যে গভীর আর্তি ও অসংগতির বেদনা ফুটিয়ে তোলাতে সিঙ্-এর একাঙ্কগুলি স্বতন্ত্র হয়ে আছে। শন ও'কেসি সেদিক থেকে তত মূল্যবান একাঙ্ক তেমন রচনা করেননি। তবে তাঁর শেষদিকে লেখা কিছু অত্যন্ত কৌতুককর নকশা খুব উপভোগ্য। এই ক-জন খ্যাত নাট্যকার ছাড়া লর্ড ডানসানি (Lord Dunsany, Edward John Moreton Drax Plunkett, [১৮৭৮-১৯৫৭]-এর ছদ্মনাম) অ্যাবি থিয়েটারের জন্য বেশ কিছু একাঙ্ক লিখেছিলেন। তাঁর 'কিং আরজিমেনেস অ্যাণ্ড দি আননোন ওঅরিয়র' (১৯১১), 'দ গড্‌স অব দ মাউনটেন' (১৯১৪) 'দ গোল্‌ডেন মুন' এবং বিশেষত 'আ নাইট অ্যাট অ্যান ইন' (১৯১৬) উল্লেখযোগ্য।

অ্যাবি থিয়েটার আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডে একাঙ্কের যে প্রতিষ্ঠা দেয় তারই প্রতিফলন ঘটে একাঙ্কের জনপ্রিয়তায়। কাজেই এ শতাব্দীর গোড়ায় 'দ টুএল্‌ভ পাউণ্ড লুক' নামক জনপ্রিয় একাঙ্কসহ বহু একাঙ্কের রচয়িতা জেমস ব্যারি শুধু একাঙ্কের অভিনয় দিয়ে এক সন্ধ্যার নাট্যপ্রদর্শনী করবেন—এ তেমন বিস্ময়ের কথা নয়। পরে ১৯২৬-এ ব্রিটিশ ড্রামা লিগ একাঙ্কের প্রথম পরীক্ষা-মূলক উৎসবের আয়োজন করে—সেই বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় পরের বছরই প্রায় ৩০০ দল যোগ দেয়। ১৯২৭-এ স্কটিশ কমিউনিটি ড্রামা অ্যাসোসিয়েশন প্রবর্তন করে একাঙ্কের 'নক-আউট' প্রতিযোগিতার। এ থেকেই ব্রিটেনে তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত পাই আমরা। বিস্ময়ের কথা এও নয় যে জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)-এর মতো পূর্ণাঙ্গপ্রিয় নাট্যকারও একাঙ্ক রচনায় নিয়োগ করছেন নিজেকে। ১৯০৪-এ লিখেছেন 'হি হু লায়েড টু হার হাজবণ্ড', ১৯১০-এ 'দ ডার্ক লেডি অব দ সনেট্‌স', ১৯১২-তে 'ওভার-রুল্‌ড' এবং পরে আরো বেশ কিছু একাঙ্ক।

একাঙ্কে বার্নার্ড শ-এর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তাঁর চেয়ে অনেক দুর্বল কিন্তু 'ওয়েল-মেড প্লে' পন্থার নাট্যকার, আলান আলেকজাণ্ডার মিলনে (১৮৮২-১৯৫৬)। তাঁর মজাদার নাটক Wurzel-Flummery-র আগে উল্লেখ করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর কাজ করার ফাঁকে তিনি নাটক রচনা করে ফেলেন। ছোটদের নাটক Toad of the Toad Hall (1929) বেশ জনপ্রিয় হয়।

৫.

এই নিবন্ধে সমস্ত নাট্যকারের সমস্ত একাঙ্কের উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। ইয়োরোপ মহাদেশের দিকে আরেকবার চোখ ফেরালে দেখি ফ্রান্সে ফার্সের ধারার অনুবর্তন চলছে দীর্ঘকাল। এ ধরনের অজস্র ফার্স লিখেছেন জর্জে ফেদো (Feydeau, ১৮৬২-১৯২১), এবং আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪)-এর অন্তত একটি একাঙ্ক—'The Man Who Married a Dumb Wife' সারা পৃথিবীতেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে, বাংলাতেও অভিনীত হয়েছে। এই ধারায় পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাট্যকার জঁ আনুই (Jean Anouilh, ১৯১০-৮৮) যাঁর নাটকে বিষাদ ও রঙ্গ পাশাপাশি অবস্থান করে। তাঁর 'সেসিল অথবা পিতাদের শিক্ষালয়' (১৯৫১) একটি পরিচিত একাঙ্ক।

ফ্রান্সে একাঙ্ক নাটকে নতুন মাত্রার যোজনা হয় তথাকথিত 'অ্যাবসার্ড' নাট্যকারদের হাতে। তাতে ফার্সের বাইরের লক্ষণগুলি সাদরে গৃহীত হয়, কিন্তু ভিতরে জীবনের করুণ অসংগতি ও বিরোধ, এবং এঁরা যাকে 'অর্থহীনতা' বলেন তার আর্তি ফুটে ওঠে। স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬—)-এর 'গোদোর প্রতীক্ষা' (১৯৫৩) এবং 'এণ্ডগেম'—দুটিই ছোটো নাটক, তবে প্রচলিত অর্থে একাঙ্ক বলে গণ্য হবে না। কিন্তু তাঁর 'ক্রাপের শেষ টেপ' রেডিয়ো-নাট্য, 'যা কিছু পতনশীল' এবং 'এমবারস' দুটি মূকনাট্য বা 'কথারহিত নাট্যাঙ্ক', নিঃসন্দেহে একাঙ্ক। বেকেটের পর ইউজিন ইয়োনেস্কো (১৯১২—)। তাঁর 'দ লেসন' (১৯৫১), 'দ চেয়ারস' (১৯৫১), 'জাক' (১৯৫০), 'নতুন ভাড়াটে' (১৯৫৩), 'ছবি' (১৯৫৫), 'মেষপালকের বহুরূপী' (১৯৫৭) ইত্যাদি বিখ্যাত ও বহু-অভিনীত একাঙ্ক। জন্মে রুশ কিন্তু রচনায় ফরাসি আর্থার আদামব (১৯০৮—) গোটা দশেক 'তাব্‌লো' বা নাট্যদৃশ্য রচনা করেছেন। ইদানীংকার একাঙ্ক রচয়িতার মধ্যে ফের্নান্দো আরাবল (১৯৩৩-) এর 'যুদ্ধক্ষেত্রে বনভোজন' একাঙ্কটিতে স্যুররিয়ালিজম এবং 'অ্যাবসার্ড'—দুয়েরই সূত্র লক্ষ করি। ফরাসি একাঙ্ক, যতদূর মনে হয়, এখনো এই ঐতিহ্যের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

ইতালীয় নাটকের ইতিহাসে এ শতাব্দীতে প্রথমে উল্লেখ করতে হবে লুইজি পিরান্‌দেল্লো (১৮৬৭-১৯৩৬)-র নাম। এই সংশয়বদ্ধ এবং বিভ্রান্ত নাট্যকার থিয়েটার জগতে বিপ্লব এনেছিলেন পূর্ণাঙ্গ 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র' (১৯২১) রচনা করে, কিন্তু তাঁর 'দ ম্যান উইথ দ ফ্লাওয়ার ইন হিজ মাউথ' ইত্যাদি ছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক জনপ্রিয় হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে মার্কসবাদী নাট্যকার দারিয়ো ফো (১৯২৬-) তাঁর সমাজ-সমালোচনাত্মক কিন্তু অসাধারণ হাস্যরসের নাটকগুলিতে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁর 'We Can't Pay! We Won't pay' বড় নাটক, কিন্তু ফ্রাঙ্কা রামে-র সহযোগে রচিত এবং ইংরেজিতে 'Female Parts' নামে অনুবাদিত একটিমাত্র নারীচরিত্রের চারটি একাঙ্ক 'ওয়েকিং আপ', 'আ উয়োম্যান অ্যালোন', 'দ সেম ওলড স্টোরি' এবং 'মেদেয়া' অসাধারণ চারটি একাঙ্ক রচনা।

জার্মানিতে মহান্ নাটকার বেরটোল্ট ব্রেশট (১৮৯৮-১৯৫৬)-এর একাঙ্ক-গুলিকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম দলে আছে ফ্যাসিস্ট শাসনে শ্বাসরুদ্ধ জার্মানির জীবন সম্বন্ধে তাঁর 'তৃতীয় রাইশ-এর অধীনে ত্রাস

ও আতঙ্ক' শিরোনামে রচিত সাতাশ-আঠাশটি মোটামুটিভাবে বাস্তববাদী নাট্যদৃশ্য। এগুলি তিনি প্যারিসে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে 'ইহুদি বউ' 'গুপ্তচর' ইত্যাদি নাটক বাংলাতেও অভিনীত হচ্ছে। দ্বিতীয় দলে আছে 'বিধি ও ব্যতিক্রম' 'লুকুল্লুসের বিচার' জাতীয় নাটক—যেগুলিতে শোষণ ও শ্রেণীসংঘর্ষের নানা নৈতিক সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি ব্রেশ্‌টের পক্ষপাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে পড়ছে মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি, লোভ ও তথাকথিত নিরপেক্ষতাকে আক্রমণ করে লেখা কিছু একাঙ্ক—'ডানসেন', 'লোহার দর কত' এবং সিঙ্‌-এর 'রাইডার্স টু দ সী'-র ছায়ায় রচিত 'শ্রীমতী কারারের রাইফেল' ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর একাঙ্কে কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরকার আদর্শগত সংগ্রাম, পন্থার ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন ইত্যাদি বিষয়ে খানিকটা 'ড্রামাটিক লেসন' গোছের তৈরি করেছিলেন ব্রেশ্‌ট—তার মধ্যে 'ডের টাগে কম্যুনে' (১৯৪৮-৪৯) 'ডী মাসনামে' (১৯৩০) ইত্যাদি নাটক। আধুনিক পৃথিবীতে ব্রেশ্‌টের এসব একাঙ্ক নাটক এবং রাজনৈতিক দীক্ষা উভয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

৬

ব্রিটিশ ও মার্কিন একাঙ্ক-ঐতিহ্যের আলোচনা করলে দেখতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিট্‌ল থিয়েটার-এর বিস্তার, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগের প্রসার, গির্জার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণে মার্কিন দেশেই একাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বেশি। সেখানে ১৯১৪ থেকে ১৯২৫ একাঙ্কের বিশেষ সমৃদ্ধির সময়। এর মধ্যে একে একে এসে যান সুজান গ্ল্যাস্পেল, ইভলিন গ্রিনলিফ, পার্সিভ্যাল ওআইল্‌ড, অ্যালফ্রেড পার্সি ম্যাক্‌কেই, পল গ্রিন, হলব্রুক ব্লিন, জজ মিড্‌লটন প্রভৃতি। ইংল্যাণ্ডের নোএল কাওয়ার্ডের একাঙ্কের প্রযোজনা ও অভিনয় এদেশে একাঙ্কের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করে। মার্কসবাদী ভাবধারাতে দীক্ষিত নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেট্‌স (১৯০৬-১৯৬৩) 'গ্রুপ থিয়েটার' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর 'ওয়েটিং ফর লেফ্‌টি' এক অসাধারণ একাঙ্ক। ওডেট্‌সের আগে মার্কিনি 'ক্ল্যাসিক্যাল' নাট্যকার ইয়ুজিন ও'নীল (১৮৮৮-১৯৫৩) বেশ কিছু একাঙ্ক রচনা করেন। তার মধ্যে 'দ এম্‌পারার জোনস' (১৯২০), 'হোয়ার দ ক্রস ইজ মেড', 'বাই

ওয়ে অব অরবিট' (১৯৫৯) ইত্যাদি বিশিষ্ট। মার্কিনদেশের রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের নাট্যকার থর্নটন ওআইল্ডার (১৮৯৭-?) তাঁর 'দ লং ক্রিসমাস ডিনার' নামে সংকলনটিতে পাঁচটি চমৎকার একাঙ্ক গ্রথিত করেছেন। তার মধ্যে 'দ লং ক্রিসমাস ডিনার' এবং এক্সপ্রেশনিস্ট পদ্ধতিতে রচিত 'পুলম্যান কার হাইয়াওয়াথা' বিশেষভাবে মনকে টানে। তা ছাড়া 'কুইনস অব ফ্রান্স', 'লাভ, অ্যাণ্ড হাও টু কিওর ইট', 'দ হ্যাপি জার্নি টু ট্রেনটন অ্যাণ্ড কামডেন'-ও মনে রাখবার মতো নাটক। ওআইলডারের পরে সাম্প্রতিক কালের শক্তিশালী নাট্যকার এডোয়ার্ড অলবি (১৯২৮-) বিশেষভাবে একাঙ্কে আগ্রহী। 'অ্যাবসার্ড' তত্ত্বে আক্রান্ত তাঁর নাটিকা 'দ জু স্টোরি' (১৯৫০), 'দ ডেথ অব বেসি স্মিথ' (১৯৬০), 'দ স্যাণ্ডবক্স' (১৯৬০), 'ফাম অ্যাণ্ড ইয়াম' (১৯৬০) এবং 'দি অ্যামেরিকান ড্রিম' (১৯৬১) তাঁর সামর্থ্যের পরিচয় বহন করছে।

ইংল্যাণ্ডে পঞ্চাশের দশকের শেষে জন অসবোর্ন, আর্নল্ড ওয়েস্কার প্রমুখ নতুন নাট্যকারদের উদ্ভবের পর একাঙ্ক রচনা বাস্তবমুখী ও অ্যাবসার্ড—এই দুই ধারায় খানিকটা বিভাজিত হয়েছে দেখতে পাই। জন অসবোর্ন (১৯২৯-)-এর 'দ ব্লাড অব দি ব্যামবার্গজ' এবং 'আনডার প্লেন কভার', এন এফ সিম্পসন (১৯১৯)-এর একাঙ্কে রূপান্তরিত 'এ রিজাউণ্ডিং টিংক্‌ল' 'দ হোল্', 'দ ফর্ম', ব্রেণ্ডান বেহান-এর 'মুভিং আউট', হ্যারল্ড পিন্টার-এর 'দ ডাম ওয়েটার', 'দ রুম', 'দ গার্ডেন পার্টি', 'দ বিগ্ হাউজ', 'দ কেয়ারটেকার', 'দ কালেকশন', 'দ লাভার' ইত্যাদি এই দুই প্রবণতাকেই পৃথকভাবে, কখনো বা মিশ্রভাবে, চিহ্নিত করে। এ ছাড়াও দু দেশে অজস্র একাঙ্ক লিখিত হয়েছে, এবং অপেক্ষাকৃত অখ্যাত নাট্যকারদের রচিত বেশ কিছু একাঙ্ক অতিশয় সংবর্ধিত হয়েছে। বিভিন্ন রেপার্টরিতে সে সব স্থায়ী সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্গারেট মেয়োর্গা তাঁর 'দ বেস্ট শর্ট প্লেজ', ১৯৫৮-১৯৫৯ নামে সংকলনের[৯] শেষে ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত উত্তম-উত্তম একাঙ্কের একটি তালিকা করে দিয়েছেন।

৭.

সোবিয়েত রুশ ও পূর্ব ইয়োরোপের একাঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব অসম্পূর্ণ। চেখফের পর ম্যাক্সিম গোর্কি একাঙ্ক রচনা করেননি। ১৯৪৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'সোভিয়েট ওয়ান-অ্যাক্ট প্লেজ' নামক সংকলনটিতে পি. ইয়াল্‌ৎসেব, ভি. কৃবাস্‌নিৎস্কি, এ. উলিয়ানিন্‌স্কি, গ্রেগরি রম্, ওয়সেবোলোদ

ওয়েস্, ওয়াই গনচারফ প্রভৃতির এগারোটি একাঙ্ক সংকলন করা হয়েছে।[১০] প্রত্যেকটিই সুনির্বাচিত ও অভিনয়যোগ্য। মায়াকভ্স্কি এবং মিখাইল বুলগাকফ-এরও কয়েকটি চমৎকার একাঙ্ক আছে।

পোলাণ্ডে ইদানীংকালে যাঁর একাঙ্ক বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাঁর নাম স্লাবোমির ম্রোজেক। তাঁর 'পুলিশ', 'অথৈ সমুদ্রে', 'চার্লি', 'দ পার্টি', 'পিটার ওহে-র শহিদত্ব লাভ', 'সম্মোহিত রাত'—সবই চমৎকার একাঙ্ক।

জন্ম হয়েছিল ফার্সের উৎস থেকে। সেই একাঙ্ক আজ শক্তিতে ও বৈচিত্র্যে কত অসংখ্য রূপই না গ্রহণ করেছে। তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে স্বপ্ন, কবিতা, বাস্তব; তাতে আশ্রিত হচ্ছে হাসি, অশ্রু, আতঙ্ক, উৎসাহ; পৃথিবী জুড়ে একাঙ্কের শারীরিক বিস্তার ও বিভিন্নতা আজ সাধারণ পাঠক-দর্শককেও বিমূঢ় করে দেয়।

একাঙ্ক নাটকের প্রকরণ নিয়ে অনেক বাঙালি নাট্যসমালোচক নানারকম বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলেছেন। হীরেন ভট্টাচার্য একটি নিবন্ধে[১১] সে সবের অসংগতি দেখিয়ে দিয়েছেন। একাঙ্ক নাটক একটিমাত্র দৃশ্যের হবে, অনেকের এই বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা আছে। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এইরকম বলেছেন[১২]। প্রয়াত মন্মথ রায়ও দেখছি বলেছিলেন "একদৃশ্যে সম্পূর্ণ হলেও একাঙ্ক নাটকে থাকবে একটি আদ্য, একটি মধ্য এবং একটি অন্ত।"[১৩] পশ্চিমদেশের একাঙ্ক সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা থাকলে একথা বলা সম্ভব হত না। কখনও কেবল পুথিগত বিদ্যা এবং কখনও নিজেদের অতি সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার উপর দ্বিধাহীন নির্ভরতা এ ধরনের ধারণাবিপর্যয়ের জন্য দায়ী। 'অ্যাক্ট' কথাটি 'অঙ্ক'-এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ, 'দৃশ্য'-এর নয়। আর প্রাচীন আধুনিক যে-কোনো নাট্য-প্রকরণেই অঙ্ক একাধিক দৃশ্যে, কচিৎ একটি দৃশ্যে (বিশেষত আধুনিক তিন অঙ্কের নাটকগুলিতে—ইবসেনের 'আ ডল্‌জ্ হাউজ' বা আরনল্ড ওয়েস্কারেরর 'দ রুট্‌স'-এ যেমন) বিন্যস্ত হয়, কাজেই একাঙ্ক নাটক এক দৃশ্য থেকে বহু দৃশ্যের হতে কোনোই বাধা নেই। ইয়েট্সের কাব্যনাট্য 'পারগেটোরি' বড় জোড় পনেরো মিনিট চলে, আন্তন চেখফের 'তামাকুসেবনের অপকারিতা'-ও তার চেয়ে দীর্ঘ নয়। এ দুটিই এক দৃশ্যের একাঙ্ক। কিন্তু অজস্র একাঙ্ক পাই

একাধিক দৃশ্যের—যেমন গল্‌সওয়ার্দির 'দ লিট্‌ল ম্যান' তিন দৃশ্যের, জো কোরির 'হিউআর্স অফ কোল' দু-দৃশ্যের, টেনিসি উইলিয়াম্‌জ্‌-এর '২৭ ওআগন্‌জ্‌ ফুল অফ কটন' তিন দৃশ্যের একাঙ্ক, আনুই-এর 'সেসিলে' দু-দৃশ্যের। আবার ওঅল্‌ফ ম্যানকোভট্‌স্‌-এর 'দ বিস্পোকেন ওভারকোট' মোট ষোলোটি ছোট দৃশ্যে গড়া একাঙ্ক নাটক। এই দৃশ্যগুলিতে দৃশ্যপটের বদল হতেও পারে, আবার কেবল আলো নিবিয়ে জ্বালিয়ে, কিংবা কমিয়ে বাড়িয়ে সময় ও দিনরাত্রির পার্থক্য তৈরি করে, দৃশ্যান্তর বোঝানো যেতে পারে, 'সেসিলে'-তে যেমন হচ্ছে। কিংবা একই মঞ্চের মধ্যে এলাকা ভাগ করে 'জোনাল প্রেজেণ্টেশন'-এর দ্বারা দৃশ্যের সংখ্যা বাড়ানো যায়—উপরের শেষ নাটকটিতে যেমন ঘটছে। ব্যয়সাপেক্ষ বলে অনেক সময় একাঙ্কে দৃশ্যপট একটিই থাকে, কেবল ওই 'ব্ল্যাকিং-আউট'-এর দ্বারা দৃশ্যের পরিবর্তন, আসলে সময়ের পরিবর্তন, বোঝানো হয়।

একাঙ্কের অভিনয়ে কত সময় লাগবে তার হিসেব পাশ্চাত্য সমালোচকেরা মোটামুটি এইভাবে নির্দেশ করেছেন, "a few minutes or a full hour"[১৪]। ওডেট্‌সের 'ওয়েটিং ফর লেফ্‌টি' রীতিমতো দীর্ঘ একাঙ্ক। এর বেশি সুনির্দিষ্ট হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে এটাও ঠিক যে, খুব নিমেষমাত্রের হলে তা মনে খুব দ্রুত ও অস্থায়ী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, আবার খুব দীর্ঘ হলে তা দর্শকের, যে-দর্শক একাঙ্ক দেখবে বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে তার, ধৈর্যকে খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলে।

কিন্তু সময়ের এই হিসেবটাও খুব জরুরি নয়। একাধিক অঙ্কের নাটকের মধ্য থেকে একটি অঙ্ককে বিচ্ছিন্ন করে আনলেই সে নাটক একাঙ্ক হয়ে ওঠে না। বড় নাটকের সংগঠন-প্রকরণ থেকে একাঙ্ক নাটকের গঠন-প্রকল্প সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে অনাবশ্যক বিস্তারের কোনো স্থান নেই, অথচ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যেই একটি সমগ্রতা ও অখণ্ডতার অনুভব আনতে হবে। এখানেই ছোটগল্পের সঙ্গে একাঙ্কের ক্লেটন হ্যামিলটন-কৃত তুলনা[১৫] ভেঙে পড়ে। ছোটগল্প যেহেতু বর্ণনামূলক শিল্প, একং তার পুরো বিষয়টিকেই পাঠক তার কল্পনায় আবার তৈরি করে নেয়, সেহেতু ছোটগল্পের উপসংহার সাংকেতিক বা ব্যঞ্জনাগর্ভ হতে পারে, তার বর্ণনাতেও প্রচুর ব্যঞ্জনা নিহিত থাকতে পারে। পাঠক তা না বুঝতে পারলে বারবার পাতা উলটে তা পড়ে নিয়ে বোঝবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু একাঙ্ক নাটকে পাতা উলটে দেখে নেওয়ার উপায় নেই, মঞ্চে মুহূর্তে উচ্চারিত কথাগুলি ওই মুহূর্তেই দর্শককে বুঝে নিতে হবে, না

বুঝতে পারলে পরবর্তী সংলাপ এসে আবার নতুন বোঝবার সমস্যা এনে হাজির করবে। আর সংলাপে বড় নাটকের চেয়ে এতে ভাষাগত ব্যঞ্জনার ব্যবহার বেশি হওয়া সম্ভব, কারণ ব্যঞ্জনা সংক্ষিপ্তির সহায়ক, তবু একাঙ্কের উপসংহারের ব্যঞ্জনাও ছোটগল্পের মতো সবটাই ভাষা-নির্ভর হবে না,—হলেও দৃশ্যসজ্জায়, অন্য চরিত্রগুলির প্রতিক্রিয়ায়, চরিত্রটির নিজের মুখভঙ্গি ও আচরণে—তাকে অনেকটা স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ততা, সমগ্রতা অথচ বিশদতার ত্রিমুখী শর্ত একাঙ্কের উপরে বেশ খানিকটা দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। এটা ঠিক যে, বড় নাটকের যেমন পাঁচটি পর্যায়বিভাগ থাকে—opening, exposition, development, climax, ending[১৬] একাঙ্কেও তাই থাকতে হবে, কারণ দুয়ের মধ্যে নাটকীয় প্রত্যাশা ও প্রত্যাশাপূরণের ক্রমগুলি মোটামুটি একই। কিন্তু সেই কারণে প্রতিটি পর্যায় দীর্ঘ-বিলম্বিত করে একটি বিস্তারিত আখ্যাননির্মাণের অবকাশ একাঙ্ক রচয়িতার নেই, কোনো জায়গাতেই তিনি বেশিক্ষণ জিরোবার সুযোগ পান না। খুব বেশি খণ্ড-ঘটনা বা এপিসোড-ও তিনি জুড়তে পারেন না, কারণ তা দর্শককে বিক্ষিপ্ত করতে পারে। 'ওয়েটিং ফর লেফ্‌টির' গড়ন এদিক থেকে খানিকটা ছড়িয়ে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চরিত্র ও ঘটনার পরিচয় ও পটভূমি নির্মাণ শেষ করে তাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে দর্শকদের কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে হবে, পরের নাট্যিক উদ্‌ঘাটনে এবং বিবর্তনে সেই কৌতূহলে প্রায় অধীর ও অসহনীয় তীব্রতা আনতে হবে, ক্লাইম্যাক্‌সে ঘটনার চূড়ান্ত জটিলতা ঘটবে, এবং পর্যবসানে দর্শকের সমস্ত 'টেনশন'-কে শিথিল করতে হবে। ফলে একাঙ্কে প্রথম দুটি পর্যায় খুব একটা গুরুত্ব পায় না। সিডনি বক্স যে "Singleness of Purpose"-এর কথা বলেন একাঙ্কের,[১৭] তার দাবিই হল এই দ্রুততা, ভূমিকাকে সংক্ষিপ্ত অথচ অপরিহার্য স্পষ্টতা দেওয়া। শ্রীমতী কোহেনও বলেন এক "Singleness of impression"-এর কথা[১৮]। একজন দেখছেন রচয়িতার দিক থেকে, আরেকজন দেখছেন দর্শকের দিক থেকে। এ দুয়ের মিলন ঘটে কখন? যখন নাট্যকারের উপলব্ধ আখ্যানভিত্তি (থিম), কিংবা দেখা কোনো তীব্র চরিত্র, কিংবা কোনো স্মরণযোগ্য ঘটনা, কিংবা একটি আবহ-সংকেত—অল্প কয়েকটি চরিত্র, অপল্লবিত স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত সংলাপ, ও নির্বাচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি আবেদনময় রূপ অর্জন করে। কোথাও অবান্তর কিছু চলবে না—প্রতিটি সংলাপ আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, প্রত্যেকটি ঘটনা, ও চরিত্রগুলির একক ও

যৌথ আচরণ নাটকের পক্ষে অপরিহার্য হবে। তার অর্থ এই নয় যে, সব একাঙ্ককেই well-made একাঙ্কের ধরনে এক দৃশ্যের হতে হবে। স্যামুয়েল মুন তাঁর সংকলনের ভূমিকায় আমাদের দেখিয়ে দেন, 'মিস জুলি'-তে ঘটনার দুটি পর্যায় থাকলেও স্ট্রিণ্ডবার্গ মাঝখানে বিরতির প্রশ্রয় দেননি। আর্থার মিলার তাঁর 'আ মেমোরি অফ টু মানডে'জ-'এ কেবল একটি গীতিময় অনুচ্ছেদ দিয়ে ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে জুড়েছেন, এবং 'সেসিলে' নাটকে আনুই-এর দুটি দৃশ্যের দুটি আলাদা ক্লাইম্যাক্স আছে—এমনও বলা সম্ভব।[১৯]

অর্থাৎ মূলে একটি "unity and economy"-র কঠোর শর্ত থাকলেও একাঙ্কে তারই মধ্যে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার অজস্র সুযোগ আছে। কিন্তু তার মূল নীতিগুলি এই, নাটকের ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলবে—শ্রীমতী কোহেন চমৎকারভাবে 'ম্যাকবেথ' নাটকের এই সংলাপটি তুলেছেন "Twere well it were done quickly."[২০]—ফলে চরিত্রের আচরণে, হাবেভাবে থাকবে না কোনো অবান্তর, প্রসঙ্গহীন বিস্তার; তার সংলাপ হবে কেবল উপযোগী ও প্রসঙ্গবদ্ধ; কোনো অবান্তর ঘটনা এসে মূল ঘটনাক্রমকে বিক্ষুব্ধ বা বিচ্যুত করবে না। প্রায় সমস্ত তাত্ত্বিকই ওই "economy of means" এবং দ্রুতধাবিত পরিণামমুখিতার কথা বলেন একাঙ্কের ক্ষেত্রে। কিন্তু এও ঠিক যে, একাঙ্ক নিয়ম মেনেই প্রচুর নিয়ম ভাঙে, তার ফলেই তা একটি জীবন্ত রূপ হয়ে থাকে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্র. Sakanishi, Shio অনুবাদিত জাপানি কিয়োগেন সংকলন, *The Ink-Smeared Lady and other Kyogen*, 1960 Charles E. Tuttle Company, Rutland, Vermont & Tokyo, pp. 8-9.

২. Keith, A. Berriedale, *The Sanskrit Drama*, 1924, Oxford University Press, London, p. 96.

৩. Levi, Sylvan, *The Theatre of India*, 1978, Writers' Workshop, Calcutta, pp. 119-131.

৪. যদিও বড় নাটক থেকে বর্জন ও সংক্ষেপীকরণের সাহায্যে ইদানীংকালে বেশ কিছু একাঙ্কের জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে খুব স্মরণীয় উদাহরণ আর্থার মিলনে-র Wurzel-Flummery। আবার এর উলটো উদাহরণও আছে—একাঙ্ক 'জবানবন্দী' থেকে চার অঙ্কের পনেরো দৃশ্যের 'নবান্ন'।

৫. ১৯৬৯-তেও সংকলনে 'শর্ট প্লে' কথাটির ব্যবহার দেখি—যেমন *The Best Short Plays of 1969*, New York, Avon Books, edited by Stanley Richard.

৬. এখনও ওদেশে সন্ধেবেলার মূল অভিনয় শুরু হয় আটটা নাগাদ। দর্শকেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে সেজেগুজে থিয়েটারে এসে বসে।

৭. Ernest Blythe লিখিত *The Abbey Theatre* (1963 ?), The National Theatre Society Ltd., Dublin দ্রষ্টব্য।

৮. দ্রষ্টব্য, Cohen, Helen Louise (ed.), *One-Act Plays by Modern Authors*, 1923, New York, Harcourt, Brace and Company, p. xxiv.

৯. বস্টন-এর বীকন প্রেস প্রকাশিত, ১৯৫৯।

১০. হারবার্ট মার্শাল-এর নির্বাচনে এ বইটি The Pilot Press থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

১১. "একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা বিচার" প্রবন্ধ দ্র. ড. সরোজমোহন মিত্র সম্পাদিত (১৯৮৪) 'একাঙ্ক নাটকের রূপরেখা', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২৪-৩৪ পৃ.

১২. তদেব, ২৫ পৃ.

১৩. "একাঙ্কিকা", ড. সরোজমোহন মিত্র সম্পাদিত উপরিউক্ত সংকলনে গ্রথিত (৪-৬), ৫-৬ পৃ দ্র.

১৪. দ্র. Wilde, Percival, 1939, "The Construction of the One-Act Play", উইলিয়াম কোজলেক্কো সম্পাদিত (1939), *The One-Act Play Today*, London etc., George Harrap & Co. Ltd., pp. 17-32, দ্র. p. 20.

১৫. ক্লেটন হ্যামিলটনের এই মন্তব্য তুলেছেন হেলেন লুইজ কোহেন, তাঁর ভূমিকায়। ৮ সংখ্যক পাদটীকার উল্লেখ, xiv পৃ.

১৬. সিডনি বক্স কোজ্‌লেঙ্কো-সম্পাদিত পূর্বোক্ত সংকলনে (১৪ পাদটীকা দ্র.) "The Technique of the Experimental One-Act Play" নিবন্ধে (51-72) 57 পৃষ্ঠায় এই পর্যায়গুলির উল্লেখ করেছেন। তাঁর আগে এডুইন ভ্যান বি নিকারবোকার সম্পাদিত *Short Play* সংকলনে (1939, New York, Henry Holt and Company) এগুলির আলোচনাও পাই (14-21 পৃ.)

১৭. ১৬. পাদটীকার উল্লেখ, 57 পৃ.

১৮. দ্র. ৮ পাদটীকার সূত্র, xvi. পৃ.

১৯. স্যামুয়েল মুন সম্পাদিত (1961), *One Act*, নিউ ইয়র্ক, গ্রোভ প্রেস, ix পৃ.

২০. ৮ পাদটীকার সূত্র, xvi পৃ.

রবীন্দ্রনাথ

নাটকীয় : রবীন্দ্রভাবনা

"ফাল্গুনীটা গদ্য নাটক, ডাকঘরেরই সমজাতীয় এই কারণে ওটা কাব্যসংগ্রহে স্থান পাবার অযোগ্য, ..." —অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি, 'চিঠিপত্র' ১১, বিশ্বভারতী, ১৭৫ পৃ.

১

কী নাটক, আর কী নাটক নয়—রবীন্দ্রনাথের কবি ও নাট্যকার জীবনের নানা পর্যায়ে তিনি এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষত নাট্যকার জীবনের প্রথম দিকে এ প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁর একটু অতি-সচেতনতার পরিচয়ই লক্ষ করি যেন আমরা। তাঁর এই আলোচনা, মন্তব্য ও ইঙ্গিতগুলি বিচার করলে বুঝতে পারি —এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অভিনয় বা রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে শম্ভু মিত্র যাকে 'নাট্য' বলেন তার দিক থেকে নয়, নেহাতই রচনার সংরূপ বা genre-এর দিক থেকে। এই সিদ্ধান্ত নেবার কারণটিও আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। প্রথমদিকে কবিতার আকারেও এমন কিছু রচনা লিখেছেন তিনি যেগুলিতে সংলাপ আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ গেঁথেই রচিত হয়েছে কোনো কাব্য-উপাখ্যান। সেক্ষেত্রে সাধারণ বোধের কোনো পাঠক যদি আপাতদৃষ্টে সেটিকে নাটক বলে ধরে নেয় তাতে এক ধরনের ধারণাগত বিপর্যয় ঘটবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা বা ওই জাতীয় কিছুতে সাবধান করে দেন পাঠককে যে, রচনাটি নাটক নয়, অন্য কিছু। যেমন ঘটেছে 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১)-এর ক্ষেত্রে। এ বইয়ের নাম পত্রে শুধু 'গীতি-কাব্য' কথাটিকে নাম ও লেখকের নামের মধ্যিখানে বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করে তিনি নিশ্চিন্ত হননি, পরপৃষ্ঠায়[১] ভূমিকাতে সতর্ক করে দিয়েছেন, "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন।" এবং তার পর নাটক জিনিসটা কী তাকে "দৃষ্টান্ত" বা রূপকের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যতদূর মনে হয় নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম তাত্ত্বিক উচ্চারণ এটিই।

নাটক সম্বন্ধে এই যে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি, তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়াও সে সবের প্রধান উৎস ওই গ্রন্থারম্ভের "ভূমিকা" বা ওই জাতীয় অংশ। এগুলিকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে ফেলে দেখা চলে। প্রথমত,

গ্রন্থরচনা বা প্রকাশকালে লেখা পাঠক-সম্ভাষণ; দ্বিতীয়ত পরে জুড়ে দেওয়া পাঠক-সম্ভাষণ, যেমন রবীন্দ্র রচনাবলীর বিশ্বভারতী সংস্করণ প্রকাশের সময় (১৯৩৯) রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও নাটকের বইগুলির আরম্ভে একটি করে "সূচনা" যোগ করছিলেন, সেগুলির ক্ষেত্রে "ভূমিকা" বা "বিজ্ঞাপন" কথাগুলি ব্যবহার করেননি। এ ছাড়া গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপদান, পুরনো নাটকের সংশোধন ও পরিমার্জন —এ সবের মধ্য দিয়ে, অন্তত পরোক্ষভাবে, নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি ধারণা নিশ্চয়ই আভাসিত হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর উক্তি ও আচরণের ভিতর থেকে তাঁর সেই নাটকীয়তার বোধটির বিভিন্ন মাত্রা লক্ষ করব। তাঁর মঞ্চসজ্জা বা দৃশ্যপট, অ্যারিস্টটল যাকে বলেছেন 'অপ্‌সিস'—তার বিষয়ে মন্তব্যগুলি নেহাৎ পার্শ্বিকভাবেই লক্ষ করব, কারণ সেগুলি নাটকের টেক্সট্ নির্মাণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। আমরা যে কথাগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করছি সেগুলি নাটকের লিখিত রূপের এবং সংগঠনের বিষয়ে। অর্থাৎ একটি নাটক লিখতে হলে কী কী নীতি-নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ মেনে চলতেন, নাটক-রচনার কোন্ বিশেষ মডেল তাঁর কাছে গ্রাহ্য ছিল তার অনুধাবন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। মঞ্চায়নের কথা এখনই উঠছে না।

২.

'ভগ্নহৃদয়'-এর "ভূমিকা"টিই লক্ষ করা যাক। আগেই বলেছি, এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি সাঙ্গ রূপক বা মেটাফর প্রয়োগ করে নাটকের লক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, বলেছেন—"নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, যতক্ষণ পর্যন্ত "ফুল," "মূল" "কাণ্ড" "শাখা", "পত্র", "কাঁটা"—এই কটি মেটাফরের মূল অভিপ্রেত অর্থ আমরা পরিষ্কার না বুঝতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত নাটক বিষয়টি আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠছে না। রবীন্দ্রনাথ যে এখানে আমাদের খুব একটা সহায়তা করছেন তা নয়। "ফুল"—এই রূপকটির অর্থ হয় তো খানিকটা ধরতে পারছি, মূলত তা কবিতা বা আবেগের ছন্দ-লালিত্যপূর্ণ ও সালংকার উচ্চারণ। কিন্তু "মূল" কী? "কাণ্ড" কি জীবনের বাস্তব ভিত্তি, "শাখা" কি আখ্যানের বহুধা বিস্তার, "পত্র" কি সংলাপ, "কাঁটা" কি দ্বন্দ্ব? রবীন্দ্রনাথ ফর্ম বা কন্‌টেন্‌ট—কোন্ দিক থেকে কোন্ রূপকের আশ্রয়

নিচ্ছেন তাও যেন স্পষ্ট নয়, শুধু এটুকুই বোঝা যায় যে, কাব্যকে তিনি নাটকের একটা নির্বাচিত অংশ মনে করেন, অর্থাৎ কবিতার তুলনায় নাটক একটি ব্যাপ্ততর ধারণা। কাব্য নাটকের একটি অংশ বা উপাদান হতে পারে, সম্পূর্ণ নাটক কখনোই হতে পারে না।

নাটক যে মূলত দেখানোর শিল্প বা দৃশ্যকাব্য—বাংলা সাহিত্য বা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিকদের কাছে এ ধারণা অস্বীকৃত হলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে তা আদৌ অস্পষ্ট ছিল না। "রঙ্গমঞ্চ" নিবন্ধটিতে[২] এই দৃশ্যত্বের বৈশিষ্ট্য, সম্ভাবনা ও সীমার কথা তিনি অতিশয় বিশদভাবে বলেছেন। 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) নাটিকাটির "উপহার" পত্রে "ভাই জ্যোতিদাদা" কেও বলেছেন,

আগ্রহে অধীর হয়ে ক্ষুদ্র উপহার লয়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।

"দেখাতে পারিলে" লেখকের "সকল আশ" পূর্ণ হত, এতে বুঝতে পারি নাটকের মূল জায়গাটা কী সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন। কিন্তু লিখিত নাটকের রূপকর্ম বিষয়ে এ আলোচনায় এ ধারণা ততটা প্রাসঙ্গিক নয়।

সে বিষয়ে বরং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ 'বিসর্জন'-(১৮৯০) এর উৎসর্গ অংশ —সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধে রচিত দীর্ঘ কবিতা, যাতে এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে ক্রিটিকদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনুমান করা হচ্ছে—

কেহ বলে, "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।"

বলাই বাহুল্য, এ কথাগুলি কল্পিত "ক্রিটিক"দের, রবীন্দ্রনাথের নয়। কিন্তু এই অনুমানের মধ্যে তাঁর নিজের অর্থাৎ পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ লিরিক কবির—নাটক রচনা বিষয়ে একটু দ্বিধা বা হীনমন্যতারও পরিচয় পাই না কি? নিজের লিরিক-প্রবণতার বিষয়ে তিনি প্রথমাবধি অতি-সচেতন ছিলেন, পরে 'ক্ষণিকা'র (১৯০০) "মহাকাব্য" কবিতায় এ নিয়ে মজা করে লিখেছেনও এমন পঙ্‌ক্তি যে, "আমি নাবব মহাকাব্য/সংরচনে/ছিল মনে ;/ ঠেকল যখন তোমার কাঁকন/কিঙ্কিণীতে/ কল্পনাটি গেল ফাটি/ হাজার গীতে।" মহাকাব্য রচনার চেষ্টা তিনি করেননি, 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামক বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যকে[৩] বিস্মরণে বিলুপ্ত করে যা রক্ষা করেছেন তা 'রুদ্রচণ্ড' নামে ওই আখ্যানেরই একটি নাট্যরূপ—এ থেকেও বোঝা যায় নাটক রচনা সম্বন্ধে তাঁর আকাঙ্ক্ষা মহাকাব্য বিষয়ক আকাঙ্ক্ষার

চেয়ে অনেক তীব্রতর ছিল। অবশ্য এ অনুমানের জন্য প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না—মহাকাব্য লেখেননি, আর নানা প্রকরণের খান চল্লিশ নাটক লিখে অভিনয় করে ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক চিত্রশিল্পীর মতো প্রথম আধুনিক নাট্যকার এবং মঞ্চনির্দেশকও হয়ে উঠেছেন, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে ?

মহাকাব্যের কাছে না হোক, শুধু কবিতার কাছে তাঁর আনন্দিত আত্ম-সমর্পণের কথা কতবার কতভাবেই না বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছিন্নপত্রাবলী'-র (১৮৮৫-৯৫) একটি চিঠিতে যদিও বলছেন, "মিউজদের মধ্যে আমি কোনো-টিকেই নিরাশ করতে চাইনে," এবং—"আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে।"[৪]—তবু আরেকটি চিঠিতেই ভিতরকার খবরটা দেন আমাদের—"সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান···আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"[৫] তাই কি আরেকটি চিঠিতে খবর পাই যে, কবিতার তাগিদের কাছে নাটককে জায়গা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে—"এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা-আপনি এসে পড়ছে বলে আর নাটকে হাত দিতে পারছি নে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকালে ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে—অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।"[৬]

কিন্তু তাঁর কবিতা কি তাঁর নাটককে কেবল সময়ের দিক থেকে প্রতিহত করছে, নাটকের জন্য আলাদা একটি ঋতু নির্দেশ করে দিচ্ছে মাত্র ? প্রকরণের দিক থেকে নাটকের সঙ্গে তার কোনো দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না ? রবীন্দ্রনাথ নিজে তো মনে হয় এই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তাঁর জীবনের একটি পর্বে অতিমাত্রায় সচেতন। মনে পড়ছে 'রাজা ও রানী' (১৮৯১) থেকে 'তপতী' রূপান্তর তৈরি করার প্রসঙ্গ মনে করে পরবর্তীকালে 'রচনাবলী'তে 'রাজা' ও রানী'র আরম্ভে যোগ-করা "সূচনা" (১৯৩৯)-য় তাঁর কথা—"একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক—রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে

লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা ও কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়েছে বিশ্বঘাতী।"[৭] এ সব কথা থেকে তাঁর নিজের কবি ও নাট্যকার সত্তার পারস্পরিক প্রভাব ও আদান-প্রদান সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতা লক্ষ করি, এবং এ পর্যন্ত, অর্থাৎ জীবনের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, যেন তিনি কবিতা ও নাটকের মধ্যে, বিশেষত গীতিকবিতা ও নাটকের মধ্যে একটি তাত্ত্বিক ব্যবধান বজায় রাখতে চান। ইলা ও কুমারের যে-কাহিনী 'মায়ার খেলা'-র কোনো একটি জুটিরই সম্প্রসারণ বা বিকল্প বলে মনে হয়, তার প্রতি এইজন্যই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এত বিরাগ।

আপাতদৃষ্টিতে ১৯২৯-এর এই সিদ্ধান্ত আমাদের বিমূঢ় করে, কারণ আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিরিক ও 'নাটক'-এর—অর্থাৎ তিনি যাকে নাটক বলে মনে করতেন তার—দ্বন্দ্ব একভাবে সমাধান করেছেন, 'শারদোৎসব' (১৯০৮) থেকে তাঁর নাটকগুলি হয়ে উঠেছে এক ধরনের গীতিকবিতা। গীতিকবিতার চেয়ে সংগঠনে অনেক বৃহৎ ও জটিল, প্রতীক এবং সজীব ও অজীব রূপকের নির্মাণে, আখ্যানের শাখাপ্রশাখায়িত বিস্তারে সেগুলি নাটক হয়েও মৌল ধর্মে গীতিকবিতাই থেকে গেছে। 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২) 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) ইত্যাদি যাবতীয় নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে-দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করেছেন তার মধ্যে গীতিকবির আবেগ-সংবেদ এবং নাট্যকারের বিরোধ-সন্ধান দুইই মিলিত হয়েছে; বস্তুতপক্ষে গীতিপ্রতিভা এবং নাট্যপ্রতিভার মধ্যে যে কোনো গভীর দ্বন্দ্ব নেই রবীন্দ্রনাথের এই সব নাটকই এক হিসাবে তার উজ্জ্বল প্রমাণ তুলে ধরে। ধরা যাক 'রাজা' নাটকের এই অংশটি—

সুরঙ্গমা। ওই যে মা, একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া।

সুরঙ্গমা। ওইযে গন্ধ পাচ্ছ না?

সুদর্শনা। না, কই, গন্ধ পাচ্ছিনে তো।

সুরঙ্গমা। বড়ো দরজটা খুলেছে—তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস।

সুরঙ্গমা। কী জানি মা। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কি না, তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে—আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তাহলে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা। হবে মা, হবে। তুমি 'দেখব' 'দেখব' করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে। রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী, সেইজন্যেই এত সহজ হল। আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন, 'সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো, এই তোমার কাজ' তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম—আমি মনে মনেও বলিনি, 'যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও।' তাই যে কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না।[৮]

এই অংশে যে-নাটক তৈরি হয়েছে তা মূলত গীতময় ভাবসংঘাতের এবং সেই ভাব গীতিকবিতার যোগ্য। 'রাজা' নাটকে বহির্ঘটনার সংঘাতও আছে, যেমন আছে এ ধরনের অন্য সব নাটকেই, কিন্তু তার মূল ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের ওই ব্যক্তিগত সংজ্ঞা—যা মূলত কবিতার উচ্চারণ লাভ করে।

৩.

তাহলে রবীন্দ্রনাথ কেন বলছেন লিরিক ও ড্রামাটিক দুটি আলাদা ধারণা, অন্তত লিরিক ড্রামাটিককে ব্যাহত করে? এর একটি উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে তাঁর অবলম্বিত প্রাথমিক নাট্যাদর্শে, যা মূলত শেক্‌সপীরীয়, এবং যে নাট্যাদর্শ তিনি 'শারদোৎসব'-এর পর বর্জন করলেন বলা চলে। 'মালিনী' নাটকের (১৮৯৬) ওই "সূচনা" (১৯৩৯) অংশে তিনি ইংলণ্ডের সমাজ-ইতিহাসকার চার্লস ট্রেভেলিয়ান 'মালিনী'তে "গ্রীক নাট্যাকলার প্রতিরূপ দেখেছেন" বলে উল্লেখ করে বলেন যে, "তার অর্থ কী আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, কারণ যদিও

কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি, তবু গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।"[৯]

আমরা জানি, 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) থেকে 'মালিনী' (১৮৯৬) পর্যন্ত সচেতন না হোক, অচেতনভাবে শেক্‌সপিরীয় নাট্যাদর্শ রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। তা ছাড়া কমেডিগুলিতে গীতিকবিতার স্পর্শদোষ থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছিলেন তিনি। তাহলে ওই শেক্‌সপিরীয় নাট্যাদর্শই কি তাঁর মধ্যে জীবনের শেষ পর্যন্ত এই ধারণা বাঁচিয়ে রেখেছিল যে লিরিক ও ড্রামাটিক দুই ভিন্ন বস্তু? অথচ লিরিক উচ্ছ্বাস ও উচ্ছ্বাসের সংঘাতে বা পাশাপাশি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক উপস্থাপনায় যে অন্য এক ধরনের নাটক তৈরি হয় তারও স্রষ্টা তো তিনিই। তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে এই অন্য ধরনের নাটকীয়তা নির্মাণ করেছেন তিনি। 'রাজা'-র গদ্য উদাহরণ আমরা আগেই তার দৃষ্টান্তে দেখেছি। তার পাশে এই গান বা কবিতার নাটকও কম উল্লেখযোগ্য নয়—

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ?

অর্জুন। আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা। শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী। সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা ব্রত ভঙ্গ করি! হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ!

অর্জুন। তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা। ধিক্, পার্থ, ধিক্। কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি, কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে হতেছ বিস্মৃত। মুহূর্তেকে সত্যভঙ্গ করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা, মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারিনু জানিতে মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

অর্জুন। খ্যাতি মিথ্যা। বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোর সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য তুমি—

এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি বিশ্রামরূপিণী।[১০]

এই নাটকীয়তা যাকে প্রচলিত শেক্‌সপিরীয় নাট্যাদর্শ হিসেবে জানি তার কাছাকাছি নয়, তবু এ অন্য এক ধরনের গীতিময় নাটকীয়তা, এ দিয়ে নাটক তৈরি করা অসম্ভব নয়। শেক্‌সপিয়রেও বহুক্ষেত্রে এ ধরনের উচ্চাঙ্গের কাব্যময় নাটকীয়তার প্রকাশ আছে, শেক্‌সপিয়রের মহত্ত্বই সেইখানে। তবে কেন রবীন্দ্রনাথ গীতোচ্ছ্বাস আর নাটকীয়তায় এই দ্বন্দ্ব কল্পনা করে নিলেন?

তবে কি গাছ যেমন করে সহজে ডালপালা বিস্তার করে ফুল ফোটায়, সেখানে ফুল আর কাণ্ডের মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হয় না, যে যার স্থান এবং বিকাশের মধ্যে সংগতি লাভ করে—সেই ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য বিষয়েই ছিল রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাবনা? কাণ্ড থেকে বিস্তারিত হয় শাখা, শাখা থেকে নির্গত হয় পাতা আর ফুল, সেই সহজ বিবর্তনের (transition-এর) ছন্দটি ভ্রষ্ট হয় বলেই কি তাঁর সংশয়? 'রাজা ও রানী'-তে পরিমাণ ও সংস্থানে ওই ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে বলেই তিনি অনুতপ্ত? আমাদের মনে হয়, এখানেই তাঁর লিরিক-ড্রামাটিক দ্বন্দ্বের মূল রহস্যটি কোথাও লুকিয়ে আছে। 'তপতী'র (১৯২৯) ভূমিকায়[১১] রবীন্দ্রনাথ যাকে "বাস্তবসত্য" এবং "ভাবসত্য" বলেন—এ দুয়ের সংযোগ সংস্থাপন এবং এক ও অন্যের ভূমিকা নির্দেশের যে অসামান্য সামঞ্জস্যবিধান করে গেছেন শেক্‌সপিয়র—তা থেকে বিচ্যুতির আশঙ্কাই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে আজীবন পীড়িত করেছে।

৪.

রবীন্দ্রনাথ নাটকের ওই তথাকথিত শেক্‌সপিরীয় আদল ছেড়ে যখন কবিতা, গান বা নৃত্যের সমন্বয়ে, কখনো বা গদ্যে কিন্তু গীতিকবির মূল ভিত্তি থেকে বিচ্যুত না হয়ে, নতুন নাটক তৈরি করতে লাগলেন, তখন প্রায়ই তাঁকে নাটক কথাটির প্রয়োগে একটি দ্বিধা করতে দেখি। 'অচলায়তন'-এর উৎসর্গপত্রে ও বইটিকে "নাটক"—বলে উল্লেখ করা আছে, কিন্তু 'ফাল্গুনী' (১৯১৬)-কে বলা হচ্ছে "নাট্যকাব্য", "উৎসর্গ" ও পাত্রগণের তালিকার শেষে উভয়ত্র। 'রাজা' ও 'অরূপরতন'ও "নাটক"। 'অরূপরতন'-কে অধিকন্তু বলছেন "নাট্য-রূপক"। 'রক্তকরবী' "নাটক" এবং "পালা"। অন্যত্র অবশ্য তিনি বলেন কীর্তনের "পালাগানের রূপটি নাট্যরূপ।"[১২] তবু গদ্যনাটক সম্বন্ধে নাটক কথাটির প্রয়োগ বারবারই হয়েছে, কিন্তু গীতিবহুল ভাবসত্যমূলক নাটকে বা কাব্যনাটকে তাঁকে

অন্য পরিভাষা প্রয়োগ করতে দেখি। যেমন 'চিত্রাঙ্গদা'-র উৎসর্গে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাটককে বলছেন "কাব্য"[১৩]। প্রথমদিককার এসব নাটক প্রসঙ্গে "নাট্য" বা "নাটিকা" কথাগুলি যদি বা ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ, শেষ দিককার, গীতিময় ভাবসত্যমূলক নাটকে "পালা" কথাটি বারবার ব্যবহার করতে দেখি তাঁকে। যেমন 'বসন্ত'-(১৯২৩)-তে—

রাজা।…আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।[১৪]

'শেষ বর্ষণ' (১৯৩৪ ?)-এ—

রাজা।…নটরাজ, তোমার পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।[১৫]

'নটরাজ' ঋতুরঙ্গশালা'য় (১৯২৭) রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত পরিচায়িকাতেও আছে "নটরাজ পালাগানের এই মর্ম্ম।"[১৬]

অর্থাৎ বস্তুসত্য হোক, ভাবসত্য হোক, কিছুটা দ্বন্দ্বময় গদ্যনাটক প্রসঙ্গে "নাটক" কথাটা ব্যবহারে তাঁর দ্বিধা না থাকলেও গীতিমুখর ঋতুনাট্যগুলির ক্ষেত্রে তিনি "পালাগান" কথাটিই ব্যবহার করেছেন সাধারণভাবে, যদিও সেগুলিতে অংশত গদ্য সংলাপও উপস্থিত, কিন্তু গদ্য-সংলাপ পালাগুলির ফ্রেমের মতো, মূল বস্তুর আশ্রয় নয়।

৫.

নাটক বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝেছেন সে সম্বন্ধে সবচেয়ে স্পষ্ট নির্দেশ আমরা সম্ভবত পাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪)-এর "সূচনা" (১৯৩৯)[১৭] থেকে। এই জায়গায় রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)-র উল্লেখ করেছেন। বস্তুতপক্ষে 'ছবি ও গান' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের মধ্য থেকেই তাঁর ইঙ্গিতটি আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। আত্মহৃদয়বদ্ধ ভাবুকতা থেকে 'ছবি ও গান'-এ তিনি বাইরের ছবি,—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে হোক, কল্পনা থেকে হোক—এঁকেছেন এ কাব্যের কবিতাগুলিতে। "লেখনীর সেই…বহির্মুখী প্রবৃত্তি" "ভাবুকতার অস্পষ্টতার" বন্ধন অস্বীকার করে "কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে" চলেছে। অর্থাৎ তাঁর কল্পনা 'ছবি ও গান' থেকে এক ধরনের objectification-এ নিরত হয়েছে, বা এলিয়টীয় ভাষায় objective correlative সৃষ্টি করেছে। 'ছবি ও গান'-এর "সূচনা"-তেও (১৯৩৯) তিনি বলেছেন, "ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে।"[১৮]

তাহলে নাটকের একটা উপাদান এই (কাল্পনিক বা কল্পনাজাত) প্রত্যক্ষতা। আরেকটা উপাদান কি সংলাপ বা উক্তিপ্রত্যুক্তি—গানে হোক, কবিতায় হোক, গদ্যে হোক,? 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র "উপকরণ কিন্তু গান নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না"[১৯]—এমন সুনির্দিষ্ট কথা যে তিনি বলছেন এখানে তা কি ওই অর্থ থেকে? এ নাটকে তাঁর কল্পনা বাল্মীকির কবিত্বলাভের উপাখ্যানকে যথাসম্ভব আত্ম-নির্লিপ্ত বস্তুময় রূপ দিয়েছে বলে?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে আসছি আমরা, যখন তিনি বলছেন "হেদে গো নন্দরাণী" গানটির কথা। এ গানটিকে তিনি বলছেন "নাট্যীয়", কারণ তা "আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত।" "রূপায়িত" এই কথাটি আক্ষরিক অর্থেই অর্থাৎ ওই objectified অর্থেই ধরতে হবে নিশ্চয়। এই গানটি তাঁর মতে "একটি ছবি, যার রস নাট্যরস।"[২০]

সবশেষে আসছেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কথায়। বলছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।" কিন্তু কোথায় আছে এর কাব্য, আর কোথায়ই বা আছে এর নাটক? আমরা 'সূচনা'র কথাগুলি স্পষ্ট ভাগ করে সাজাচ্ছি :

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ কবিতার অংশ : "সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশিত হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা।"

প্র-প্র নাটকের নাট্যীয় অংশ : "এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে।"

তাহলে শুধু "রূপ" নয়, রূপ ও অরূপ বা "অনির্বচনীয়ের" মধ্যে যে বৈপরীত্য—সেখানেই আছে নাটকীয়তা। Contrast-এই নাটকীয়তা। বৈপরীত্য মহৎ ও তুচ্ছের মধ্যে, মন্ময় ও তন্ময়ের মধ্যে, ব্যক্তিগত ও বস্তুগত অভিজ্ঞতার মধ্যে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে ওই দুটি বিপরীত সাহিত্যবস্তু—কাব্য ও নাটক—"মিলিত" হয়েছে, কিন্তু 'রাজা ও রানী'তে হয়নি। 'রাজা ও রানী'তে "নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি।" "প্লাবন", "জলাভূমি" "উপসর্গ" "শোচনীয়রূপে অসংগত"—এইসব কথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় কবিতা ও নাটকের মধ্যে ভারসমতার যে অভাব ঘটেছে 'রাজা ও রানী'তে, তারই ইঙ্গিত করছেন।

এই রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ উপলক্ষ্যেই লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা'র "সূচনা" ও[২১] মূল্যবান। এ নাটককে তিনি বলেছেন গানের সূত্রে গাঁথা একটি "নাট্যকথা"। এর নাটকীয়তা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান থেকে জানতে পারি "দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে" তার অন্তর্গূঢ় করুণা উচ্ছ্বসিত হওয়ার মধ্যেই আছে দ্বন্দ্ব, (বা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর ওই বৈপরীত্য), "ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে"—তাতেই "একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল"। এখানেই তৈরি হল নাটক। 'মায়ার খেলা' প্রসঙ্গেও এখানেই তিনি বলেছেন, তাতে "গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপন স্বভাবকে জানতেই পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।" 'জীবনস্মৃতি'তে এ সম্বন্ধে বলেছেন, "ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।"[২২]

তাহলে অন্তত 'মায়ার খেলা', 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এই তিনটি রচনায় ব্যক্তির নিজস্ব কেন্দ্রে তিনি কবিতার উৎস দেখেছেন, অন্যদিকে নাটকের উৎস দেখেছেন হয় ব্যক্তির নিজের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্বে, না হয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মতো একলা ও অনেকের দ্বন্দ্বে বা বৈপরীত্যে। সেই সঙ্গে আছে কল্পনার আত্মবিবিক্তি objectification, অন্যাশ্রিত রূপের সৃষ্টি। এর সমর্থন পাই অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে—"ছন্দে বন্ধে বাঁধা ভাষায় খামকা মানুষ যে কবিতা লেখে যার মধ্যে অপ্রাকৃত এবং অসংগতও অসংকোচে স্থান পায় সেই খেলাকে কী বলবে? এই খেলাকে খুশির খেলা করতে চাই তার মধ্যে সুন্দরের রস দিয়ে তাকে কারুশিল্পে মনোলোভন করে। এই হোলো যাকে বলে লিরিক। এদিক হোলো আশ্চর্যকে নিয়ে খেলা করা। আর নাট্য হোলো কাল্পনিক ঘটনাবলীকে এমন করে গেঁথে তোলা যাতে সে আমাদের মনে যাথার্থিকের আবির্ভাব আনে।"[২৩] কিন্তু নাটকে গানের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি প্রাচ্যপন্থী। শিশিরকুমার ভাদুড়ী "কোনো শোকাবহ অতি গম্ভীর নাটকের জন্য তাঁর কাছে গান ফরমাশ" করায় তিনি বলেন, "কোনো বিলাতী নাট্যেশ্বর এমন প্রস্তাব মুখে আনতেন না, মনে করতেন এটা নাট্যকলার মাঝখানে একটা অভ্যুৎপাত। এখানকার ইংরেজি পোড়োরাও হয়তো এ রকম অনিয়মে তর্জনী তুলবেন। আমি তা করিনে, আমি বলি আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে।"[২৪]

তাহলে এই দাঁড়ায় যে, কোনো-কোনো নাটকের ক্ষেত্রে গীতিকবিতা ও নাটকের যে বিষমতা ও অনুপাতভঙ্গের জন্য অনুশোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তা রচনার ক্ষেত্রে খুব বড় সমস্যা নয়। দুয়ের স্থানিক সংগতি ও সৌহার্দ্য ঘটতে পারে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই সমস্যাটা সম্বন্ধে তিনি যত সচেতন তার সমাধানের সূত্রও তিনি খুঁজছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই তাঁর বহুমাত্রিক নাট্যরচনায় কবিতা ও নাট্যের যথাস্থানে যথাযোগ্য ভূমিকা দিয়ে অন্য এক নাটক গড়ে তুলেছেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ৯৪ পৃঃ
২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ৭৪৩-৪৬।
৩. 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৬৬ পত্র, দ্রষ্টব্য (২০ অক্টোবর, ১৮৯৪)।
৪. পত্রসংখ্যা ১০৭, ১৭ই জুলাই ১৮৯৩।
৫. পত্রসংখ্যা ৯৪, ১২ মে ১৯৮৩।
৬. পত্রসংখ্যা ৫১, ৩০ মে ১৯৮২।
৭. দ্রষ্টব্য যে, 'রাজা ও রানী'র আরেকটি রূপান্তর (১৯২৯) 'ভৈরবের বলি'-তে কুমার, ইলা ও শঙ্করের উপকাহিনীকে বর্জন করেননি। তা কি উপস্থিত অভিনয়ের প্রয়োজনে তাড়াহুড়ো করে তৈরি? গগনেন্দ্রনাথের আয়োজিত অভিনয়ের জন্য 'ভৈরবের বলি' প্রস্তুত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তা তিনি জানিয়েছেন, কিন্তু তাহলে তাতে পাঠকমুখী একটি ভূমিকা যোগ করলেন কেন? শুধু অভিনয় উপলক্ষ্যে রচিত হলে "রাজা ও রানীর কিছু কিছু রূপান্তর সাধন করিয়া এই নাটকটি রচিত"—এ কথা যোগ করবার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? অভিনয়ের 'বুকলেট' জাতীয় কিছুর জন্যে কি এই ভূমিকা? এ ভূমিকার কথাগুলি কি তার পক্ষেও সংগত? সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'রবীন্দ্রনাথের ভৈরবের বলি' নামক পুস্তিকাটিতে (টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৬৮) এসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নি।
৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), ৩০৭ পৃঃ।

৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ৪৮৫ পৃঃ।

১০. তদেব ৪৫০ পৃঃ।

১১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ১০৩৪ পৃঃ।

১২. দ্র. "আলাপ-আলোচনা", সংগীত-চিন্তা ; বিশ্বভারতী, ১৯৬৬, ১১০ পৃ.

১৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ৪৩৯ পৃঃ।

১৪. তদেব, ৫৫৮ পৃঃ।

১৫. তদেব, ৬০৫ পৃঃ।

১৬. তদেব, ৬২০ পৃঃ।

১৭. তদেব, ২৩৮ পৃঃ।

১৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), ১০৩ পৃঃ।

১৯. তদেব, ১৬০ পৃঃ।

২০. তদেব।

২১. তদেব, ২০৫ পৃঃ।

২২. দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ (বিশ্বভারতী), ৩৮৩ পৃ.

২৩. 'চিঠিপত্র' ১১, ২১২-১৩ পৃঃ।

২২. "শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান", দ্র. 'সংগীত-চিন্তা', বিশ্বভারতী' ১৯৬৬, ৮০ পৃ.

রবীন্দ্রনাথের নাটক

১.

বাংলা বা ভারতীয় নাটক প্রথম তার প্রাদেশিক চেহারা উত্তীর্ণ হয়ে একটা আন্তর্জাতিক চরিত্র পায় রবীন্দ্রনাথের নাটকে।

আমরা জানি, 'প্রাদেশিক', 'আন্তর্জাতিক'—এই কথাগুলিকে এমন সরল-ভাবে ছুঁড়ে দেওয়া সংগত নয়। যা খুবই প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক—তা আন্তর্জাতিক গ্রাহ্যতা ও সমাদর অর্জন করতে পারে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। একান্ত নিজস্ব নাট্যভাষা, সেই সঙ্গে কম-বেশি মর্মগ্রাহী মানবিক আবেদনের জন্য জাপানের কাবুকি ও নো নাটক, চীনের ধ্রুপদী ওপেরা, ইন্দোনেশিয়ার (জাভার) যোগ-জাকার্তা অঞ্চলের রামায়ণ ব্যালে, এমন কী হবীব তনবীরের ছোটনাগপুরি নৌটঙ্কীর আদলে করা লোক-প্রকরণের নাটক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, কেরলের কথকলিও তার ব্যতিক্রম হয়নি।[১] কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা মূলত স্বাতন্ত্র্যের জন্য, ইয়োরোপীয় পরম্পরাগত নাটকের ইডিয়ম থেকে অতিশয় আলাদা একটি নাট্যাদর্শের জন্য। ইয়োরোপ দীর্ঘকাল মূলত এক ধরনের নাট্যকলায় অভ্যস্ত ছিল, তার নাট্যের আদর্শ নিজের সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ওপেরা (যেমন ভাগ্‌নারের নানা ওপেরা), ব্যালে, ও প্রণালীবদ্ধ নাটকের ('লেজিটিমেট' বা 'লেজিট' থিয়েটারের) তিনটি সমৃদ্ধ ধারা গড়ে তুলেছে, কিন্তু তিনটি ধারারই বিবর্তন মূলত একরৈখিক বা লিনিয়ার। বাইরের থেকে তা কদাচিৎ নাট্যকৌশল ও নাট্যভাষার উপাদান ধার করেছে। কেবল এই শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকেই বাইরের নাট্যধারা সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক কৌতূহলের বাইরে এসে ইয়োরোপ তাকে নিজের নাট্য-ঐতিহ্যের মাঝে জুড়ে নিয়ে তার নাট্যকলায় নূতনত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করেছে। জার্মানিতে বেরটোল্ট ব্রেশ্‌ট ও এরভিন পিসকাটর-এর কাজ ও আলোচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মতো। তবুও ইয়োরোপের নাট্যকলার বিবর্তনে বাইরের নাট্যধারার ছোঁয়াচ বেশি নেই। এমনকী উনিশশো

পঞ্চাশের পর ইয়োরোপীয় নাটকের একমুখী বিস্তার ও বিকাশে প্রথম যে বড় ভাঁজ তৈরি হল ওই অ্যাবসার্ড নাট্যধারার উদ্ভবে—তাতেও বহিঃপৃথিবীর নাট্য-ধারার অবদান খুব বেশি নেই।

ইয়োরোপ তার নাট্যকলায় বাইরের উপাদান ও আঙ্গিক খুব-একটা গ্রহণ করেনি, কিন্তু আমরা ইয়োরোপের নাটককে গ্রহণ করেছি আমাদের 'আধুনিক' নাট্যধারা হিসেবে,[২] ঔপনিবেশিক অবস্থায় ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের এরকম মহাজন-খাতক সম্পর্ক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। অষ্টাদশ আর গত শতাব্দীতে মূলত ইংরেজের নাটক দেখে বা পড়েই আমরা বাংলা নাটক লিখতে বা অভিনয় করতে উৎসাহিত হই।[৩] ১৮৫২ থেকে মৌলিক বাংলা নাটক লেখা এবং ১৮৫৪ থেকে তার ধারাবাহিক অভিনয় শুরু হয়ে যায়, কিন্তু বিদেশী নাট্য-পরিবেশনার ফ্রেম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ নাটক দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেবল বাংলা বা বাঙালির নাটক হয়েই থাকে। তার কারণ, যে-নাট্যপ্রকরণ বা গঠনকলা আমরা ইয়োরোপ থেকে গ্রহণ করেছিলাম, তা ছিল সংঘাতময় সংলাপ-বিন্যাসের একটি হালকা আধার মাত্র, যে-আধার নিজে কখনোই তীব্রভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কিন্তু পাত্র-পাত্রীর অন্তর্গত এবং বহির্গত দ্বন্দ্বকেই তুলে ধরে। এ আধার বিষয়কে যতটা সম্মুখবর্তিতা দেয়, নিজেকে ততটা প্রকট করে না। তারই ফলে এই দৃশ্য ও অঙ্কবদ্ধ নাটকের ফ্রেমের মধ্য থেকে মূলত বাঙালির সময় সমাজ এবং পুরাণ-পুনরুজ্জীবিত আবেগই প্রকাশিত হল। রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) থেকে আরম্ভ করে মন্মথ রায় (১৯০০-১৯৮৮) পর্যন্ত সকলের সামাজিক-পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাটকে, দিশি ট্রাজেডি বা কমেডিতে আমরা কেবল বাঙালির দেশীয় ও সামাজিক ভাবনারই উত্থাপনা পেলাম। যে বাঙালি কুলীনের মেয়ের দুঃখে কাঁদে, যে-বাঙালি মদ্যপ নিমচাঁদের জন্য চোখের জল ফ্যালে, যে-বাঙালি সরোজিনীর জহরব্রতে উদ্দীপিত হয়, যে বাঙালি সিরাজদ্দৌলার দুর্ভাগ্যে শোকাপ্লুত হয়, বা কংসের কারাগারে কৃষ্ণের বন্ধনমোচনে ভক্তি ও দেশানুরাগে উদ্‌বেল হয়ে ওঠে, সে-বাঙালি তার নাটকে বহুর মধ্যে আশ্রিত কিছু সামাজিক প্রাদেশিক আবেগেরই সন্ধান করে, তার বেশি নয়। সে ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক সংকট, এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির গভীর মানবিক সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে খোঁজে না জাতিপরিচয়মুক্ত সমাজলক্ষণহীন মানুষের সত্তাকে, মানবসত্তমকে। বাউলের 'মনের মানুষ' কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এই অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এই মানুষই আপন অন্তরালে সবচেয়ে

দুর্গম, "তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে। / সে অন্তরময় / অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"

২.

এই নিছক মানুষের সমস্যাকে প্রথম ধরলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে। কোনো সময়ের সমস্যা নয়, সমাজের সমস্যা নয়, দেশের সমস্যা নয়, এমনকী সময়বদ্ধ কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যাও নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, দেশকালবদ্ধ মানুষের অনেক সমস্যা যেমন আছে, যেমন কৌলীন্য, মদ্যপান ও ভ্রষ্টাচার, পরাধীনতা, জাতিভেদ ইত্যাদি, তেমনই আছে দেশকালহীন মানুষের কিছু সমস্যা। সে সমস্যায় দেশকাল একটা আংশিক উপাদান হতে পারে, সামগ্রিক উপাদান নয়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করব যে, কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন মানুষের সমস্যা থেকে আরও বড় ভূগোলহীন সময়হীন অস্তিত্বের প্রশ্নে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছেন।

'নিছক' মানুষকে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে ধরবার এই পরম্পরাবদ্ধ চেষ্টায় আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে-কৌশল লক্ষ করি তা হল চারপাশের বর্তমান থেকে সরে যাওয়া। প্রহসনে অবশ্য তিনি কলকাতার উচ্চ ও অবসরভোগী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে অবলম্বন করেন, তরুণ-তরুণীর অনুরাগ নিয়ে কিছু নাটকীয়তার খেলা খেলেন 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'শোধ-বোধ' (১৯২৬), আর 'বাঁশরি' (১৯৩৩)-তে, কিন্তু এর বাইরে যে-বৃহৎ নাট্যসম্ভার, তাতে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেন তাঁর সময়, তাঁর অব্যবহিত নাগরিক বা গ্রামীণ পরিবেশ। তিনি আশ্রয় নেন অতীতে। এ অতীত কখনো হয়তো ভারতীয় পুরাণের পটভূমিকা গ্রহণ করে— 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২)-তে যেমন রামায়ণ-কথার সূত্র, কিন্তু তার পরেই চলে আসেন এমন এক সামন্ত-পরিমণ্ডলে, যেখানে রাজা, রানি, মন্ত্রী, কবি, সন্ন্যাসী, আশ্রমিক সব একসঙ্গে এসে ভিড় করে। 'বিসর্জন'-এ (১৮৯০)-এ 'মুকুট' (১৯০৮)-এ থাকে ক্ষীণ ইতিহাসের ভিত্তি, 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'শাপমোচন' (১৯৩১), 'চণ্ডালিকা নাটক' (১৯৩৩), 'শ্যামা' (১৯৩৬)-এ থাকে মহাভারত ও বৌদ্ধ আখ্যানের স্মরণ, কিন্তু যে-সব ভাবপ্রধান নাটকের আখ্যান তিনি স্বয়ং উদ্‌ভাবন করেন সেগুলিতেও প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের একটি আবহ তিনি নির্মাণ করে তোলেন। তাতে যেখানে কোনো রাজা স্পষ্টত নেই, যেমন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ বা 'ফাল্গুনী'-তে

সেখানে চরিত্রের যে-সমাবেশ গড়ে তোলা হয়েছে তাতে একজন রাজা দিব্যি খাপ খেয়ে যান। পরিবেশটাই এক প্রাচীন, মুখ্যত হিন্দু রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ একাদশ দৃশ্যে একটি রাজার উল্লেখও পাই এইভাবে, একটি স্ত্রীলোকের কথায়—

দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,
কোনো দুঃখ নেই প্রভু! রামরাজ্যে থাকি।

ওই নাটকেরই পঞ্চদশ দৃশ্যে খবর পাই রাজপুত্রের বিয়ে, রাজার বাড়ি 'নবৎ' বসেছে, স্ত্রীলোকটি তার রুদ্যমান সন্তানকে আশ্বাস দিচ্ছে—"আজ রাজপুত্তুরের বিয়ে,—আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি।"[৪]

এই রাজা পরবর্তী 'রাজা ও রানী'র বিক্রমদেব, এমনকী 'রাজা'-র বা 'রক্তকরবী'-র রাজার মতো কোনো ব্যক্তি নয়, সদাশয় রাজার একটি টাইপ মাত্র, যার উপস্থিতি আমরা পরেও দেখতে পাব। রবীন্দ্রনাথের নাটক ইত্যাদির জটিল রাজার ধারণায় এই দয়ার্দ্র সদাশয়তা একটি উপাদান, যা তাঁর আরো কিছু রাজার চরিত্রে যোগ করা হয়েছে—গোবিন্দমাণিক্যে ('বিসর্জন') যেমন, তাও আমাদের চোখে পড়বে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাটকে রাজার বিষয়ে আলোচনা আমরা করছি না। আমরা দেখাতে চেষ্টা করছি যে, রাজকেন্দ্রিক একটি প্রাচীন ইতিহাসের আবহপট তিনি নির্মাণ করে চলেছেন, তাঁর বেশ কিছু নাটককে সেই আবহে স্থাপন করেছেন। প্রচলিত পুরাণ থেকে সরে গিয়ে এ আরেক ধরনের পুরাণনির্মাণ হলেও রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি পুরাণের পরিবেশের সঙ্গে এর একটি ধারাবাহিকতা আছে, কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই নতুন পুরাণনির্মাণ বা mythopoeia-র আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ কেন নিলেন এই প্রশ্ন যদি করি, তার একটি উত্তর এই যে, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের দর্শক আর তাঁর নাট্যের চরিত্রগুলির মধ্যে, এমন-কী নাট্যের ঘটনাগুলির মধ্যে—রূপগত ব্যবধান তৈরি করে হয়তো এমন দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভাখো, মানুষের চেহারায় পোশাকে সময়ে অভ্যাসে যত দূরত্বই থাক—মানুষ কিন্তু সব সময়ে এবং সব জায়গাতেই এক, এবং যে-সব সমস্যা আমাদের রোজকার সময়বদ্ধ সমস্যা, তার বাইরেও মানুষের ভিতরকার কিছু সমস্যা আছে যা সব সময়ে সব জায়গাতে জেগে ওঠে, মানুষ সেই সমস্যাগুলিকে বারবার সমাধান করার চেষ্টা করছে, কখনও সার্থক হওয়ার পর আবার বিভ্রান্তি আসছে, আবার সে সেই আবর্তমান সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

এই চিরন্তন মানবসমস্যাগুলি কী কী? আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটককে ধরেই এ সমস্যাগুলির এভাবে বিন্যাস করতে পারি—ক. মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, খ. মানুষের সঙ্গে বৃহত্তর মানবিক প্রতিষ্ঠান—ধর্ম, সংগঠন, আদর্শ ইত্যাদির সম্পর্ক এবং গ. মানুষের সঙ্গে বিশ্বনিসর্গের সম্পর্ক। এগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়, প্রায়ই একটি এসে পার্শ্বিক বা গৌণ উপাদান হিসেবে আরেকটিতে মিশে যায় এবং তার সঙ্গে সংগতি বা বিরোধের দ্বারা থিমটিতে বৈচিত্র্য তৈরি করে। তবু প্রধান সমস্যার সূত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে এভাবে সাজাতে পারি—

ক. সম্পর্ক : ব্যক্তি আর ব্যক্তি

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) মায়ার খেলা (১৮৮৮) রাজা ও রানী (১৮৮৯) তপতী (১৯২৯) বিসর্জন (১৮৯০) চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) বিদায়-অভিশাপ (১৮৯৪) মুকুট (১৯০৮) প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) মালিনী (১৮৯৬) রাজা (১৯১০) অরূপরতন (১৯২০) শাপমোচন (১৯৩১) গৃহপ্রবেশ (১৯২৫) শোধবোধ (১৯২৬) চণ্ডালিকা (১৯৩৩)।

খ. সম্পর্ক : ব্যক্তি আর আদর্শ, ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠান

অচলায়তন (১৯১২) গুরু (১৯১৮) রক্তকরবী (১৯২৩) নটীর পূজা (১৯২৬) কালের যাত্রা (১৯৩২) তাসের দেশ (১৯৩৩) বাঁশরি (১৯৩৩)।

গ. সম্পর্ক : ব্যক্তি আর বিশ্বনিসর্গ

শারদোৎসব (১৯০৮) ঋণশোধ (১৯২১) ডাকঘর (১৯১২) ফাল্গুনী (১৯১৬) বসন্ত (১৯২৩) শেষ বর্ষণ, নবীন (১৯৩১) শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)।

আমরা আগেই বলেছি যে, সম্পর্কের এই সমস্যাগুলি প্রত্যেকটি নিজের সরল ছকে সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্য দুটি সমস্যাও গৌণত এসে তাকে জটিল করে তোলে। আর এও লক্ষ করবার যে, 'ক' আর 'খ' মূলত মানবিক, অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব, সৃজন ও উদ্‌ভাবনের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু 'গ'-এ এসে যাচ্ছে মানব-বহির্ভূত সত্তা, বিশ্বনিসর্গ; মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে যা ছিল, মানুষ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরেও যা থাকবে, কিন্তু এর মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপে তার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটবে। আবার উলটোদিকে সেও মানুষকে

শারীরিক ও মানসিক রূপান্তর দেবে। 'ক' আর 'খ' হল মানুষ আর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত (intra) সমস্যা, 'গ' হল আন্তর্ (inter) সমস্যা। মানুষকে বুঝতে হলে তার intra এবং inter দুধরনের পরিপ্রেক্ষিতই আমাদের দেখতে হবে, এবং রবীন্দ্রনাথ খুব সহজেই এই দার্শনিক বীক্ষণটিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪.

'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) থেকে আরম্ভ হয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের সূত্রসন্ধান, তার বাধা ও ব্যাঘাতগুলির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। প্রায় একই থিম পুনরাবৃত্ত হয়েছে 'মায়ার খেলা'তে (১৮৮৮)। কিন্তু এ দুটি নাটকে লক্ষ করি যে, ব্যক্তি সম্পর্কের ওই বাধা ব্যক্তিচরিত্রের ভিতরে নিহিত, চরিত্রের ভিন্নতা, কিংবা মান-অভিমান, লজ্জা-সংকোচ, বা ভুলবোঝাবুঝির ফলে। প্রথমটি স্থায়ী, দ্বিতীয় কারণটি অস্থায়ী। কখনও মন ও মুখের দ্বিধা—যা মনে পোষণ করছি মুখে তা না বলার প্রবণতা, কিংবা ওই লজ্জাজনিত নীরবতা—ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করছে। 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'রাজা ও রানী' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'-তে এই বাধা তৈরি করছে কোনো মানবিক কিন্তু অস্বাভাবিক আদর্শ—সন্ন্যাসীর তপশ্চারণা ('প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'চিত্রাঙ্গদা'), কোনো অমানবিক বৃত্তি ('বাল্মীকি-প্রতিভা'), কিংবা কোনো মানববৃত্তির আতিশয্য, যা অন্য স্বাভাবিক মানবসম্পর্ক থেকে ব্যক্তিটিকে বিচ্ছিন্ন করে আনছে, যেমন 'রাজা ও রানী'র বিক্রমদেব। 'ভগ্নহৃদয়', 'নলিনী' (১৮৮৪) 'মায়ার খেলা'র দলে ফেলব 'শোধবোধ' 'গৃহপ্রবেশ'-কে, যেখানে বাধা মূলত ব্যক্তিচরিত্রের, 'শোধবোধ'-এ অবশ্য সামাজিক norms, উচ্চমধ্যবিত্তের বিলাসিতার বাতাবরণে দরিদ্র সতীশের অসংগতিপূর্ণ অস্তিত্ব—সতীশের জন্য জটিলতা তৈরি করেছে। তা গৌণ উপাদান হিসেবে এ নাটকে আছে। কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দলে আছে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পরিত্রাণ', 'বিদায়-অভিশাপ', 'মালিনী'। এখানে কোনো একটি জীবিকা বা অস্বাভাবিক আদর্শ—সন্ন্যাসীর আদর্শ, রাজার আদর্শ, ব্রহ্মচারীর আদর্শ, ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে কারও স্ফীত বা / সেহেতু ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু এ নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এখানে যে আদর্শ বা জীবিকা মানুষকে মানুষ থেকে বিমুখ করে তুলছে তা মূলত চরিত্রের অঙ্গীভূত, internalized। 'চণ্ডালিকা'-তে যে চরিত্রটিকে চণ্ডালিকা ভালোবাসছে, সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দ অবশ্য জানতেই

পারছে না চণ্ডালিকা প্রকৃতির হৃদয়ের উদ্‌বোধনের খবর, একটিমাত্র কথাতে উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষার শিখা জ্বালিয়ে সে চলে যাচ্ছে, নিজের কাজের অব্যবহিত পরিণাম কী হল তা না জেনেই। অন্য মেয়েরা যে প্রকৃতিকে ঘৃণা করছে তাতেও প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। সমাজপতিদের আলাদা কোনো সংগঠন মাঝখানে খাড়া হয়নি। 'মালিনী'-তে অবশ্য পুরোহিততন্ত্রের একটা উপস্থিতি আছে, তা গৌণ উপাদান হিসেবে। এখানেও ক্ষেমংকর তার সংকীর্ণ ধর্মবোধকে পেয়েছে বিশ্বাসের মধ্যে। আমরা বলতে পারি, এসব নাটকের যেগুলিতে institution-এর ভূমিকা আছে, সেগুলিতে তা বেশিরভাগই personalized, অর্থাৎ মানবচরিত্রের অন্তর্গত হয়ে দেখা দিয়েছে। তার বাইরের উপস্থিতি বেশি নেই।

৫.

কিন্তু 'খ' শ্রেণীর নাটকগুলিতে ওই আদর্শ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির একটি বাইরের ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক চেহারা আছে। 'বাঁশরি'-র (১৯৩৩) গুরুদেব যেমন। তবু গুরুদেব পুরন্দর শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি হয়ে ওঠে। আর সে কোনও বিশেষ ধর্মসংগঠনের প্রতিনিধিও নয়, যদিও হিন্দুত্বের একটি বহিরাবরণ তার আছে। এই আদর্শের সঙ্গে মানবিকতার দ্বন্দ্বের বিষয়টি বাঁশরি বোঝে বলেই সে বলে,—"ও যে আইডিয়ালিস্ট ! বাস্‌ রে ! এতবড়ো ভয়ংকর জীব জগতে নেই !"[৫] কিংবা 'অচলায়তন'-এর অচলায়তন, তার মন্ত্রতন্ত্র আচার অনুষ্ঠান বিধিনিষেধ যেমন। তাতে প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিক চেহারাও আছে, মহাপঞ্চক, উপাধ্যায়, তৃণাঞ্জন, অধ্যেতা ইত্যাদি। 'রক্তকরবী' (১৯২৩)-তে তো পুরো একটা বিশাল সংগঠনই আছে যক্ষপুরীর—রাজা থেকে শ্রমিক পর্যন্ত। রবীন্দ্র-নাথের কথা থেকে সেই বিভিন্ন স্তর বা hierarchy এবং পদোন্নতির সংস্থান-যুক্ত জটিল ব্যবস্থার বর্ণনা উদ্ধার করি—"এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখনকার মোড়লরা একসময় খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়।"[৬] 'কালের যাত্রা'-য় (১৯৩২) রাজা মন্ত্রী বণিক নারীর দল সকলেই সেই বৃহৎ ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতিনিধি, তবে

এখানে তারা কেউ ব্যক্তি নয় শ্রেণী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা—ইনস্টিট্যুশন বা সিস্টেম-কে যখন কতকগুলি মানুষের কাজ ও কথার মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন রবীন্দ্রনাথ তখন তাদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল কম থাকে, শ্রেণীগত প্রোফাইলটি বড় হয়ে ওঠে। ফলে এই চরিত্রগুলির অনেকেই দ্বন্দ্বহীন একমুখো চরিত্র, তারা নিয়মপালনের যন্ত্র মাত্র। যখন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটে তখন তারা ব্যক্তি হয়ে ওঠে এবং নাটকের ভিতরকার দ্বন্দ্বের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

'গ' শ্রেণীর নাটকে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করছেন আরো গূঢ়তর এক সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে তার বাসস্থান এই পৃথিবীর সম্পর্ক। মানুষ যে বাঁচে, তার এই বাঁচার মধ্যে তার পৃথিবী কি শুধু খাদ্য বস্ত্র আচ্ছাদন এইসব ভোগ ও জীবনরক্ষার উপকরণ যোগান দেয় মাত্র, তার বেশি ভূমিকা কি তার নেই? অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি কেবল শারীরিক ও জৈবিক, মানসিক নয়? 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর নাটকে মানবসম্পর্ক সংক্রান্ত অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগও কেবল জৈবিক বিবেচনার উপর নির্ভর করে না, তাতে নানা সাংস্কৃতিক-মানসিক উপাদান এসে যুক্ত হয়। কামনা জৈবিক, কিন্তু প্রেম একই সঙ্গে জৈবিক ও মানসিক। সম্পর্কের মধ্যে সৌন্দর্য নির্মিত হয় যখন তাতে যুক্ত হয় মানসিক উপাদান, সেটাই উচ্চ সংস্কৃতির সংযোজন। মানুষ আর নিসর্গের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনাই রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল—যদি জৈবিক ও শারীরিক সম্পর্কের উপরে মানসিক—আবেগ এবং বুদ্ধি দুদিক থেকেই—একটা বড় সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র গানে এ কাজ করেছেন। কখনও মনে নবীন মেঘের সুর লাগিয়েছেন, কখনও ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় আপনহারা বাঁধনছেঁড়া প্রাণকে দান করেছেন, কখনও 'শরততপনে প্রভাতস্বপনে' প্রাণের অনির্দেশ্য ব্যাকুলতায় উন্মনা হয়ে উঠেছেন। মানুষ ও বিশ্বের সম্পর্ক সন্ধান রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রথম করেননি, কিন্তু তাঁর মতো স্পষ্ট, সুনির্ধারিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ আর কোনো স্রষ্টা করেননি। এখানে তিনি যে নটরাজের আর একটি মিথ, কিংবা ঋতুচক্রের অনুধরনের নাট্যক্রিয়ার মিথকে কাজে লাগিয়েছেন তা আমরা অন্যত্র লক্ষ করেছি।[৭] 'শারদোৎসব (১৯০৮) থেকে আরম্ভ করে শ্রাবণগাথা (১৯৩৪) পর্যন্ত সবই এই বড় মানবিক ও বৈশ্বিক সম্পর্কের সন্ধান। 'ডাকঘর'-এ (১৯১০) হয়তো আরও বড় এক রিয়্যালিটির আশ্রয়ে তিনি মানুষের স্থান খুঁজছেন, যে রিয়্যালিটির নাম মৃত্যু। আমরা

আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই যে, 'ক' 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর নাটকে তিন শ্রেণীর উপাদানই মিলে মিশে গেছে প্রায়ই, কেবল উপাদান-প্রাধান্যের বিচারে আমাদের ওই ভাগ।

নিসর্গের কোনো নাটকে তিনি হাস্যমুখরিত বহির্দ্বন্দ্ব তৈরি করেন বৈষয়িকতা (=নিসর্গবিমুখতা)-র সঙ্গে নিসর্গমুখীনতার। সে দ্বন্দ্ব 'শারদোৎসব'-এ আছে, সে দ্বন্দ্বের আভাস আছে 'ফাল্গুনী'তে। ওই নাটকের প্রথম দৃশ্যে যুবকদলের গান চলেছে 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে', চলচঞ্চল নবপল্লব দল তাদের মনে মনে যেন মর্মরিত হচ্ছে, এবং তারা বলছে—

> ফাগুনের গুণ আছে রে ভাই গুণ আছে।
> বুঝলি কী করে।
> নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে
> কিসের জোরে।
> তাই-তো—দাদা আমার চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকা—
> ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে কাগজ কলমের উলটো মুখে উজিয়ে চলেছে।

এই সূত্রেই আরও কতকগুলি দ্বান্দ্বিক ধারণার সংঘাত তৈরি করেন রবীন্দ্রনাথ —ঘর বনাম বাহির, কাজ বনাম খেলা, বার্ধক্য বনাম যৌবন, পাণ্ডিত্য বনাম সহজের আনন্দ—এবং শেষ পর্যন্ত দেখান যে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেবল আপাত-প্রতীয়মান—'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ'। আপাত-প্রতীয়মান দ্বন্দ্বগুলিকে ঘিরেই নাটকের বুনোট তৈরি হয়। পরবর্তী নিবন্ধে আমরা তা আর একটু বিস্তারিত করে আলোচনা করব। 'শারদোৎসব'-এ আর একটি আপাতপ্রতীত দ্বন্দ্ব হল সন্ন্যাসী বনাম রাজা। এই দ্বন্দ্ব কখনোই খুব তীব্র নয়, মূলত হাস্যে কৌতুকে উচ্ছলতায় এই দ্বন্দ্বকে বহন করে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ এবং এবং পরে একটি প্রায় অ্যারিস্টটলীয় 'আনাগ্নরিসিস'-এ সে দ্বন্দ্বের আপাত-প্রতীয়মানতার স্বরূপটি দর্শক-পাঠকের দেখিয়ে দেন। 'শারদোৎসব'-এ সন্ন্যাসী প্রকাশিত হয় সম্রাট বিজয়াদিত্যরূপে, 'ফাল্গুনী'-তে বৃদ্ধ সর্দার গুহা থেকে বালক হয়ে বেরিয়ে আসে। শম্ভু মিত্র সম্ভবত একেই 'লীলা' বলেন[৮]—এই বিরোধকে খুব প্রবল সংঘর্ষে না স্থাপন করে আপাতপ্রতীয়মানতার চেহারা দেওয়ার প্রবণতাকে।

৬.

বল। বাহুল্য, বক্তব্যের এই ক্রমপ্রসারমাণ ব্যাপ্তিকে প্রচলিত অঙ্ক ও দৃশ্যবদ্ধ নাট্যরীতির ফ্রেমে আটকে রাখা সম্ভব নয়, তার জন্য নতুন নতুন রূপকল্পনার খোঁজ অবশ্যই করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এর অন্যথা দেখি না। নাটকের ফর্মকে তিনি কত অজস্রভাবে ভেঙেছেন—গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, একদৃশ্যময় আবর্তনমূলক নাট্য (রক্তকরবী), তাব্‌লো (tableau) বা মিছিল ধরনের নাট্য (ফাল্গুনী, বসন্ত, কালের যাত্রা)—কত বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষাই না তিনি করেছেন—তার বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এ নয়। এভাবে শুধু বিষয় ও প্রসঙ্গের দিক থেকে কেন, রীতির দিক থেকেও পৃথিবীর নাটককে ভারতবর্ষের কোনো নাটক তাঁর আগে স্পর্শ করতে পারেনি। আমরা অন্যত্র[৯] দেখিয়েছি যে, নাটক তাঁর কাছে একটি শিল্পমাত্র ছিল না, তা ছিল তাঁর জীবনচর্যার এক অপরিহার্য অঙ্গ। ফলে নাটক কেবল লিখে ফেলেই তিনি ছুটি নেননি, অন্যে কবে সেই নাটক অভিনয় করবে সেজন্য প্রতীক্ষা করে থাকেননি। নিজেই অভিনয়ের আয়োজন করেছেন, মহলা দিয়েছেন, পার্ট শিখিয়েছেন, পোশাক-আশাক সাজ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের নাটককে ধরলে রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার ব্যক্তিত্বের একটা মূল আদল যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই কোথায় তিনি যথার্থভাবে বিশ্বগত প্রতিভা হয়ে ওঠেন তারও খবরটি জানা সম্ভব হবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. এই লেখকের কাছে নাটকের সংজ্ঞা একটু ব্যাপক। নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, মূকাভিনয়,—সবই নাটক।

২. আধুনিক পৃথিবীর অনেক দেশেই মূলত তিনটি নাট্যধারা পাশাপাশি বর্তমান থাকে—ক. ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক্যাল, অর্থাৎ প্রাচীন, বিধিবদ্ধ ও দরবারি নাট্যকলা, খ. লোকনাট্য বা পরম্পরাগত (ট্র্যাডিশনাল) নাট্যকলা এবং গ. পাশ্চাত্য নাট্যধারা প্রভাবিত আধুনিক নাট্যকলা —যাতে প্রসেনিয়াম স্টেজের ব্যবহার হয়।

৩. গেরাসিম লেবেদিয়েফ-এর বাংলা নাটকের অভিনয় (১৭৯৫) বাংলা

নাটক রচনা বা প্রযোজনার ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী প্রভাব তৈরি করতে পারেনি। তা ছিল এক আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) ২৭১ পৃঃ।

৫. রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) ১২১০ পৃঃ।

৬. ওই, ৬৪৯ পৃঃ।

৭. এই বইয়ের পরবর্তী প্রবন্ধ "নিসর্গ-নাটক ও রবীন্দ্রনাথ" দ্র.

৮. এ গ্রন্থের শেষ নিবন্ধ "ভারতবর্ষের জাতীয় নাট্যরূপ" দ্রষ্টব্য।

৯. এ বইয়ের প্রবন্ধ দ্র. "অভিনয়, প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথ" ; তাতে জগদানন্দ রায়ের পত্রাংশের এই কথাগুলি আমরা উল্লেখ করেছিলাম—"লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।"

নিসর্গ-নাটক ও রবীন্দ্রনাথ

১.

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-নাটকগুলির[১] মধ্যে কয়েকটি নাটক আছে, যেগুলিতে বছরের নৈসর্গিক পরিবর্তনের চক্রটিকে একটি নাটকীয় চেহারা দেওয়া হচ্ছে। বলা ভালো, নিসর্গের স্বভাবে নিহিত নাটকীয়তা রবীন্দ্রনাথে অন্য ধরনের একটি নাট্যব্যাখ্যা লাভ করছে। কেবল 'নটরাজ : ঋতুরঙ্গশালা'-র মধ্যেই ঋতুচক্রের সম্পূর্ণ আবর্তনটিকে ধরা হয়েছে। সে তুলনায় অন্য নাটক বা নাটকাখ্য রচনা-গুলিতে বর্ষা, বর্ষাশেষ, শরৎ বা বসন্ত—যে কোনো একটি বাৎসরিক কালখণ্ডকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে, নাটকে ঋতু হিসাবে বসন্তের সম্মানই সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ (যদিও তাঁর প্রিয় ঋতু ছিল নাকি বর্ষা[২])। মোট তিনটি নাটকে বসন্ত তাঁর বিষয়—'ফাল্গুনী', 'বসন্ত' এবং 'নবীন'-এ। বর্ষা একটি নাটকের অবলম্বন—'শ্রাবণগাথা'। শরৎ অধিকার করে আছে 'শারদোৎসব' নাটকটিকে, আর 'শেষ-বর্ষণ' নাট্যটিতে বর্ষা ও শরৎ দুয়েরই অংশ আছে, বর্ষার অংশ হয়তো একটু বেশি।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাট্যরচনাগুলির সঙ্গে এই নাটকগুলির পার্থক্য শুধু বিষয়ের নয়, পার্থক্য লক্ষ্য উপলক্ষ্য এবং প্রকরণের। শান্তিনিকেতনে এবং অন্যত্র এগুলির অভিনয়ের ইতিহাস লক্ষ করলে সহজেই ধরা পড়ে, এগুলি একই সঙ্গে নাটক এবং 'রিচুয়াল' বা উৎসবের অঙ্গ—'শারদোৎসব' নামকরণের মধ্যে যার ইঙ্গিত আছে। প্রাচীন ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে রবীন্দ্রনাথ এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রিচুয়াল তৈরি করছেন। এ রিচুয়াল কামনা বা বাসনা-পূরণকে লক্ষ করে উদ্‌যাপিত হয় না, তার লক্ষ্য ইস্থেটিক, নান্দনিক। তা শিল্পের নির্মল আনন্দ উপহার দেয়, সাংসারিক লাভক্ষতি-গত উল্লাস ও বিমর্ষতার বাইরে নিয়ে গিয়ে মানুষকে প্রকৃতির অনাহত সৌন্দর্যের জগতে আমন্ত্রণ করে। এগুলি যে রিচুয়াল তার প্রমাণ এই যে, এগুলি অন্য নাটকের মতো তাদের ঋতু-প্রতিবেশ থেকে ছিঁড়ে বছরের যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো ভাবে অভিনয় করা

সম্ভব নয়। 'শারদোৎসব' শরৎকালের সূত্রপাতে অভিনয় করতে হবে, 'বসন্ত' বসন্তের নাটক এবং সেই ঋতুর পরিবেশেই অভিনেয়। একমাত্র 'নটরাজ: ঋতুরঙ্গশালা'তে একটি বিস্তৃত পরিসর তৈরি করা হয়েছে, তা বছরের যে-কোনো সময়ে অভিনয় করা সম্ভব। কিন্তু সে অভিনয়ও উদ্‌যাপন বা অনুষ্ঠানসূচক, কারণ একটি উপস্থিত ঋতুর সূত্রকে অবলম্বন করে সাংবৎসরিক ঋতুবদলের শোভাপরম্পরা ও তজ্জাত আনন্দের উদ্‌বোধনই এ নাটক অভিয়ের মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, এ নাটকগুলির আখ্যান ahistorical বা ইতিহাস-রহিত। সে চরিত্র, বলা বাহুল্য, এগুলির রিচুয়াল-লক্ষণের মধ্যেই আছে—রিচুয়াল মাত্রেই ইতিহাস-বর্জিত বা ইতিহাস-বহির্বর্তী। এ নাটকগুচ্ছে কখনও কিছু কিছু পাত্রপাত্রীর ভূমিকা[৩] তৈরি করা হয়েছে বটে, কিন্তু 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী' নাটকদুটিকে যদি একপাশে অন্য বিবেচনার জন্য সরিয়ে রাখি তাহলে দেখব, বাকি নাটকগুলির মূল পাত্র ওই ঋতু বা ঋতুসৌন্দর্যের পৌর্বাপর্য—অন্য চরিত্রগুলি সেই মূল পাত্রের নানা লীলা, আভাস ও অংশের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কখনো সোজাসুজি, কিন্তু প্রায়শই উক্তি-প্রত্যুক্তির মৃদু দ্বন্দ্বময় একটি ডায়ালেকটিক্‌সের মধ্য দিয়ে[৪]। অর্থাৎ ওই চরিত্রগুলির গল্প নয় এসব নাটক, ওই চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে কিছু ঘটছে না, বা ঘটলেও তা আদৌ বিবেচ্য নয়। ফলে তারা কোনো একমুখী অগ্রগতি বা পরিবর্তনের দখলে নেই। আর মূল পাত্র যে ঋতুরঙ্গ, তার পরিবর্তন ঠিক linear বা একমুখী নয়, খানিকটা বৃত্তাকার। শুধু যে প্রতিটি ঋতু বা তার সঙ্গে যুক্ত প্রকৃতির রম্যতা একটা নির্দিষ্ট অবকাশের পর আবার ফিরে আসে তাই নয়, একটি ঋতুর মধ্যে আছে পরবর্তী ঋতুর উপক্রম, কখনো একটি অন্যটির ছদ্মবেশ মাত্র—

> রাজা। ওই জীর্ণ বসন পরে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।
>
> কবি। তবে তো চিনতে পারেননি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন, তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলাকার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ, নূতনপুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন। [বসন্ত][৫]

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন ; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না ; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই আমন্ত্রণের গান ধরল। [শেষ বর্ষণ][৬]

ঋতুবদলের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকলেও যখন একটি আরেকটির সামীপ্য, সম্ভাবনা বা পূর্বাভাস সূচিত করে, কিংবা যখন ছদ্মবেশের আড়ালে একটির সঙ্গে আরেকটির identity বা সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই ধারণাটাই যেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এ ধারাবাহিকতা আসলে বৃত্তরেখার ধারাবাহিকতা—এ ধারাবাহিকতায় কোনো ঘটনাই সম্পূর্ণ, পরিসমাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্য ঘটনার ক্ষেত্র তৈরি করছে না, বরং আবর্তনের সূত্রে প্রতিটি চলে-যাওয়া যেমন ফিরে-আসার ভূমিকা হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রতিটি আগমনের মধ্যেও চলে-যাওয়ার সূচনা জেগে থাকছে। 'শেষ বর্ষণ'-এ আরও দেখছি,

নটরাজ। প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদল-লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎ-প্রতিমা।[৭]

ঋতুনাট্যগুলির এই ahistoricity বা নিত্যতা 'নটরাজ' নাট্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন, নিত্য বর্তমানকালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করে :

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশের রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।[৮]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটকে ঘটনার এই নিত্যতা বা পৌনঃ-

পুনিকতা নেই, আর সে সব নাটকে ব্যক্তিগত ইতিহাসের একাভিমুখী বা linear অগ্রগতিই লক্ষণীয়। আর সেখানে গল্পের গ্রন্থিতে বা চরিত্রের ব্যক্তিগত বিবর্তনে, যে-সব পর্যায় আসছে সে সব পর্যায়ই সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত (final) —সেগুলি স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় বা প্রতিক্রিয়াহীন অর্থে নয়, বরং এই অর্থে যে, চরিত্রটির ব্যক্তিগত ইতিহাসে সেগুলির আর পুনরাবর্তনের সম্ভাবনা নেই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীর প্রাথমিক নিষ্ঠুরতা যেমন, পরবর্তীকালে অর্জিত সর্বাঙ্গীণ মমতা যেমন, কিংবা বিভিন্ন নাটকে বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা। এমন-কী 'রক্তকরবী'র মতো নাটকেও—যে নাটককে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন 'সময়হারা'[৯]—তাতেও, চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত ইতিহাসের একমুখী পরম্পরাই বেশি লক্ষ করি। ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যমূলক'[১০] এই বিশেষণটি ব্যবহার করে, এবং 'প্রস্তাবনা'য়[১১] বাল্মীকির আখ্যানের সঙ্গে নিজের আখ্যানের সারূপ্য নির্দেশ করে এর সময়-অতিক্রমী চরিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি টানবার চেষ্টা করেছেন, তবু শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই প্রার্থনাটুকুই রাখতে হয়েছে, "এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি।"[১২]

বস্তুত, এ প্রসঙ্গে আমরা আগেই দেখেছি যে, ঋতুমণ্ডলের নাটকগুলিতে মানব পাত্রপাত্রী যে-কটি আছে, তাদের চরিত্র আলাদা করে প্রধান হয়ে ওঠে না, কোনো ধারণাযোগ্য বিবর্তনের মধ্য দিয়েও যায় না। এ সব চরিত্রই যে-ভূমিতে আরম্ভ করে সেই ভূমিতে বিদায়ও নেয়। এর মধ্যে দুটি নাটক একটু ব্যতিক্রম —'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী'। ব্যতিক্রম হওয়ার কারণও আছে। 'শারদোৎসব' কিংবা তার রূপান্তর 'ঋণশোধ' সে অর্থে নিসর্গ-নাট্য নয়, অর্থাৎ নিসর্গের ঋতুধৃত রম্য নাটকীয়তা সে নাটকের মূল চরিত্র নয়। শেষ পর্যন্ত এটি মানব-পাত্রদেরই নাটক, শরতের উদার মুক্তিতে মানুষের কাজের বন্ধন থেকে ছুটি খুঁজে নেওয়ার কাহিনী। আর এই ছুটি-পাওয়ার তত্ত্বটি দুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একটি আপাতবিরোধকে পুরোভূমিতে রেখে—কর্তব্যকর্মে স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োজিত উপনন্দ ও ছুটির খোলা হাওয়ায় ভেসে-বেড়ানো ঠাকুরদা ও ছেলের দলের মধ্যে, অন্যদিকে পাশাপাশি একটি যথার্থ বিরোধকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে—সে বিরোধ লক্ষেশ্বরের আপন সঞ্চয়ের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি ও নিসর্গ-বিমুখতার সঙ্গে এবং মহারাজ বিজয়াদিত্যের সন্ন্যাস এবং নিসর্গশোভার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষার। তবু নিসর্গের সৌন্দর্য এ নাটকে মানবসত্যের সঙ্গে সংবদ্ধ বলেই সুন্দর:

সন্ন্যাসী। আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনায় এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন আর এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠছে।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বের মূল বিশ্বাসের তিনটি স্তম্ভ—সৌন্দর্য, আনন্দ এবং কল্যাণের অন্তর্লীন সম্বন্ধটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এ সংলাপদুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমাদের উপস্থিত প্রয়োজনে এ দুটির বিশেষ মূল্য এই যে, 'শারদোৎসব' নাটকের মানবমুখ্যতা এ অংশে আভাসিত। প্রকৃতি এখানে পটভূমি, যদিও নিষ্ক্রিয় বা passive পটভূমি-মাত্র নয়। সে মানবচরিত্রগুলির মধ্যে কোনো-না-কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, কিন্তু তবু মানবচরিত্র-গুলিই এ নাটকের প্রধান মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে, প্রকৃতি নয়। মানবজীবনের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া গভীর উপলব্ধি বরং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে নিগূঢ় একটি অর্থ আরোপ বা আবিষ্কার করছে।

'ফাল্গুনী'-তে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার এই সম্পর্ক প্রায় উলটে গেছে। এখানে প্রকৃতির পরিবর্তনের আড়ালে অপরিবর্তনের ওই বৃত্তকেন্দ্রটিকে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ—এখানে এ নাটক হয়েছে ঐ ঋতুনাটকগুলির সঙ্গী : আর তা থেকেই পৌঁছেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনতত্ত্বে

জয়ী প্রাণ চির প্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম
জয়ী জ্যোতির্ময় রে।

প্রবীণতা, বার্ধক্য, মৃত্যু চিরন্তন নয়, 'মরণ আয়োজনের' মধ্যে 'প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী' সেজে যে বসে আছে

এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক্ না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী।

'শারদোৎসব'-এ যেখানে জীবনসত্য তাৎপর্য দিচ্ছে নিসর্গসত্যকে, সেখানে 'ফাল্গুনী'তে নিসর্গসত্যের মধ্য থেকে জীবনসত্যের উদ্ধার ও উপার্জন ঘটছে। এ নাটকে মানবিক ভূমিকাগুলি তাই সর্বাংশে নিসর্গভূমিকার ফ্রেম নয়। কিন্তু দাদা, কোটাল, মাঝি ইত্যাদি গৌণ চরিত্র, এবং অন্যদিকে সর্দার বাউল ও চন্দ্রহাস ছাড়া বাকিদের চারিত্রিক identity বা স্বাতন্ত্র্যও তত স্পষ্ট নয়। যে-জন্য সংলাপে যুবকদলের নাম আলাদা করে জানানো হয়নি, অনেকটা গ্রিক কোরাসের মতো তারা সমবেতভাবেই কথাগুলি বলতে পারে। সর্দার, বাউল ও চন্দ্রহাস আবার এতই রূপকের দ্বারা গ্রস্ত যে, তাদের মানবিক লক্ষণগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যুবকদল বিশ্বাসের একটি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে [তৃতীয় দৃশ্য সন্দেহ ও চতুর্থ দৃশ্য প্রকাশ দ্রষ্টব্য], ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তারা কেবল চালচিত্র হয়ে থাকছে না এবং 'ফাল্গুনী' 'শারদোৎসব'-এর চেয়ে অনেক বেশি করে নিসর্গ-নাট্য হওয়া সত্ত্বেও এখানে ওই চরিত্রগুলি অন্যান্য ঋতুনাট্যের চরিত্রের মতো কমবেশি অলংকরণ নয়।

২.

এই নাট্য সংস্কারে পৌঁছে তো তিনি অভিনেতা ও দর্শকের ভূমিকাও বদলে দিলেন। অভিনেতা হয়ে উঠল রিচুয়ালের অনুষ্ঠাতা, খানিকটা পুজোর পুরোহিতের মতো। আর দর্শক যেন হয়ে উঠল যজমান। ঋতুর সঙ্গে আবর্তনশীল শোভা-সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবিক অস্তিত্বের আনন্দকে যুক্ত করে দেওয়ার এই রিচুয়ালে অভিনেতা (বা গায়ক ও অন্যান্যরা) সাধারণ নাটকের অভিনেতাদের চেয়ে অনেক বেশি করে অংশ নিচ্ছে, কেননা সে নিজে ওই সৌন্দর্য ও আনন্দের একই সঙ্গে স্রষ্টা ও উপভোক্তা। আর দর্শকও কেবল সায়ংকালীন প্রমোদ

আহরণ করার মধ্যেই নিজেকে বদ্ধ রাখছে না, সেও হয়ে উঠছে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও অংশীদার—সেও তার জীবনের জন্য স্থায়ী ও জরুরি কিছু উপলব্ধি পাচ্ছে এবং সংগ্রহ করছে এই অনুষ্ঠান থেকে। অন্তত আদর্শ সম্ভাবনার দিক থেকে অভিনেতা ও দর্শক দুয়ের ভূমিকার এরকম সম্প্রসারণ, এই নাটকগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কল্পনা করা সম্ভব। এ জাতীয় নাটকের বস্তু উভয়ের কাছ থেকেই ওই ধরনের আত্মনিয়োগ দাবি করে।

৩.

নিসর্গদৃশ্যের এই আবর্তন—যা একই সঙ্গে ধ্রুব ও পরিবর্তমান, স্থির এবং সচল,—বিশ্বজীবনবৃত্তের এই সূত্রকে, যখন নাটকে ব্যবহৃত হতে দেখি, একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই তত্ত্ব কখন এবং কীভাবে রবীন্দ্রনাথের মনে উদয় হল, এবং একে তিনি নাটকের বিষয় হিসেবেও বেছে নিলেন কেন? প্রকৃতির দর্শনগ্রাহ্য চেহারায় পরিবর্তন ঘটছে অথচ শেষ পর্যন্ত মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটছে না—এই বিরোধকে আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহজেই সমাধান করতে পারি, বলতে পারি যে, তা কোনো যথার্থ বিরোধ নয়; আবার লেভি স্ত্রোস্-এর আরো টেকনিক্যাল অস্ত্র—যা তিনি সোস্যুরের ভাষাচিন্তা থেকে ধার নিয়েছেন—সেই langue ও parole-এর বিরোধের সূত্র ধরেও সমাধান করতে পারি[১৪]। কিংবা এই তুলনারই সম্ভতম পুনরাবৃত্তি, নোয়াম চম্‌স্কির Deep Structure/Surface Structure-এর বিরোধের সহায়তায়ও একভাবে দেখাতে পারি। অর্থাৎ ঋতুচক্রের একটি মৌলিক নিয়ম আছে, বিশ্বপদার্থের এবং সৌরকেন্দ্রিক গ্রহগুলির আবর্তনের নিয়মের তা অন্তর্ভুক্ত, সেখানে তা ধ্রুব এবং অনড়, তার হেরফের হবার উপায় নেই। কিন্তু তারই মধ্যে, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, খণ্ড খণ্ড ভাবে দৃশ্যের রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের মধ্যে রয়েছে ঐ অমোঘতা, যেজন্য কবি সহজেই 'If winter comes, can spring be far behind' বলে আশ্বাস তৈরি করতে পারেন।

এমন বলা হয়েছে যে, সময়ের প্রাচীন প্রাচ্য ধারণা বৃত্তাকার (cyclical) এবং প্রতীচ্যের ধারণা একাগ্রমুখী বা একরৈখিক (linear)[১৫]। এ খানিকটা সরল বিভাগ, কারণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আবর্তন বা cyclicity-র ধারণাকে যেমন প্রতীচ্য গ্রহণ করেছে—৬০ সেকেণ্ডে মিনিট, ৬০ মিনিটে ঘণ্টা, দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর ইত্যাদি ধারণাগুলি মূলত বৃত্তাকার, তেমনি

আবার প্রাচ্য সময়ভাবনার মধ্যেও একমুখিতার আভাস আছে—যেমন ভারতীয় বিশ্বাসে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের ধারণায়। এ যুগের প্রখ্যাত ধর্ম-শাস্ত্রী মির্চা ইলিয়াডি (Mircea Eliade) তাঁর 'কস্‌মস অ্যাণ্ড হিস্ট্রি'[১৬] গ্রন্থে সার্থকভাবে দেখিয়েছেন যে, আবর্তনশীল সময়ের এই ধারণা মূলত আদিম মানব-সমাজের বিশ্বাস, ইলিয়াডির (অর্থাৎ তাঁর বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের) কথায় "archaic" বা "ahistorical" সমাজের বিশ্বাস, আধুনিক "historical" সমাজের বিশ্বাস নয়। ইলিয়াডি দেখিয়েছেন যে, "continuous time"-এর ধারণা এই সব সমাজে "profane" বলে গৃহীত, তাই তা স্বীকৃত হয়নি। আরও কারণ এই যে, এই সব সমাজের বিশ্বাসে জীবনের কোনো ঘটনাই চূড়ান্ত ও নিজের সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত নয়। এবং তার পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী, ইয়েট্‌সের Lapis Lazuli কবিতার পঙ্‌ক্তিতে যেমন বলা হয়েছে, "All things fall and are built again / And those that built them again are grey"। ইলিয়াডির কথাই তুলে দিই

...any form whatever, by the mere fact that it exists as such and endures, necessarily loses vigour and becomes worn; to recover vigour, it must, be reabsorbed into the formless if only for an instant ; it must be restored to the primordial unity from which it issued ; in other words, it must return to "chaos" (on the cosmic plane), to "orgy" (on the social plane), to "darkness" (for seed).[১৭]

জীবন থেকে মৃত্যুর অভিমুখিতা, আবার তার পরেই রেজারেকশন বা পুনরুত্থান, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থেকে বিপর্যয়, বিপর্যয়ের পর আবার সুসংগঠিত পুনরুদ্ধার—আদিম বিশ্বাসে এই 'ভবচক্র'-এর কোনো ক্ষতি ঘটতে পারে না, আবার তার আবর্তনের সৌষম্য কোনো becoming বা পরিণামের দ্বারাও নষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাটকে এই বিশ্বাসের প্রায় সব কটি দিক বিস্তারিত হতে দেখি।

আদিম লোকবিশ্বাসের তথ্য আহরণ করলে সময় ও জীবনের এবং বৃহৎ অর্থে অস্তিত্বের এই চক্র সম্পর্কিত ধারণাটির বহুবিধ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। (জে জি.) ফ্রেজারের[১৮] The Golden Bough গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের[১৯] অনেক জায়গায় জীবন-মৃত্যুর চক্রাবর্তনের এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত নানা ক্রিয়া-

কাণ্ডের বিবরণ আছে। আফ্রিকার আদিম জুলুদের মধ্যে এমন প্রথা ছিল যে, রাজার মুখে বলিরেখা বা মাথায় সাদা চুল দেখা দিলেই তাকে মেরে ফেলা হত। সোফানার কাফ্রি রাজাদের ক্ষেত্রে কোনোরকমের শারীরিক অঙ্গহানি ছিল তাদের প্রাণদণ্ডের অজুহাত। এক্ষেত্রে বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে রাজা আবার নতুন করে জন্মাবেন। ফ্রেজারের কথায়—"The killing of the god that is, of his human incarnation, is therefore a necessary step to his revival or resurrection in a better form."[২০] নির্দিষ্ট সময়ের শেষে রাজা বা পুরোহিতের প্রাণদণ্ড এমন কিছু দুর্লভ ছিল না। ফ্রেজারের বইয়ের আদোনিস, আত্তিস (Attis), ওসাইরিস (Osiris) এবং গ্রিসের ডায়োনিসাস (দিয়োন্যুসস্) প্রভৃতি দেবতার কাহিনী এই নিসর্গচক্রেরই দৈবী রূপান্তর বলে স্বীকৃত হয়েছে। এরা সকলেই অবস্থান বা উৎসের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যুক্ত।

এর আগে আদিম লোকবিশ্বাস কথাটা আমরা খানিকটা শিথিল অর্থে ব্যবহার করেছি। যে-বিশ্বাস ঋতুচক্রের আবর্তনের ব্যাপারটাকে নিসর্গের অমোঘ নিয়ম বলে সিদ্ধান্ত করে সে বিশ্বাস কতটা আদিম? একেবারে আদি বর্বর যে-মানুষ পশুর চেয়ে নামমাত্র উন্নত ছিল, কিন্তু পশুর মতোই যে ছিল ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রজননের উপস্থিত উপলক্ষ্যে বন্দী, যার না ছিল অতীত সম্বন্ধে বোধ, না ছিল ভবিষ্যতের ধারণা—সে কি বছরের পুরো ছবিটা একসঙ্গে ধরতে পারত চিন্তায়? ফ্রেজারের বিশ্বাস, পারত না। ফ্রেজার বলেছেন, মানুষের আয়ুষ্কাল যেহেতু মাত্র কয়েক বছরের, একটা পুরো বছর তার কাছে বড়ো সামান্য সময় নয়। দিনরাত্রির চক্রাবর্তনের ব্যাপারটা মানুষ বহু আগেই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলে বুঝতে শিখেছে, ফলে রাতের পরে ভোর হবে কি না—এ নিয়ে পৃথিবীর আদিমতম মানুষও বোধ হয় আতঙ্কিত হয়নি। কিন্তু 'annual cycle of the seasons'-এর ঘটনাটা একটু আলাদা। প্রথমত এক বছর একটা দীর্ঘ সময়খণ্ড। দ্বিতীয়ত 'the Primitive Savage'-এর স্মরণশক্তি ছিল যেমন কম, তেমনই সময়ের ধারাবাহিকতাকে টুকরো-টুকরো করে দিন সপ্তাহ মাস ঋতু ইত্যাদির লেবেল লাগানোর জন্য যে মানসিক প্রকর্ষ দরকার, তা সে তখনও উপার্জন করে উঠতে পারেনি। ফলে বছরের বৃত্তাকার চরিত্র তার ধারণাতেই আসত কি না সন্দেহ। ফ্রেজারের চিত্তাকর্ষক অনুমান তাঁর নিজের ভাষাতেই তুলে দিই…"To the primitive Savage...a year may well have been so long that he

failed to recognise it as a cycle at all, and watched the changing aspects of earth and heaven with a perpetual wonder, alternately delighted and alarmed, elated and cast down, according as the vicissitudes of light and heat, of plant and animal life, ministered to his comfort or threatened his existence[২১]। হেমন্তের পত্ররিক্ত কঙ্কালসার গাছ দেখে কি সে ভাবতে পারত আবার তার ডালপালা সবুজ পাতায় ভরে যাবে? সূর্যের দক্ষিণদিকে ক্রমশ হেলে-পড়া, চন্দ্রকলার ক্ষয় হতে-হতে জ্যোৎস্নাহীন অমাবস্যার অভ্যুদয় দেখে তার কি আতঙ্ক হত না? নিশ্চয়ই হত। তাই আদিম বর্বর মানুষ উদ্ভাবন করেছে নানা অভিচার, নানা জাদু-নির্ভর অনুষ্ঠান, যাতে গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বৃষ্টি নামে, যাতে শীতের পর বসন্ত আসে—নিসর্গের গতিবিধির উপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করবার লোভে। অস্ট্রেলীয় বসন্তের আবির্ভাবের প্রাগ্‌ভূমিকা হিসাবে মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা প্রকৃতির সুপ্ত ও জড়তাপ্রাপ্ত শক্তিকে নতুন করে জাগিয়ে তোলবার জন্য অনুষ্ঠান করে। এ অনুষ্ঠানে, কিংবা উত্তর আমেরিকার মধ্যাঞ্চলীয় এস্কিমোদের গ্রীষ্ম ও শীত বেশী দুই ব্যক্তির মধ্যে যুদ্ধের রিচুয়ালে আছে আদিমানবের প্রাথমিক সরল বিশ্বাস। অন্যদিকে খ্রিষ্টীয় ইয়োরোপের বিশ্বাস-ভিত্তিহীন নানা প্রাক্-খ্রিষ্টীয় কার্নিভ্যাল বা উৎসবের মধ্যেও ঋতুচক্রের আবর্তনটিই কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। কিন্তু সেগুলি আর ধর্মীয় অর্থে রিচুয়াল নয়, অভিনয়ের অর্থে রিচুয়াল মাত্র। ফ্রেজার এ ধরনের একাধিক উৎসবেরও বিবরণ দিয়েছেন তাঁর বইয়ের "The Killing of the Tree-Spirit" অংশে (Chap. XXVIII)। "Burying the Carnival", "Carrying out Death", "Battle of the Summer and the Winter", "Death and Resurrection of Kostrubonko"[২২], ইত্যাদি নানা চেহারায় মূলত এই বসন্ত উৎসবগুলি ইয়োরোপের নানা জায়গায় উদ্‌যাপিত হয়। জার্মানির বোহেমিয়া অঞ্চলে শিশুরা খড়ের তৈরি মৃত্যুর মূর্তি নিয়ে গ্রামের প্রান্তে যায়, তারপর মৃত্যুর অগ্নিসংকার করতে করতে এই গান গায়

> Now carry we Death out of the village,
> The new Summer into the village.
> Welcome, dear Summer,
> Green little corn.[২৩]

বোহেমিয়ারই অন্যত্র অনুরূপ অনুষ্ঠানের পর গান গাওয়া হয়

We have carried away Death
And brought Life back
He has taken up quarters in the village,
Therefore sing joyous songs.[২৪]

সুইডেনের নানা শহরে মে-ডে-তে আগে ঘোড়সওয়ার দুদল যুবক-বাহিনীর লড়াই হত—একদল শীতের সৈন্যদল, অন্যদল গ্রীষ্মের।[২৫] এইসব নাটকায় উৎসবে যদি-বা শীত এবং গ্রীষ্মকে (ফ্রেজারের বর্ণনা থেকে যতটা অনুমান করা সম্ভব) দুটি আলাদা সত্তা হিসাবে ধরা হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ এবং একের উদয়ে অন্যের বিলয় কল্পনা করে, রাশিয়ার বসন্ত-দেবতা কোস্ত্রুবোঙ্কো-র উৎসবে কিন্তু এ দুটি পৃথক নয়—বরং কোস্ত্রুবোঙ্কোর মৃত্যুও তার পুনর্জন্মেরই অন্য নাম।[২৬] অর্থাৎ ওই উৎসবগুলিতে বছরের আবর্তনের দুটি বৃহৎ ঘটনাকে যতটা অসংসক্ত বা discrete হিসাবে দেখানো হয়েছে রাশিয়ার উৎসবে শীত ও বসন্ত ততটা অসংসক্ত নয়, একই ধারাবাহিকতার দুটি পর্যায় মাত্র।

পরের অধ্যায়ের শুরুতে ফ্রেজার একটু সরলভাবে বৎসরাবর্তনের ঘটনার সূত্রে আদিম মানুষের ভাবনার অগ্রগতির একটি ছক এঁকে দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রথমে আদিম মানুষ ভেবেছিল ঋতুর এই পরম্পরা তার জাদুশক্তিরই নিয়ন্ত্রণে ঘটছে ; পরে সে একটু গভীরভাবে ভেবে বুঝতে পারল যে, তা নয়, এই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে আরো মৌলিক সব কারণ। ঐ কারণগুলিকে মানবরূপী (অ্যান্থ্রো-পোমরফিক) চেহারা দিয়ে তারা তাদের নাম দিল দেবতা—আদিম মানুষ আদি ম্যাজিক থেকে ধর্মবিশ্বাসে উত্তীর্ণ হল।[২৭] কাজেই ঋতুপরিবর্তনের প্রাচীন জাদু ও মন্ত্রবিশ্বাস-নির্ভর ধারণার সঙ্গে যোগ দিল দৈবী ধারণা।

আমরা আদোনিস ইত্যাদি দেবতার বিস্তারিত জীবনচক্রের পরিচয় দেব না—কৌতূহলী পাঠক ফ্রেজারের বই দেখে নেবেন। শুধু এইটুকু পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেব যে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ১৯২৫-এ একটি 'নটরাজ'-এর আবির্ভাব ঘটল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই নটরাজ ও শিবের অভিন্নতা স্বীকার করে এই পরিকল্পনার একটি পূর্বসূত্র দেখিয়েছেন, বলেছেন ১৯২০-২১-এ মার্কিন দেশ ভ্রমণকালে সেখানকার অর্থ-সচ্ছলতা-গৃধ্নু বস্তুকামী[২৮] ঘোড়দৌড়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন অপরিসীম ক্লান্তি ও দৈন্য বোধ করেছিলেন তখন তাঁর শিবের স্তব করার তীব্র ইচ্ছা জেগেছিল[২৯]। প্রভাতকুমার নটরাজ ও শিবের ঐক্য দেখিয়ে

লিখেছেন, "নটরাজ নৃত্যময় শিব"। অনুমান করেছেন রবীন্দ্রনাথের এই মৌলিক ভাবকল্পনার "প্রেরণা দক্ষিণী নটরাজের মূর্তি ও দক্ষিণী নটদের নৃত্য দেখিয়া বহু পরিণামে উদ্বোধিত"[৩০]। প্রভাতকুমার এও দেখিয়েছেন, 'শেষ-বর্ষণ'-এর নটরাজ আর 'ঋতুরঙ্গশালা'-র নটরাজ দুটি আলাদা সত্তা[৩১]। প্রথম নটরাজ একজন কবি ও গানের ব্যাখ্যাতা মাত্র, অনেকটা সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মতো। আর এই দ্বিতীয় নটরাজ রুদ্র শিব। এ শিবের পরিকল্পনায় কালিদাসের 'কুমার সম্ভব'-এর শিবের প্রভাব থাকাও অভাবনীয় নয়। হিন্দুধর্মের শিব-কল্পনার এই সম্প্রসারণের কোনো পূর্বাভাস ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যে আমাদের চোখে পড়েনি, কিন্তু ফ্রেজারই এক জায়গায় ভারতে ইয়োরোপীয় বসন্ত-উৎসবের অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের কাংড়া জেলায় 'রালি কা মেলা' উৎসবে কুমারী মেয়েরা চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিব ও পার্বতীর রং করা মাটির মূর্তি পুজো করে, এবং দূর্বাঘাসের স্তূপ তৈরি করে (প্রজনন-প্রতীক ?) তার চারদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গান গায়, এবং নানা অনুষ্ঠানের শেষে শিব ও পার্বতীর বিয়ে দেয় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে। যদিও এ উৎসবের প্রত্যক্ষ অভীষ্ট হল কুমারীদের যোগ্য পতিলাভ, ফ্রেজার বলছেন শিব ও পার্বতী এখানে আসলে 'spirit of vegetation' হিসাবেই মূলে গৃহীত হয়েছিল।[৩২] হয়তো বাংলা লৌকিক কাব্য 'শিবায়ন' ইত্যাদিতে শিবের চাষবাসের আখ্যানে তাঁর উদ্ভিদ্-জগতের সঙ্গে সেই আদি সম্বন্ধটি স্মরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই লৌকিক শিব, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের নটরাজ নন।

৪.

ইয়োরোপের বসন্ত-উৎসবে শীত-বসন্ত জীবন-মৃত্যুর রূপক কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে (পশ্চিম এশিয়া) উদ্ভূত নানা দেবতার পরিকল্পনার মধ্যে যে-জিনিসটি আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এই যে, এখানে একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় রূপান্তর সাধারণভাবে তীব্র, অমসৃণ এবং সংঘাতময় (violent)। ইয়োরোপের বসন্ত উৎসবে শীত-গ্রীষ্মের সংগ্রাম হয় এবং শীত পরাভূত হয় অনেক জায়গায়। গ্রাম থেকে মৃত্যুরূপী শীতকে বার করে দেওয়া হয় বোহেমিয়াতে। ব্যাবিলোনিয়া ও সিরিয়ার দেবতা তাম্মুজ, গ্রিক জগতে যার নাম হয়েছিল আদোনিস—তার মৃত্যু ঘটে বন্য শূকরের হাতে। ফ্রিজিয়া অঞ্চলের দেবতা আত্তিসেরও মৃত্যু আঘাত ও রক্তপাতের ফলে ঘটেছিল। ওসাইরিসের মৃত্যু

হয়েছিল তার দেহের মাপ অনুযায়ী তৈরি করা একটি সিন্দুকে বদ্ধ হয়ে। তার ভাই সেৎ-এর কৌশলে সে তাতে ঢুকেছিল নেহাৎ কৌতূহলবশে। কিন্তু ঢোকামাত্রই বন্ধ করে এতে পেরেক মেরে দেওয়া হয়, সিসে গলিয়ে এটি ভরে দেওয়া হয়। তারপর সে সিন্দুক ভাসিয়ে দেওয়া হয় নীল নদের জলে। ওদিকে গ্রিকদের সুরা, ভোজ্য ও নাট্যকলার দেবতা ডায়োনিসাসকে তার শত্রু টাইটানরা ছুরি দিয়ে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলে।

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-নাটকে ঋতুর পরিবর্তন এমন সংঘাত-সংকুল বা violent যে নয়, তা আমরা দেখেছি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন···"গ্রীষ্ম-বর্ষা, শীত-বসন্ত, কেহ কাহারও বিরুদ্ধে নহে, এক অপরের মধ্যে সার্থক—পরস্পরের মধ্যে আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের অনন্ত পর্যায় চলিয়াছে"।[৩৩] এরই নাম তিনি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়বাদ। কিন্তু গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিনটি ঋতুর বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ খানিকটা violence বা রুদ্রতার সংযোজন করেছেন। বৈশাখের প্রলয়ের শাঁখ আহ্বান করেছেন তিনি, যুদ্ধ ও আক্রমণের চিত্রকল্পও ফুটছে কোথাও কোথাও—

শুষ্কপথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।

কোথাও বা তাণ্ডব নৃত্যের চলচ্ছবি—

বাজায় ডমরু তব তাণ্ডবে
গুরুগুরু মেঘ মন্দ্রিয়া,—
দিগ্‌বধূ যত হাহাকার রবে
দুর্দাম ওঠে ক্রন্দিয়া।

বর্ষাতে দেখি এই অস্থিরতার উদ্ভাস—

শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি ওঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে ;

মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা ঝঞ্ঝার দামামা
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন…

গীতের প্রতি প্রার্থনাতেও দেখি ঐ রুদ্রতার আকাঙ্ক্ষা, এক বিচিত্র মর্ষকামিতা

বাজুক তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্বলেরে করো তিরস্কার; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো; হিমশ্বাসে
আরাম করুক ধূলিসাৎ। হে নির্মম
গর্বহরা, সর্বনাশা, নমো নমো নমঃ।[৩৪]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত নতুন পুরাণে বিশ্বপুরাণের মতোই এই দুঃখ, ধ্বংস, মৃত্যু সবই এক 'লীলা'র অঙ্গ। 'ফাল্গুনী'তে কবিশেখর বলছে, "আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখদুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্য।"[৩৫] 'নটরাজ'-এও দেখি রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি "সুখেদুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।" সেখানে যিনি 'সন্ন্যাসী' তিনিই আবার 'সুন্দর', তিনি একাধারে শংকর ও ভয়ংকর, তিনি যুগে যুগে জলদমন্দ্র স্বরে জীবনমরণ নাচের ডম্বরু বাজান। তাঁরই লীলায় বৈশাখের পিনাকের টংকারে ভীষণে মধুরে ঝংকার জাগে, ভালোমন্দ মিশে একাকার হয়ে যায়।

৫.

'নটরাজ'-এর স্বরূপের বিস্তৃত অনুসন্ধান বা অবলোকন এখানে আমাদের পরিকল্পনা নয়। বরং এ প্রবন্ধের শেষে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে এর কী যোগ, তার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করব। তার আগে আরো একটি জিনিস দেখা দরকার। এ কথা সকলেই জানেন যে, আদিম বা প্রায়-আদিম লোকবিশ্বাসে ঋতুচক্রের যেমন একটি রূপক-তাৎপর্য বা দৈবী অর্থ তৈরি হয়ে গিয়েছিল তেমনি পৃথিবীর আদিমতম নাটকগুলিও মূলত এই বৎসর-নাটক (year play) বা ঋতুবদলের নাটক হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। হানিংগার লিও ফ্রোবেনিয়স-এর কথা তুলেছেন এই নাট্যক্রিয়ার

মূল সূত্র হিসাবে—"the actual fact of natural rhythm in growth and decline seized upon their inward understanding and this in turn led to compulsive and reflex action."[৩৬] আদিম মানবের জীবন-মরণ যেহেতু ঋতু-আবর্তনের প্রত্যাশিত সুনিয়মের উপর নির্ভর করত, তার প্রাথমিক অনুষ্ঠানে এবং শিল্পেও তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। বস্তুতপক্ষে রিচুয়াল প্রায় রিচুয়াল হিসাবেই এ পর্যন্ত জ্ঞাত পৃথিবীর প্রাচীনতম নাটকে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রাচীন মিশরের মন্দিরে অভিনীত 'King-drama'-তে রাজার মৃত্যু, উত্তরাধিকারীর মধ্যে তার পুনরুত্থান, নতুন রাজার অভিষেক—এ সব উপাদানই আছে। ওসাইরিসের কাহিনী-বৃত্তকে আশ্রয় করেই তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দেরও আগে এসব নাটক তৈরি হয়েছিল। হানিংগার ফ্রেজারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়োরোপের নানা আখ্যান ও উৎসব-উদ্‌যাপনের মধ্যে এই প্রাক্-খ্রিষ্টীয় 'year-drama'-র স্মৃতি সন্ধান করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, হিব্রু আসিফ, গ্রীক পার্সিউস থেকে সেণ্ট জর্জ ও ড্রাগনের কাহিনী পর্যন্ত সবই হল "an image and myth of summer's battle and trumph over winter performed in ritual."[৩৭]

এই বিশ্বনাট্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গশালা'র ভাবগত মিল ও অমিল আমরা দেখেছি। অমিলের চেয়ে মিলের অংশ এত বেশি যে, মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে পৃথিবীর আদ্যতম নাটকের ওই স্মৃতি থেকে নিজের নাট্যরচনার একটি বৃহৎ সূত্র গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের মতো করে তার রূপ তৈরি করেছিলেন। এই রূপে সংগীত ও নৃত্যের প্রাধান্য থাকতে বাধ্য, কারণ রিচুয়ালে একটা বড়ো ভূমিকা পায় সংগীত ও নৃত্য। তার উপর এই নাটক এক হিসাবে communal বা গোষ্ঠী-ভিত্তিক, অর্থাৎ community-র জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত শক্তি ও ঘটনা নিয়েই এ নাটক। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি যে রূপক বা allegory-র স্বভাব গ্রহণ করে, তার কারণ নিহিত রয়েছে এগুলির গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যেই। রূপক ভাষার মতোই প্রাথমিক ও সাধারণভাবে সমাজের সৃষ্টি, ব্যক্তির একার সৃষ্টি নয়। কখনো বা একটি দল বা যূথ যে একটি চরিত্র হয়ে যায় এ নাটকে,—তাও ওই গোষ্ঠীর অংশগ্রহণেরই স্মৃতি। অন্যদিকে এগুলির আবেদনও ব্যক্তির একার কাছে নয়, ব্যক্তিকে অতিক্রম করে বৃহৎ সমাজের কাছে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য ও ঋতুসংগীতগুলির[৩৮] জনপ্রিয়তার কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু সে জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই তাঁর

অন্যান্য নাটকের তুলনায় অনেক বেশি। ইদানীং তো রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যের থিমকে বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করেও ঋতুনাট্য বা 'পালা' রচিত এবং পরিবেশিত হচ্ছে, এবং গ্রামোফোন কোম্পানিও এ ধরনের কিছু লং প্লেয়িং রেকর্ড বার করছেন। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে ও আদানপ্রদানের একটি খুব মৌলিক সংস্কারকে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এই যে নাটকগুলি রচনা করলেন, তার পিছনে কি ফ্রেজারের The Golden Bough বইটি পড়ার প্রভাব ছিল? বইটি তিনি পড়েছিলেন এমন কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ হাতে না থাকায়[৩৯] এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা শক্ত। তবে বইটি বারো খণ্ডে বৃহৎ আকারে বেরিয়ে যায় ১৯১১ নাগাদ, তারপরে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু অংশ পড়ে ফেলা খুব অসম্ভব নয়। নাকি পরে সুইডেনে ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যে লোকনৃত্য দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন প্রভাতকুমার[৪০] সেই ধরনের কোনো উৎসব ছিল তাঁর স্মৃতিতে? মেপোল উৎসব যেন 'রক্তকরবী'র বস্তুতে উঁকি দিয়ে যায় বারবার।

৬.

এই ঋতুনাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন-সংক্রান্ত তত্ত্বের কতকগুলি বিশেষ সূত্র প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত দেখি, তাঁর মতে পরিবর্তন আসলে নিত্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; ফলে এ পরিবর্তন নয় violent বা সংঘাতময়, এবং যেটুকু violence তাতে ঘটছে তা বিশ্বশক্তির 'লীলা' বা রঙ্গের অংশ। নূতন-পুরাতন, বার্ধক্য-যৌবন, জীবন-মৃত্যু এই অবস্থা-যুগ্মকগুলির সম্পর্ক নির্ণয়েও তাঁকে কয়েকটি ধাপ পেরোতে দেখি। চিন্তার একটা স্তরে তিনি আভাস দেন যেন এগুলি একটি আরেকটার অব্যবহিত পরবর্তী। তারপরে ইঙ্গিত দেন পুরাতন, বার্ধক্য এবং মৃত্যু যথাক্রমে নূতন, যৌবন এবং জীবনেরই অন্য রূপ—ছদ্ম রূপ। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বোধে সময়ের বা পরিবর্তনের যে আরেকটি রূপ—খণ্ডিত বা discrete রূপ—তা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবেই বর্জন করেন। শেষে অন্য একটা স্তরে ঐ বিরোধী বাস্তবগুলির সমীভবন বা identification ঘটে রবীন্দ্রনাথে। এর সঙ্গে আরো যুক্ত হবে, নটরাজ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—ভয়ংকর=শংকর, সন্ন্যাসী=সুন্দর, (অন্যত্র রুদ্র=সুন্দর, ধ্বংস=সৃষ্টি বা সৃষ্টির উপক্রম) বা কুৎসিত ও সুন্দর ('রাজা'), দুঃখ ও আনন্দ, অমঙ্গল ও মঙ্গল সম্বন্ধে তাঁর সামীপ্য বা ঐক্যের বোধ। এ প্রবন্ধে সে-সব আলোচনার পরিসর নেই, শুধু ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হতে হবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. 'শারদোৎসব' (১৯০৮/১৩১৫), 'ফাল্গুনী', (১৯১৪/১৩২১) 'বসন্ত' (১৯২২/১৩২৯), 'শেষ বর্ষণ' (১৯২৫/১৩৩২), 'নটরাজ : ঋতুরঙ্গশালা' (১৯২৬/১৩১৩), 'নবীন' (১৯৩০/১৩৩৭) এবং 'শ্রাবণগাথা' (১৯৩৪/১৩৪১) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিসর্গবৃত্ত-নির্ভর নাটক। রবীন্দ্রনাথের গানে এবং কবিতায় ঋতু-আবর্তনের বিচিত্র নাটকীয়তা 'খুব সূক্ষ্ম ও হৃদ্য পরম্পরায় ধরা পড়েছে, কিন্তু সেগুলি আমাদের মূল আলোচ্য নয়।

২. 'গীতবিতান'-এ প্রকৃতি অংশে বর্ষার গানের সংখ্যা ১১৫, বসন্তের গান ৯৬টি।

৩. 'শেষ বর্ষণ'-এ রাজা, নটরাজ (এ নটরাজ, 'নটরাজ : ঋতুরঙ্গশালা'র নটরাজ নয়) ইত্যাদি ; 'বসন্ত'-এ রাজা, কবি ; 'নবীন'-এ মনোলগ উচ্চারণকারী কবি ; 'শ্রাবণগাথা'য় রাজা, সভাকবি ও নটরাজ।

৪. এই ডায়ালেকটিক পদ্ধতির ইঙ্গিত পাই 'শেষ বর্ষণ'-এর রাজা ও নটরাজের সংলাপে :

নটরাজ। ···মহারাজ, দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা। নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কসুর কর না।

নটরাজ। আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা। আর আমার হল তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হল নুড়ি, দুয়ে মিলেই তো ঝরনা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ।···

নটরাজ। এবার বুঝেছি আপনি ছদ্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন।

দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১, ৫ম খণ্ড ৬১২ পৃষ্ঠা। এর পর থেকে সবই রর/খণ্ড/পৃষ্ঠা—এই ক্রমে নির্দেশিত হবে।

৭. রর/৫/৬১৫।

৮. রর/৫/৬২০।

৯. "কালের যাত্রা", 'কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', ১৯৬৯, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ৭৭ পৃষ্ঠা। আরো দ্রষ্টব্য, "ঋতুমণ্ডল ও রক্তকরবী", ১৩৮-৪৫ পৃষ্ঠা।

১০. রর [বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৫০] /১৫/৩৪৩।

১১. তদেব, ৫৪৫—৪৭।

১২. তদেব, ৫৪৮।

১৩. রর/৬/২০৪।

১৪. দ্র. Strauss, Levy, "The Structural Study of Myth", Thomas A Sebeok সম্পাদিত *Myth, a Symposium* (ইণ্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন, ১৯৫৫), ৮৪ পৃষ্ঠা।

১৫. মার্কিনিদের সময় সম্বন্ধে ধারণা কী, এ সম্বন্ধে এডোয়ার্ড টি. হল্-এর বিবৃতি উল্লেখযোগ্য…"Americans think of time as a road or a ribbon stretching into future, along which one progresses. The road has segments or compartments which are to be kept discrete ("one thing at a time")." দ্রষ্টব্য, Hall. Edward T. *The Silent Language, 959*. Greenwich, Conn., Fawcett Publications, Inc., (A Premier Book), P. 19.

১৬. ইলিয়াডির গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের নাম *Cosmos and History : The Myth of the Eternal Return*. Trask, Willard R-এর অনুবাদে নিউ ইয়র্কের হারপার থেকে ১৯৫৯-এ বেরিয়েছে। এ বইটি দেখার সুযোগ পাইনি আমি—এর কথাগুলি সবই নিয়েছি এন. য়োসেভ ক্যালারকো (Calarco)-লেখা *Tragic Being* বইটি থেকে। প্রকাশক ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা প্রেস, (মিনিয়াপোলিস), ১৯৬৮। দ্র. পৃ. ৪-৫।

১৭. তদেব, ৫ পৃষ্ঠা।

১৮. লণ্ডন, ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং, ১৯২১। এ লেখায় ১৯৬৩-র পেপারব্যাক সংস্করণ ব্যবহৃত।

১৯. ফ্রেজারের অনেক সিদ্ধান্ত—যেমন পৃথিবীর সব মানবগোষ্ঠীকেই একই ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে, ইত্যাদি আজকাল যে পরিত্যক্ত হয়েছে তা সকলেরই জানা। আমি মূলত তাঁর দেওয়া তথ্য ব্যবহার করেছি—যে পরিমাণে তাঁর তথ্যকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক করে আনা আমার পক্ষে সম্ভব, সেই পরিমাণে অন্তত।

২০. The Golden Bough, পূর্বোক্ত সংস্করণ, ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

২১. তদেব, ৪২৩ পৃষ্ঠা।

২২. তদেব, পৃ. ৩৮৯-৪২৬।

২৩. তদেব, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

২৪. তদেব, ৪০৮ পৃষ্ঠা।

২৫. তদেব, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

২৬. তদেব, ৪১৮ পৃষ্ঠা।

২৭. তদেব, ৪২৬-২৭ পৃষ্ঠা।

২৮. পরে 'রক্তকরবী'র আকর্ষণজীবী সভ্যতার পরিকল্পনায় ঐ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপণ ঘটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জনৈক মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক তাঁর নিজের সমাজকে একটি বইয়ে 'The Acquisitive Society' রূপেই বিশেষিত করেছিলেন।

২৯. রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী (১৩৫৯), ১১৬ পৃষ্ঠা। প্রভাতকুমার এনড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ব্যবহার করেছেন এসব তথ্যের জন্য।

৩০. তদেব, ২০৫ পৃষ্ঠা।

৩১. তদেব, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৪২১ পৃষ্ঠা।

৩৩. রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ, ২০৫ পৃষ্ঠা।

৩৪. সমস্ত উদ্ধৃতি 'নটরাজ : ঋতুরঙ্গশালা' থেকে।

৩৫. রর/৬/৪৫০।

৩৬. Hunningher, Benjamin *The Origin of the Theatre,* 1961, New York, Hill and Wang, ১৩ পৃ.। Leo Frobenius-এর মূল জার্মান বইয়ের (Schickalskunde im Sinne des Kulturwerdens) ১৪২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি।

৩৭. তদেব, ৯৮ পৃষ্ঠা।

৩৮. ঋতুসংগীতগুলি সবই বিশেষ বিশেষ নাটকের অংশ হিসাবে একসঙ্গে রচিত হয়নি, তা আমরা জানি। কখনও কখনও পুরনো কিছু গানের চারদিকে কথা বুনেই এ ধরনের নাটক দাঁড় করিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তা সত্ত্বেও, এ প্রবন্ধে নাটকগুলিকে একটি অখণ্ড এবং এককালিক রচনা বলেই ধরা হয়েছে। আর, পাঠকেরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে লক্ষ করেছেন যে, নাটক

বলতে অ্যারিস্টটলীয় সংস্কারের দ্বন্দ্বসংঘাতময় পূর্ণাঙ্গ আখ্যান এবং চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি উপাদানবিশিষ্ট structured নাটকের সংকীর্ণ ধারণাকেও এ প্রবন্ধে গ্রহণ করা হয়নি।

৩৯ আমি নিজে বিশ্বভারতীতে গিয়ে বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখিনি। তবে ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—যাঁর রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা বিষয়ে প্রবন্ধ আছে—আমাকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, ও বইটি রবীন্দ্রনাথ যে পড়েছিলেন এমন কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই।

৪০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' তৃতীয় খণ্ড, ৫৬ পৃ.

অভিনয়, প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথ

১. ভূমিকা

জার্মানির ভাইমার রাজ্যের ডিউক কার্ল আউগুস্ট-এর যে ছোট্ট থিয়েটারটি মহাকবি গয়টে-র হাতে ছিল, তার সম্বল ছিল যৎসামান্য। ডিউক নিজেই বেশ গরিব ছিলেন, কাজেই তাঁর থিয়েটার যে গরিব হবে তা আর বেশি কথা কী? ঢিলেঢালা উইংস, একটা পুরোনো ব্যাকক্লথ, আসবাবপত্রের সংখ্যা শূন্য। পোশাক-টোশাকের কথা না তোলাই ভালো, শহরের থিয়েটারের পুরানো নোংরা পোশাক কিনে এনে কাজ চলত। অভিনেতাদের ক্ষমতাও ছিল স্বল্প। গয়টে নিজে একটি 'অভিনয়ের নিয়মাবলি' রচনা করেছিলেন তাদের জন্য, তাতে বলেছিলেন কীভাবে স্টেজে চলাফেরা করতে হয়, বুঝিয়েছিলেন কী ধরনের ভাবভঙ্গি দেখতে খারাপ লাগে চোখে—অভিনেত্রীরা যেন নিজেদের ছোট্ট পয়সার বটুয়া স্টেজে না নিয়ে আসে, অভিনেতারা যেন স্টেজের উপরে সশব্দে নাক না ঝাড়ে। কিন্তু হলে হবে কী? গয়টে যতই তাদের নিয়মকানুন শেখাতে যান ততই অভিনেতাদের ভাবভঙ্গি কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। তার জন্য অবশ্য তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই, নিজের থিয়েটারকে তিনি একটি অসামান্য সফল প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করেন। যদিও অন্যেরা কী মনে করে সে আরেক কথা। অভিনেতাদের বেতন এত কম যে, ভালো অভিনেতা আসেই না থিয়েটারে। এক অভিনয়ে একটি অভিনেত্রীর উপর রেগে উঠে নায়ক মারধোর শুরু করে দিল, পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। এসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর মধ্যে দিয়েই থিয়েটার চলছে, অভিনীত হচ্ছে পৃথিবীর মহত্তম নাটকগুলির একটি—'ফাউস্ট'।

আশ্রিত গয়টে-র পক্ষে যে অসুবিধাগুলি ছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার অধিকাংশই অনুপস্থিত। সম্বল, সহায়তার অভাব তাঁর ছিল না। অন্তত কয়েকজন শক্তিমান প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা তাঁর হাতের কাছেই ছিলেন। তাঁরা বেতন প্রত্যাশায় অভিনয় করতে আসেননি, এসেছিলেন শখ বা শিল্পের

জন্য। বর্ণশিল্পী ছিলেন কাছে, সংগীতজ্ঞ ছিলেন, ছিলেন নৃত্যবিশারদ আনন্দ-পিপাসুর দল—চতুর্দিকেই সর্বাঙ্গীণ সহযোগ, তাই তাঁর হাতে কয়েকটি মহৎ নাটকই শুধু যে রূপ নিল তা নয়, সৃষ্টি হল বাংলাদেশের প্রথম পরিণত থিয়েটার—একমাত্র থিয়েটার, যা প্রত্যেকটি কালের সঙ্গে সমকালীন, প্রত্যেকটি নাটকীয় রূপবন্ধের আত্মীয়, অথচ কোনোটাতেই চিরস্থায়ীরূপে রুদ্ধ নয়। সার্বত্রিক, সার্বভূমিক। থিয়েটারকে *picture-frame* স্টেজের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার, বা অন্য বিকল্প মঞ্চ তৈরি করে প্রযোজনায় ব্যাপকতর স্বাধীনতা আবিষ্কার করার, যে ইচ্ছা ক্রমশ জেগে উঠেছিল এপ্রন স্টেজ, এরিনা থিয়েটার থেকে শুরু করে 'হানামিচি' ধরনে মঞ্চ থেকে দর্শকদের মধ্যে পথ বার করে দেওয়ার চেষ্টায়, *Theatre in the round*-এর প্রবর্তনায়; বা ব্যাপকভাবে প্রতীকী মঞ্চ-পরিকল্পনায় থিয়েটারের শুদ্ধতম রূপকে পাওয়ার যে আগ্রহ আছে—রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনা তাতে অনায়াসেই প্রেরণা জোগাতে পারে। এ শুধু পুরাতনের মধ্যে ফিরে যাওয়া নয়—নাটকের শুদ্ধতম নিষ্কর্ষটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা। যাঁরা বলেন *Theatre in the round* আসলে এক ধরনের 'যাত্রা' মাত্র, তাঁরা একথা ভুলে যান যে, 'যাত্রা' তার নিজস্ব ফর্মের শুদ্ধতা বিষয়ে সচেতন নয়, তা গৃহীত উত্তরাধিকার মাত্র, আবিষ্কার নয়। ওই সব মঞ্চরূপ যে অর্থে শুদ্ধ, তা বোধের মধ্যে পেতে হলে, খানিকটা 'অশুদ্ধতার' স্তর পেরিয়ে আসা দরকার। পৃথিবীর নাটক সেই পরিক্রমা করেছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, তিনি তাঁর একার জীবনের মধ্যে এই পরিভ্রমণ শেষ করেছেন। পৃথিবীর আর খুব কম নাট্যকার বা প্রযোজক সম্বন্ধেই একথা বলা যাবে। ইবসেন বা স্ট্রিণ্ডবার্গএর নাম প্রথমেই মনে আসছে, তবে এ দুয়ের মধ্যে স্ট্রিণ্ডবার্গ-এর উত্তরণ আরও স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো করে নাটকীয়তার ঐ archetype-টিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর জীবনের প্রযোজনা ও অভিনয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যটি বিস্ময়করভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২. নতুন নাট্যপ্রযোজনা, তার চরিত্র

কালানুক্রম অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনাকে স্থূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। আবার ভূগোল ও সংগঠনের দিক থেকে হয়তো তিনটি পর্যায়—কলকাতার প্রথাগত প্রযোজনা, শান্তিনিকেতনের নবীন ভাবনা, কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের মিলিত শিল্পরূপ। ১৯১৬-র (১৬ই মাঘ, ১৩২২-এ 'ফাল্গুনী'র

অভিনয়-এর) পূর্ববর্তী সময়ে মূলত তাঁর নাট্যরূপায়ণ ছিল প্রতিরূপাত্মক বা representational, পরবর্তীকালের রূপায়ণ প্রতিরূপণ বর্জিত, প্রতীকী, ব্যঞ্জনাময়। আগের পর্বে গীতিনাট্যগুলিছাড়া অন্য নাটকগুলি ছিল শেক্সপিরীয় আদর্শে তৈরি, সুগঠিত গল্পের কাঠামোতে প্রবল বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তঃসংঘাতময়, আর পরবর্তী নাটকে এই দ্বন্দ্বও ঠিক গল্পের স্পষ্ট কাঠামোর আশ্রয় নিচ্ছে না। কিন্তু ১৯০৮ আগস্ট-সেপ্টেম্বরের (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৫) শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব' অভিনয় থেকে তিনি প্রতিরূপাত্মক রূপায়ণের প্রতি উদাসীন হতে শুরু করেন।

এটা ঠিক যে শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় স্থাপনের (১৯৮১) পর ছোট ছোট ছেলেদের সারা বছরের সিলেবাস-বোঝা বহনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে উৎসব ও আনন্দের আয়োজনে আমন্ত্রণ করার কথাটিও তাঁর মনে আসে। গান আর নাটককে সেই কাজেই তিনি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। শুধু বিনোদনের জন্য নয়, তাঁর কাছে শিক্ষাদানের পদ্ধতিটাই একটা ব্যাপক অর্থ পেয়েছিল, যার মধ্যে পড়াও আছে, আবার নাচ-গান অভিনয় ও অন্যান্য সামাজিক কাজকর্মও আছে, আবার উপাসনাতে যোগদানও আছে। দৈনন্দিন রুটিনেও যে একটি "বিনোদন পর্ব" নির্দিষ্ট হয়েছিল তার উল্লেখ অনেকেই করেছেন, তাতে "হেঁয়ালি-নাট্য" বা charade-গুলির (রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর ছোট নাটিকাগুলির) অভিনয় ছিল প্রায় স্থায়ী অঙ্গ,[১] শান্তিনিকেতনের বালক-ছাত্রদের জন্য রচিত হওয়ার কারণেই সেগুলি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। এই বালকদের প্রতিবেশিত্ব এবং তাদের নাট্যক্রিয়ায় টেনে আনার তাগিদ যে ওই "হেঁয়ালি নাট্য," 'শারদোৎসব,' ইত্যাদি বালক-প্রধান নাটক রচনা এবং 'রাজা' 'অচলায়তন', প্রভৃতি নাটকে ঠাকুরদাদা ও তার দলবল তৈরির প্রাথমিক প্রেরণা —তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং শান্তিনিকেতনের সারাবছরের আবর্তনময় উৎসবক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল নাটক, তার ফলে বেশ কিছু নাটকও হয়ে উঠতে লাগল একধরনের উৎসব-আচার, বিশেষত ঋতু-উৎসবের সঙ্গে যুক্ত—তা নাটকগুলির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়—'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'বসন্ত' ইত্যাদি। পূর্ববর্তী নিবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

কিন্তু শুধু নাটকের বিষয়ে বা গঠন-প্রকরণে বৈচিত্র্য নয়। নাট্য-প্রযোজনা সংক্রান্ত ভাবনারও পরিবর্তন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের। অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণার যে-বদল হয়েছে তার সাক্ষ্য পাই একই অভিনয় সম্বন্ধে দুটি প্রায় স্ববিরোধী মন্তব্য থেকে। ১৮৯১ সালে যখন 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' লিখছেন তখন

তিনি লাইসিয়ম থিয়েটারে হেনরি আরভিং আর এলেন টেরি অভিনীত 'ব্রাইড অব ল্যামারমুর' নাটক প্রসঙ্গে লিখছেন, "চমৎকার লাগল। কী সুন্দর scene! অভিনয়ের সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্র ভাবের concert বাজে, সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভালো অভিনয় করেছিল, Irving-এর অভিনয়ও খুব ভালো—কিন্তু এমন Mannerism, এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গি! কিন্তু তবুও ভালো অভিনয়—সেই আশ্চর্য।"[২] এসব লেখার উনিশ বছর পরে লিখছেন 'পথের সঞ্চয়'-এর প্রবন্ধ "অন্তর বাহির"[৩]।...তাতে অভিনয় সম্বন্ধে সাধারণ কথা বলতে গিয়ে আবার সে প্রসঙ্গ আসছে—

"অভিনয়—জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবুও তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যামলেট ও ব্রাইড অফ লামারমুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।"[৪]

একই অভিজ্ঞতা দুযুগ পরে কীরকম ভিন্ন হয়ে যায় তারই দৃষ্টান্ত পাই এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে। প্রথমটি অভিজ্ঞতার পরে পরেই লেখা, ফলে সেই মুহূর্তের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার রেশটি রবীন্দ্রনাথ গোপন করেননি, আরভিঙের আতিশয্য সত্ত্বেও বলছেন "চমৎকার লাগল।" কিন্তু উনিশ বছর পরে সে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নেতিবাচক হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁর স্মৃতিতে, এখানে স্মৃতিতে

আরূঢ় হয়েছে পরবর্তীকালের ভাবনা।

এই ভাবনা মিমেসিস বা অনুকরণ-নির্ভর বাস্তবতাকে বর্জন করে, এবং 'লীলা'কে 'প্রকাশ' করার দিকে লক্ষ্য দেয়। প্রযোজনাতেও বাস্তবের অনুকরণে আঁকা দৃশ্যপট বর্জনের কথা বলেছেন তিনি ১৯০২-এ লেখা 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর "রঙ্গমঞ্চ" প্রবন্ধে[৫] : "ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল ; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতেই পারে না।"

অথচ ওই দশ-এগারো বছর আগেই "কী সুন্দর scene!" বলে প্রশংসা করেছেন 'ব্রাইড অব ল্যামারমুর' নাটকের দৃশ্যপটের। আর এখন বলছেন ইয়োরোপের "বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদন," বলছেন "বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ।" "বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র যে অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।" ১৮৯২-এ লেখা "গদ্য ও পদ্য" প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথকে স্রোতস্বিনীর কথায় "সংগীত আলোক দৃশ্যপট সুন্দর সাজসজ্জা' ইত্যাদিকে নাটকের স্বাভাবিক উপকরণ হিসেবে মেনে নিতে দেখি। লক্ষ করি, 'দৃশ্যপট'ও তার মধ্যে আছে। তা "ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে সহযোগিতার" দৃষ্টান্ত তাঁর কাছে তখনও[৬]।

'শারদোৎসব' নাটকে স্ত্রী-চরিত্র ছিল না, কিন্তু তার দৃশ্যপট কেমন দাঁড়িয়েছিল ? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ১৯১১ সালের 'শারদোৎসব'-এর অভিনয়ের উল্লেখ আছে, তাতে বলা হচ্ছে,[৭] "সেকালে মঞ্চ সাজাত ছেলেরাই। বাঙাল ছেলেরা সারা সকাল পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে আনে, কাশফুল সংগ্রহ করে আনে। নাট্যঘরের মঞ্চ অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। সীন প্রভৃতি এঁকে ছেলেমি করার মনোভাব শান্তিনিকেতনে কোনোদিনই দেখা যায়নি।"···প্রভাতকুমার এই সময় ছেলেদের ভূমিকাটি বড় করে লক্ষ করেছেন আবার—"ছেলেরাই স্টেজ সাজিয়েছে, পদ্ম এনেছে রাশি রাশি, কাশ ফুল তুলে কাদার ডাব করে তার উপর পুঁতেছে। পাতা ফুলে নাট্যঘরের মঞ্চ ভরে উঠেছে। তারাই ফুটলাইট জোগাড় করে আনে···দ্বিপুবাবুর কাছ থেকে চেয়ে।"[৮] প্রমথনাথ বিশীর সাক্ষ্য থেকে জানি, দেবদারুর ডালপালা দিয়ে চারটি

উইংস রচনা করা হয়েছিল, পিছনে ছিল একটি কালো পরদা, আর যবনিকাতে মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য—অর্থাৎ নটরাজের মূর্তি আঁকা।[৯] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের জানান, এ ড্রপসিনটি শিল্পী মুকুল দে-র আঁকা।[১০] এ নিশ্চয়ই ১৯০৮ সালের অভিনয়ের কথা নয়, ১৯২০-র কাছাকাছি সময়ের হবে। বিশীই স্টেজ বাঁধবার জন্য ডালপালা ভাঙতে যাবার কথা বলছেন একটু আগে,[১১] পরে[১২] 'শারদোৎসব'-এর দৃশ্যপট রচনার বর্ণনা করছেন এইভাবে—"স্টেজের মধ্যে বেতসিনী নদীর তীরভূমি মাটি দিয়া উঁচু করিয়া গড়িয়া তাহার উপরে ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দেওয়া হইত; পটভূমিতে বা একটা আস্ত বটের ডাল পুঁতিয়া বটগাছ সৃষ্টি হইত…"।

এর একটু পরে, পরিমল গোস্বামী বর্ণনা করছেন 'শারদোৎসব'-এরই রূপান্তর 'ঋণশোধ'-এর অভিনয়ের। তাতে দেখছি 'ঋণশোধ' নাটকের পশ্চাৎপটরূপে নন্দলাল বসুর আঁকা দৃশ্যের কথা—"একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজের সমুদ্রে সাদা ফেনার ঢেউ।" পরিমল গোস্বামী জানাচ্ছেন নিজের প্রতিক্রিয়া—"শরৎকালের আনন্দ-আবেগের প্রকাশ এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারত ভেবেই পেলাম না।"[১৩]

কিন্তু এসব অভিনয় 'ফাল্গুনী-র প্রথম অভিনয়ের পরেকার। যতদূর অনুমান করতে পারি, এবং প্রভাতকুমার প্রভৃতির লেখা থেকেও এই ইঙ্গিতই বেরিয়ে আসে যে, 'ফাল্গুনী'-র প্রযোজনাতেই প্রথম হাত পড়ল নন্দলালের মতো শিল্পীদের। সকলের সাক্ষ্যই বলছে, 'শারদোৎসব'-এর প্রথম দিকের অভিনয় মূলত ছিল "সবটাই ছেলেদের ব্যাপার।" প্রভাতকুমার জানিয়েছেন 'শারদোৎসব'-এর প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয়ও করেননি।[১৪] তবে পরে করেছেন। এরকম একটি অভিনয়ের, সম্ভবত একাধিক অভিনয়ের সংহত একটি স্মৃতির কথা লিখেছেন অমিতা সেন,[১৫]—হয়তো তা ১৯১৮-১৯ নাগাদ হবে। তাতে কতকগুলি বিশেষ খবর পাই। এক, সেবার রবীন্দ্রনাথ 'বালক-বালিকাদের' নিয়ে মঞ্চ জুড়ে গান গাইতে গাইতে নাট্যঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শালবীথি প্রদক্ষিণ করে গানটি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে গেয়েছিলেন। দর্শকরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। প্রসেনিয়াম ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার এই দৃষ্টান্ত খুবই চিত্তাকর্ষক—এতে মধ্যযুগের ইয়োরোপের ধর্মীয় শোভাযাত্রা-ধর্মী নাটকের স্মৃতি জেগে ওঠে। দ্বিতীয়ত, বালক-বালিকাদের সাজে যুক্ত হয়েছিল একটি করে রঙিন ওড়না, কোমরে, কিংবা গলার পাশ দিয়ে দুধারে

ঝোলানো। নাচের সঙ্গে সঙ্গে এই ওড়নার চঞ্চল দোলা নিশ্চয়ই একটা তরঙ্গিত রঙিন ছন্দের সৃষ্টি করেছিল। অমিতা সেন জানাচ্ছেন, "মঞ্চে ঘুরতাম ফিরতাম নাচতাম গাইতাম, ওড়নাগুলো দুলে দুলে উঠত আর মঞ্চের আলোয় অভ্রের কুচিগুলি ঝকমকিয়ে উঠত।" তৃতীয়ত, সেবার পশ্চাৎপট ছিল "মঞ্চের পিছনে গাঢ় নীল পর্দা, তার গায়ে সাদা কাশের গুচ্ছ, শিউলি ফুলের মালা, আর সবুজ ধানের মঞ্জরীর ঝালর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" নন্দলাল এর পরে হাত দিলেন দৃশ্যপট রচনায়—'ঋণশোধ'-এর অভিনয় প্রসঙ্গে যার কথা বলেছেন পরিমল গোস্বামী। নন্দলাল শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দেন ১৯১৯-এর পরে।

'শারদোৎসব' নাটকটির বিশিষ্ট ফর্মটি সম্ভবত তাঁব প্রযোজনার ভিন্নতর রূপ-সন্ধানের প্রেরণা দিয়েছিল, কিন্তু আসল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তার বিপরীত। অর্থাৎ প্রযোজনায় ভিন্নতর রূপসন্ধানের ইচ্ছাই রবীন্দ্রনাথকে ভিন্ন ফর্মের নাটকরচনায় প্রবর্তিত করেছে।

কাজেই শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে, বাঁকুড়ার বন্যার্তদের সাহায্যার্থে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয় হয়, তাতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ মঞ্চপরিকল্পনায় নূতনত্ব সঞ্চার করেন,[১৬] সেদিক থেকে এই অভিনয়টির আনুপূর্বিক পর্যালোচনা খুবই কার্যকর হবে। অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'ফাল্গুনী'র তত্ত্বদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আমাদের কাছে যা প্রয়োজন, অর্থাৎ 'ফাল্গুনী'র প্রযোজনা-সংক্রান্ত তথ্য, তা তাঁরা তেমন দেননি।[১৭] তা পাই রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে, এবং আংশিকভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত একটি সমালোচনায়[১৮]—তিনি ওই দিনকার অভিনয়ে একজন দর্শক ছিলেন। প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের কথাই উদ্ধৃত করা যাক। সত্যেন্দ্রনাথ প্রেক্ষাগৃহের বর্ণনাটি এইভাবে দিয়েছেন: "দেখলুম কল্পনাদেবীর কল্প-কুঞ্জচারী শিল্পীদের তপস্যার প্রভাবে শহরের ধুলোতেই ফুলের ধুলোট শুরু হয়েছে। কল্পলতার ডাল নুইয়ে ধরে তার সমস্ত সৌন্দর্য চয়ন করে রঙ্গমঞ্চটিকে সাজানো হয়েছে। রঙ্গ-তোরণের একদিকের স্তম্ভে আঁকা রয়েছে জলাভাবে শুষ্কপ্রায় "পাপড়ি-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী।" অন্যদিকের স্তম্ভে দিঘির নীলজলে সদ্য-ফোটা শতদল পদ্ম। তোরণের মাথায় মরালের শ্রেণী, শুষ্কতার দিক পরিহার করে পরিপূর্ণতার দিকে সোৎসাহে ছুটে চলেছে। সারদার কৃপায় ঐ সারগ্রাহী মরালের দল আসল জিনিসটুকুই চয়ন করে ফিরবে,—

সুধী ওরা ত্যজি নীর
গ্রহণ করিবে ক্ষীর।”

তোরণদুটি সম্ভবত ‘টরমেণ্টর’-এর প্রাক্তন সংস্করণ, “তোরণের মাথা” নিশ্চয়ই ঐ স্টেজের টিজার (teaser)। কিন্তু এ তো গেল যবনিকা ওঠার আগেকার দৃশ্যবস্তু। যবনিকা ওঠার পরে যে-দৃশ্যপট চোখে পড়ল, তা সত্যেন্দ্র-নাথের কথায় :

“সাজ-সজ্জায় বিশেষ কোনো যুগের বা বিশেষ কোনো জাতের হুবহু অনুকরণ করা হয়নি, আর দৃশ্যপট যা দেখানো হয়েছে তা ভূগোল-পরিচয়ের কোনো পর্যায়ের সঙ্গেই মেলে না। তা হলেও বেশ সুন্দর এবং ভাবদ্যোতক। নীল রঙের পর্দায় সবুজের আভা—আকাশে এবং অরণ্যে মিলে-মিশে যেন নিবিড় হয়ে উঠেচে। গোটা কতক তারা দেখা যাচ্ছে। হরশিরস্থিত চন্দ্রকলার মতো একটুখানি চাঁদও দেখা দিয়েচে। দু-একটা গাছের ডাল মাথার উপর ঝুঁকে রয়েছে, তার একটাতে একটি ঝুলানা বাঁধা। দু-একটা লতা লতিয়ে উঠ্‌চে, উঁচুনীচু জায়গার ফাঁকে ফাঁকে তৃণমঞ্জরী বসন্তের হাওয়ায় রঙীন হয়ে উঠেচে। এর বেশি আর কিছু নয়।”[১৯]

অবনীন্দ্রনাথ সাজিয়েছিলেন এই স্টেজ। এই মঞ্চসজ্জার অভিনবত্ব কোন্‌খানে? সম্ভবত এর অনাড়ম্বরে ও ব্যঞ্জনা-ধর্মিতায়। হয়তো সেই সঙ্গে তিন-মাত্রার বদলে দু-মাত্রার (ডাইমেনশনের) উপরে বেশি নির্ভরতায়। কিন্তু কেবল সিন-টাঙানো দৃশ্যপট সম্পূর্ণত দ্বিমাত্রিক, তার সত্ত্বেও এর চরিত্রের প্রচুর তফাত। সে দৃশ্যপট বাস্তবের প্রতিরূপণাত্মক, এ দৃশ্যপট তা নয়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ অভিনয়ের ছবি[২০] যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই পূর্বের ত্রিমাত্রিক মঞ্চসজ্জার তুলনায় “ফাল্গুনী”র মঞ্চসজ্জার পার্থক্য সম্যক বুঝতে পারবেন। ‘বাল্মীকি প্রতিভা’র ঐ মঞ্চসজ্জায় দেখা যাচ্ছে অজস্র গাছপালা দিয়ে অরণ্যপ্রদেশ মতো করা হয়েছে, মাথার উপরে বাঁশের ডাল কেটে কেটে চালার মতো কিছু একটা বানানো হয়েছে বলে মনে হয়, তার আড়ালে কাপড়ের চাঁদোয়া-টাঁদোয়ার আভাস আসছে। দু পাশে আবার পাম্-এর পল্লব উঁকি দিচ্ছে, এদিক ওদিক ইতস্তত কয়েকটি ঝোপঝাড়। সামনে বাঁদিকে পর্দা গুটিয়ে উপরে বেঁধে রাখা, তার একটা কোণ ফ্রেমকে নষ্ট করেছে। পরিকল্পনার চেয়ে স্তূপীকরণের ভাবটাই বেশি চোখে পড়ে। এ সেই বিখ্যাত হ. চ. হ. বা হরিশ্চন্দ্র হালদারের মঞ্চসজ্জা, যাঁর আঁকা সীন এক সময় রবীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জার

উপর আধিপত্য করেছিল। ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী স্পষ্টই বলে দিয়েছেন,[২১] "আমাদের রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতি অনুকরণে হত। হ চ হ—হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি অতি নিকৃষ্ট বিলিতি অনুকরণে আঁকতেন। বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ।" শোনা যায়, তার পূর্বে[২২] শান্তিনিকিতনে 'ফাল্গুনী'র যে-অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে "খোলা গাছ-মাঠ-পথের বিন্যাসকেই করে তুলেছিলেন অভিনয়ভূমি।"[২৩]

১৯১৬-র ঐ অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক-প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন সূচিত হল, তার সূত্রপাত হয়েছে সম্ভবত ১৯০৮-এর 'শারদোৎসব' অভিনয় থেকেই। ১৯০২ সালে 'বিসর্জন' অভিনয় থেকে শান্তিনিকেতনের নাটক অভিনয়ের পর্ব শুরু হয়—একথা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন[২৪]। এই পর্বের অভিনয়গুলি ['বিসর্জন', 'শারদোৎসব', 'রাজা' (১৯১১), 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয়] ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী দেখেননি, 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়-বিবরণের পরেই (১৮৯০ নাগাদ ?) 'ফাল্গুনী'র (১৯১৬, কলকাতা) অভিনয় প্রসঙ্গে চলে এসেছেন।[২৫] রথীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যে জানা যায়, 'শারদোৎসব' (১৯০৮), অচলায়তন' (১৯১৪) এবং 'ফাল্গুনী' (১৯১৫) এই তিনটি নাটক অভিনয়ের সময়েই "চিত্রিত দৃশ্যপট বর্জন করা হয় এবং তার পরিবর্তে আসে স্বাভাবিক দৃশ্যের প্রযোজনা। তার পিছনে যে স্পষ্টভাবে কোনোরকম সচেতন শিল্পপ্রচেষ্টা ছিল এমন নয়। অন্য দুই নাটকের চেয়ে 'ফাল্গুনী'তেই এই রীতিতে স্টেজ সাজানোর সুযোগ ছিল বেশি। ফুলপাতা সমেত সত্যিকারের গাছপালা দিয়ে সযত্নে তৈরি হল এক বাগান, এখানে ওখানে গাছের গুঁড়ি দিয়ে বসবার আসন, আর রাখা হল এক দোলনা—এইভাবে রচিত হল পশ্চাৎপটের দৃশ্য।"[২৬] তার পূর্বে 'শারদোৎসব' অভিনয়েও যে শান্তিনিকেতনের প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয়েছিল একথা ওই প্রবন্ধেই রথীন্দ্রনাথ বলেছেন। সুতরাং প্রযোজনার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে পথপরিবর্তন ১৯০৮ থেকেই শুরু হয়েছে। এই পর্বের মাঝখানে বোধহয় 'মুকুট' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর অভিনয় হয়েছিল (১৯০৯ জানুআরি, ১৯০৯ অক্টোবর)। শেষের অভিনয়টিতে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। ওই সব রূপকধর্মী প্রযোজনার মধ্যে 'মুকুট' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' একটু খাপছাড়া। এই দুটি প্রক্ষেপ বাদ দিলে ১৯০৮ থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনার মধ্যে একটি নতুন প্যাটার্নের আভাস লক্ষ করা

যায়। পরিপূর্ণ realistic-naturalistic নাটক তিনি কখনও রচনা করেন নি। অপেরার সংগীত-সমুচ্ছ্বসিত আধারে কিংবা কাব্যের উন্নত উচ্চারণে তাঁর নাটকগুলি কখনোই জাগতিক স্বাভাবিকতার সমপ্রতিষ্ঠায় নেমে আসেনি। তাঁর তথাকথিত শেক্‌সপিরীয় নাটকগুলি সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 'মালিনী', 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এ কাব্যের সংক্রমণ এমন যে, তা দৃশ্য-পটের অধীনতা থেকে দর্শকচিত্তকে মুক্ত করে একটি শুদ্ধতর নাটকীয়তায় অনায়াসেই পৌঁছে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এগুলি প্রযোজনার সময় প্রথম দিকে এ সত্য আবিষ্কার করেননি, কিন্তু পরে, যেন তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের গভীরতর পরিণতির তাগিদেই, দেখলেন যে, যে-ফর্ম তিনি সন্ধান করছেন প্রযোজনায় তার জন্য তাঁর নাটকগুলি যেন প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে আছে। সুতরাং 'রাজা ও রানী'কে 'তপতী'তে রূপান্তরিত করতে বিশেষ কোনো বিবেকদংশনই সহ্য করতে হল না তাঁকে। এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনয়ে[২৭] কেবল চৌকো বেদি, দুটি ধাপ, বেদির উপরে দীপবৃক্ষ ও পুষ্পপাত্র দিয়েই মঞ্চসজ্জা করা সম্ভব হল। অর্থাৎ নাটকপ্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তাঁর সেই 'তথ্য ও সত্য' সংক্রান্ত উপলব্ধি প্রতিভাসিত হয়েছে। মঞ্চে তথ্যের স্তূপ গড়ে তোলা নয়, সত্যের আদর্শ তৈরি করতে হবে। বস্তুর চেয়ে ভাবসত্তাকে গ্রহণ করার জন্যই তাঁর ব্যগ্রতা ছিল, তাই উপকরণকে বর্জন করে ক্রমশ কেবল লাক্ষণিক উপাদান-সমাবেশেই তিনি দৃশ্য রচনা করতেন। তাতে নাটকের ভাবসত্যের সঙ্গে বহিরূপাদানের সম্মিলন ঘটত, নাটক দর্শকের চিত্তে অনেক সহজ সংস্কারের সৃষ্টি করতে যা আদিম, মানবিক, যেখানে গিয়ে শিল্প ও জীবনের সমস্ত কৃত্রিম ভেদরেখা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ নইলে নিচের অভিজ্ঞতাগুলির মতো তীব্র নাটকীয় ঘটনা ঘটতে পারত কি ?—

"...the interpretation of Baul reached a height of tragic sublimity which could hardly be endured. Not often can men have seen a stage part so piercing in its combination of fervid acting with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own *Samson Agonistes*."[২৮]

"ধীরে বন্ধু ধীরে" এই গানটি কবির কণ্ঠে সেদিন যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমৃত্যু তাঁহাদের কর্ণে সেটি ধ্বনিত হইবে।"[২৯]

"গানের শেষ মূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁর কণ্ঠস্বর যেত আস্তে আস্তে

মিলিয়ে, আর তিনি দৃশ্যপটের অন্তরালে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ত।”[৩০]

এর প্রত্যেকটি সাক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিনয়-প্রতিভা ও গীতদক্ষতার কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু একথা সত্য যে, রঙ্গমঞ্চের সজ্জা সেদিন বিশেষভাবে ওই অনন্ত মুহূর্তটি রচনা করার সহায়ক হয়েছিল। প্রতিমা দেবীর স্মৃতিচিত্র বইয়ে এর সমর্থন আছে। নিছক সংবাদের মধ্য দিয়ে সেই মহিমাকে পরিবেশন করা যায় না বলে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে :

“শেষদৃশ্যে সোনালি আলখাল্লা পরা অন্ধ বাউল, গাঢ় নীল প্রচ্ছদপটের পাশে যেন মূর্তিমান স্থর! চাঁদের ম্লান ছায়া পড়েছিল রূপালি কেশের উপর, হাতের একতারায় বেজেছিল সেদিনের অকথিত গান।…‘ফাল্গুনী’র ভিতরকার মর্মার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিক এবং বেশভূষা নাট্যের বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করার জন্য সেই তারাখচিত গভীর নীলাকাশের প্রয়োজন ছিল। তা না হলে চিরপুরাতন যে চিরনবীন হয়ে অসীম মণ্ডলে বারংবার যুগপ্রবর্তন করছে, সৃষ্টির এই গভীর তাৎপর্যের প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকত। অন্ধ বাউলের—ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে—সুরের গতি সেই আঁধার রাত্রির সীমাহীন পথের পাশে, ছায়ায় মায়ায় মিলিয়ে শ্রোতাদের প্রাণের মধ্যে একতারা হাতে যে সুর বাজিয়েছিল, সেই সুরের সম্পূর্ণ রূপটি ফুটত না যদি পারিপার্শ্বিক নাট্যের অনুযায়ী আবহাওয়া সৃষ্টি না করত।”

অহীন্দ্র চৌধুরীও পরে এই কথাই আর একটু বিশদ করে বলেছেন, “আমি মনে করি তাঁর নাটকের অভিনয় বিশ্বকবির বিশেষভাবে পরিকল্পিত রঙ্গমঞ্চ ছাড়া অন্য কোথাও হতে পারে না।”[৩১]

যাই হোক, দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ক তাত্ত্বিক চিন্তা বিশ শতকের গোড়া থেকে, কিংবা অস্পষ্টত তারও আগে থেকে[৩২] রবীন্দ্রনাথের মনে জাগলেও ১৯১৫-১৬-র ‘ফাল্গুনী’র অভিনয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ণ প্রমূর্তনা দিতে পারলেন। অবশ্য আমার মনে একটু খটকা আছে যে, বিশেষত ‘ফাল্গুনী’র অভিনয়ে প্রাচীন ধরনের দৃশ্যপট বর্জন করা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছিল কিনা। ‘বৈরাগ্যসাধন’ নামে ‘ফাল্গুনী’র যে সূচনা অংশ অভিনীত হয়েছিল তাতে কালিদাসের যুগের রাজসভার দৃশ্যপট ছিল, সেই দৃশ্যপটে হ. চ. হ.-র ত্রিমাত্রিকতার আদল এবং প্রতিরূপ-আভাসকে কতদূর বর্জন করা সম্ভব হয়েছিল তা আমাদের জানতে ইচ্ছা করে। ওই অভিনয়ের স্মৃতিতে সীতা দেবী লিখেছেন, “বৈরাগ্যসাধনে” রাজ-

সভার দৃশ্যটি হইয়াছিল অপরূপ। যেন কালিদাসের কাব্যের একটি দৃশ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল।”[৩৩] যদিও গগনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ করের সহায়তায় দৃশ্যপটসজ্জার ব্যবস্থা হয়, তবু স্বাভাবিকতার (অর্থাৎ কালিদাস যুগের কল্পিত চিত্রলতার) প্রক্ষেপকে তাঁরা কী পরিমাণ অন্তরাল করতে পেরেছিলেন ওই ভূমিকাতে, তা প্রত্যক্ষদর্শীরাই বলতে পারেন। মঞ্চের সামনে যে-অঙ্কনের বর্ণনা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন, তাকেও একটু যেন বেশি চিত্রধর্মী মনে হয়, এবং ওই চিত্ররূপকগুলিকে যেন এখন আমাদের কাছে একটু বেশি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। একথা বলা হচ্ছে এই জন্য যে, এই শতকের গোড়াতেই অবনীন্দ্রনাথের মতো শিল্পী গিলার্ডি বা পামার-এর পাশ্চাত্য চিত্রণদীক্ষা থেকে সরে এসেছিলেন, রেখার অতিনিরূপিত আভাসকে বর্জন করে তিনি ভারতশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। যদিও অন্তত তাঁর ছবিতে, সম্ভবত মুঘল চিত্রশিল্পের প্রভাবে, রেখার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত দেখা যায় না, তবু তাঁর প্রবর্তিত শিল্পধারায় রেখানির্দেশের চেয়ে সুরঞ্জন ভাবরূপের নির্দেশটিই বড় হয়ে ওঠে। গগনেন্দ্রনাথ প্রায় কোনোদিনই রৈখিক চিত্রকলাকে তেমন সম্মান দেননি।[৩৪] অবনীন্দ্রনাথ তো প্রতিমা দেবীকে বলেছিলেনই যে, “যেখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা ভাবরাজ্যের কথা এসে পড়ে সেখানে লাইন আর এগুতে পারে না। তখন রঙের অসীমত্বের মধ্যে তাকে ডুব দিতেই হয়। ছবিতে রেখা যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তখন তার তাৎপর্য সীমার দ্বারা পরিমিত।”[৩৫]

এ কথাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ, বাংলাদেশে চিত্রশিল্পে ওই রেনেসাঁসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনার একটি দিক আবশ্যিকভাবে জড়িত। ইয়োরোপের নাটকের ইতিহাসে তার চিত্রকলা ও নাট্যকলার সহযোগ একটি সাধারণ ঘটনা—উভয়ে পরস্পরকে সহায়তা করে কিংবা নাট্যকলা চিত্রকলাকে গ্রহণ করে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা ঘটেছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনায়। কেবল সেখানেই ভারতবর্ষের নতুন চিত্রকলা নাটককে সক্রিয় প্রেরণা দিয়েছে, উভয়ে সমপদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। এই ব্যাপারটি বাংলা নাটকের ঐতিহাসিকদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। গগনেন্দ্রনাথও তাঁর নিত্যনূতন আবিষ্করণী প্রতিভা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেছেন। গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র-পরিবারে নাটক-অভিনয়ের একটি সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার ছিল—এ তো সকলেরই জানা। গগনেন্দ্রনাথ যৌবনকালে পেস্টবোর্ড কেটে বিচিত্র ধরনের ছবি

এঁকে স্টেজ তৈরি করতেন এবং তাতে ছোট ছোট ছবি দিয়ে বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সন্ধেবেলায় নানারকম নাটক অভিনয় করে দেখাতেন।[৩৬] বলা বাহুল্য, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ শুধু মঞ্চই সাজাতেন না, রবীন্দ্রনাটকে অভিনেতাদের প্রসাধন ও সাজসজ্জার দায়ও তাঁরা নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁদের সহকারিতা করতেন।

এই সমস্ত অনুষঙ্গী চেষ্টার সম্মিলিত ফল হিসাবে ১৯১৬-র 'ফাল্গুনী'র অভিনয় বিপুল সার্থকতা লাভ করল।

৩. পুরনো প্রযোজনা, তার চেহারা

তার আগে, হ. চ. হ.-র সেই গৌরবময় যুগে ব্যাপারগুলি কী ধরনের ছিল? একটুখানি অনুমান আমরা এর মধ্যেই করেছি। এবার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য উদ্ধার করা যায়। ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী এবং অবনীন্দ্রনাথ দুজনেরই খুব স্পষ্ট বিবরণ আছে। বিশেষত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় সম্বন্ধে দুজনের দেওয়া সংবাদ নিয়ে ওই নাট্যের একটি পরিষ্কার চেহারা তৈরি করা যায়:

> "হ. চ. হ. এলেন সেবারে, তার উপরে ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চমিথুন হল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সীন আঁকলেন কচুবনে বন্যবরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডালপালা এনে লাগিয়ে দিলেন।"[৩৭]

"ঝড়বৃষ্টির দৃশ্যে সেখানে সত্যসত্যই ঝরঝর করিয়া…জলধারা পড়িতেছিল"।[৩৮] তারও আগে, ১৮৬৭-তে ঠাকুরবাড়িতে যখন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' অভিনয় হয় তার মঞ্চসজ্জার বর্ণনা দিতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকি পোকা আটা দিয়ে জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হয়েছিল।"[৩৯] 'সোমপ্রকাশ' এই মঞ্চসজ্জার প্রশংসা করেছিল, "নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর…"। যে সংগীত সমাজ-এর কথা আমরা পরে বলছি তাতে রাধামাধব কর যে-সমস্ত নাটক পরিচালনা করেছিলেন —'মেঘনাদবধ', 'দুর্গেশনন্দিনী' ইত্যাদি—তাতে প্রমীলা এবং জগৎসিংহ ঘোড়ায় চড়ে স্টেজে ঢুকত, হেমেন্দ্রকুমার রায় তার উল্লেখ করেছেন। বেথুন

কলেজের প্রাঙ্গণে 'মায়ার খেলা'র যে প্রথম অভিনয় হয়, তাতে "মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মুণ্ডে ইলেক্‌ট্রিক আলো জলছিল, বোধহয় বিলিতি পারির অনুকরণে।"[৪০] 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ে দিনেন্দ্রনাথও স্টেজে ঘোড়া নিয়ে ঢুকতেন। তাতে "রিমঝিম ঘনঘন রে বরষে" গানের সঙ্গে অরুণেন্দ্রনাথ টিনের নল ফুটো করে বৃষ্টি ঝরাতেন। ঐ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তেই বাল্মীকি-বেশে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তাঁর পিঠে বিলিতি রাজরাজড়াদের mantle-এর মতো একটা লম্বা চাদর ঝুলছে—এ ধরনের খাটো mantle এখনও যাত্রার দলের কৃষ্ণের পিঠে ঝোলানো হয়। ডাকাতদের খুব দুর্বোধ্য কারণে "কাবুলিওয়ালা-সাজে" সাজানো হত,[৪১]—"ইয়া গোঁফ" এবং "ইয়া পাগড়িতে"—সুসম্পূর্ণ। 'রাজা ও রানী'র শেষ দৃশ্যে কুমারের ছিন্নমুণ্ড দেখানো হত—wax-এ তৈরি ছিন্নমুণ্ডের আদল দেখিয়ে। 'কালমৃগয়া'র দুটি বনদেবী "সমুখেতে বহিছে তটিনী" গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গিতে সামনের দিকে তটিনী বয়ে যাচ্ছে, আর দু-আঙুল উপরে তুলে "দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া" দেখাত[৪২]।

স্বভাবতই মনে হয়, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় বা প্রয়োগে নিজের ব্যক্তিত্বকে খুব বেশি আরোপ করার চেষ্টা করেননি। সম্ভবত এ সময় তাঁর অভিপ্রায়টি ছিল আনন্দলিপ্সু শিক্ষার্থীর, যে জন্য এ সময় প্রয়োজনার পরিকল্পনা ও শ্রম তিনি করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে কোনো গভীর সংগতি, কোনো আবহ-সঞ্চারী ভাবনা তিনি যুক্ত করেননি। যে-রবীন্দ্রনাথ পরে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, অভিনয়টা যেহেতু জীবনদর্পণ এবং যেহেতু নিয়ত-গতিশীল, সেহেতু স্থির দৃশ্যপট গতিশীল অভিনয়ের রসটিকে বিকশিত করে তোলায় ব্যাঘাত ঘটায়, সে রবীন্দ্রনাথকে এখনও আমরা পাইনি। তা যখন পেলাম, ১৯১৬-র 'ফাল্গুনী'র ওই অভিনয়ে, তাতে যোগ দিল শিল্পীর চিত্রকল্পনা।

৪. অভিনয়রীতি, অভিনয়শিক্ষণ

তবে অভিনয় শেখানোর যে সুনির্দিষ্ট কাজটুকু আছে—সেখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকতাকেই প্রথম থেকে শরণ্য বলে মেনেছিলেন। সেই ভূমি থেকে পরবর্তীকালেও তিনি যে খুব একটা বিচ্যুত হয়েছেন এমন নয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থাপিত 'ভারত সংগীত-সমাজ'-এ তিনি যে-অভিনয়শিক্ষা দিতেন তার আঙ্গিক ও বাচনিক নির্দেশগুলি ছিল এইরকম[৪৩] :

অভিনয়ে খানিকটা তেজস্বিতা বা ওভার-অ্যাকটিং চলতে পারে, তাতে অভিনেতার "আত্মাভিমানজনিত সংকোচের যে অভ্যাস দ্বারা দূরীকৃত" হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা দর্শকের 'প্রাণস্পর্শ' করতে পারে। বাঙালির স্বাভাবিক প্রবণতা আণ্ডার-অ্যাকটিং-এর দিকে। "মৃদু অভিনয়কলা ও মিনমিনে গলা, অঙ্গচালনার বাধবাধ ভাব" দর্শক ও শ্রোতাদের অন্যমনস্ক করে দেয়, তাই ভাবরসটুকুকে স্পষ্টভাবে প্রক্ষেপ করা দরকার। তার জন্য প্রম্‌টিং সর্বথা বর্জনীয়, মুখস্থ সর্বাগ্রে কর্তব্য। উচ্চারণ যা কিছু শোধরাবার তা একেবারে প্রথম দিকেই শুধরে নিতে হবে। শব্দের শেষ অক্ষরটা (syllable) স্পষ্টভাবে উচ্চারণের অভ্যাস করতে হবে। প্রম্‌টিং সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণার খবর আরো পাই বিজন-বিহারী ভট্টাচার্যের বিবরণ থেকে—"কোনো সংলাপের একটি শব্দও ছাড় পড়লে তাকে বিরক্ত হতে দেখেছি। তাঁর অভিনয়ে তন্ত্রধারণের বালাই ছিল না। অভিনয়ের সময় রঙ্গমঞ্চে বসে থাকতেন। কেউ কাউকে প্রম্প্‌ট করবে তার উপায় নেই। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সময় দুর্বল স্মৃতির দুর্ভাবনায় যতই হৃৎকম্প হোক্ না কেন মধুসূদন ছাড়া আর কারুর শরণ নেওয়া যেত না।"[৪৪]

পরবর্তীকালে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'রুমেলা' নাটক দেখে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ একটি দৃশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ভালোবাসা দেখাতে নায়ক গলা ফুলিয়ে যেভাবে কথা বললে···কণ্ঠ গদগদ করে···অত্যন্ত অস্বাভাবিক।" থিয়েটারের জন্য নাটক কেউ লিখুক, এতে তাঁর নিষেধ ছিল না, কিন্তু সৌরীন্দ্র-মোহনকে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, "রিহার্সালটা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না, নিজেরা শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে।"[৪৫] এ ক্ষেত্রে সংগীত সমাজে তাঁর যৎকিঞ্চিৎ ওভার-অ্যাকটিং-এর নির্দেশের সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনকে আদিষ্ট স্বাভাবিকতা আপাতদৃষ্টিতে সংগতিহীন মনে হয়। কিন্তু এটুকু মনে রাখতে হবে যে, ওভার-অ্যাকটিং কখনোই সর্বাংশে স্বাভাবিকতার বিরোধী নয়, কখনও কখনও তা স্বাভাবিকতাকেই আরও শাণিত করে তোলে। আর ওই 'শিখিয়ে-পড়িয়ে' নেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোনো শৈথিল্য ছিল না। সংগীত-সমাজে অনেকের (খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিলাত-প্রত্যাগতও ছিলেন) মাতৃভাষার উচ্চারণ খুব ভয়াবহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ দুপুরে অভিনেতাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বা সমাজভবনে এসে তাদের উচ্চারণ শোধরাতেন আবার সন্ধ্যার পর তাদের আবৃত্তি ধরতেন, আনুষঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি শেখাতেন। মঞ্চসজ্জার দিকে রবীন্দ্রনাথ তখনও পৃথগ্‌ভাবে মনোযোগ

দেননি, কিন্তু বাকি বিষয়গুলি তিনি এমন সূক্ষ্ম নিরলস সর্বাঙ্গীণ প্রযত্ন দিয়ে সমাধা করতে চাইতেন যে, অভিনেতাদের ধৈর্যের দুরূহ পরীক্ষা চলত রিহার্সালের সময়। সংগীত-সমাজ সম্বন্ধে এই জনশ্রুতিই চালু হয়ে গিয়েছিল, "সমাজ বড় ফ্যাস্‌টিডিয়াস (fastidious)"। সমাজে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ে[৪৬] শিবু ডাক্তারের ভূমিকা যাঁর ছিল, সেই অটলকুমার সেন সামনের দুটো দাঁত তুলে ফেলে নকল দাঁত পরতেন। কথাবার্তায়, হাবভাবে, চালচলনে, কণ্ঠস্বরে, অকৃত্রিমতা ফুটিয়ে তোলাই ছিল সে সাধনার লক্ষ্য। বিশেষত সামাজিক নাটকে বা প্রহসনে সংলাপ শোনানো যে কত অনিবার্যরূপে জরুরি তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন, সেজন্য প্রতিটি শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে তাঁর অব্যাহত মনোযোগ থাকত।

শুধু তাই নয়, অভিনেতাদের সঙ্গে দৈহিক মানসিক সহযোগের দ্বারা তাদের মনে পরিপূর্ণ আশ্বাস সৃষ্টি করতে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি ছিল না। ওই 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ে বেণীমাধব দত্ত 'নিমাই' সেজেছিলেন। তিনি একটু নার্ভাস ধরনের অভিনেতা ছিলেন, অট্টহাস্যটা কিছুতেই হেসে উঠতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ ওই ভূমিকা থেকে তাঁকে ছাঁটাই করলেন না, শুধু বলে দিলেন যে, অভিনয়ের সময় বেণীবাবু যেন রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করেন। এদিকে অট্টহাসির যে যে উপলক্ষ্যগুলি ছিল, তাতে বেণীবাবু চমৎকার হেসে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিলেন। এর রহস্য এই যে, নিমাই-এর হাসির জায়গা আসতেই রবীন্দ্রনাথ একটি করে বিদ্‌ঘুটে বিচিত্র মুখভঙ্গি করেছেন; ফলে বেণীবাবুর হাসি খুব স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই উদ্‌গত হয়েছে। এই অভিনয় দেখে অমৃতলাল বসু উচ্ছ্বসিতভাবে কবিতাই লিখে ফেলেছিলেন :

> অঙ্গভঙ্গি রঙ্গ দেখে হইল বিস্ময়।
> সবে সখে অভিনেতা, কে জানি এদের নেতা
> প্রতিভা যে শিক্ষাদাতা বুঝ পরিচয়॥[৪৭]

অভিনয়-শিক্ষাদানের ব্যাপারে এই কঠোর শ্রম থেকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই নিজেকে অব্যাহতি দেননি। এর উল্লেখ তাঁর জীবনীকার করেছেন, অল্পবিস্তর বিবরণ দিয়েছেন প্রতিমা দেবী, শান্তিদেব ঘোষ, রানী চন্দ, সুধীরচন্দ্র কর প্রমুখ রবীন্দ্রসন্নিহিত ব্যক্তিবর্গ। শান্তিদেব ঘোষের কথা অনুধাবনযোগ্য, রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনা সম্বন্ধে তিনি জানাচ্ছেন :

"সে সব অভিনয় দেখে দর্শকরা গভীর তৃপ্তি পেয়েছেন([৪৮]), কিন্তু তাঁদের

পক্ষে কল্পনা করাও দুরূহ যে, এর পিছনে কেবল একজন মানুষের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা কাজ করেছে বলেই এ সম্ভব হয়েছে। অভিনেতৃবর্গকে তৈরি করতে তাঁকে প্রাণপণে দিনের পর দিন খাটতে হয়েছে। তিনি কখনও পেশাদার অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে এ কাজে নামেননি। যে সব ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক ও কর্মী শান্তিনিকেতনে এসে সমবেত হয়েছেন([৪৯]), তাঁদের নিয়েই তিনি অভিনয় সার্থক করে তুলেছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় তিনি একা শিখিয়েছেন পাখি-পড়ানোর মতো। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কী ভাবে ঝোঁক দিতে হবে, কী ভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আনতে হবে, সবই তিনি পুঙ্খানুরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন। একসময় এমন ব্যক্তিকেও তৈরি করেছেন যাকে দেখে অভিনয়ের পূর্বে কেউ মনে করতে পারেনি যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটতে পারে। অভিনেতার চালচলনে হাবভাব অভিনয়কালে পাছে কোনো প্রকার জড়তা বা আড়ষ্টতা প্রকাশ পায় সেই কারণে প্রতি পদক্ষেপে, ওঠাবসার, হাতের ও দেহের ভঙ্গি কী রকম হলে অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে সেদিকেও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না।”[৫০]

অর্থাৎ সেই সংগীত-সমাজ যুগের খুঁতখুঁতে স্বভাব আজীবন তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। সুতরাং সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের জন্য তাঁর প্রযত্ন ছিল অনলস, উদ্বেগ ও তাড়না ছিল অন্তহীন। নাটকের জন্য নিজে নির্বাচন করেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নিজে শিখিয়েছেন, একসঙ্গে এবং প্রত্যেককে আলাদা করে—অভিনয়ের দিন পর্যন্ত[৫১]। শুধু প্রত্যক্ষভাবে নয়, অভিনয়ের চিন্তা তাঁর মনকে এমন আচ্ছন্ন করে থাকত যে, দূর থেকে চিঠি লিখেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন,

ক. “বৌমা, কাল ক্লান্ত শরীরে নাচের বাহুল্য ক্লেশকর হয়েছিল। মণিপুরীকে না ছাঁটলে সভা ছেড়ে পালাতে হবে। সমস্ত জিনিসটি বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভালো হয়। এ নাটকটি লিরিক্যালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি।”[৫২]

খ. “এই নতুন গানে, মমতার ফুলবিক্রির ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে অনীতা আর হাসি এসে যেন ওর কাছে থেকে ফুল নিয়ে কানে পরচে খোপায় পরচে ভঙ্গি করে তবে ভালো হয়।”[৫৩]

গ. “গগন, ‘ফাল্গুনী’র সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত delicate—ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত

হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আসবে তারা একেবারেই আগাগোড়া এ জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় শুরু হবার পর প্রোগ্রাম পডবারও সময় থাকবে না, কেন না একবারও যবনিকা পডবে না। তাই গোড়ায় খুব ছোট্ট একটা কিছু যদি করা যায় তা হলেও চলে— তাহলে অন্তত লোকজনের আনাগোনাটাও তার উপর দিয়ে কেটে যায়। আর একটা কথা, অভিনয় হবার দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তাহলে সেটাতে বিজ্ঞাপনও হবে, শ্রোতাদের বোঝবারও সুবিধা হতে পারবে। প্রোগ্রামের নাম দিয়ো নাট্যবিষয়সার।…
রাস্তা দিয়ে পথিক চলাচলের by-playটা তোমরা করে নিতে পারবে, সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছনে দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।”[৫৪]

ঘ. “বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো। মনোরমাকে একটা কথা বলা হয়নি—সে audience-এর দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে—গোঁফদাডি থাকলেও ক্ষতি হবে না—নেপথ্য থেকে একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে। অবশ্য মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে। তাকে দিব্য করে ত্রিপুণ্ড প্রভৃতি এঁকে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবীগোছের চেহারা করে দিতে হবে। —অথচ দেখতে ভালো হওয়া চাই।
ফাল্গুনীর সর্দার যে সাজবে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তার হাতে ধনুর্বাণ দিতে হবে।…সর্দারকে একটু বেশ সাজানো চাই। অন্য যারা আছে তারা নানারঙের চাদর উড়িয়ে পাগড়ি জড়িয়ে বেশ সরগরম করে তুলবে। বাউলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ধবধবে সাদা করে দিয়ো।”[৫৫]

ঙ. “কাপড়ের কী করলে। আমার জন্যে যে সাদা ঝোলা করবে তার হাতের আস্তিনটা খুব ঝোলানো করতে হবে—মসলিনের কাপড হলে সাদাটা বেশ খুলবে ভালো। মেয়ে যারা থাকবে, তাদের পেশোয়াজ গোছের সাজেই বোধহয় মানাবে। কী বল।”[৫৬]

৫. বিবেচনা

এইসব বিবরণ ও চিঠিপত্রের মধ্যে অভিনয়শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে যতটা ধরা

যায়, গগনেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি ক-টির ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যত্র নাট্যপ্রযোজক রবীন্দ্রনাথকে ততটা ধরা যায় না। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে দৃশ্য, মঞ্চ ও পোশাক-আশাক পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা ঠিক কতখানি ছিল। গগনেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিগুলিই অবশ্য প্রমাণ যে, এই ভূমিকা যথেষ্টই ছিল কিন্তু 'ফাল্গুনী'র আগে কয়েকটি তাত্ত্বিক আলোচনা ছাড়া আমরা কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাই না। দৃশ্যপটকে অবান্তর বাধা বলে মনে করেছেন, যাত্রার প্রতি নিজের অনুরক্তি জ্ঞাপন করছেন—কেন না যাত্রা *Picture-frame stage*-এর ক্ষেত্রে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে যে-ব্যবধান তৈরি হয় তা ভেঙে দেয়, তাতে "পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।"[৫৭] কিন্তু প্রয়োগরীতিতে রবীন্দ্রনাথ এইসব ভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছেন, তার দিনানুদৈনিক বা তাৎক্ষণিক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল না[৫৮]। যদি এমন বিবরণ পেতাম যে, রবীন্দ্রনাথ সমীপস্থ গগনেন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালকে[৫৯] নির্দেশ দিচ্ছেন—প্রায় ডকুমেণ্টারি ধরনের—তাহলে কালানুক্রম ধরে তাঁর প্রযোজনার একটা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ চেহারা তৈরি করা সহজ হত। কোথাও বিবরণ দেখছি 'নটীর পূজা'য় উপালি প্রেক্ষাগৃহ থেকে সরাসরি মঞ্চে উঠে আসছেন, কিংবা অভিনয়ের আগে দর্শকদের অনুরোধ করা হচ্ছে হাততালি না দেওয়ার জন্য[৬০]; কোথাও বা উল্লেখ পাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথ 'লিট্‌ল থিয়েটার' ধরনের মঞ্চ এদেশে প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী[৬১], কারণ "সাধারণ রঙ্গালয়ে শিল্পীরা দিনের পর দিন ধরে দীর্ঘকাল এই একই ভূমিকায় নামতে বাধ্য হন। মানুষ কলের পুতুল নয়, প্রকৃত শিল্পীর প্রাণ এই একঘেয়ে জীবনের ভিতর সংকুচিত হয়ে পড়ে"; কোথাও রবীন্দ্রনাটকে মঞ্চসজ্জা, আলো, সংগীত ও অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিবর্তনের মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে :···"প্রথম আমলে দেখিয়াছি, নাটকে কেনা পোশাক ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোশাকের যুগ চলিয়া গিয়া এখানকার শিল্পীগণ কর্তৃক পরিকল্পিত পোশাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজপোশাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুণ প্রয়োগের দিকে চোখ গেল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হারমোনিয়াম দূর হইয়া গিয়া বীণা, বাঁশি, এসরাজ দেখা দিল।"[৬২] কিন্তু ঐতিহাসিকের প্রতিমুহূর্তের নথিবদ্ধ উল্লেখ নেই—কী করে, কোন্ বিশেষ বিশেষ উক্তি, বা ঘটনার মধ্যে, কোন্ অভিজ্ঞতার প্ররোচনায় এই বিবর্তনগুলি ঘটেছে; কোথাও দেখছি তিনি চমৎকার play

reading করেছেন,[৬৩] কোথাও তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে নট-নটীর নৃত্য ও মূকাভিনয়ে নাট্য নির্মাণ করছেন[৬৪] কিন্তু কোথাও পূর্ণাঙ্গ নেপথ্যবিধান সংক্রান্ত বিবরণ নেই। যদি অন্তত একটি নাটকের ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যক্ষদর্শী এই বিবরণ রাখতে পারতেন—প্রত্যেকটি মুহূর্তের ডায়েরি বা প্রোডাকৃশন নোট্‌সের মতো—তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনার সচল মূর্তি যেমন আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ফুটত, রবীন্দ্রনাট্যের সমালোচনাও নিশ্চয়ই সমৃদ্ধতর হত। কেবল খণ্ড ছিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। নাটক পরিচালনার সময় কীভাবে তাঁর কৌতুক উচ্ছলিত হত, কখন তাঁর মাথায় দুষ্ট সরস্বতী চাপত, কখন তিনি ধৈর্য হারিয়ে ভ্রূকুটি করতেন—তার ইতস্তত উল্লেখ আছে মাত্র। তাঁর সরসতা ও কৌতুকপ্রিয়তা দিয়ে তিনি অভিনয়-শিক্ষার ক্লান্তিকর সময়গুলিকে কীরকম উজ্জ্বল করে তুলতেন তার লিপিরৈখিক হিসেব কে রেখেছে?

তা ছাড়াও বিচার্য বিষয় কিছু থেকেই যায়। সংক্ষেপে সে কথাগুলি বলে নেওয়া ভালো। রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত মঞ্চসজ্জা নাটকের মঞ্চসজ্জার চরমতম সিদ্ধি কিনা তাও বিবেচনা করে দেখা দরকার। বর্তমান লেখকের পক্ষে ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত কোনো রবীন্দ্রনাটক দেখা সম্ভব হয়-নি, তাই তাঁর মঞ্চরূপায়ণের কোন্ প্রতিক্রিয়া আজকের সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকত, তার হিসেব করা মুশকিল। 'ফাল্গুনী'র দৃশ্যসজ্জা তাত্ত্বিকভাবে সমর্থন করা যায়, এমনকি উচ্ছ্বসিত হয়েও ওঠা যায়। কিন্তু 'ডাকঘর'-এর মঞ্চসজ্জাও কি তাই? ছবি দেখে আমার কাছে কেন যেন 'ডাকঘর'-এর মঞ্চটিকে একটু বেশি ভারতীয় চিত্রধর্মী মনে হয়েছে, যেন বড়ো বেশি সাজানো সুন্দর এবং সুনির্দিষ্ট—একটু pretty pretty। অবশ্য চোখে না দেখে এরকম মন্তব্য করা যে বিপজ্জনক, সেকথা মানতেই হয়। কিন্তু কেন যেন মনে হয় ঐ সেটের উপকরণবাহুল্য আর একটু কম হলে হত, প্রতীকগুলি অত স্পষ্ট না হলেও চলত। তবু আগের তুলনায় এই মঞ্চসজ্জার রূপান্তর ও অগ্রগতি সুস্পষ্টই চোখে পড়ে। এ দেখলেই বোঝা যায়, "বেচারী হরিশচন্দ্র হালদার ওরফে হ. চ. হ. থেলো হুঁকো হাতে মুর্শিদাবাদ বালাপোশের তলায় লুকিয়ে" পড়েছেন। 'তপতী'র মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে অভিযোগ করার কিছুই নেই—রবীন্দ্রনাথ নিজের আদর্শকেই ফুটিয়ে তুলেছেন সেখানে। 'বিসর্জন'-এও পরে কয়েকটি চৌকো সংস্থান সাজিয়ে বেদি, একটি দুটি ধাপ, বেদিতে দীপবৃক্ষ ও পুষ্পথালা—এইটুকু দিয়েই মন্দিরের দৃশ্যরচনা করেছিলেন।

৬. শেষের কথা

এই সমস্ত-কিছুর মধ্যে যে elan বা প্রৈতির প্রকাশ আছে তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার কাছে প্রত্যাশা করা যায়? রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকেও একটি শিল্পের মতো রচনা করেছেন—একথা অন্নদাশংকর রায় বলেছেন। নাটক প্রযোজনা তাঁর ওই জীবনশিল্পসৃজনেরই তাগিদে। অভিনয়কে বিচ্ছিন্ন একটি শখ, বৃত্তি বা কৌতূহল হিসেবে তিনি কোনোদিন দেখতে পারেননি, তা তাঁর কাছে বৃহত্তর জীবনচর্যারই একটি অঙ্গ ছিল। এই জীবনবাউল তো বলেইছেন যে, আমি নাচি, নাচাই। সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন, "শেষবার রাজা অভিনয়ের মহড়ার সময় উত্তরায়ণে দিনের পর দিন সন্ধ্যায় কবি সকলকে পাঠ শেখাচ্ছেন, গান গাইছেন সকলের সঙ্গে। পথিকের দৃশ্য এলে তিনি অভিনেতাদের বললেন, শুধু গাইলে হবে না নাচতে হবে। দলের মধ্যে দু একজন স্বাভাবিক পটুতায় সাড়া দিল, কিন্তু আনাড়িদের আড়ষ্টতা আর ভাঙে না। কিন্তু কবিও ছাড়বেন না। গাইতে গাইতে নিজে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন, নেচে দেখাতে লাগলেন —গ্রামের লোকের উৎসবের নাচ। চারিদিকের হাসি কৌতুকের মধ্যে সে দৃশ্যের সকলকেই তখন চাল-চলনে নাচের ভঙ্গি কিছু না কিছু আনতে হল।...আনন্দময় তাঁর সঙ্গই উল্লাসে সকলকে শেষে নৃত্যগীতে মাতিয়ে তুলত।"[৬৫] যাঁর কাছে এই বিশ্বজগৎটার মধ্যেই প্রতিমুহূর্তে নটরাজের লীলা চলছে তিনি অভিনয়কে একটা পৃথক নন্দনতাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে দেখবেন কী করে? তাই শান্তিনিকেতনে ঋতুউৎসবগুলির মধ্যে আবশ্যিকভাবে তিনি অভিনয়কৃত্য যোগ করেছেন। ঋতু অনুযায়ী বেশধারণের মধ্যেই অভিনয়ের রূপায়ণগত উপাদান এসে পড়ত[৬৬] অমিতা সেন লিখেছেন ১৯২৬-এর মে (২৫শে বৈশাখ) মাসে 'নটীর পূজা' অভিনয়ের কথা—দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে অভিনয়ের জন্য রচিত হল 'নটীর পূজা'। "তিনি যেন তাঁর জর্জরিত মনের বেদনা প্রকাশ করবার একটা পথ খুঁজে পেলেন।"[৬৭] ১৯৩২-এর গ্রীষ্মশেষে দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। বর্ষামঙ্গল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শোকাহত আশ্রম-বাসীরা নাচগানের মহড়া দিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাদের ডেকে বলেছিলেন, "আমার ক্ষতি হয়েছে, বা আমার দ্বারে এসেছে আঘাত, তাতে বন্ধ থাকবে আশ্রমের উৎসব?...এ জিনিস শোক-দুঃখ আঘাত আন্দোলন থেকে ঊর্ধ্বে, বর্ষে বর্ষে কালে কালে পৃথিবীতে অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়েই হয়েছে আনন্দের আগমন।"[৬৮]

মৃত্যুর পূর্বে জীবনের শেষ বসন্তে প্রতিমা দেবী প্রভৃতিকে ডেকে বলেছিলেন, "তোমরা কিছু করো, 'নটীর পূজা'র রিহার্সাল আরম্ভ করে দাও, কিছু করা চাই, নইলে শান্তিনিকেতনের জীবন ঝিমিয়ে পড়বে যে।"[৬৯] নিজেই শৈলজা-রঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষকে ডেকে গান নির্বাচন করে দিলেন। জগদানন্দ রায় উল্লেখ করেছেন :

"লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।"[৭০]

শিল্প ও জীবনের মধ্যে কোনো ব্যবধান যে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতেন না, তা আমাদের আরেকবার স্মরণ করতে হয়। সেই শিল্পই মহত্তম যা জীবনকে লালন ও পোষণ করে, তাকে ঐশ্বর্য দেয়। ওই গভীর জীবনপ্রত্যয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের নাট্য সম্বন্ধে আমাদের সজীব জিজ্ঞাসা কোনোদিন নিঃশেষ হবে না।[৭১]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, ১৯৭৮, 'রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সঙ্গীত ও নৃত্য', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৭-২০ পৃ.

২. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯৬১ শতশবার্ষিকী সংস্করণ, পরে র-র [শ] ১০, ৪৩৭ পৃ.

৩. রচনার তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

৪. র-র [শ], ১০, ৮৯৬ পৃ.

৫. র-র [শ], ১৪, ৭৪৩-৪৬। পরে 'রাজা ও রানী'র রূপান্তর 'তপতী' (১৯২৯) নাটকের ভূমিকাতেও তিনি বলছেন, "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা।...নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল ; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত ; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক মূঢ়, স্থাণু ; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে।" র-র [শ], ৬, ১০৩৩-৪ পৃ. লক্ষ করি যে, 'দৃশ্যপট'-কে রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিকভাবেই মঞ্চে টাঙানো 'সিন' হিসেবে দেখেছেন, যা

উঠিয়ে-নামিয়ে দৃশ্যের পটভূমি-পরিবর্তন বোঝানো হয়। মঞ্চসজ্জা আর দৃশ্যপটকে তিনি পৃথক রেখেছেন। নাহলে 'ডাকঘর'-এর মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধেও একই স্থাণুত্বের অভিযোগ আনা যেত।

৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ (পরে র-র [বি]), দ্বিতীয় খণ্ড, ৬০৩।

৭. ১৯৭৮, 'ফিরে ফিরে চাই', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৭৬-৭৭।

৮. তদেব, ১৬৩।

৯. 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', বিশ্বভারতী, ৩২।

১০. পূর্ববৎ, ১৬৩।

১১. পূর্ববৎ, ২৯।

১২. তদেব, ৭২।

১৩. ১৯৫৮, 'স্মৃতিচিত্রণ', ১ম খণ্ড, কলকাতা, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৪৩।

১৪. পূর্ববৎ, ১৬৩ পৃ.

১৫. 'আনন্দ সর্বকাজে', কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৮২।

১৬. "ফাল্গুনীর স্টেজ-সজ্জা পরযুগে বাংলাদেশের স্টেজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লেখকদের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইবে।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

১৭. বাংলা নাটকের সমালোচনায় বা ইতিহাসে এইটেই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অসুবিধা যে, নাটকের মঞ্চরূপায়ণ-সংক্রান্ত কোনো তথ্যের দিকেই কেউ খুব একটা নজর দেননি। নাটকের বক্তব্য যে নাটক নয়, তার পরিবেশিত রূপটাই যে নাটক, এই সচেতনতার জন্য খুব ইদানীংকাল পর্যন্ত আমাদের প্রতীক্ষা করতে হল। ফলে রেমণ্ড উইলিয়ামস-এর রাগারাগি সত্ত্বেও নাট্যকার প্রিস্টলির বক্তৃতায় *Dons and the Drama* বিষয়টির প্রতি আমাদের ভক্তি অটুট থাকে।

১৮. ভারতী, ফাল্গুন ১৩২২। তাছাড়া প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ-এর "রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিচালনায় সে যুগের নাচগানের আসর" ('পুরশ্রী' : ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ২৫ বৈশাখ ১৩৮৫, পৃ. ২৮-৩২) প্রবন্ধেও এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

১৯. ভারতী, ফাল্গুন ১৩২২।

২০. র-র[বি], ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬-এর মুখোমুখি।

২১. 'রবীন্দ্রস্মৃতি', পৃ. ৩৪। এ ছাড়া 'ফাল্গুনী'র দৃশ্যসজ্জার কথা ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীর বর্ণনাতেও পাওয়া যায়—"অবনদাদার মঞ্চসজ্জার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিসদৃশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাদ্‌পট দিয়েছিলেন, সেটি এখনও দেওয়া হয়। তার উপর কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটিমাত্র লাল ফুল, এবং তার উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা।" রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃ. ৩৭।

২২. ১৯১৫, ইস্টারের ছুটিতে। চৈত্র ১৩২১।

২৩. শঙ্খ ঘোষ, "পথের পটভূমি। রবীন্দ্রনাটক", 'বহুরূপী', ত্রয়োবিংশ বিশেষ সংখ্যা। অধিকন্তু দ্রষ্টব্য, শঙ্খ ঘোষ, 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৯, পৃ. ৫২।

২৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অতীতের স্মৃতি", 'গীতবিতান বার্ষিকী', ১৩৫০।

২৫. যদিও কলকাতার পরবর্তী প্রযোজনাগুলি তিনি দেখেছিলেন— ১৮৮৯-এ এ 'রাজা ও রানী' (বির্জিতলাও), ১৮৯৩-এ 'বিসর্জন' (পার্ক স্ট্রীট) ইত্যাদি।

২৬. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অতীতের স্মৃতি", 'গীতবিতান বার্ষিকী,' ১৩৫০, পৃ.৬৬।

২৭, আগস্ট, ১৯২৩।

২৮. Edward J. Thompson, *Rabindranath Tagore*, p 254 'রবীন্দ্রজীবনী' ২য় খণ্ডে উদ্‌ধৃত।

২৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

৩০. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অতীতের স্মৃতি", 'গীতবিতান বার্ষিকী', ১৩৫০, পৃ. ৪৭।

৩১. 'বাঙালীর নাট্যচর্চা', শঙ্কর প্রকাশন, ১৩৭৯ পৃ. ৮৭।

৩২. ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯০-এর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি'তে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাইড অফ ল্যামারমূর' উপন্যাসের নাট্যরূপে হেনরি আর্ভিং-এর অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন, তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং অঙ্গভঙ্গি অদ্ভুত। তৎসত্ত্বেও তিনি কী এক নাট্যকৌশলবলে ক্রমশ দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।" র-র[বি], ১ম খণ্ড পৃ. ৬০৬।

৩৩. "অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ" 'গীতবিতান বার্ষিকী', ১৩৫০, পৃ. ১৫২। তাছাড়া 'ফাল্গুনী'তে 'নদী আপন বেগে' গানের সময় দুটি বালক দুধারে দাঁড়িয়ে

"একটি নীল কাপড়কে ঢেউ খেলিয়ে নদীর বেগ প্রকাশ করছিল, তাতে সেই পুরনো বাস্তবের নকলের কথাই মনে পড়ে।" ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী 'রবীন্দ্রস্মৃতি', পৃ. ৩৭।

৩৪. যিনি 'অজন্তা' থেকে কিউবিজম উদ্ধার করতে পারেন, তাঁর পক্ষে এ বেশি কী। দ্র. হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ৬৯।

৩৫. প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র' পৃ ৭০।

৩৬. তদেব পৃ ৬৫।

৩৭. 'ঘরোয়া', পৃ ৮৫।

৩৮. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ ১৬১।

৩৯. স্তানিস্লাভ্স্কি-দানচেঙ্কো তো একবার 'দ্য চেরী অর্চাড'-এর সেটে মশাও ছেড়েছিলেন কয়েক ঝাঁক। তবে তাঁদের হাতে যে নাটক ছিল তা বোধহয় সবরকম ন্যাচারালিজম্-কেই নিস্প্রভ করে নিজের মাহাত্ম্যে দীপ্যমান হয়।

৪০. ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানী, 'রবীন্দ্রস্মৃতি', পৃ ৩৩।

৪১. তদেব, পৃ ৩৫।

৪২. তদেব, পৃ ৩২।

৪৩. সংগীত-সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনা সংক্রান্ত সকল তথ্যই খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রকথা' গ্রন্থটি থেকে নেওয়া।

৪৪. দ্র. 'লিপিবিবেক', ১৯৬২, বুকল্যাণ্ড (কলকাতা), পৃ ৮৮। তবে পরবর্তীকালে উচ্চারণ স্বাভাবিক করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও অভিনেতার সুবিধা অনুযায়ী শব্দও বদলেছেন। শ্রীহট্টীয় অনিলকুমার চন্দের ক্ষেত্রে এইরকম পরিবর্তনের কথা রানী চন্দ উল্লেখ করেছেন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের বিবরণেও তার খবর পাই।

৪৫. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রস্মৃতি', পৃ ১৯৬।

৪৬. ১৮৯২ সাল।

৪৭. 'অমৃত মদিরা'।

৪৮. 'বিসর্জন' দেখে একজন তৃপ্ত দর্শকের মন্তব্য: "এমন শ্রদ্ধা এবং তৃপ্তি নিয়ে অভিনয় আমি কমই দেখেছি। যা পাব আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেলাম। সবটা অভিনয় এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।" পরিমল গোস্বামী, 'স্মৃতিচিত্রণ', প্রজ্ঞা প্রকাশনী ১৩৬৫,

পৃ ১৫৬।

৪৯. এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯১৪তে 'অচলায়তন' অভিনয়ে শান্তিনিকেতনে তিনি পিয়ার্সন সাহেবকেও শোণপাংশুদলে ভিড়িয়ে স্টেজে নামিয়েছিলেন। "এমনিতে তাঁর বাংলা কথাবার্তা ছিল বেশ নিখুঁত—কিন্তু 'আর খেসারির ডাল ?'—এই কথাগুলোতে এসে এমনভাবে হুঁচোট খেতেন যে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হাসির শোরগোল পড়ে যেত।" রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অতীতের স্মৃতি"। 'গীতবিতান বার্ষিকী', ১৩৫০, পৃ ৬৫-৬৬।

৫০. শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসংগীত', পৃ ২১৯।

৫১. একথা নিশ্চয় মনে করানোর দরকার নেই যে, এরই ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কবিতা ও গান রচনা, গান শেখানো, অন্যান্য লেখা, চিঠিপত্র, মানুষজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ—এই সমস্ত নিত্যকৃত্যগুলিও চলেছে !

৫২. 'চিত্রাঙ্গদা'র মহড়া উপলক্ষে প্রতিমা দেবীকে লেখা। শান্তিদেব ঘোষের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ ২২২।

৫৩. শান্তিদেব ঘোষকে লেখা। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২২২।

৫৪. গগনেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। ১৯১৬-র 'ফাল্গুনী' অভিনয় প্রসঙ্গে। পুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহ। র-র[বি], ১১শ খণ্ড, পৃ ৬০১।

৫৫. তদেব, পৃ ৬০২।

৫৬. তদেব, পৃ ৬০৩।

৫৭. রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৯।

৫৮ এই না পাওয়া আমার নিজের সন্ধানের ত্রুটিতেও ঘটতে পারে। তবে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'থিয়েটার প্রসঙ্গে' [তারিখহীন, কলকাতা, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ] বইয়ে (৭৬ পৃঃ) একটি চমকপ্রদ খবর পাই যে, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রস্তাবিত 'রক্তকরবী' অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনাথ ভাদুড়ীকে দিয়ে নন্দিনীর ভূমিকা অভিনয় করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন।

৫৯. শান্তিদেব ঘোষের লেখা 'তাসের দেশ'-এর অভিনয় সংক্রান্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভূমিকার সঙ্গে অসংলগ্নভাবে এই বিবরণ পাই—"নাটকটির সাজসজ্জার পরিকল্পনা ও রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল ও প্রতিমা দেবী। নন্দলালের উপর ছিল পুরুষ চরিত্রের সাজসজ্জার দায়িত্ব, নারী চরিত্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রতিমা দেবী। নন্দলাল, সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনা মত পুরুষ চরিত্রের সাজগুলি তৈরি করান। প্রতিমা

দেবী করান জাভায় (বর্তমানের ইন্দোনেশিয়া) নৃত্যনাট্যের নানা প্রকার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে, কিন্তু কলকাতায় প্রথম রাত্রির অভিনয়ের সময়, সেই সাজ পরে, নাচ ও চলাফেরা করতে মেয়েরা গুরুতর অসুবিধা বোধ করায়, পরের দিন, সকালের মধ্যেই নন্দলাল, প্রতিমা দেবী ও সুরেন কর একত্রে ভেবে চিন্তে মেয়েদের সাজের আমূল পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালের অভিনয়ে পরিবর্তিত সাজেই মেয়েদের সাজানো হতো।

শিল্পাচার্য নন্দলালের পরিকল্পনা ছিল অভূতপূর্ব। তাঁর পরিকল্পিত সাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রঙের ছন্দসাম্য। পিসবোর্ডের উপর সাঁটা নানা রঙের কাগজ ও কাপড়ের উপর, আলপনায় যে সব সাজ-পোষাক রচনা করেছিলেন সেগুলি ছিল প্রত্যেকটি চরিত্রের অনুকূল অলংকার বিশেষ। নানা প্রকার রঙিন কাপড়ের সমন্বয়ে রচিত জামা-কাপড়ের সঙ্গে মিলে তা প্রত্যেক অভিনেতাকে একটি সার্থক শিল্পরূপে পরিণত করেছিল। সব চেয়ে বড় কথা হল, যখন বিভিন্ন চরিত্র একসঙ্গে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াতো তখন কারও সঙ্গে কারও সাজ-পোষাক রঙে কোন বিভেদের সৃষ্টি করতো না। সব মিলে মনে হতো যেন একটি বিরাট ছন্দোময় রঙের জগৎ দর্শকের সামনে রূপ মেলে দাঁড়িয়েছে। যেন একটি রূপকথার রঙিন জগৎ। এই সাজ-পোশাক কোন প্রকার মামুলি প্রথায় তিনি রচনা করেননি। কোন দেশের, কোন প্রকার সাজ-পোষাকের সঙ্গে তা মিলবেও না। এইসব সাজ-সজ্জা নতুন ধরনের হলেও দেখে মনে হতো যেন এই নাটকের চরিত্রে এ সাজ ছাড়া আর কোন সাজই মানায় না। এদিক থেকে তাদের দেশের সাজসজ্জাকে বলা চলে শিল্পাচার্যের আর একটি মহৎ সৃষ্টি।" দ্র. 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৫, ৮৬ পৃ.।

৬০. ৩১ নম্বর টীকায় উল্লিখিত বই, পৃ ৮৯।

৬১. 'নাচঘর', ৩ জুন, ১৯২৭।

৬২. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', পৃ ৭২।

৬৩. "হাস্যনাটকের পাঠ, তাই তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল রীতিমতো চটুল এবং চোখে মুখেও ফুটতে লাগল তরলভাবের লীলা। ···ভালো করে ভাবাভিব্যক্তির জন্য মাঝে মাঝে যথাস্থানে নিপুণ অঙ্গুলি ইঙ্গিতের অভাব হল না।" 'চিরকুমার সভা'র প্লে-রিডিং এর বিবরণ : হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ', পৃ ৯৭। পরলোকগত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

'শেষরক্ষা' পাঠ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'শেষরক্ষা' নাটক-পাঠ শেষ হবার পর মনে হয়েছিল কেন শেষ হল।…রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠভঙ্গীতে বিভিন্ন চরিত্র এমন স্পষ্ট ক'রে তুলেছিলেন যে, তাঁকে বলে দিতে হয়নি কোন্ কথা কে বলছে।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩৬ পৃষ্ঠা।]

৬৪. ১৩২৬-এ শান্তিনিকেতনে 'অরূপরতন'-এর অভিনয়ে।

৬৫. 'কবিকথা', পৃ ১২৪।

৬৬. সুধীরচন্দ্র কর, 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা'।

৬৭. দ্র. "নটীর পূজার পূজারিনী", 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৫, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

৬৮. সুধীরচন্দ্র করের পূর্বোক্ত বই, টীকা ৫৫, পৃ ৬৩।

৬৯. প্রতিমা দেবী, 'নির্বাণ'।

৭০. স্মৃতি। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা', জন্মোৎসব সংখ্যা, ১৩৩৩।

৭১. প্রায় বারো বছরের পুরনো এই লেখাটির নানা ত্রুটি, বিশেষত ভাষার চটুলতা ও উৎসনির্দেশের অসম্পূর্ণতা, আমার কাছে লজ্জাকর মনে হচ্ছে। ব্যক্তিগত দু-একটি অভিমতও আমি পরে সংস্কার করেছি। তবু সময়াভাবে খুব সামান্যই পরিবর্তন পরিবর্জন করা হল—সেজন্য পাঠকদের মার্জনা ভিক্ষা করছি। দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা নতুন কিছু সাক্ষ্য জুগেছি, কিন্তু আগের ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণ সংশোধন করা যায়নি।

রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়:
সাধারণ রঙ্গালয়, গ্রুপ থিয়েটার

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার পেশাদার (সাধারণ) রঙ্গালয়ের কী সম্পর্ক ছিল, এ নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। বহুরূপী কর্তৃক 'রক্তকরবী'র অসামান্য প্রযোজনার (১৯৫৪) পর সংগতভাবেই মনে করা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের অপরিমেয় সম্ভাবনা রবীন্দ্রমণ্ডলের বাইরে প্রথম আবিষ্কার করে কলকাতার অপেশাদার নাটকের মানুষেরা। এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই এমনও কথা উঠেছিল যে, আমাদের ঐতিহ্যসম্পন্ন সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাথকে কখনোই তার নিজের সম্পত্তি করে তুলতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লিখতে উৎসাহিত হননি, তেমনই সাধারণ নাট্যশালাও, মাঝে-মাঝে তাঁর নাটক বিষয়ে কৌতূহল দেখিয়ে দু-একটি প্রযোজনা করলেও, তাঁর নাটক বিষয়ে কোনো স্থায়ী আকর্ষণ বোধ করেনি। ফলে দুয়ের সম্পর্ক একটা অস্বস্তিকর পর্যায়েই শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে। ইদানীংকালে হরীন্দ্রনাথ দত্ত টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি বক্তৃতায়[১] সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাহচর্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন, এবং সেখানে রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের এক পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে একথা বলবার চেষ্টা করেছেন যে, সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার যোগ্য সমাদর করতে কখনও কার্পণ্য করেনি।

বস্তুতপক্ষে বাইরে থেকে দেখলে ওই তালিকাটি অবহেলাযোগ্য মনে হয় না। তবু ওই তালিকা থেকে সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ যে হয় না, তার সাক্ষ্য শুধু একালের মানুষের ধারণা নয়, শিশিরকুমার প্রভৃতির আক্ষেপও। মণি বাগচি একটি প্রবন্ধে শিশিরকুমারের এই খেদোক্তি উদ্ধার করেছেন—"বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা।...আমাদের

দেশের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বাধা এসেছে নানা দিক থেকে।…রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হলে আমরা পেতাম অপূর্ব সম্বন্ধ (সমৃদ্ধ ?) নাট্যসাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রঙ্গশালা ও সমাজের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যে আবয়বিক সম্পর্ক সেটা সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত হতে পারত।"[২]

এই পারস্পারিক ঔদাসীন্যের দায় কার, সাধারণ রঙ্গালয়ের না স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, এ নিয়েও পরে প্রশ্ন উঠেছে। হরীন্দ্রনাথ দত্তের ইঙ্গিত সে দায় রবীন্দ্রনাথের, কারণ তাঁর নাটক সম্বন্ধে সাধারণ রঙ্গালয় দীর্ঘদিন ধরেই গ্রহিষ্ণুতা দেখিয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের যে তালিকাটি তাঁর ও অন্যান্যদের সাক্ষ্যে প্রস্তুত করা যায়, তা এইরকম :

১৮৮৬ : 'রাজা বসন্ত রায়', ('বউঠাকুরানীর হাট' অবলম্বনে কেদার চৌধুরীকৃত নাট্যরূপ); গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (৩ জুলাই)।

১৮৯০ : 'রাজা ও রানী'; এমারেল্ড থিয়েটার।

১৮৯৫ : 'চিত্রাঙ্গদা', এমারেল্ড।

১৮৯৫ : 'দুকড়ি দত্ত' ('খ্যাতির বিড়ম্বনা'); এমারেল্ড।

১৮৯৭ : 'রাজা ও রানী'; ক্লাসিক থিয়েটার (২৪ জুলাই)।

১৯০৪ : 'চোখের বালি'; (অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাট্যরূপ) ক্লাসিক থিয়েটার (২৬ নভেম্বর)।

১৯১০ : 'গোড়ায় গলদ'; কোহিনুর থিয়েটার (৯ জানুআরি)।

১৯১০ : 'দশচক্র' ("মুক্তির উপায়" ছোটগল্প থেকে সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ); স্টার (২৬ ফেব্রুআরি)।

১৯১১ : 'জীবনে মরণে' ("দালিয়া" গল্পের অমরেন্দ্রনাথ দত্তকৃত নাট্যরূপ); গ্রেট ন্যাশনাল (১১ জুন)।

১৯১২ 'বিনি পয়সার ভোজ'; স্টার (১০ অক্টোবর)।

১৯১৩ 'বিদায় অভিশাপ'; মিনার্ভা (৯ অগাস্ট)।

১৯১৪ 'অভিমানিনী'; ("শাস্তি" গল্পের নাট্যরূপ), স্টার (১৩ জুন)।

১৯১৪ 'অকলঙ্ক শশী' ("দিদি" গল্পের নাট্যরূপ); স্টার (১৩ অক্টোবর)।

১৯২০ 'বশীকরণ'; মিনার্ভা (২৪ ফেব্রুআরি)।

১৯২৩ 'রাজা ও রানী'; স্টার (আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনা, ২৯ আগস্ট)

১৯২৫ : 'চিরকুমার সভা' ; স্টার (আর্ট থিয়েটার, ১৮ জুলাই)।

১৯২৫ : 'গৃহপ্রবেশ' ; স্টার, আর্ট থিয়েটার (৫ ডিসেম্বর)।

১৯২৬ : 'বিসর্জন' ; নাট্যমন্দির, শ্রী সিনেমা হল (২৬ জুন)।

১৯২৬ : 'শোধবোধ' ("কর্মফল" গল্প) ; আর্ট থিয়েটার, (২৩ জুলাই)।

১৯২৭ : 'শেষরক্ষা' ; নাট্যমন্দির (৭ সেপ্টেম্বর)।

১৯২৭ : 'পরিত্রাণ' ; আর্ট থিয়েটার (১০ সেপ্টেম্বর)।

১৯২৯ : 'তপতী' ; নাট্যমন্দির (২৫ ডিসেম্বর)।

১৯৩০ : 'মুক্তির উপায়' ; আর্ট থিয়েটার (১৭ মে)।

১৯৩৩ : 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ; আর্ট থিয়েটার (১৭ জুন)।

১৯৩৫ : 'শ্যামা' ; নবনাট্যমন্দির (২৮ সেপ্টেম্বর)।

১৯৩৬ : 'গোরা' ; নাট্যনিকেতন (১৯ ডিসেম্বর)।

১৯৩৬ : 'যোগাযোগ' ; নবনাট্যমন্দির (স্টার, ২৪ ডিসেম্বর)।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১২ পর্যন্ত 'গিরিশ যুগ', তারপর তাকে ধরে নিয়েই ১৮৮৬ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত 'প্রাক্-শিশির যুগ' এবং ১৯২৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সময়কে 'শিশির যুগ' বলে অভিহিত করে দেখিয়েছেন যে, দু যুগেই রবীন্দ্র-নাটক বা রবীন্দ্র-রচনার নাট্যরূপের অভিনয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান—গিরিশ যুগে তেরোটি, আর শিশির যুগে সব মিলিয়ে চোদ্দটি। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "তবে অন্যায়ভাবে অতীত যুগের পরিচালকদের অপবাদ দেবার কারণ কি ?"[৩]

আমরা এখানে অবশ্য গিরিশ যুগ ও শিশির যুগের রবীন্দ্র-নাটক সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করছি না, ফলে একটির তুলনায় অন্যটির উৎকর্ষ প্রতিপাদন আমাদের এই মুহূর্তে লক্ষ্য নয়। অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ইংরেজি গ্রন্থে সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত রবীন্দ্রনাটক বা নাট্যরূপের চরিত্র[৪] চমৎকার বিচার করেছেন, তাঁর আগে 'নাচঘর' সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সমালোচনাও সে দিকে অঙ্গুলনির্দেশ করেছে।[৫] এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। তার আগে সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং বাংলা নাট্যশালা সম্বন্ধে বিশেষভাবে, রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটি মানচিত্র লক্ষ করা যাক। একথা সত্য যে, দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের

'জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' ইত্যাদি গানও রচনা করেছিলেন। 'জ্যোতিদাদা'র নাটকের অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিয়ে তিনি নিশ্চয় দেখেছেন। হরীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরপরিবারের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সাধারণ নাট্যশালায় এসে অভিনয় দেখার ইতিবৃত্ত দিয়েছেন। কখনো কখনো শুধু ঠাকুরপরিবারের লোকেরাই ছিলেন দর্শক, অন্য দর্শকদের সেদিন অভিনয়ে প্রবেশাধিকার ছিল না। এই 'এলিটিজম' বাদ দিলেও, নোবেল পুরস্কার পাবার আগে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক হতে বিশেষ সংকোচ ছিল না। তবু আমরা লক্ষ করি, অন্যেরা যখন 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' নিয়ে উচ্ছ্বাস করে চলেছেন তখন এই সবচেয়ে মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন বাঙালি নাট্যকার, স্রষ্টা, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে সেই নাট্যমঞ্চের বাইরে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অভিনয়ের ধারা গড়ে তুলেছেন, এবং তাঁর যথার্থ বিশিষ্ট নাট্যসৃষ্টিগুলিও সাধারণ রঙ্গালয়ের দরজার বাইরেই থেকে গেছে। এর মূলে কি ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম শুচিতাবোধ, নাট্যালয়ে পতিতাগ্রহণ ইত্যাদি জনিত অস্বস্তি? রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় কাদম্বরী বউঠাকরুনের আত্মহত্যা ও স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ট্রাজেডির পিছনে একজন অভিনেত্রীর কথা শোনা যায়—সেই কিংবদন্তীর সম্ভাব্য সত্যও কি ছিল এর মূলে? 'গল্পগুচ্ছ'-এর "মানভঞ্জন" গল্পের[৬] নায়ক গোপীনাথ লবঙ্গ নামে যে অভিনেত্রীর 'শ্রীচরণে দাসখত' লিখে দিয়েছিল তার অভিনয়কৌশল, অর্থাৎ তৎকালীন রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় অভিনয়ের ধারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এইরকম—"সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েস্টকোট পরা, ফুলমোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী 'এক্সেলেণ্ট' 'এক্সেলেণ্ট' করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।"[৭] অথচ এই নিজস্ব মন্তব্যের পাশাপাশি সাধারণ দর্শকের কাছে রঙ্গালয়ের একটি ইন্দ্রজালবৎ আপাত বিভ্রম বা ইলিউশন সৃষ্টির বিষয়টিকেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, প্রথম অভিনয় দেখে গিরিবালার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে।

আমরা জানি, কোনো সমাজনীতি বা চরিত্রনীতির দিক থেকে নয়, ইংলণ্ড ও বাংলার তৎকালীন অভিনয়রীতি সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি ওই 'ইলিউশন' সৃষ্টির আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনকে একদিকে যেমন হাস্যকর মনে করেছেন, অন্যদিকে তৎকালীন অভিনয়ের অতিনাটকীয়তা ও

কৃত্রিমতা সম্বন্ধেও বিদ্রূপোক্তি করেছেন। অর্থাৎ অভিনয়রীতি ও মঞ্চপ্রযোজনার রীতিনীতি—দু বিষয়েই তাঁর আপত্তি ছিল। শুধু বাংলা নাটকে নয়, ইংলণ্ডে দেখা ইংরেজি নাটকের অভিনয় সম্বন্ধেও। অভিনয়ের আতিশয্য সম্বন্ধে 'পথের সঞ্চয়' এর "অন্তরবাহির" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে-ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আভিঙের হ্যামলেট ও ব্রাইড অফ লামারমুর দেখিতে গিয়েছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্য অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।"[৮]

অভিনয় সম্বন্ধে যখন এই কথা বলেছেন তখন রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টিগ্রাহ্য বা দৃশ্যরূপ—আরিস্টটল যাকে বলেন 'অপ্‌সিস'—সে সম্বন্ধে তাঁর কোন্ ধারণা তৈরি হচ্ছে? 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের সেই বিখ্যাত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি[৯] এ সূত্রে বহু উদ্ধৃত। তাতে দৃশ্যপট বিষয়ে তাঁর আপত্তির সমর্থনে তিনি যে শুধু ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এর অনুল্লেখের প্রসঙ্গ এনেছেন তাই নয়, তিনি সংস্কৃত নাটক থেকে উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন—"দুষ্মন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও। আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি, এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে ···দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস করা হয়।"[১০]

একথা লিখেছেন ১৯০২ সালে। যখন গিরিশচন্দ্র দোর্দণ্ডপ্রতাপে বেঁচে, স্টারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' (১৮৯৯), জনসমাদৃত হয়নি, কিন্তু ক্লাসিকে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) 'বহুত আচ্ছা' নামে নাগরিক দর্শকদের সচকিত করেছে।

'তপতী' (১৯২৯) নাটকের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। মণি বাগচির পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধে দেখি, গিরিশচন্দ্র বিষয়ে তাঁর নৈঃশব্দ্যের বিষয় নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁর 'স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যতার' (মূলে এইরূপ) সঙ্গে বলেন, "ত্যাখো, গিরিশচন্দ্র যে একজন genius, এবং তিনিই যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, এই প্রচলিত মতবাদ সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা অভিমত আছে, যেটা আমি প্রকাশ্যে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করেছি, পাছে কারো মনে আঘাত লাগে"।[১১] লক্ষ করতে হবে, শিশিরকুমার এবং মণি বাগচি দুজনেই 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' কথাটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, প্রায়ই ব্যবহার করেছেন 'পেশাদার' মঞ্চ।

বস্তুতপক্ষে 'জাতীয়' এই কথাটি থেকে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আরেকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কথা মনে পড়ে। এই শতাব্দীর গোড়ায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৬) 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) ইত্যাদি নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতাপাদিত্য জাতীয় সামন্তভূস্বামীদের যে মহান দেশপ্রেমিকরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছিল তা রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি—তাঁর 'বউ ঠাকুরানীর হাট'-এর প্রতাপাদিত্যের চরিত্রচিত্রণ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির সম্বন্ধেও এই একই কারণে তিনি আগ্রহ বোধ করেননি—তাতে বিলিতি নাট্যরীতির নকল যেমন আছে, তেমনই আছে বিস্ফারিত বাষ্পীভূত দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস, মাত্রাহীনতার অসংযম। বিলিতি যে-থিয়েটার রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে তা যে দ্বিজেন্দ্রলালকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।[১২] ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এই ক্ষোভ অন্যান্য অভিযোগ ও উষ্মার সঙ্গে জড়িত হয়ে ১৯১২-র ১৬ নভেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ করে রুচিহীন ব্যঙ্গনাটিকা 'আনন্দ-বিদায়'-এর অভিনয়ে পরিণাম লাভ করে তা আমরা জানি। অর্থাৎ পেশাদার রঙ্গমঞ্চই রবীন্দ্রনাথকে নাটকের মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে আক্রমণ করে। এই অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের লাঞ্ছনা হয়েছিল এ তথ্য যথার্থ, কিন্তু নাটকটিই এত কদর্য ছিল যে, এমন-কী দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী, যিনি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলাল কম বড় কবি নন—এটা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন সারা বইয়ে—তিনিও এ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন, "আপনি আজ সত্য-সত্যই আত্মহত্যা করিলেন।"[১৩]

এই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং "স্টারের মতো প্রসিদ্ধ মঞ্চ"। হরীন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য সংগতভাবেই বলেছেন যে এর জন্য মূলে দায়ী হয়তো দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু এই ঘটনা পেশাদার মঞ্চ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে উন্নত করেনি, বলাই বাহুল্য।

৩.

পেশাদার মঞ্চের কী ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে? এ সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষের কিছু কিছু বৃত্তান্ত তুলেছেন কেউ কেউ, যেমন গিরিশচন্দ্র সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার প্রস্তাব অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তাতে নাকি বলেছিলেন, "কী! এই দুর্নীতি-মূলক বই-এর আমি নাট্যরূপ দেব? আমি যে থিয়েটারে আছি, সে থিয়েটারে কখনও অমন জঘন্য বই অভিনীত হতে দেব না।"[১৪] এবং ওই অমরেন্দ্রনাথ দত্তই আবার গোঁ ধরে 'চোখের বালি' মঞ্চস্থ করেন এবং দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হন। হরীন্দ্রনাথ দত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন যে, "গিরিশচন্দ্র যে থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, তেমন কোনো রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে রবীন্দ্র-রচনা এক রাত্রি ছাড়া কখনও দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয়নি"।[১৫] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের একটি 'complex' ছিল। অবশ্য এটা যে-সময়ের কথা তখন গিরিশচন্দ্র অন্যের রচনার নাট্যরূপদান দীর্ঘদিন বর্জন করেছেন। ১৮৮০-র আগে তিনি কেবল মধুসূদন, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির রচনাই নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, পরে শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' (১৮৯৩) এবং মলিয়েরের 'লামুর মেয়াসঁ।' ('য্যায়সা-কা-ত্যায়সা', ১৯০৭) ছাড়া তাঁকে অন্যের দ্বারস্থ হতে বিশেষ দেখা যায় না।

হয়তো 'চোখের বালি' সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল, কিন্তু সেটাই কি সাধারণ রঙ্গালয়ের সার্বিক মত? হরীন্দ্রনাথ দত্ত 'বাঙ্গালী' ইত্যাদি নাটকের লেখক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিগতকালের কথা" ('বিংশ শতকে', ১৯৭৩) নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানোর প্রয়াস করেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে জীবনাবেগের অভাব আর কৃত্রিমতা" ছিল, শেক্সপীয়রের নাটকের যে 'ভাইটাল লাইফ'—তা তাতে ছিল না। "পৌরুষ" এবং তার "দীপ্ত প্রকাশ" ছিল না। তাতে নাকি ছিল "ঠুনঠুন পেয়ালা", "বেলোয়ারী আওয়াজ"; ছিল "পুরুষত্ববর্জিত মেয়েলীপনা",

কাজেই "গৈরিশী যুগের নাট্যকার ও কবিলেখকদের সেই সঙ্গে থিয়েটারের দর্শকদের রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না।"[১৬]

জানি না হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বিচার সত্য কিনা। কিন্তু ঘটনার দিক থেকে তো লক্ষ করি পেশাদার থিয়েটার ১৮৮৬ থেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনার নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করছে, রবীন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ির বা শিল্পীর অহমিকাবোধ থেকে সে রঙ্গালয়কে প্রত্যাখ্যান করছেন না। এবং শিশিরযুগে, যে সময়টা পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ—এমন কী 'শেষরক্ষা'-তে শিশিরকুমারের কথা ভেবে চন্দ্রবাবুর ভূমিকাও নাকি তিনি বাড়িয়ে দেন—নাটকের রচয়িতার অধিকার নিয়ে জুলুম করেননি। তার কারণ তিনি নিজেই বলেছেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে—"শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটা অভিনয়ের ভার তার হাতে দিয়েছি"।[১৭] কিন্তু আর্ট থিয়েটারের অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর তাঁর অনুরূপ শ্রদ্ধার কথা তো তিনি বলেননি। যে-অপরেশচন্দ্র 'কর্ণার্জুন'-এ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের রোমহর্ষক দৃশ্য দেখিয়েছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মাটির খেলনা রথ ব্যবহার করেছেন বলে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং যে অপরেশচন্দ্রের 'চিরকুমার সভা'-তে সভার সদস্যদের রসগোল্লা খেয়ে আঙুল চাটা এবং একে অন্যের কোলে বসে পড়া ইত্যাদি ছিল, তিনি বা তাঁর আর্ট থিয়েটার তো রবীন্দ্র-নাটকের প্রসাদ কম পায়নি। তাহলে সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো বদ্ধমূল বিদ্বেষ ছিল এ কথা তো যথার্থ মনে হচ্ছে না।

৪.

কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় যে, শিশির যুগ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাথের নাটক বা নাট্যরূপকে চেয়েছে তার নিজের শর্তে, তা ব্যবহার করে ব্যাবসা চালানোর জন্য। শিশিরকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি একটু অন্য রকম ছিল, বলা বাহুল্য, কিন্তু 'রীতিমত নাটক' বা 'জীবনরঙ্গ' দেখে প্রশ্ন জাগে, খুব অন্য রকম ছিল কি? যে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮-এর 'শারদোৎসব' থেকে একটা ভিন্ন নাট্যরীতির মধ্য দিয়ে নাটকের মুক্তি খুঁজেছেন, কিংবা যে-রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' থেকে আরম্ভ করে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের একটি সম্পূর্ণ অভিনব রূপকর্মের চূড়ান্ত উৎকর্ষ নির্মাণ করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ রঙ্গালয় বা

পেশাদার রঙ্গালয় প্রত্যাখ্যান করেছে। নিয়েছে তাঁর হৃদয়াবেগ ও দ্বন্দ্বসংঘাতময় নাট্যকর্মকে, কিংবা তাঁর হাসির নাটকগুলিকে ; যে-নাটকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থরূপে রবীন্দ্রনাথ, সে নাটকের দিকে পেশাদার রঙ্গালয় ফিরেও তাকায়নি। হরীন্দ্রনাথের এই কথাটি মূল উদ্দেশ্য ও চিন্তার দিক থেকে সাধারণ রঙ্গালয়কে চিহ্নিত করে—"সকলে ব্যাবসা করতে নেমেছিলেন তো!"[১৮] ব্যাবসার কারণে নাটক নির্বাচনের অধিকার রঙ্গালয়ের থাকবেই, বিশেষত যে-রঙ্গালয় 'পেশাদার', এবং তা অন্যায়ও নয়। কিন্তু তার জন্য 'রাজা ও রানী', 'মালিনী' বা 'বিসর্জন'-এর নাট্যকারের রচনায় "পৌরুষ" নেই একথা যেমন অন্তঃসারশূন্য, তেমনই রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়কে প্রশ্রয় দিতেন না তাও সত্য নয়। বরং মনে হয় রঙ্গালয়ের সঙ্গে একটা 'প্রফেশনাল' সম্পর্ক গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ অনুৎসুক ছিলেন না, সেজন্য নাটকে বা নাট্যরূপে আপোশও করেছেন তিনি।[১৯] সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং হরীন্দ্রনাথ দুজনেই অবশ্য বলতে চেয়েছেন যে, সে যুগের দর্শকদের কাছে রবীন্দ্র-নাটক বড় বেশি "উন্নত" এবং "দুর্বোধ্য" এবং "শিল্পিত" (সুশীলকুমারের ভাষায় দর্শকেরা ছিল "to earthey earthey" আর রবীন্দ্রনাথের নাটক ছিল "too airy airy"[২০]।) যে কারণেই হোক, এই কাজের সম্পর্ক গড়ে উঠল না দুয়ের মধ্যে, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের নাটক অভিনয়ের এক সমান্তরাল মঞ্চ গড়ে তোলবার চেষ্টা করলেন। তাঁর 'শারদোৎসব' 'ফাল্গুনী', 'বিসর্জন' 'রক্তকরবী' ইত্যাদি অভিনীত হল শান্তিনিকেতনে এবং পরে তাঁর 'রক্তকরবী' ইত্যাদি নাটক বাংলার বহুরূপী প্রমুখ নতুন নাট্যদলগুলি প্রযোজনা করে রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করল। 'রক্তকরবী' শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের দ্বারা কলকাতায় আগেও অভিনীত হয়েছিল। মণি বাগচি সে সম্বন্ধে বলেছেন, "তেমন অভিনয় বহুরূপী সম্প্রদায়ের কল্পনার বাইরে।"[২১] আমরা আগেরটি দেখিনি, আর সে অভিনয়ের যখন পুনরাবৃত্তি ঘটেনি তখন মণি বাগচির উচ্ছ্বাস কতটা সমর্থনযোগ্য তা যাচাই করবার উপায় নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনা যা দাঁড়ায় তা এই যে, রবীন্দ্র-নাটকের যথার্থ ও যোগ্য পরিবেশনা স্বাধীনতার পরেই শুরু হয়েছে। 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর' এমন কী 'চার অধ্যায়' ও 'ঘরে বাইরে' অভিনয়ে, বিশেষত বহুরূপী সম্প্রদায়ের নাট্যচেতনার উন্নতি ও মহত্ত্ব বাঙালি দর্শকের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরে অন্যান্য দলও যে 'অচলায়তন', 'রথের রশি', 'কালের যাত্রা' ইত্যাদি নাটক

করতে এগিয়ে এসেছে—তার কারণ তাদের দর্শক ছিল কিছুটা আলাদা, এবং দ্বিতীয়ত, তাদের লাভ লোকসানের বিবেচনাটা ছিল একটু অন্য রকম। থিয়েটারের মধ্য দিয়ে "লোকশিক্ষা" হয় রামকৃষ্ণের এই কথা স্বাধীনতার পরে যে-সব সম্প্রদায় বিশ্বাস করত, তারা "পেশাদার" নয়, কিন্তু গণনাট্য-জাত, মতামতের দিক থেকে কম-বেশি সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী নানা নাটকের দল। শান্তিনিকেতনে সমান্তরাল নাট্যচর্চা কখনোই রবীন্দ্রনাথের ওই নাটকগুলি গ্রহণ করে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি, তা মূলত গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের পরিবেশনা-তেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-মহত্ত্বের বিস্তার যথার্থরূপে সম্পন্ন হয় কলকাতার ওই আদর্শবাদী ও সচেতন মধ্যবিত্ত মানুষদের তৈরি দলগুলির দ্বারা। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করে তারাই—যার মধ্যে বহুরূপীর শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব অবিসংবাদিত।[২২]

৫.

সাধারণ রঙ্গালয় হোক আর গ্রুপ থিয়েটার হোক, রবীন্দ্রনাথের নাটক সবসময় একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। নাটকের মধ্যে যদি নৃত্যনাট্য বা রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানকে একটি সম্ভব-অসম্ভব থিম-এর সূত্রে গেঁথে নাচের তালে বেঁধে ফেলা 'নেত্যনাট্য' বুঝি, তাহলে অবশ্য রবীন্দ্রনাটক আর তত বড় চ্যালেঞ্জ থাকে না। একটি মাঝারি নৃত্যশিল্পীর জুটি এবং কিছু চলনসই নাচিয়ে জোগাড় করতে পারলেই হল, দিব্যি একটি 'নাটক' নামিয়ে ফেলা যায়। বস্তুত এ ধরনের 'নাটক' প্রচুর হয়, 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা' ইত্যাদির অভিনয়-সংখ্যা ধরলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার। কিন্তু এ আলোচনায় এই 'নাটক'গুলিকে আমরা ধরছি না, ধরছি নৃত্যহীন এবং সংগীতপ্রাধান্যবর্জিত অন্য নাটকগুলিকে—গদ্যে-পদ্যে লেখা মূলত অভিনেয় নাটকগুলিকে। তার হিসেব করলে এক বহুরূপী ছাড়া অন্য সব দলের রেকর্ডই ব্যর্থতার, কখনও হয়তো 'গৌরবময়' ব্যর্থতার। রবীন্দ্রনাথের নাটক অধিকাংশ গ্রুপ থিয়েটার ভালো করে করে উঠতে পারেনি, দর্শকদের কাছে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে তার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলে ধরতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের নিজের শান্তিনিকেতনে বা কলকাতায় আয়োজন করা সমান্তরাল নাট্যচর্চার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নই। ফলে তার সাফল্য ও গৌরব সম্বন্ধে তৎকালীনদের, অধিকাংশক্ষেত্রে রবীন্দ্র ভক্তদের, সাক্ষ্যই

আমাদের মেনে নিতে হবে।[২৩] সে-সাক্ষ্য অনেক সময়েই ভক্তিপ্রসূত মুগ্ধতায় সিক্ত, এমন সংশয় অহেতুক নয়। অন্যদিকে একথা ঠিক যে, পেশাদার রঙ্গালয়ের তুলনায় রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ে গ্রুপ থিয়েটারের অহংকার অনেক বেশি। এখানে যথার্থ রবীন্দ্রনাটক অভিনীত হয়েছে, যে-নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছেন, সারা পৃথিবীর সমকালীন নাট্যভাবনার কথা বলেছেন সেই নাটকই গ্রুপ থিয়েটার অভিনয় করেছে, সফল হয়েছে। কিন্তু এই অহংকার অধিকাংশত একটিমাত্র দলের একার সংগত অহংকার, সমগ্রভাবে গ্রুপ থিয়েটারের নয়। সে দলটি বহুরূপী। তবু গ্রুপ থিয়েটার অন্তত এমন একটি পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করতে পেরেছে যাতে 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' করার কথা ভাবা যায়, পরে থিয়েটার ওয়ার্কশপ নতুন ভাবনায় 'বিসর্জন' অভিনয়ে ঝাঁপ দেয়, এমন-কী অতি-সাম্প্রতিক কালে কলকাতা থেকে দূরবর্তী বহরমপুরের তিনটি দলও যথাক্রমে 'রাজা' (ক্রান্তিক) 'অচলায়তন' (ছান্দিক) এবং ছোটগল্প থেকে তৈরি 'তোতা-কাহিনী'কে (বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার) বেশ গ্রহণযোগ্য রূপে দাঁড় করায়। পেশাদার মঞ্চে সেই পরিপ্রেক্ষিতের অস্তিত্ব ছিল না। তখন দর্শক তৈরি হয়নি, সাধারণ রঙ্গালয়ের চৌহদ্দিতে যে-সব দর্শক আসত তারা এসব নাটকের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে গণনাট্য, এবং পরে গ্রুপ থিয়েটার অন্তত দর্শকের চারিত্রটিকে খানিকটা বদলে দিতে পেরেছে, তাদের দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী, মফস্‌সলের জমিদার জোতদারের শ্রেণী থেকে খানিকটা তুলে, খানিকটা ছড়িয়ে অনেক বড় একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছে। এখন তার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপক, অফিস-আদালতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কেরানি—যার অধিকাংশই বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী—সকলেই আছেন, এবং তাঁরা নাটকের কাছে শুধু বিনোদন আর প্রত্যাশা করেন না। অফিস ক্লাবের অভিনয়ের চেহারাও যে গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে বদলে গেছে তাতেও এই দর্শকের রুচির বদল অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক ধাতের পরিবর্তন বেশ চোখে পড়ে। এখন ভালো অভিনয় বা প্রযোজনা হলে তাঁরা অতি দুরূহ বিষয় বা খুব অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও সংবর্ধনা জানাতে প্রস্তুত, মস্তিষ্ক-চর্চাতে তাঁদের আতঙ্ক নেই। অধিকাংশ নাটকের অভিনয় আর প্রযোজনার মূল স্তম্ভ দুটি নড়বড়ে থাকে বলে এই দর্শকেরাও প্রায়ই মঞ্চের রাস্তা ভুলে যান—কিন্তু সে জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার, বা গ্রুপ থিয়েটারের একটি দলের রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ে ওই সাফল্য, দর্শকদের

রবীন্দ্রনাথের নাটকের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছে। নাটক যদি দুর্ধর্ষ করে নামানো সম্ভব হয়, এই দর্শক উদাসীন থাকবে না—এমন আশা অলীক নয়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এই অবস্থাটাই তৈরি ছিল না। সেদিক থেকে গ্রুপ থিয়েটার খানিকটা এগিয়েছে বলতেই হবে। তা রবীন্দ্রনাথকে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মোটা-মোটা বই লেখা পণ্ডিতদের উন্নাসিক অবিশ্বাসকে বাতিল করেছে, দেখিয়ে দিয়েছে যে, রবীন্দ্রনাটক 'নাট্য' নাটক, কেবল 'পাঠ্য' নাটক নয়, তা নয় দ্বন্দ্বহীন গীতল উচ্ছ্বাসমাত্র। শশাঙ্কমোহন সেনের মতো সমালোচকেরা 'রাজা' বা 'অচলায়তন' সম্বন্ধে যখন বলেন,—"কোনটাই প্রকৃত নাট্য নহে, আপাততঃ নাট্যপ্রণালীতে রচিত thesis বা সন্দর্ভ"[২৪] তখন তাঁরা রবীন্দ্রনাটকের নাট্যিক সম্ভাবনা আদৌ ধরতেই পারেন না।

যখন দেখি, রবীন্দ্রনাটক সম্বন্ধে এই প্রথম জাগৃতির মূল কৃতিত্ব প্রধানত একটিমাত্র দলের, তখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রতি ধিক্কার একটু নরম হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তো এখনও হয়ে উঠতে পারলেন না সমস্ত দলের উত্তরাধিকার, সকলের নিজস্ব সম্পত্তি। অনেকে ধরতেই সাহস করল না তাঁকে, অনেককে সাহস করে পস্তাতে হল, অনেকে শতবার্ষিকী বা একশ পঁচিশের ধাক্কায় রবীন্দ্র-নাটক নামিয়ে বিব্রত ও অপ্রতিভ হয়ে গেল, তা চালাতে পারল না আর। মুখ্যত একটিমাত্র দলের কৃতিত্বে সমগ্র গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন যদি ভাগ বসাতে যায় তা বোধ হয় উচিত কাজ হয় না।

অথচ এমন নয় যে, গণনাট্য এবং পরে গ্রুপ থিয়েটারের বহু দল রবীন্দ্রনাথের নাটক করা সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই ব্যয় করেনি। ১৯৫২-র 'গণনাট্য' পত্রিকায় উৎপল দত্ত লিখেছিলেন, "ধর্মের অনুশাসনের নির্বুদ্ধিতাকে উদ্‌ঘাটিত করা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক আমরা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' বা 'তাসের দেশ' আমরা করতে পারি। অথচ আমাদের নাট্যকারদের কখনও এই দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয় না।"[২৫] তারপর ১৯৫৪ সালের ১০ই মে-তে শেয়ালদার রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিট্যুট-এ বহুরূপীর 'রক্তকরবী'-র উদ্‌বোধনের সঙ্গে সঙ্গে ওই দলের রবীন্দ্রনাটক মঞ্চায়নের গৌরবময় পরম্পরা আরম্ভ হল। একথা সত্য যে, অন্যান্য দলও রবীন্দ্রনাটকের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকেনি। বহুরূপী ছাড়াও যে-সব প্রধান দল রবীন্দ্রনাটক, অর্থাৎ 'হাস্যকৌতুক'-'ব্যঙ্গকৌতুক'-'মুকুট'-'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া মোটামুটি সিরিয়াস ও পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রনাটক অভিনয়

করতে এগিয়ে এসেছে, সেগুলির হিসাব মোটামুটি এইরকম :

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ—'তপতী, 'শোধবোধ' (১৯৫৮), 'অচলায়তন', 'কালের যাত্রা'; শৌভনিক—'গোরা' (১৯৫৯), 'রাজা' (১৯৬১), 'রাজা ও রানী' (১৯৬১), 'বাঁশরী' (১৯৬১), 'তাসের দেশ' (১৯৬৩), 'শেষরক্ষা' (১৯৬৫), 'ঘরে-বাইরে' (১৯৬৬); অনুশীলন সম্প্রদায়—'বিসর্জন' (১৯৬১); গন্ধর্ব—'বিসর্জন'; নান্দীকার—'চার অধ্যায়' (১৯৬১); ইণ্ডিয়ান থিয়েটার অ্যাকাডেমী—'গোরা', 'বিসর্জন'; থিয়েটার ওয়ার্কশপ—'বিসর্জন' ('দ স্যাক্রিফাইস' অবলম্বনে, ১৯৮৪); থিয়েটার সেণ্টার—'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৯৫৫), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯৬৫); রূপকার—'কালের যাত্রা' (১৯৬২), 'অচলায়তন' (১৯৬৬); থিয়েটার ইউনিট—'যোগাযোগ', 'চিরকুমার সভা', 'নৌকাডুবি', 'শোধবোধ', 'বিসর্জন'; মাস থিয়েটার—'চিরকুমার সভা' (১৯৬১); ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ—'বিসর্জন' (১৯৫৪), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৫৭); নট নাট্যম্—'ডাকঘর' (১৯৫৩); শিল্পীমন—'বিসর্জন'; রঙ্গম্—'বৈকুণ্ঠের খাতা'; অহীন্দ্রম্—'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'শোধবোধ' (সবই ১৯৬২); ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট—'রাজা ও রানী' (১৯০৩, ১৯০৮), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৯১৪), 'গোড়ায় গলদ' (১৯২২), 'বিসর্জন' (১৯২৯), শোধবোধ (১৯২৯), 'তাসের দেশ', 'রথের রশি'।[২৬] আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়—'রক্তকরবী' (১৯৮৪); ক্রান্তিক (বহরমপুর)—'রাজা' (১৯৮৮); ছান্দিক (বহরমপুর)—'অচলায়তন' (১৯৮৮); অনামিকা (হিন্দিভাষী)—'ঘর ঔর বাহার' (১৯৬১), 'শেষরক্ষা' (১৯৬৩)।

উপরের তালিকায় 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'নৌকাডুবি' মূলত উপন্যাসের নাট্যরূপ। এ ছাড়াও গ্রুপ থিয়েটারের নানা দল রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করেছে, তার মধ্যে আছে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা', 'শাস্তি', 'কাবুলিওয়ালা', 'গুপ্তধন', 'মাস্টার মশাই', 'বদনাম' ইত্যাদি। উপন্যাস 'মালঞ্চ'-এর নাট্যরূপও অভিনীত হয়েছে।

এই যে, তালিকা—এ থেকে গ্রুপ থিয়েটারের রবীন্দ্রনাথ-গ্রহিষ্ণুতার যে ছবি ফুটে ওঠে তা খুব ব্যাপক নয়। ইদানীংকালের অনেক জনপ্রিয় দল রবীন্দ্রনাথ আদৌ অভিনয় করেননি তা লক্ষ করা যায়; তার মধ্যে পড়ে চার্বাক, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, শূদ্রক, নান্দীমুখ, পি এল টি প্রভৃতি। এ কথা এই দলগুলি সম্বন্ধে অভিযোগ হিসেবে বলছি না, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাটক না করায় এই দলগুলি কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছে, বা তাদের কৃতিত্বের কিছুটা নম্বর এ জন্য কেটে

নেওয়া হবে—এমন হাস্যকর দাবি করছি না আমরা। কিন্তু এ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটক করার কিছু সমস্যার ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে আমরা সেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করব, তার আগে বহুরূপীর কৃতিত্বের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখে নেওয়া যাক।

১৯৫৪-র 'রক্তকরবী'র আগেও বহুরূপী রবীন্দ্রনাথের নাটক করেছিলেন। উপন্যাসের নাট্যরূপ 'চার অধ্যায়' মঞ্চস্থ হয়েছে ১৯৫১-তে। তা প্রচুর পরিমাণে সংলাপাক্রান্ত হলেও, শম্ভু মিত্রের সেই অনন্য ক্ষমতা—ভারী ও দীর্ঘ সংলাপের মধ্য থেকে সমস্ত নাটককে নিংড়ে বার করে আনার—প্রতিটি শব্দের অর্থ ও ওজন বুঝে তাকে কণ্ঠস্বরে জলজ্যান্ত অনুবাদ করার অভাবনীয় দক্ষতা—এতে যথারীতি প্রকাশ পায়। সম্ভবত রবীন্দ্রনাটকের সংলাপ আর আপাত অ-নাটকীয়তার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েই শম্ভু মিত্রের প্রতিভা বিস্ফোরিত হয়।

কিন্তু এইসব বিবেচনার আগে বহুরূপীর রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের একটি তালিকা দিই[২৭]—

'চার অধ্যায়' প্রথম অভিনয়, শ্রীরঙ্গম, ২১. ৮. ১৯৫১

'রক্তকরবী', প্র অ. রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট, ১০. ৮. ১৯৫৪

'স্বর্গীয় প্রহসন', নিউ এম্পায়ার, ২২. ৫. ১৯৫৫

'ডাকঘর', নিউ এম্পায়ার, ২৪. ২. ১৯৫৭

'মুক্তধারা', নিউ এম্পায়ার, ১৫. ১২. ১৯৫৯

'বিসর্জন', আইফ্যাক্স হল, দিল্লি, ১১. ১১. ১৯৬১

'রাজা', নিউ এম্পায়ার, ১৩. ৬. ১৯৬৪

'দুরাশা', একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ১৬. ১২. ১৯৭৩

'ঘরে বাইরে', একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, ৯. ৬. ১৯৭৪

'মালিনী', একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, ১. ৫. ১৯৮৬

এর মধ্যে 'ঘরে বাইরে' আর 'দুরাশা' রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত নাটক নয়, নাট্যরূপ। প্রযোজনার দিক থেকে সবচেয়ে সফল সম্ভবত যথাক্রমে 'রক্তকরবী, 'রাজা', 'ডাকঘর', এবং তুলনায় কম সফল 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা'।[২৮] 'মালিনী' কুমার রায়ের নির্দেশনা, 'ডাকঘর' 'দুরাশা' আর 'ঘরে বাইরে' তৃপ্তি মিত্রের। যদি আমাকে এরও মধ্যে দুটি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাট্যরূপকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আমি 'রক্তকরবী' আর 'রাজা'কেই বেছে নেব। 'ডাকঘর' আমাকে আন্দোলিত করেছে, কিন্তু শেষ দৃশ্যটি—যেখানে মঞ্চ-জোড়া নীলচে-সবুজ

আলোর প্রক্ষেপে অমলের ঘরটি হঠাৎ ঊর্ধ্বে উঠে অম্লান জ্যোৎস্নার সমুদ্রে গিয়ে ভাসতে থাকে বলে মনে হয়—সেখানে ছাড়া অন্যত্র প্রযোজনার বিশেষ কোনো বড় কল্পনা স্মরণীয় হয়ে থাকে না। তবু অন্য নাটকগুলিতেও সজ্ঞান পরিকল্পনার যে-পরিচয় ছিল, সচরাচর তার তুলনা দুর্লভ। গ্রুপ থিয়েটারের করা আর কোনো রবীন্দ্রনাটকই বহুরূপীর গৌরব ও সাফল্যের কাছাকাছি যেতে পারেনি।

৬.

'বহুরূপী'র এই সাফল্য অনায়াসে এবং বিনা সাধনায় অর্জিত নয়, তা বলা বাহুল্য। যাঁরা ১৯৬১-তে শৌভনিকের 'রাজা' এবং ১৯৬৪-তে বহুরূপীর 'রাজা' দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, দ্বিতীয় প্রযোজনাটিতে কী গভীর চিন্তা কল্পনা ও প্রয়াসের পরিচয় ছিল, এবং কী প্রচণ্ড নির্মমতায় তাঁরা প্রতি-ক্ষেত্রে নাটকটির সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছিলেন। এই কঠোর আত্মপীড়নধর্মী নিষ্ঠুরতা না থাকলে বোধ হয় বড় কিছু তৈরি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিষ্ঠুরতার বাইরেও আর একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল। তা হল একটি বড় চ্যালেঞ্জের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার এবং শেষে জিতে যাওয়ার আনন্দ। আর কিছু প্রতিভাশালী লোক একটি চমৎকার ঐতিহাসিক যোগাযোগে ঘনপিনদ্ধ সংগঠনের মধ্যে একত্র মিলিত হয়ে কাজ করতে পেরেছিলেন—শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন প্রভৃতির মধ্যে একটি দুর্লভ সহযোগের আবহ তৈরি হয়েছিল।

মূল শক্তি ও কল্পনাঋদ্ধির উৎস অবশ্যই ছিলেন শম্ভু মিত্র। পরে এই মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের অভিমান বা অভিযোগ কম তৈরি হয়নি—তাঁরও অনেকের সম্বন্ধে পালটা অভিমান—আমাদের মতে সহেতু ও নির্হেতু দুধরনেরই অভিমান—নিশ্চয়ই আছে। তাঁর পরবর্তী পন্থা ও বিশ্বাসের সংগতি-অসংগতি নিয়ে প্রশ্ন আমরা নিশ্চয়ই তুলব। ১৯৬২-র নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের কংগ্রেসি নির্বাচনী সভায় শম্ভু মিত্রের যোগ দেওয়ার সাফাই স্বপন মজুমদার যেভাবে খাড়া করেছেন আমাদের মতে তা দাঁড়ায় না।[২৯] কিন্তু এইসব বাদবিতণ্ডার বাইরেও যা অক্ষত হয়ে থাকে তা হল নাটক নামক মিডিয়ামটির উপর শম্ভু মিত্রের অসামান্য ও নিঃসংশয় দখল, সমস্ত ক্ষেত্রে উৎকর্ষবিধানের এক আপোষহীন মনোভাব। সঙ্গে সঙ্গে নাটকের বিভিন্ন দিকের সবকটিতে—সংলাপ বলানোয়, সংলাপ-সংবদ্ধ আঙ্গিক অভিনয়ে, সাধারণ অভিব্যক্তি-অভিনয়ে, মঞ্চে চলা-ফেরা,

ওঠা-বসায়, অভিনেতাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও অবস্থান নির্ধারণে ; মঞ্চের অনুপুঙ্খ বিন্যাসে, অর্থাৎ তার রূপ, রঙ, গভীরতা, ধাপ, উপকরণ সংস্থাপনে ; সংগীত ও আবহধ্বনির বাদী-সংবাদী ব্যবহারে, আলোর প্রত্যয়যুক্ত ও অর্থময় সংযোগে—তাঁর পারফেকশনিস্ট-এর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ নামক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে তাঁর এই ক্ষমতাগুলি আরো শক্তি লাভ করেছিল।

সংলাপ-বলানোয় তাঁর সদর্থে অতি-সচেতন প্রয়োগকলার একটি দৃষ্টান্ত এখনও কানে লেগে আছে। 'রাজা'তে ৮ দৃশ্যে রাজবেশীর ছলনায় মুগ্ধ সুদর্শনা অন্ধকার কক্ষে ফিরে এসে রাজাকে তার তীব্র আর্তি ও তাপ জানাচ্ছে। সে বলছে, এখনও তার মন সুবর্ণের রূপে মোহাবিষ্ট, রাজার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব, তা মিথ্যা হবে। রাজা বলছে, "একটুও চেষ্টা করবে না?" সুদর্শনা বলছে, "কাল থেকে চেষ্টা করছি—কিন্তু যতই চেষ্টা করছি ততই মন আরও বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে।" এই দৃশ্যে রাজরূপী অদৃশ্য শম্ভু মিত্র সম্ভবত ইচ্ছে করেই নিজের কণ্ঠস্বরকে খুব অনুত্তেজিত এবং flat রাখেন, যাতে সেই স্বরমাত্রার সঙ্গে বিরোধে তৃপ্তি মিত্রের সমস্ত দ্বন্দ্ব তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং উচ্চারণে প্রত্যাশিত আলোড়নময় নাটকীয়তা নিয়ে ফুটে উঠতে পারে, এবং সেটাই ঘটে। তৃপ্তি মিত্র ওই সংলাপে 'অশুচি' কথাটা যে আত্মধিক্কারের সঙ্গে বলেন, পরবর্তী 'অসতী' কথাটাতে তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মমুখী ঘৃণা ঢেলে ভেঙে পড়েন, অশুচিতা এবং অসতীত্বের অর্থের মাত্রাগত পার্থক্য, সে সম্বন্ধে ভারতীয় নারীর মূল্যবোধের দূরত্ব—এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিংবা অনেকেরই হয়তো মনে আছে 'রক্তকরবী'তে রাজার সংলাপ—"আমি এক প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মতো একটা ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।" শম্ভু মিত্রের সংলাপে 'তপ্ত' 'রিক্ত' এবং 'ক্লান্ত' শব্দতিনটি সম্পূর্ণ আলাদা তিনটি রণনে উচ্চারণ করা হত, 'তপ্ত'তে জ্বালা, 'রিক্ত'তে শূন্যতা এবং 'ক্লান্ত'-তে খিন্ন অবসাদের বোধকে শম্ভু মিত্র অনায়াসেই ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। সমস্ত চরিত্রের সংলাপেই এই প্রখর ধ্বনি ও অর্থের চৈতন্য ছিল বহুরূপীর নাটকের বিশিষ্ট চিহ্ন।

সংলাপ নিয়ে বহুরূপীর অর্থাৎ শম্ভু মিত্রের ভাবনার তাগিদটা তৈরি হয়েছিল এই কারণে যে, নাট্যসাহিত্যের বাঘা বাঘা ইতিহাস-লেখকেরা যেখানে রবীন্দ্র-

নাটককে অনাটকীয় বলে রায় দিয়েছিলেন,[৩০] সেখানে রবীন্দ্রনাটকের মূল এবং গভীরতর নাট্যিকতা নিহিত ছিল তার সংলাপেই। রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই গভীরতর নাট্যধর্মের আবিষ্কার ও প্রকাশই শম্ভু মিত্রের বড় উপার্জন। 'রাজা' নাটকের এই সংলাপগুলি পড়লে প্রচলিত ধারার নাট্যসমালোচকদের কাছে সমস্তটাই 'কাব্যি' বলে মনে হবে।—

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না।

সুদর্শনা। এক রকম করে আসে বইকি! নইলে বাঁচব কী করে।

রাজা। কীরকম দেখেছ।

সুদর্শনা। সে তো একরকম নয়! নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বসে বসে মনে করি, আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয় ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার, শরৎকালের আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা শাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতরমহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রাঙন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি তার উতলা।

কিন্তু যাঁরা প্রয়াত তৃপ্তি মিত্রের মুখে এই কথাগুলির অভিনীত উচ্চারণ

শুনেছেন তাদের কখনোই মনে হবে না এগুলি কবিতাসিক্ত ভাবালু স্বরক্ষেপ মাত্র। তাঁর অভিব্যক্তিতে প্রতিটি কথা জীবন্ত হয়ে উঠত এবং কবিতা জীবনের আবেগময় উপলব্ধি হয়ে দাঁড়াত।

কাব্যসংলাপেও বহুরূপী স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। তাঁরা কাব্যের সুরেলা কাব্যিকতাকে যথাসম্ভব নিরস্ত করেছেন, অধিকাংশত দৈনন্দিন কথার ভঙ্গি বজায় রেখেছেন, এবং দৈনন্দিন সংলাপ-ভঙ্গিকে একটু অতিশায়িত করে এবং কাব্যের সুর সামান্য এনে 'বিসর্জন' ইত্যাদির নাট্যসংলাপকে নাটকেরই সংলাপ করে তুলেছেন, তা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অতিনাটকীয় আবৃত্তি হয়ে থাকেনি।

অন্যান্য বিভাগে বহুরূপীর, অন্তত শম্ভু মিত্র ও ক্বচিৎ তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত বহুরূপীর, সাফল্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার পরিসর এ নয়। তবু এখান থেকেই অন্যদের ব্যর্থতার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গৌরবময় ব্যর্থতার (থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'বিসর্জন'-কে আমি তাই মনে করি), উৎস কী—সে সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সংলাপ ব্যবহার করেননি এবং নাটক তার দ্বারা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, নাটকের বিন্যাসও আর একটু সম্পাদিত হতে পারত। কিন্তু কেন লিট্‌ল থিয়েটার এক রাত্রি 'তপতী' অভিনয় করে তা বর্জন করেন এবং পরে 'শোধবোধ' আর 'অচলায়তন' করে হতাশ দুঃখে জানান "প্রিতিজ্ঞে করিছি, আর কখনো করবুনি, এই কাজটা আর কখনো করবুনি"[৩১] গণনাট্যে রবীন্দ্রনাটক করা সম্বন্ধে উৎপল দত্তের প্রস্তাব সত্ত্বেও, তখন ভাবতেই হয়, কোথায় তাদের ত্রুটি বা বাধা, কেন তাঁরা রবীন্দ্রনাটককে আত্মস্থ করতে পারেন না শম্ভু মিত্রের বহুরূপীর মতো করে। আমরা দেখেছি যে, শম্ভু মিত্রের সাফল্যও সমস্ত রবীন্দ্রনাটকে ঘটেনি—'মুক্তধারা' প্রায় চলেইনি, 'বিসর্জন'-ও 'রক্তকরবীর', বা 'রাজা'র' পর্যায়ে আসতে পারেনি। রবীন্দ্রনাটকে গ্রুপ থিয়েটারের সাফল্য প্রায় একটিমাত্র দলের সাফল্য, দলটির সাফল্য প্রায় একটিমাত্র ব্যক্তির সাফল্য এবং ব্যক্তিটির সাফল্য মাত্র দুটি কি তিনটি নাটকে এসে দাঁড়ায়। একথা ঠিক যে, এ নাটকগুলি প্রচলিত ছকের নাটক নয়, এবং ওই ভিন্ন ছকের উত্তুঙ্গ কাব্যিকতাময় সংলাপের নাটকগুলিকে ঘটমান সত্যপ্রতীতি দেওয়া বহুরূপী তথা শম্ভু মিত্রের অসামান্য কৃতিত্ব।

অন্যরা ঠিক সেভাবে সফল হলেন না কেন? 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ'[৩২] নামক সংকলনটিতে একালের বহু অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশকের সাক্ষাৎকার আছে[৩৩]। সকলেই গ্রুপ থিয়েটারের লোক। এই সাক্ষাৎকারগুলি থেকে বিভিন্ন সমস্যার

একটা তালিকা বেরিয়ে আসে। যেমন কুমার রায় বিশের করে জোর দেন রবীন্দ্রনাথের সংলাপের ভাষার উপর, যে-ভাষা আয়ত্ত করতে হলে চর্চা ও সাধনা দরকার, অথচ সেই চর্চা ও সাধনার সময়টাই বা আগ্রহটাই তত সুলভ নয় সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল কথাটি বুঝতে অসুবিধা, চরিত্রগুলির মানবিকতার চেহারাটা ধরতে না পারা, কুমার রায় এই সমস্যাগুলিকেও তুলে ধরেন, এবং সংগতভাবেই বলেন "রবীন্দ্রনাটক সহজ সফলতার নয়"।[৩৪] নিবেদিতা দাস ভাষার কথা ছাড়া বলেন নারী শিল্পী পাওয়ার সমস্যার কথা। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী পরিবেষ্টিত জগতে অভিনেত্রী পাওয়া কোনো কঠিন দায় ছিল না, কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের নাটকে একটির বেশি দুটি নারীচরিত্র থাকলেই মুশকিলে পড়তে হয়। আছে গানের সমস্যা। রবীন্দ্রনাটকে গান অপরিহার্য, অথচ গান ভালো করে গাইবে, বা নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী গাইবে—তেমন শিল্পী কই? যাঁরা 'রক্তকরবী'-তে বিশু পাগলরূপে সবিতাব্রত দত্ত আর শোভেন মজুমদারের অভিনয় দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, সবিতাব্রত দত্তের লখনউ মরিস কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অতিশয় কুশলী, দরাজ সুরেলা গলার গানের চেয়ে শোভেন মজুমদারের ভাঙা, কিছুটা ফ্যাসফেঁসে গলার গান কেমন অনেক বেশি বাঙ্‌ময় হয়ে উঠত ওই নাটকে, কারণ তাঁর গান নাটকের অধীন থাকত, নাটকের সঙ্গে মিশে যেত সহজে। নিবেদিতা বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কঠিন অনুশাসনের কথাও বলেছেন—জানি না এখনও সেটা ততটা কঠিন কিনা। শেখর চট্টোপাধ্যায় বলেন 'বিসর্জন' জাতীয় নাটকও "সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না"। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সেণ্ট্রাল স্কোয়াড এই নাটকের যাত্রা রূপ দিয়ে মোটামুটি সফল হয়েছিলেন, যদিও শান্তিগোপালের (তখন 'সান্ধ্য নাট্য সমাজে'র পক্ষে) যাত্রা 'বিসর্জন' একবার অভিনয়ের পর আর করা সম্ভব হয়নি। যাই হোক, শেখর চট্টোপাধ্যায় এর পরে রবীন্দ্রনাটকে ঘটনা প্রাধান্যের অভাব এবং ভাবপ্রাধান্যের, ব্যক্তিদ্বন্দ্বের কথা বলেন, যে দ্বন্দ্ব দু একটি বিরল ক্ষেত্র ('রাজা ও রানী' যেমন) ছাড়া কখনোই খুব violent হয়ে ওঠে না। এও নিশ্চয়ই দর্শকদের অসুবিধায় ফেলে কিছুটা। আমাদের প্রশ্ন, তাহলে গ্রুপ থিয়েটার এত বছরে কি দর্শক তেমন করে তৈরি করতে পারেনি ভিন্ন ধরনের নাটকের জন্য? শেখর চট্টোপাধ্যায় ব্যর্থতার দায়িত্ব দেন রবীন্দ্রনাথকেই—"তিনি একটা নতুন কাঠামো আনতে চেয়েছিলেন নাটকে—যেটা সার্থক হয়নি। এটা মেনে নিতে কুণ্ঠা কোথায়?"[৩৫] সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "রবীন্দ্রনাথের কবি-

প্রতিভার সামনে বারংবার তাঁর নাট্যচিন্তা দর্শন ও কাব্যের স্রোতে ভেসে গেছে।"[৩৬] বলে তিনি কয়েকটি সংলাপ তুলে ওই 'কাব্যস্রোতে'র চেহারাটা দেখিয়ে দেন। এতে তিনি তোলেন 'রক্তকরবী'র অধ্যাপকেরও সেই বিখ্যাত সংলাপ—"ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়ে গেলে।" কিন্তু আমরা যখন 'রক্তকরবী' দেখেছি, তখন এ সংলাপ-কে তো মোটেই কাব্যিক মনে হয়নি, বরং গঙ্গাপদ বসুর অভিনয়ে তার মিলের মজাটাও বেরিয়ে আসতে দেখেছি।

'আমরা' মানে কলকাতার কিছু লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্ত দর্শক, মূলত যাদের জন্য গ্রুপ থিয়েটারের নাটক হয়। আমরা তো শারীরিক মানসিক কোনো দিক থেকেই গ্রামের বা শহরের জনসাধারণ দর্শক নই। তাঁদের জন্য এখনই 'রক্তকরবী' করার কথা বলছি না আমরা। এই আমাদেরই জন্য যদি 'রক্তকরবী', এমন কী 'বিসর্জন' করতে হয় তাহলে যে সমস্যাগুলি বড় হয়ে ওঠে তা ওই অভিনেত্রী, গায়ক অভিনেতা-অভিনেত্রী ইত্যাদির অপ্রতুলতা, সংলাপের পরিমার্জিত স্তর অধিকারে অপারঙ্গমতা বা অনাগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের ভিতরে ঢোকবার সময়াভাব বা অনাগ্রহ এবং রবীন্দ্রনাথকে নিজের মতো করে সম্পাদনার সাহসের (শম্ভু মিত্র যেটা দেখাতে পেরেছিলেন) অভাব—এ সবই তালিকায় আসবে। নির্মল ঘোষ নন্দীগ্রামের খেতমজুর নাট্যকার রাখালরাজ মণ্ডলের কথা লিখেছেন, তিনি 'রক্তকরবী'তে আলোড়িত হননি, হয়েছিলেন শ'র 'মিসেস ওয়ারেন্‌জ্‌ প্রোফেশন্‌'এ।[৩৭] তা-হতেই পারে। গণনাট্যের রেপার্টরিতে কোন্ রবীন্দ্রনাটক থাকবে, আর গ্রুপ থিয়েটারে কোন্ রবীন্দ্রনাটক—তা নিয়ে আলোচনা চলবেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যথেষ্ট লড়াই না করে রবীন্দ্রনাটককে ছেড়ে রাখার ইচ্ছেটাই বড় বাধা এখন। শুধু রবীন্দ্রনাটকের সাফল্য নয়, গ্রুপ থিয়েটারের অ-রবীন্দ্র নাটকের সাফল্যও এই প্রাণপণ আত্মপীড়নধর্মী একাগ্রতা ও নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। সেই সাফল্যই যখন তুলনায় এমন কিছু বেশি নয় তখন রবীন্দ্রনাটক সফল হয় না বলে আক্ষেপ করি কেন?

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. 'রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ নাট্যশালা', ১৯৮৩ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্রচর্চা ভবন কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

২. "পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথের নাটক", নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত 'গন্ধর্ব',

রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা, ১৩৬৮ (৮২-৮৫), ৮২ পৃ. শিশিরকুমারের এ কথাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে আছে তাঁর "রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে (শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৩৪৮)।

৩. পূর্বসূত্র, ২৮ পৃ.।

৪. *The Story of the Calcutta Theatres*, 1982, Calcutta, K. P. Bagchi & Company. pp. 539-45.

৫. 'সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ', ১৯৫৯, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং।

৬. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, ২৮২-৮৯ পৃ.। ১৮৯৫ সালে রচিত।

৭. ওই, ২৮৪ পৃ.।

৮. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দশম খণ্ড, (৮৯৩-৯৭), ৮৯৬ পৃ।

৯. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্দশ খণ্ড, ৭৪৩-৪৬ পৃ.।

১০. ওই, ৭৪৪ পৃ.।

১১. পূর্বসূত্র, ৮৩ পৃ.।

১২. 'দ্বিজেন্দ্রলাল'

১৩. ওই। আরও দ্র. গায়ত্রী মজুমদার, ১৯৭৯, 'রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল', কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৯০-৯৯ পৃ.।

১৪. হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বসূত্র, ১১ পৃ.।

১৫. ওই, ১০ পৃ.।

১৬. ওই, ৫ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি।

১৭. শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' (১৯৭০, ডি. এম. লাইব্রেরি) বইয়ের ২৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৮. পূর্বসূত্র, ২৯ পৃ.।

১৯. হরীন্দ্রনাথের নিজের সাক্ষ্যেই পাই, শিশিরকুমারের অভিনয়ের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ' বদলে 'শেষরক্ষা' লেখেন, 'রাজা ও রানী'কে "ঢেলে সাজালেন" 'তপতী' রূপে। অর্থাৎ নাট্যালয়ের দাবিতে নাটকের পরিবর্তন পরিবর্ধনে রবীন্দ্রনাথের তত আপত্তি ছিল না। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের "ঠাকুরবাড়ি, রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ রঙ্গালয়" প্রবন্ধেও ('মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ' [পরে দেখুন] ৩৭-৪৭ পৃ.) এসব খবর পাই।

২০. পূর্বসূত্র, p. 545।

২১. পূর্বসূত্র, ৮২ পৃষ্ঠা।

২২. এ পর্যন্ত প্রবন্ধটি "রবীন্দ্রনাটক ও সাধারণ রঙ্গালয়" নামে ১১ মে, ১৯৮৬ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি অংশ এ বইয়ের

জন্য নতুন করে লেখা হয়েছে।

২৩. তা আমরা আগের প্রবন্ধে বেশ কিছু ব্যবহার করেছি।

২৪. 'বাণী-মন্দির' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮), পৃ. ১০৩-৪ এ ছাড়াও 'আধুনিকতর' সমালোচকদের কয়েকটি উদ্ধৃতি—১. "রক্তকরবী'র মধ্যে বিশেষ নাট্যধর্ম নাই। ইহা অনেকটা গীতধর্মী। কেবল শেষের দিকে বন্দশালা ভাঙিবার চেষ্টায় নাটকীয় ঘটনার আভাস ফুটিয়াছে।"—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৬৬ (২য় সং), 'রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৪২৯ পৃ.। ২. ('রক্তকরবী' সম্বন্ধে) "এই নাটকে নাট্যকার চরিত্রগুলির কথার সৌন্দর্যের দিকে যত দৃষ্টি দিয়াছেন, গতির দিকে তত দৃষ্টি দেন নাই।" —অজিতকুমার ঘোষ, ১৯৪৬, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', জেনারেল প্রিণ্টাস অ্যাণ্ড পাবলিশার্স', ৪১৪ পৃ.।

২৫ ১৯৫২-র 'গণনাট্য' পত্রিকায় "গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা" প্রবন্ধ দ্র. স্নীল দত্তের 'নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর' গ্রন্থে (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭, দ্বিতীয় প্রকাশ, ৫৩-৫৫) ৫৪ পৃ.।

২৬. উপরের গ্রন্থটির নানা সূত্র থেকে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়াও 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ' নামক সংকলনটিতে বিস্তৃততর একটি তালিকা (৯৯-১১৩) পাওয়া যাবে। তাতে সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের তালিকাটিও দ্রষ্টব্য (৯৫-৮)।

২৭. দ্র. স্বপন মজুমদার, ১৯৮৮, 'বহুরূপী'। বহুরূপী প্রকাশিত ওই গ্রন্থ থেকেই এ তালিকা প্রস্তুত।

২৮. এটি আমার অনুমান।

২৯. ২৭ নং পাদটীকা দ্র.। ৫১ পৃ.।

৩০. ২৪ নং পাদটীকা দ্র.।

৩১. দ্র. 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ' (পরবর্তী পাদটীকা) সংকলনে স্বপন মজুমদারের প্রবন্ধ, "গণনাট্য, নবনাট্য ও রবীন্দ্রনাথ : বন্ধনহীন গ্রন্থি", (৭০-৭৪), ৭১ পৃ.।

৩২. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভারতী পরিষদ বার্ষিকী হিসেবে, ভারতীয় পরিষদ কলকাতা ৪ কর্তৃক ১৩৮৫-তে প্রকাশিত।

৩৩. ওই, ৪৯-৬৪ পৃ.।

৩৪. ওই, ৫৮ পৃ.।

৩৫. ওই, ৬১ পৃ.।

৩৬. ওই, ৬৪ পৃ.।

৩৭. "ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ও রবীন্দ্রনাথ", ওই (৬৪-৬৯) ৬৯ পৃ. (৬৯ পৃষ্ঠা সংখ্যা ভুল করে ৫৩ ছাপা হয়েছে এই সংকলনে)।

বর্তমান

ত্রিশ বছরের বাংলা নাটক

১.

অঙ্কের হিসেবে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পাই ১৯৫৪ সালটাকে। (এ প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৯৮৪—প. স.) বাংলা নাটমঞ্চের ইতিহাসের দিক থেকে এবছর বেশ উল্লেখযোগ্য, তবে নাটক রচনার দিক থেকে তেমন নয়। বহুরূপী সম্প্রদায় 'রক্তকরবী' প্রযোজনা করেন, এই বছরে (১০ মে) সেটি বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনায় এক ধরনের যুগান্তর নিয়ে আসে। একমাত্র 'রাহুমুক্ত' নামে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রসিদ্ধ যাত্রাপালাটি বীরু মুখোপাধ্যায় রচনা করেন ওই বছরে। কিন্তু 'রাহুমুক্ত' গণনাট্য আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেও তা প্রচলিত অর্থে 'নাটক' নয়, অর্থাৎ স্টেজের নাটক নয়। ফলে সংকীর্ণ অর্থে যাকে নাটক বলি, তার ইতিহাসে 'রাহুমুক্ত'-এর স্থান নিঃসন্দিগ্ধ নয়।

বরং ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করা এক দিক থেকে সংগত। আগের বছর দেশ ভাগ হল বলে নয়, এই বছর আই পি টি এ বা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে আলাদা হয়ে এসে শম্ভু মিত্র 'বহুরূপী' সম্প্রদায় স্থাপন করলেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত ও প্রভাবিত করবেন—এমন একজন প্রযোজক-পরিচালক স্বাধীন কাজ শুরু করলেন এই বছর থেকে।

'গ্রুপ থিয়েটারে'র প্রযোজক পরিচালকের দল ও প্রসঙ্গ দিয়ে নতুন বাংলা নাটকের আলোচনা শুরু করার একটা আলাদা যুক্তি আছে। আমরা জানি, গত শতাব্দীর পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বাংলা নাটক মূলত যে-থিয়েটারের আশ্রয়ে রচিত ও লালিত হয়েছে তা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, তখন গ্রুপ থিয়েটার বা গণ-নাট্যের অস্তিত্বই ছিল না। ন্যাশনাল, বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার, ক্লাসিক, মিনার্ভা, বীণা, মনোমোহন ইত্যাদি কোম্পানির বাঁধা চুক্তিতে নাটক লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো বিখ্যাত নাট্যকারেরা, তাঁদের নাটক ঐসব

থিয়েটারে অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, পরে ছাপা বইয়ের আকারে বেরিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের দুর্বল ও অপুষ্ট শাখা নাটকে যা কিছু স্মরণীয় সঞ্চয় ১৮৭২ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে জমে উঠেছে সবই ঐ সাধারণ রঙ্গালয়ের আশ্রয়ে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাংলা নাটকের সবচেয়ে গরীয়ান প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে—'রাজা', 'রক্তকরবী' 'মুক্তধারা', 'ফাল্গুনী', 'রথের রশি'—বা এই ধরনের আরও কিছু সৃষ্টিকে—যে সাধারণ রঙ্গালয় গ্রহণ করেনি, এতেই সে রঙ্গালয়ের সীমাবদ্ধতার চেহারাটি ধরা পড়ে। শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত সম্প্রতি একটি বক্তৃতায়[১] সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাট্য-রচনার বিবরণ দিয়ে এমন কথা বলবার চেষ্টা করেছেন যে, সাধারণ অর্থাৎ ব্যবসায়িক রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি অগ্রাহিষ্ণু ছিল না। তাঁর তথ্য থেকে যে একথা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় না, তা আমরা আগের একটি নিবন্ধে আলোচনা করেছি। ফলে বাংলা নাটকের সবচেয়ে মূল্যবান উপার্জনগুলি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রেরণা ও প্রশ্রয় ছাড়াই রচিত হল। সেগুলির উৎস ছিল ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতনের পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক থিয়েটার।

এই সামান্য ইতিহাস-পটভূমিকা বলার কারণ এই যে, যে-মঞ্চ সাধারণভাবে লাভের দিকটা দেখে, দর্শকের কাছে টিকিট বিক্রির টাকার ওপর যার অস্তিত্ব নির্ভর করে, ব্যক্তিগত মালিকানার সেই সব থিয়েটার ততক্ষণই ভালো নাটকের জন্মে সহায়তা দেয় যতক্ষণ তার মধ্যে কোনো আইডিয়ালিজ্ম বা আদর্শবাদের প্রভাব থাকলেও তার স্বার্থের পরিপোষণে বিঘ্ন ঘটায় না। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্য-লীলা' বা 'বিল্বমঙ্গল' বা 'পাণ্ডব-গৌরব' বা 'জনা'-র সৃষ্টি হয়েছিল ভক্তিরস, পৌরাণিক মিথ ও মানবিকতাবোধ প্রসূত এক ধরনের আদর্শবাদ থেকে। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বা মন্মথ রায়ের স্বদেশপ্রেমাত্মক নাটকগুলিও তাই। অবশ্য নিছক আদর্শবাদ থাকলেই ভালো নাটক লেখা যায় না। নাট্যরচনার মৌলিক নিপুণতাও থাকা চাই। কিন্তু আদর্শবাদ না থাকলে যেসব অনুকরণাত্মক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নাটকের স্তূপ গড়ে ওঠে তার সঙ্গে আমাদের যথেষ্টই পরিচয় আছে।

যুদ্ধ-পরবর্তী মন্দার বাজার এবং সেই সঙ্গে প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল যে-কোনো ধরনের আদর্শবাদের অনুপস্থিতি কলকাতার পেশাদার মঞ্চের এই সৃষ্টির আবহটিকে ১৯৩০-এর পর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। ফলে ১৯৪৩-৪৪ নাগাদ

বাংলাভাষার নাট্য-সৃষ্টির সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উৎস তৈরি হয় এবং নাট্যরচনার কেন্দ্র হিসেবে ব্যাবসায়িক মঞ্চকে স্থানচ্যুত করে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। ১৯৪৪-এ বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দিয়ে নতুন বাংলা নাটকের অভিযাত্রা শুরু। এই নাটকের মূল প্রেরণা ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত, কালোবাজার-মহাজন-নাগরিক বাবু সমাজের শোষণপীড়ন-অবজ্ঞা জর্জরিত বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের অনাহার বঞ্চনা ও অসহায়তার চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা, তাদের সংগঠন ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা। নতুন আদর্শবাদ ও জীবনভাবনার সংক্রমণ ঘটিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘই ব্যাবসায়িক মঞ্চের কাছ থেকে নাটক সৃষ্টির মূল প্রেরণাটিকে ছিনিয়ে নেয়। এখনকার বাংলায় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন, কিছু কিছু বিচ্ছেদ ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও মূলত গণনাট্য আন্দোলনেরই সম্প্রসারণ বলে এই লেখকের ধারণা। তাই গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্য প্রযোজনাগুলি নতুন বাংলা নাটকের ইতিহাস রচনার আরম্ভবিন্দু বলে ধরা যেতে পারে।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। গণনাট্য সঙ্ঘের অস্তিত্বেও সঙ্কট দেখা দিল। ডঃ দর্শন চৌধুরী এই সঙ্কটকালের সীমা-রেখা নির্দেশ করেছেন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত[২]। গণনাট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে আরও কয়েকটি দলের স্থাপনার কুলজী এইরকম : অশনি চক্র (১৯৫১), শিল্পী মন (১৯৫২), রূপকার (সবিতাব্রত দত্ত, ১৯৬৩), গন্ধর্ব (শ্যামল ঘোষ, ১৯৫৭), অনুশীলন সম্প্রদায়, (১৯৫৭), শৌভনিক (বীরু মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, ১৯৫৭), থিয়েটার ইউনিট (শেখর চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৮), চতুরঙ্গ (১৯৫৮), চতুর্মুখ (১৯৫৮), ক্যালকাটা থিয়েটার (বিজন ভট্টাচার্য, ১৯৫১, ১৯৫৯) নান্দীকার (১৯৬০), মাস থিয়েটার্স (জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০), রূপান্তরী (১৯৬১), ইত্যাদি ; এদের পাশাপাশি গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যক্রমও অব্যাহত থাকে, কিন্তু খানিকটা দুর্বল ও স্তিমিতভাবে। তার কারণ, সঙ্ঘের সবচেয়ে খ্যাতনামা, ক্ষমতাবান এবং জনপ্রিয় শিল্পীরা হয় পৃথক নাটকের দল—ওই তথাকথিত 'গ্রুপ থিয়েটার' তৈরি করেছেন, নয় তো সংহত ব্যক্তিগত জীবিকার সন্ধানে পেশাদার রঙ্গালয় বা ফিল্‌মে যোগ দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় নানা নীতির প্রশ্নে দ্বন্দ্ব এই সময় প্রকট হয়ে উঠছিল বলে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সংগঠনে ও পরিচালনায় আগেকার মনোযোগ অনেকটা শিথিল হয়েছে, গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে এ সময় দলত্যাগ গণনাট্য সঙ্ঘে যেমন খুব প্রকট ঘটনা, তেমনি

স্পষ্ট ঘটনা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কিছু গণনাট্য দলের গণনাট্যের ব্যানার বহন করে স্বাধীনভাবে নাটক করা। এরা গণনাট্যের ছত্রছায়া কখনও ত্যাগ করেননি। এঁদের মধ্যে অনুশীলন (১৯৫১), গণনাট্য সঙ্ঘ দক্ষিণ (১৯৫৪), প্রান্তিক (১৯৫৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রুপ থিয়েটারে নানা দল ভেঙে, কিংবা পুনর্বিন্যস্ত হয়ে আবার কিছু নাট্যদলের উদ্ভব হয় পরবর্তীকালে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৬৬), চলাচল (১৯৬৩), ঋতায়ন (১৯৬৪), নক্ষত্র (১৯৬৬), চেতনা (১৯৭২), চেনামুখ (১৯৮০) ইত্যাদি।

২.

নতুন বাংলা নাটক এই গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটারের প্রয়োজনেই লেখা হয়েছে, অর্থাৎ গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়েছে এইসব দলের প্রযোজনার সূত্র ধরে কিংবা এদের প্রযোজনার প্রেরণায়। নতুন বাংলা নাটকের যাঁরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার তাঁরা সকলেই কোনো না কোনো নাটকের দলের দ্বারা গৃহীত ও বর্ধিত হয়েছেন, গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকেছেন। এই জড়িত থাকার নানারকম প্যাটার্নও লক্ষ করি। তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বা চিত্তরঞ্জন ঘোষের মতো নাট্যকার আছেন যাঁদের দীর্ঘ সাহচর্য এক বা একাধিক দলের সঙ্গে হলেও এঁদের নাটক কোনো একটি দল বিশেষভাবে করেনি—একাধিক দলই অভিনয় করেছে বা করে থাকে। এঁদের ভূমিকা মূলত নাট্যকারের—প্রযোজক, পরিচালক বা অভিনেতার নয়। কিন্তু মনোজ মিত্র বা বাদল সরকার নাট্যকার এবং সেইসঙ্গে প্রযোজক পরিচালক অভিনেতা—এঁদের নিজস্ব নাটকের দলই এঁরা শেষ পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন। তাহলে নিছক নাট্যকার এবং প্রযোজক-পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার আর দল-নেতা—এই দুটি বড়ো দলে এখনকার পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ নাট্যকারকে ফেলা যায়। নাট্যকারের সীমাবদ্ধ ভূমিকা এবং অধিকন্তু প্রযোজক পরিচালক ইত্যাদির ব্যাপকতর ভূমিকার ফলে যে এঁদের নাট্যরচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষে কোনো রকম প্রভাব সৃষ্টি করেছে এমন অনুমান করা শক্ত হবে। দু দলই কিছু ভালো নাটক লিখেছেন।

৩.

বলা বাহুল্য, কলকাতায় নাট্যাভিনয়ের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যে নাটকগুলি বিশেষভাবে দর্শকদের চোখে পড়েছে সেগুলির অধিকাংশ মৌলিক নাটক নয়,

অনুবাদ—বা তারও চেয়ে বেশি করে—রূপান্তর নাটক বা অ্যাডাপ্‌টেশন। এই রূপান্তর নাটকগুলিকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে গ্রহণ করার দুটি কারণ আছে। প্রথমত, কলকাতার নাট্য প্রযোজনার সাম্প্রতিক পর্যায়ে এইসব বিখ্যাত বিদেশী নাটকের বঙ্গীয় রূপান্তর বাঙালি দর্শকদের নাটক-পিপাসাকে খুব ব্যাপকভাবে তৃপ্ত করেছে এবং নাটকের দলগুলিকে কর্মশীল ও ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। আর দ্বিতীয়ত, বাংলা থিয়েটারে অনুবাদ ও রূপান্তরের ইতিহাস নতুন নাটকের একেবারে প্রথম অভিনয়—গেরাসিম স্তেপানোবিচ লেবেদিয়েফ-এর সেই 'কাল্পনিক সঙ বদল' 'দি ডিজগাইজ' এবং 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' (১৭৯৫) দিয়েই শুরু। মাঝখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ('রজতাগরি নন্দিনী'), গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু ('চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সকলেই কিছু না কিছু রূপান্তর করেছেন, হয় বিদেশী নাটক থেকে, না হয় কাব্য বা উপন্যাস থেকে। রূপান্তর নাটক না থাকলে এ কালের বেশ কিছু গ্রুপ থিয়েটারের দল যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার অর্ধাংশও তাদের ভাগ্যে জুটত কিনা সন্দেহ। একথা গণনাট্যের দল সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য, তাঁদের অভিনয় তালিকাতেও অনুবাদ বা রূপান্তর কম নেই।

কিছু বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তরে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলার নাট্য আন্দোলনের আদর্শগত সংঘাত যতটা প্রকট হয়েছে, মৌলিক নাটকে ততটা হয়নি। ১৯৫০-এর গোড়ায় গণনাট্য থেকে সরে আসা নাট্যকর্মীদের একটি অংশ যখন 'নবনাট্য' কথাটি চালু করেন তখনও এই দ্বন্দ্ব ততটা স্পষ্ট নয়, কী রূপান্তরে, কী মৌলিক নাটকে। নবনাট্য বলতে তখন কেবল বোঝাত পার্টি-নিয়ন্ত্রিত গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলনবদ্ধ ও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক লক্ষ্যকেন্দ্রিক নাটক থেকে আলাদা হয়ে নানা ধরনের দেশী বিদেশী নাটক ও অভিনয়গত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারাটিকে। বহুরূপী সম্প্রদায়ে শ্রীশম্ভু মিত্র যখন 'নবনাট্য' কথাটিকে চালু করেন তখন সম্ভবত এইটেই ভেবেছিলেন যে, গণনাট্যের বাঁধা সংগঠন ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের বাইরে এসে পৃথিবীর ব্যাপক নাট্য সাহিত্যের উত্তরাধিকার থেকে ভালো-ভালো নাটক বেছে নিয়ে নাটক প্রযোজনা করবেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীকালে 'সৎ নাট্য' কথাটির মধ্যে যে ধরনের চালাকির সুযোগ গড়ে ওঠে, নবনাট্যের প্রাথমিক প্রযোজনাগুলিতে সেই ধরনের তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা নেই। 'নবনাট্য' মানে নিছক গণনাট্য নয়—এটুকু বুঝিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু বহুরূপীর অনুবাদ ও রূপান্তরের সেই আদি প্রযোজনাগুলিতে সমষ্টির জীবন,

যূথবদ্ধ মানুষের কল্যাণ ও অস্তিত্বের প্রশ্ন অস্বীকৃত হয়নি তা নিশ্চয়ই খেয়াল করতে হবে। ইবসেনের 'দশচক্র' ('অ্যান এনিমি অব দ পিপল', শান্তি বসুর রূপান্তর, ১৯৫২) টেড উইলিস অবলম্বনে 'এই তো দুনিয়া' (প্রণতি দে ১৯৫৩), ইবসেন থেকে 'পুতুল খেলা' ('আ ডলস হাউজ', শম্ভু মিত্র, ১৯৫৮) মূলত সমষ্টিগত মানুষের বিষয়ই কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক নাট্য সৃষ্টিগুলিকে এই সময় উৎপল দত্তের লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ বাংলায় পরিবেশন করতে থাকে। এখানে গণনাট্য বা গণমুখিতার প্রশ্নটি বড় হয়নি, যা ক্লাসিক তা সমস্ত মানুষের সব সময়ের প্রয়োজন—এই বিশ্বাস থেকেই প্রযোজিত হয় 'ম্যাকবেথ', 'জুলিয়াস সিজার', বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপাউস', (১৯৬৪), শৌভনিকের 'মা' (ম্যাকসিম গোর্কি, ১৯৫৭), 'গোস্টস' (ইবসেন, ১৯৫৯), থিয়েটার ইউনিটের 'জুলিয়াস সিজার' ইত্যাদি। এ সময় উৎপল দত্ত স্যামুয়েল বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোদো'-ও অনুবাদ করেন এবং গণনাট্যেরই একটি শাখা তা অভিনয় করেন—এই যুক্তিতেই সম্ভবত যে, এটি পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের একটি বড় কীর্তি, সুতরাং এর সঙ্গে বাঙালি দর্শকদের পরিচয় হওয়া দরকার।

কিন্তু 'ওয়েটিং ফর গোদো' নিয়ে কিছু তত্ত্বগত তর্কবিতর্ক শুরু হয়। সকলেই জানেন বেকেটের নাটক থেকে ইয়োরোপের নাট্যসাহিত্যে 'অ্যাবসার্ড' বা 'কিমিতিবাদী' (মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিভাষা) নাটকের ধারা আরম্ভ হয়। এই অ্যাবসার্ড নাটকগুলিতে সাধারণভাবে সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয় এবং সমষ্টির চাপে ও 'অত্যাচারে' ব্যক্তির সংকট, ক্ষয় ও ধ্বংস বা ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যান্ত্রিক সমষ্টি-ধর্ম অর্জন দেখানো হয়। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মধ্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিশেষ প্রচারের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের অভ্যুদয়ের যোগ ছিল এবং মার্কসবাদী জীবনদর্শনের সঙ্গে তার বিরোধ খুব অস্পষ্ট ছিল না। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী মহলে ব্যক্তি-সংকটের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া, সমষ্টিকে নির্বোধ, আবেগ ও মমতাহীন করে দেখানো এবং সাধারণভাবে আশ্বাসহীন ও নৈরাশ্যবাদী এইসব নাটকের প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয়। নাটককে যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র বলে মনে করেন তাঁদের পক্ষে এই সমালোচনা করা স্বাভাবিক ও সংগত।

পরে নান্দীকার-এর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' (১৯৬২) নিয়ে এই

সমালোচনা বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই নাটকের রূপান্তরকর্তা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তখন যতদূর জানি আবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য, পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার গণনাট্য সঙ্ঘের প্রাক্তন সহ-সভাপতি! মূল নাট্যকার পিরানদেল্লো-র মুসোলিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং অবক্ষয়বাদী দর্শনের বিষয় এঁদের অজানা থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও যে এঁরা নাটকটির প্রকরণগত চমক দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাতে বোঝা যায় নাটকের বাইরের কারুকৌশল দেখে তার মধ্যবর্তী ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিহীন এবং কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য এঁদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। নান্দীকারের পক্ষ থেকে যুক্তি এর পরের প্রবন্ধে আমরা জানাবার চেষ্টা করেছি। খানিকটা ওই কারণেই ১৯৬৬-র শেষদিকে আবার নামিয়েছিলেন পিরানদেল্লো-র 'এনরিকো কার্তো' অবলম্বনে 'শের আফগান'। এর মাঝখানে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (আন্তন চেখফের 'দ চেরি অরচার্ড') এবং 'যখন একা' (আরনল্ড ওয়েস্কার-এর 'দ রুটস')-তে নান্দীকারের প্রযোজনার গৌরব বেড়েছে।

এই তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে অনুবাদ রূপান্তরের অভিনয় হতেই থাকে, এবং কোনো দলই নিছক মৌলিক বা কেবল বাঙালি নাট্যকারকে সম্বল করে নিজেদের রেপার্টরি বা প্রযোজনা-সম্ভার গড়ে তুলতে সমর্থ হচ্ছে না—এমন দেখা যায়। বহুরূপীর রূপান্তরগুলির কথা আগে উল্লেখ করেছি, পরে এই দল অন্য প্রদেশের নাটকও অনুবাদে অভিনয় করতে থাকে। মারাঠি নবীন নাট্যকার বিজয় টেণ্ডুলকরের 'শান্ততা, কোর্ট চালু আহে' থেকে 'চোপ, আদালত চলছে!' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইয়ুজিন ইয়োনেস্কোর 'রাইনোসেরস্' থেকে 'গণ্ডার' (১৯৭২) এবং বেরটোল্ট্ ব্রেশ্‌ট-এর 'গালিলেও' (১৯৮০) এঁদের সম্প্রতম অনুবাদ রূপান্তর। উৎপল দত্তের পুরানো লিটল থিয়েটার গ্রুপ অনেক আগেই গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ্‌স' থেকে 'নীচের মহল' (উমানাথ ভট্টাচার্যের রূপান্তর) অভিনয় করেছিল। তারও আগে তাঁরা করেন সিমোনফ্‌-এর 'দ রাশিয়ানস' (১৯৫৩)। লিটল থিয়েটার গ্রুপ পরে যখন পি এল টি বা পিপলস্ লিটল থিয়েটার নামে জন্মান্তর লাভ করে তখনও এঁরা অনুবাদে 'ম্যাকবেথ' (১৯৭৫) করেছিলেন। তবে এল টি জি এবং পি এল টি দুই যুগেই উৎপল দত্তের একাধিক নাটকে বিদেশী নাটকের ছায়া দেখা যায়। গন্ধর্ব দলটি নানা সময়ে অভিনয় করেছে 'সূর্যলগ্ন' (লেডি গ্রেগরির একাঙ্ক 'দ রাইজিং অব দ মুন'—এর আরেকটি রূপান্তর 'অরুণোদয়ের পথে' নাম দিয়ে করেছিলেন সলিল

চৌধুরী), 'মধুচক্র' (জর্জ বার্নাড শ-র 'মিসেস ওয়ারেনস প্রফেশন'—উৎপল দত্তের রূপান্তর, ১৯৬৩) অজিত গাঙ্গুলির 'থানা থেকে আসছি' (জে বি প্রিস্টলি-র 'দ ইন্‌স্পেক্টর কল্‌স') 'অনিরুদ্ধ' (জঁ পোল্ সার্ত্র্-এর 'কনডেম্‌নড অ্যাট আলতোনা'—১৯৬৫), ১৯৬৮-তে গোর্কির গল্প থেকে 'একা নয়'। শৌভনিক করেছে : ১৯৫৭—ম্যাকসিম গোর্কির 'মা', ১৯৫৯—ইবসেনের 'গোস্টস' (বীরু মুখোপাধ্যায়) 'ওথেলো' (কৃষ্ণ কুণ্ডু ১৯৬৪) 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' (ওই ১৯৬৪) আনুইয়ের 'আন্তেগোনে' (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৮), ইউজিন অলবি-র 'হুজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ' অবলম্বনে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'মলাটের রং মুহূর্ত' (১৯৭৩), জি অগ্নিহোত্রীর হিন্দি 'শুতুরমুর্গ' থেকে 'উটপাখি' (প্রতিভা অগ্রবাল, ১৯৭৩), মোহন রাকেশের 'আধে অধুরে' (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৩)। অ্যাগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ' অবলম্বনে 'ইঁদুরকল' মূল নাটকটির মতো জনপ্রিয় হতে পারল না। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটার ইউনিট অভিনয় করে কাতায়েফ-এর 'স্কোরিং অল সার্কল' ('চার দেয়াল') মলিয়ের-এর 'লে ফেম্মে সর্বাতে' অবলম্বনে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'বিদুষী', ব্র্যাণ্ডন টমাসের 'চার্লিজ আণ্ট' থেকে 'পঞ্চশর' (শেখর চট্টোপাধ্যায়) গিরিশ করনাডের 'তুঘলক', ব্রেশটের 'আর্টুরো উই' (১৯৭২), তাঁরই 'হের পুন্টিলা' অবলম্বনে 'পন্তু লাহা' (১৯৭৫), পিটার হাণ্টকে-র 'অফেণ্ডিং দ পাবলিক', ডুরেনমাট-এর 'দ ভিজিট' অবলম্বনে 'অতিথি', রলফ হকুথের 'মিডওয়াইফ', ফ্রান্‌ৎস ক্রোয়েৎস-এর 'ডাস নেস্ট' অবলম্বনে 'একটুকু বাসা'। 'আর্টুরো উই' থেকে বাকি নাটকগুলি অভিনীত হয় পশ্চিম জার্মানির সাংস্কৃতিক দপ্তর ম্যাক্স-ম্যুলার ভবনের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তায়। থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৬৬) জঁ পোল সার্ত্র্-এর লা পি রেস্পেকতুয়েজ' অবলম্বনে 'ললিতা' অভিনয় করে ১৯৬৬-এ। এঁদের পরবর্তী প্রযোজনা শন ও কেসি-র 'জুনো অ্যাণ্ড দ পেকক' অবলম্বনে 'ছায়ায় আলোয়' চমৎকার উতরে গিয়েছিল। এঁদের অনুবাদ অভিনয় ব্রেশ্‌টের 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে।

নান্দীকার ১৯৬৮ থেকে অনেক বিদেশী একাঙ্কের রূপান্তর অভিনয় করে। তার মধ্যে মিলনে-র 'উরজেল-গ্রামারি' থেকে 'নাম নিয়ে', জিমারম্যান থেকে 'রাত্রি', ইয়োনেস্কোর 'দ লেস্‌ন' অবলম্বনে 'নীলিমা' (উদয়ন ঘোষ), চেখভের 'দ ওয়েডিং' থেকে 'শুভবিবাহ', ইয়ুজিন ও-নীল-এর 'হোয়ার দ ক্রস ইজ মেড' থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রূপান্তর 'বৃত্ত', ব্রেশ্‌টের 'দ থ্রি-পেনি অপেরা'

অবলম্বনে 'তিনপয়সার পালা', 'দ গুড পার্সন অব সেটজুয়ান' অবলম্বনে 'ভালোমানুষ', কেসারলিং-এর 'আর্সেনিক অ্যাণ্ড ওলড লেস' অবলম্বনে 'বীতংস', মাক্স ফ্রিশ-এর 'দ ফায়ারবাগ' অবলম্বনে 'অগ্নিবিষয়ক সতর্কতা ও গৌতম'। স্ট্রিণ্ডবার্গের 'এরিক ফোরটিন' অবলম্বনে 'শাহী সংবাদ', আনুই ও সোফোক্লেস অবলম্বনে চিত্তরঞ্জন ঘোষকৃত 'আন্তেগোনে', পিটার টারসন-এর 'জিগার-জ্যাগার' থেকে 'ফুটবল'। তারপর ১৯৭৭-এ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকার ত্যাগ করার পর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পরপর এইসব অনুবাদ রূপান্তর প্রযোজনা করেন— ব্রেশ্‌টের 'ককেশিয়ান চক সার্কল' অবলম্বনে 'খড়ির গণ্ডী', চেখফের 'দ সী-গাল' অবলম্বনে 'হে সিন্ধু সারস', ব্রেশ্‌টের 'দ একসেপশন্‌ অ্যাণ্ড দ রুল' অবলম্বনে 'ব্যতিক্রম' এবং বর্তমানে এউরিপিদেস-এর 'ইফিগেনিয়া এন আউলিদি' থেকে 'হননমেরু'। অন্যান্য দলের যেসব অনুবাদ রূপান্তর জনপ্রিয় হয়েছে ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেগুলির মধ্যে আছে নান্দীমুখ-এর 'পাপপুণ্য' (তলস্তয়ের 'দ পাওয়ার অব ডার্কনেস') 'তেত্রিশতম জন্মদিবস' (হ্যারল্‌ড পিনটার-এর 'দ বার্থডে পার্টি') মাস থিয়েটার্সের 'গভর্মেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর' (গোগোল-এর 'দ ইন্‌সপেক্টর জেনারেল' অবলম্বনে প্রমথনাথ বিশীর রূপান্তর) চেতনার 'জগন্নাথ' (লু শুন-এর 'আ কিউ'), 'উলকি' (ব্রেশট), 'সমাধান' (ব্রেশ্‌টের 'ডের টাগে কম্যুনে' থেকে উৎপল দত্তের অনুবাদ), 'ভালোমানুষের পালা' (ব্রেশ্‌ট), 'মা' (ম্যাকসিম গোর্কি); থিয়েটার কমিউনের 'পরবর্তী আক্রমণ' (জোসেফ হেলের-এর 'উই বম্‌ড ইন নিউ হ্যাভেন'); চতুর্মুখ-এর 'জনৈকের মৃত্যু' (আর্থার মিলার-এর 'ডেথ অফ আ সেলসম্যান'), 'নির্বোধ' (ডস্টয়েভস্কির 'ইডিয়ট'); বঙ্গীয় নাট্য সংসদের 'রাইনোসেরস' (ইয়োনেস্কো); নক্ষত্রের 'মৃত্যুসংবাদ' (জে এম সিং-এর 'প্লেবয় অব দ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড' অবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কিমিতিবাদী রূপান্তর), 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' (?) ইত্যাদি। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে, অনুবাদ-রূপান্তর বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনায় কতখানি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। শুধু গ্রুপ থিয়েটার কেন, গণনাট্যের দলগুলিও বহু ক্ষেত্রে অনুবাদ-রূপান্তরের ওপর নির্ভর করেছে। গণনাট্য সঙ্ঘ গোগোলের 'গভর্মেণ্ট ইনস্পেক্টর' অভিনয় করেছে, অভিনয় করেছে সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে' ('রাইজিং অব দ মুন') 'বিশে জুন' (হাঙ্গেরীয় নাট্যকার নিকলস জিয়ারফ্‌স থেকে বীরু মুখোপাধ্যায়), মিহাইল সেবাস্তিয়ানের 'স্টপ নিউজ' অবলম্বনে 'শেষ সংবাদ'। ইদানিংকালে লু শুন-এর 'রেজারেকটিং

দত্তের রূপকার তাঁর 'অ্যাণ্টনি কবিয়াল' মঞ্চস্থ করেছে।

৫.

নতুন প্রযোজক, পরিচালক অভিনেতারা নিশ্চয়ই কোনো অভাববোধ থেকেই পুরানোদের নাটক প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের ঈপ্সিত ভাবনা বা প্রকরণ তাঁরা এসব নাটকে পাননি, ফলে মুখ ফিরিয়েছেন বিদেশের দিকে। জানি না, বাঙালি নাট্যকারদের নাটক তাঁদের খুব বেশি প্রাদেশিক বা প্রথানুযায়ী বলে মনে হয়েছে কিনা। যাই হোক, এই অভাববোধ থেকে বাংলা থিয়েটারের প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতারা (অনেক ক্ষেত্রে একই মূল ব্যক্তি) নিজেরাই নাটক লিখতে শুরু করেন। তাঁদের নাটকগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করলে হয়তো বোঝা যাবে তাঁদের প্রার্থিত কী ছিল নাটকে। সে সুযোগ এখানে নেই, কাজেই কেবল উল্লেখ করে ছেড়ে দিতে হবে।

শম্ভু মিত্র মূলত ছদ্মনামেই লিখতেন তাঁর নাটকগুলি। 'উলুখাগড়া' (১৯৫০) লিখেছিলেন শ্রীসঞ্জীব নামে। 'বিভাব' (১৯৫১) একটি উৎকৃষ্ট একাঙ্ক ছিল। 'ঘূর্ণি' নামের বিশাল নাটকটি বোধহয় অভিনীত হয়নি, বহুরূপীর পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ আছে। তাতে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং এই শ্রেণীর ভণ্ডামির ছবি বেশ ফুটেছিল। তাঁর অমিত মৈত্রের সঙ্গে একযোগে লেখা 'কাঞ্চনরঙ্গ' (সম্ভবত বিদেশী কাহিনীর রূপান্তর) এবং নতুন নাটক 'চাঁদবণিকের পালা' (শ্রীবটুক নামে বহুরূপী পত্রিকায় প্রকাশ করেন) পড়ে মনে হয় তাঁর মনে নৈরাশ্যবোধ অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী, ব্যক্তির সংকট তাঁর কাছে যে সম্ভ্রম ও পবিত্রতা লাভ করে সে তুলনায় সমষ্টি অত্যন্ত হীন ও দরিদ্রভাবে চিত্রিত হয়। শেষ নাটকটি খুব শক্তিশালী রচনা কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, তা একটি বিভ্রান্ত এবং পরিপ্রেক্ষিতহীন জীবনবোধ ও সমাজদৃষ্টির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

উৎপল দত্ত অক্লান্তকর্মী প্রযোজক, অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার। প্রথম দিকে তাঁর 'ছায়ানট' ফিল্ম স্টুডিওর কাণ্ডকারখানা নিয়ে লঘু প্রহসন মাত্র কিন্তু পরে এই শুদ্ধ লঘুতা থেকে তিনি সরে আসেন। এল টি জি ১৯৫৯ সালে মিনার্ভা মঞ্চ লিজ নিয়ে অভিনয় শুরু করে, সেখানে প্রথম নাটক 'অঙ্গার' আমাদের চমকে দিয়েছিল। কয়লাখনির শ্রমিক জীবনের শোষণ পীড়নের জীবন্ত ছবি দেখানোর জন্য তিনি আস্ত কয়লা খনির দৃশ্য সাজিয়েছিলেন স্টেজে, তাতে লিফট, পিট, ট্রলি সবই ছিল। তারপর থেকে তিনি যত নাটক লিখেছেন সবই

স্টেজের কথা ভেবে লেখা—মূলত থিয়েটারের নাটক। ১৯৬১-র 'ফেরারী ফৌজ' -এ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের একটি বিস্ফোরক খণ্ড, 'কল্লোল' (১৯৬৭)-তে নৌবিদ্রো-হের ব্যক্তিগত ইতিবৃত্ত, 'তীর' (১৯৬৮)-তে নকশালবাড়ি অনুপ্রেরিত গেরিলা প্রস্তুতি, 'অজেয় ভিয়েতনাম' (১৯৬৮)-এ ভিয়েতনাম মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব—এসব নাটকই তাঁর বিশেষ মঞ্চপরিকল্পনার অর্ধাংশ মাত্র। 'মানুষের অধিকারে' (১৯৬৮) -ও তাই—এই নাটকটি নাটক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে 'রাইফেল' (১৯৬৯) 'বর্গী এলো দেশে' (১৯৭০), 'সূর্য শিকার', 'টোটা', (১৯৭৩) ব্যারিকেড (১৯৭২), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (১৯৭৪) 'লেনিন কোথায়' (১৯৭৬), 'তিতুমীর' (১৯৭৮), 'স্ট্যালিন' (১৯৭৯) ইত্যাদি নাটকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিপ্লব বা বিদ্রোহের সূত্রটিকেই তিনি নানাভাবে নাট্যায়িত করেছেন। এ কাজে তাঁকে কখনও কখনও বিদেশী উৎস থেকে ঋণও করতে হয়েছে, যেমন 'ব্যারিকেড'-এ ইয়ান পেটার্সেনের জর্মন নাটক 'উনসেরে স্ট্রাসে' (আমাদের পথ)। এর আগে 'ভি আই পি' নাটকে তিনি মার্কিন নাট্যকারযুগল কফম্যান ও হার্ট-এর 'দ ম্যান হু কেম টু ডিনার' প্রহসনটির সূত্র গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'চক্রান্ত' (১৯৭৯) 'বাংলা ছাড়ো' (১৯৮০) ইত্যাদি সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত রঙ্গময় নাটক। এই কাজে উৎপলবাবু সিদ্ধহস্ত। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭১) উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যজগতের প্রতি তাঁর নস্টালজিক মমত্ববোধের গভীর পরিচয় তুলে ধরে। পরবর্তীকালে মধুসূদনের জীবন অবলম্বনে 'দাঁড়াও পথিকবর' (১৯৮০) প্রযোজনা এবং গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' পুনরভিনয়ের মধ্যেও তাঁর ঐতিহ্য সন্ধানের চেষ্টা লক্ষ করি। তাঁর আরও বহু নাটক আছে —'ঘুম নেই', 'বিচারের বাণী', 'কাকদ্বীপের এক মা', 'রক্তাক্ত ইন্দো-নেশিয়া', 'দ্বীপ', 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়', 'তলোয়ারের কাহিনী' ইত্যাদি—যার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এক দুঃসাধ্য কাজ। মৌলিক নাট্য রচনার পাশাপাশি অসংখ্য অনুবাদ করেছেন উৎপল দত্ত, তার মধ্যে 'প্রফেসর মামলক' (ফ্রিডরিশ ভোলফ) এবং ব্রেশ্‌টের একাধিক নাটিকা ('গুপ্তচর', 'সমাধান') ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রে ঋত্বিক ঘটকের কথা বলে নেওয়া দরকার। তাঁর 'দলিল' গণনাট্য সঙ্ঘে অভিনীত হয়েছে, গন্ধর্ব নাট্যগোষ্ঠীর সূত্রপাতও এই নাটক থেকে। একাঙ্ক 'জ্বালা' এবং পূর্ণাঙ্গ 'সাঁকো' তাঁর জনপ্রিয় নাটক। তবু নাটক ঋত্বিকের পূর্ণ মনোযোগ পায়নি, এখানে তাঁর প্রতিভা অভিনব কোনো সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি।

তরুণ রায় ওরফে ধনঞ্জয় বৈরাগী দীর্ঘদিন থিয়েটার সেণ্টার নামক মঞ্চটিতে মুখোস সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেছেন এবং উপন্যাস গল্প ইত্যাদি রচনার সঙ্গে প্রচুর নাটকও রচনা করেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ধৃতরাষ্ট্র' (১৯৫৬), 'রূপোলি চাঁদ' (১৯৫৮), 'রজনীগন্ধা' (১৯৫৯), 'আর হবে না দেরি' (১৯৬০), 'এক পেয়ালা কফি' (১৯৬২), 'সৈনিক' (১৯৬২), 'নিশাচর' (১৯৬৪), 'পুড়েও যা পোড়ে না' (১৯৬৫), 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' (১৯৬৯), 'পরাজিত নায়ক' (১৯৭০), 'অথচ সংযুক্তা' (১৯৭২), 'ত্রিশূল' (১৯৭৫) 'অর্কিড' (১৯৮০) ইত্যাদি। ধনঞ্জয় বৈরাগী বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না, ফলে তাঁর নাটক মধ্যবিত্ত পারিবারিক সমস্যা, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, দেশপ্রেম—কখনো বা রহস্য-রোমাঞ্চে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তিনি মূলত নিজ দলের জন্যই নাটক লিখেছেন, গ্রুপ থিয়েটারের অন্যান্য দল তাঁর নাটক ব্যবহার করতে খুব একটা আগ্রহী হয়নি। অন্যান্য প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা-দলনেতার মধ্যে উমানাথ ভট্টাচার্য পরে নিজে দল সংগঠন করেন। অনুবাদ রূপান্তর ছাড়া তাঁর 'ঠগ' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। শৌভনিক স্থাপনের পর নিবেদিতা দাস 'ল-ল-না', 'ঝাঁসীর রাণী' ও 'অক্টোবর বিপ্লব' নাটক লেখেন।

সলিল সেন সম্ভবত প্রথমে 'নতুন ইহুদী'-র নাট্যকার হিসেবেই বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে লেখা তাঁর এই নাটকে ছিন্নমূল পরিবারের দুর্গতির মর্মন্তুদ ছবি ফুটে উঠেছিল। উত্তর-সারথি সম্প্রদায় এবং পরে ব্যাবসায়িক মঞ্চের জন্যও নাটক রচনা করেন তিনি। 'জাতিস্মর' 'মৌচোর', 'সন্ন্যাসী', দর্পণ (১৯৫১), 'দিশারী' ইত্যাদি নাটকে তিনি বাংলা নাটকের ভৌগোলিক ও মানবিক অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের (১৯৪৬) জন্য তিনি ১৯৫৫-৫৬-র মধ্যে 'মৌচোর', 'সওয়াল' এবং 'জীবনযাত্রা' লেখেন, 'ডাউন-ট্রেন' লেখেন ১৯৬৩-তে।

রূপান্তরীর (১৯৬১) প্রযোজক-পরিচালক-প্রতিষ্ঠাতা জোছন দস্তিদারের প্রথম নাটক 'বিংশোত্তরী' (১৯৬১)। তার পরে যথাক্রমে তাঁর কাছ থেকে পাই 'দুই মহল' (১৯৬২), 'স্বর্ণ-গ্রন্থি', 'কর্ণিক', 'অমর ভিয়েতনাম' এবং পরে জোছনের বর্তমান দল চার্বাক-এর জন্য, 'গল্প-পল্প-প্রবন্ধ' (১৯৭৬) এবং 'উত্তরপুরুষ' (১৯৮৩)। গণনাট্যের প্রাক্তন কর্মী বীরু মুখোপাধ্যায় তাঁর রাহুমুক্ত যাত্রা-পালাটির জন্য অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর নাট্যরচনার সংখ্যাও কম নয়। 'সংক্রান্তি' নামে নাটকটি প্রান্তিক গণনাট্য সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

রূপকার ও রূপদক্ষ তাঁর 'সাহিত্যিক' (১৯৬১) অভিনয় করে, অশনিচক্র করে 'ঢেউ'। তবে শৌভনিক প্রতিষ্ঠার (১৯৫৭) পরই এই দলে কেবল তাঁর 'তৈরি হও' (১৯৬৩) অভিনীত হতে দেখি। শেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁর দল থিয়েটার ইউনিট-এর জন্য রচনা করেন 'ফরিয়াদ', 'জন্মভূমি' এবং একাধিক একাঙ্ক নাটক। আরেকজন নাট্যকার সুনীল দত্ত 'হরিপদ মাষ্টার', 'ভাঙা তরী' লিখে খ্যাতি পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর নাটক রচনা বিষয়ে উদাসীনতা আসে।

সুন্দরম্ দলটি প্রতিষ্ঠা (১৯৫৭) করে মূলত পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক অরাজনৈতিক নাটক রচনা এবং রূপান্তরের দিকে মন দিয়েছিলেন নাট্যকার এবং পরে চলচ্চিত্র পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলির মধ্যে আছে 'ফিঙ্গার প্রিণ্ট' (১৯৬০) 'চার দেওয়ালের গল্প' (১৯৬৪) 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু' (রহস্য-চলচ্চিত্র 'ডায়াল এম ফর মারডার' অবলম্বনে). 'শব্দরূপ-ধাতুরূপ' 'খাঁচা', 'মলাটের রং মুহূর্ত' (অলবি-র 'হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ্' থেকে)। পার্থপ্রতিম চলচ্চিত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সম্ভবত নাটক সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন, ফলে সুন্দরম্ দলের দায়িত্ব নাট্যকার মনোজ মিত্রের ওপর বর্তায়। মনোজ মিত্র এখানকার বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। হাস্যরসের সবগুলি ভাঁজ তাঁর সংলাপে যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি তাঁর রঙ্গকল্পনাও বেশ উদ্দাম। অথচ প্রথম দিকে সিরিয়াস বক্তব্যের নাটক নিয়েই তিনি নাট্যকার-জীবন আরম্ভ করেছিলেন। 'মোরগের ডাক', 'টাপুর-টুপুর', 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'মৃত্যুর চোখে জল', ইত্যাদি নাটক পরবর্তীকালের উজ্জ্বল সিরিয়োকমিক নাট্যকার মনোজ মিত্রের বিষয়ে তেমন অগ্রিম ইঙ্গিত দেয় না ; আবার ব্যক্তি-সমস্যা থেকে সমাজ-সচেতন সমালোচনাতে তাঁর উত্তরণের আভাসও বহন করে না। এই মনোজ মিত্রকে আমরা পাই 'শিবের অসাধ্যি', 'নরক গুলজার', 'পরবাস' (১৯৭৫) 'বাবা বদল' (কেনারাম-বেচারাম), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৭), 'রাজদর্শন', 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৮০) ও 'নৈশভোজ' (১৯৮৪)-এ। এরই পাশাপাশি মনোজ যখন 'চাকভাঙা মধু'-র মতো শক্তিশালী নাটক রচনা করেন তখন তাঁর শক্তির বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হই। সংলাপে তাঁর পটুত্ব অসাধারণ, তবে ব্যঙ্গের চেয়ে কমেডিতেই তাঁর হাত খেলে ভালো।

গণনাট্য ও বহুরূপীর প্রবীণ অভিনেতা স্বর্গত গঙ্গাপদ বসুও বেশ কিছু নাটক লিখেছিলেন। বহুরূপী তাঁর 'অংশীদার' (১৯৫৫) অভিনয় করে ; আর নিজের দল অন্বেষা-র জন্য তিনি রচনা করেন 'অন্ধকারের বৃত্ত', জনপ্রিয় 'সত্য মারা গেছে',

'নহ মাতা', 'নমো যন্ত্র', 'মহাগুরু নিপাত' এবং 'প্রজাপতয়ে নমো'। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ দুয়েই দক্ষতা ছিল এই নাট্যকারের।

কিরণ মৈত্র অভ্যুদয় নাট্যগোষ্ঠীর জন্য লিখেছিলেন 'বারো ঘণ্টা', এবং 'নাটক নয়' (১৯৫৮)। দুটিই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর এ দুটি নাটক, এবং 'চোরাবালি', 'নাম নেই', 'অন্য ছায়া' ইত্যাদিতে আবেগময় অতিনাটকীয়তা এবং দুর্গতির আতিশয্য লক্ষ করা যায়। পেশাদার মঞ্চে তাঁর দু-একটি নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছে। বঙ্গীয় নাট্য সংসদ-এর নাট্যকার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী 'ছায়াবিহীন' (সার্ত্র্-এর 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ' থেকে), 'সমান্তরাল', 'ছারপোকা' ইত্যাদি নাটক রচনা করেছেন। ইয়োনেস্কোর 'রাইনোসেরস' প্রথমে তিনিই অনুবাদ করেন, পরে বহুরূপীর জন্য রূপান্তর করেন শাঁওলী মিত্র।

বাদল সরকারকে একটু আলাদা করে বিচার করতে হয়। ইদানীংকালের বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে বাদলবাবুই সবচেয়ে বেশি সর্বভারতীয় এবং খানিকটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। শুধু নাট্যকার নয়, নাট্যতাত্ত্বিক হিসেবেও তিনি নিজের একটা জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর বিবর্তনটি লক্ষ করবার মতো। প্রথমে ডি ভি সি প্রজেক্ট কর্মসূত্রে শৌখিনভাবে নাট্যচর্চা শুরু করেন মাইথনে। ভালো নাটক না পাওয়ায় কিছু বিদেশী ছায়ায় কিছু মৌলিকভাবে নিজেই রচনা করেন মূলত হাসির নাটক 'সলিউশন এক্স', 'রাম-শ্যাম-যদু', 'বড়ো পিসীমা' এবং 'শনিবার'। সেই সঙ্গে ভোটরঙ্গ নিয়ে লেখা 'কবিকাহিনী'। এসবই ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে। তার পর অল্প দিনের জন্য লণ্ডনে নাটক-টাটক দেখে এসে ১৯৬২-তে লেখেন 'এবং ইন্দ্রজিৎ'।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' বাদল সরকারের নাট্যরচনায় নতুন পর্যায় এবং ভারতীয় নাট্যরীতিতে দিগ্‌বদলের সূচনা করে। মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের তুচ্ছতা ও হাস্যকর অসঙ্গতি, তার দায়বোধের অভাব ও নন-ইনভল্‌মেণ্ট—তারই মধ্যে আবদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংকট ও বিনষ্টি—এইসব নিয়ে বিষণ্ণ ও ব্যাকুলভাবে তিনি প্রশ্ন তোলেন পরবর্তী 'বাকী ইতিহাস', 'পরে কোনোদিন', 'প্রলাপ', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'পাগলা ঘোড়া' এমন কী 'সারারাত্তির' নাটকে। এ নাটকগুলিতে প্রশ্ন ও সন্ধান যতটা ছিল উত্তর ততটা ছিল না, অস্তিত্ববাদী দর্শনের ছোঁয়াচ-লাগা নৈরাশ্যের জন্য এ নাটকগুলির সমালোচনাও করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি নাটকেই প্রচলিত ছক ভেঙে তছনছ করে ফর্মের এক ধরনের মুক্তি এনেছেন—তা সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রেই নাট্যকারদের বিশেষ প্রভাবিত করেছে।

বাদল সরকারের তৃতীয় এবং এখনও পর্যন্ত শেষ পর্যায় শুরু হয়েছে ১৯৬৭-র পর, নিজের দল শতাব্দী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অঙ্গন মঞ্চে অর্থাৎ সমতল খোলা আয়তক্ষেত্রাকার জায়গায় অভিনয়ের উপর ভিত্তি করে তাঁর তৃতীয় থিয়েটার-এর তত্ত্ব রূপ পেয়েছে ১৯৭২ নাগাদ। এই তত্ত্বের দুটি দিক—বিষয় ও ফর্ম। এ পর্যায়ে বাদলবাবুর নাটকের মূল বিষয় হল শহরের গ্রামকে শোষণ (বাদলবাবুর মতে গ্রামই ভারতবর্ষের মূল জায়গা) অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত রেখে শ্রেণীবিশেষের পুষ্টির নিদারুণ অসঙ্গতি, ইত্যাদি। আর ফর্মের দিকে এই নাটক ওপেন এণ্ডেড। অর্থাৎ এর ধরা-বাঁধা কাহিনী নেই, দৃশ্যে ও সংলাপে খবর শ্লোগান ছড়া বিজ্ঞাপন সবই চলে আসে, অভিনেতারা চারপাশে দর্শক বসিয়ে বিনা মেক-আপ, বিনা (বা নামমাত্র) সাজসজ্জা ও সাধারণ আলোয় অভিনয় করে। আবহসঙ্গীতের বদলে নিজেদের গলা দিয়ে নানারকম আওয়াজ করে আবহ রচনা করে, স্টেজের সরঞ্জামের বদলে নিজেরাই নিজেদের দেহকে ব্যবহার করে। এই পর্বে বাদলবাবুর খ্যাতিপ্রাপ্ত নাটক 'মিছিল', 'ভোমা', 'বাসি খবর', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', 'স্পার্টাকুস' এবং ব্রেশটের 'ককেশিয়ান চক সার্কল' অবলম্বনে 'গণ্ডী'। বাদলবাবুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা তাঁর নাট্যদর্শনে বিশ্বাস না করলেও তাঁর নাটকগুলির শক্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে বাদলবাবুর অনুকরণে ওই তৃতীয় গোছের থিয়েটারে প্রবীর গুহ-র 'সমুদ্র অস্থির' ধরনের আরও অসংখ্য নাটক লেখা ও অভিনয় হচ্ছে। সেগুলির মৌলিকতা খুব স্পষ্ট নয়।

নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নাট্যকারের মধ্যে চিররঞ্জন দাস দীর্ঘদিন গণনাট্য আন্দোলনের অংশীদার—তাঁর নাটক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষের সংগ্রামের আখ্যানকেই অবলম্বন করে রচিত। তাঁর 'জুলিয়াস ফুচিক' (১৯৬৮), 'ফ্রীডম রোড', 'জোসেফ স্তালিন', 'বিবসনা বৃহন্নলা' 'পথে নামার সময়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিররঞ্জনের নাটক গণনাট্য আন্দোলনকে বিশেষভাবে রসদ জুগিয়েছে। মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদ' নাটকে মাটির ঘনিষ্ঠ গন্ধ পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সব নাটকেই জীবন-অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠতা এবং বলিষ্ঠ সংলাপ-কুশলতার পরিচয় আছে। 'আবাদ' (১৯৬৬) ছাড়া 'ভাসান', 'আমার মাটি', 'জননী' (একাঙ্ক, ১৯৬৯), 'দাদন' (ওই, ১৯৭১), 'পদাতিক' (১৯৭৩), 'মৃত্যুর মুখে পা রেখে' (১৯৭১), 'রণক্ষেত্রে আছি' (১৯৭৩), 'সারা আকাশ লাল' (১৯৭৯) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ-

যোগ্য নাটক। নৈহাটির যাত্রিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কালো মাটির কান্না', 'রক্তে রোঁয়া ধান', 'বিচার', 'দধীচি মন', 'আমাদের বাঁচতে দাও', 'শহীদ আত্মা' এক সময় খুবই অভিনীত হয়েছে। তিনিও গণনাট্য আন্দোলনের সহযাত্রী, এবং শ্রেণী সংঘাতের থিম গ্রহণ করে প্রচুর নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা চলে—'গঙ্গা তুমি বইছো কেন' (১৯৭৭), 'সোমক ও কালীচরণ' (১৯৭৫), 'বিলাসী', 'ছুটি', 'ফাঁসি', 'এক যে ছিল রাজা', 'বাতাসে বারুদের গন্ধ', 'জরাসন্ধের সিংহাসন', (একাঙ্ক), 'গাজন', 'নাচন' 'অশান্ত বিবর', 'কালো মাটির ফরিয়াদ'। 'যুগসন্ধি' বিচ্ছিন্নতাবাদবিরোধী নাটক। ব্যঙ্গেও শ্রীভট্টাচার্যের পটুত্ব আছে। কালপুরুষ নর্থ নাটক গোষ্ঠীর পরিচালক রাধারমণ ঘোষের 'চিচিং ফাঁক', 'যদিও সন্ধ্যা', 'যদি আমি কিন্তু আমি' (১৯৭৫) 'চিত্ত বিনিময়', 'আমি' ইত্যাদি নাটক শুধু তাঁর দলের মধ্যেই অভিনীত হয় না, অন্যান্য দলকেও প্রচুর সহায়তা দেয়। 'ইতিহাস কাঁদে', 'শতাব্দীর পদাবলী', 'হারাধনের দশটি ছেলে', 'হইতে সাবধান', এবং রূপক সাংকেতিক 'সূর্য সে স্বপ্ন আছে', 'অথ স্বর্গ বিচিত্রা' শ্রীঘোষের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক।

রতনকুমার ঘোষ, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেশ গুহ নিয়োগী (পিকলু নিয়োগী) একটু প্রবীণ—এবং গণনাট্য ধারার সঙ্গে এঁদের কোনো সাক্ষাৎ যোগও ছিল না। রতনকুমার ঘোষ বিভিন্ন নাটকের প্রভাবে মূলত প্রতীক সাংকেতিক নাটক লিখেছেন, কিন্তু সেসব নাটকের বক্তব্য খুব স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নয়। তবু সংলাপের দক্ষতা এবং নাটকের কারু-কৌশলের কায়দার জন্য তাঁর নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', 'সম্রাট', 'অমৃতস্য পুত্র', 'ফেরা'—এই ত্রয়ী নাটক, 'রক্তকরবীর পরে', 'রাজবাড়ি' 'আর কতদূর', 'ক্রীতদাস', 'পাপ-পুণ্য', 'শেষ বিচার', 'মহাকাব্য', 'তৃতীয় কণ্ঠ', 'শেষ প্রহরী', 'সোনালি স্বপ্ন', 'জম্বুদ্বীপের ইতিকথা', 'সীতাহরণ', 'রস', (নরেন্দ্র মিত্র অবলম্বনে) ও 'ভয়'। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গেটম্যান', 'বায়েন', 'লৌহকপাট', 'বাজীকর', 'ফুলেশ্বরী', 'ঝিনুকে মুক্তো', ইত্যাদি নাটক অবশ্য তাঁকে এই তিনজনের মধ্যে গণনাট্যের সবচেয়ে বেশি নৈকট্যে স্থাপন করে। শৈলেশ গুহনিয়োগী মূলত প্রহসন ও হালকা বক্তব্যের নাটক লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন, কখনো কখনো আবেগপ্লুত বিষণ্ণতাও ছুঁইয়ে রেখেছেন তার মধ্যে। 'বৌদির বিয়ে', 'ক্যাম্প থ্রি', 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ', 'ঝরনা', 'পাহাড়ী

ফুল', 'ফাঁস', 'জীবনরঙ্গ' 'ক্লান্ত রূপকার', 'অভিনেত্রীর স্বামী', 'ঝুমুর' ইত্যাদি কমবেশি জনপ্রিয় নাটক তিনি রচনা করেছেন।

নান্দীকারের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ও শক্তিমান অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলিক নাটক লিখেছিলেন কয়েকটি। তার মধ্যে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' গণনাট্যের বিভিন্ন শাখা অভিনয় করেছে, ব্যঙ্গনাটক 'সেতুবন্ধন' এবং অনূদিত 'জলছবি'-রও অভিনয় হয়েছে ইতস্তত। কাব্যনাট্য 'সওদাগরের নৌকা' নান্দীকার নিজেই অভিনয় করেছে। নান্দীকারে অভিনীত তাঁর আরেকটি নাটক 'হে সময় উত্তাল সময়'। তবে মূলত রূপান্তরেই তাঁর মূল খ্যাতি অর্জিত হয়েছে। রঙ্গশ্রী নাট্য দলের পরিচালক-অভিনেতা রমেন লাহিড়ী লিখেছেন 'আরো গান চাই', 'এলেম নতুন দেশে', 'বেনজু', 'শততম অভিনয় রজনী', 'নটরঙ্গ', 'মনোবিকলন', 'জন্মমৃত্যু' ইত্যাদি নাটক। চতুরঙ্গের বরুণ দাশ-গুপ্তের 'আবর্ত' এক সময় খ্যাতি লাভ করেছিল। চেতনার অরুণ মুখোপাধ্যায় 'মারীচ সংবাদ' রচনা ও প্রযোজনা করে সাড়া ফেলে দেন সত্তর দশকে। এটি এবং পরবর্তী 'রামযাত্রা' ইদানীংকালে ফর্মের অভিনবত্ব ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতাকে সার্থকভাবে মেলাতে পারার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হবে। থিয়েটার কমিউনের নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের রচনা (বা রূপান্তর) 'বিভুর বাঘ', 'পরবর্তী আক্রমণ', 'দানসাগর', 'প্রস্তুতি', 'জীবিকা' ও 'জুলিয়াস সিজারের শেষ সাতদিন'। কাহিনীসূত্র অন্যদের হলেও নাটক তৈরি তোলায় নীলকণ্ঠের দক্ষতা অনস্বীকার্য। ক্যালকাটা পিপলস্ আর্ট থিয়েটারের অসিত বসু 'কলকাতার হ্যামলেট' লিখে সকলকে সচকিত করে যাত্রায় বিলীন হয়েছেন। গণনাট্য ও পরে বিজন ভট্টাচার্যের ক্যালকাটা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'অমৃত যন্ত্রণা', 'পাকে-চক্রে', 'অমানিশা', 'ঠগী কাহিনী', 'ব্যাণ্ডেল লোকাল', 'নিতাই গড়গড়ির বউ', ইত্যাদি নাটক উল্লেখযোগ্য। এককালে গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনেতা কিন্তু পরবর্তীকালে পেশাদার মঞ্চের সংগঠক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইঙ্গিত দলের) নাটক 'শেষ থেকে শুরু', 'পঙ্গপাল', 'নির্লজ্জ' এবং তপন থিয়েটারে দীর্ঘকাল চলা 'নহবৎ' উল্লেখযোগ্য। বহু আগে মিনার্ভায় এঁর 'এরাও মানুষ' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

গণনাট্য সংগঠনের মধ্যে থেকে দু'জন নাট্যকার বিশেষভাবে এ আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়েছেন। একজন পিপল্স আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত শ্যামাকান্ত দাস। এঁর 'নেপোয় মারে দই', 'আলিবাবা পাঁচালী', 'একই বৃন্তে', 'কাঙাল হরিশ',

'ম্যাকবেথ-৭২', 'অগ্নিগর্ভ লেনা', 'সামনে পাহাড়' ইত্যাদি বহুবার অভিনীত হয়েছে। আরেকজন শ্রীজীব গোস্বামী। এঁর 'দুই তরঙ্গ', 'সূর্য প্রতীক্ষা', 'রক্ত গোলাপ', 'শঙ্খচূড়', 'পথ', 'শান দেওয়া কাস্তে', 'নয়া বসত' ইত্যাদি নাটক গণনাট্যের রেপার্টরিতে পুনরাবৃত্ত হয়। তাছাড়া গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হীরেন ভট্টাচার্যের 'ভুলব না' (১৯৭৭), 'পাগলা ঘন্টি', 'বাস্তব শাস্ত্র', 'ইতিহাসের পাতা থেকে', 'মুনাফা ঠাকুরের নক্সা' ইত্যাদি প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন জুগিয়েছে। শুভংকর চক্রবর্তীর 'আমরা কবরে যাব না' (১৯৭১)—এই যুদ্ধবিরোধী নাটকটি আরউইন শ-র 'বেরি দ ডেড'-এর সূত্র ধরে লেখা। 'শৃঙ্খলে শব্দ' (১৯৭৭) রবীন্দ্রনাথের বদনাম থেকে কাহিনীসূত্র গ্রহণ করেছে। 'বিদ্রোহী চার্বাক' (১৯৭৫) প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রেণীসংঘর্ষের নাটক, 'দুরন্ত আগুন' (১৯৭৪) সমসাময়িক বাস্তব ছবি। একাঙ্কে, বিশেষত ব্যঙ্গমূলক একাঙ্কে শুভঙ্করের কুশলতা আছে। 'কবে বসন্ত আসবে' শুভঙ্করের আরেকটি নাটক—গণনাট্য। শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটকগুলিও ('পলাশের রং লাল', 'কালোর পালা' ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য। রজত ঘোষ মূলত মনোজ মিত্রের ধরনে ১৯৭৫-এ দুটি নাটক লিখেছিলেন 'শিবের পুনর্বাসন' এবং 'ভজ কেরোসিন'। দুটিই জনপ্রিয় হয়েছিল। অভিনয়-প্রযোজনা-পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত আরো কয়েকজন নাট্যকার ও তাঁদের সৃষ্টির উল্লেখ এইরকম : অনল গুপ্ত ('রামগিরির গুমটিঘর'), বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ('এরা কারা', 'একটি ব্যক্তিগত গল্প', 'হয়তো সেদিন') জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ('লং মার্চ') গিরিশংকর ('আজকের নাটক', 'সাইরেন', 'শেষ সংলাপ', 'ঘরবদল'—গিরিশংকর কিছু কাব্যনাটকও রচনা করেছেন), বীর সেন ('আবৃত্ত দশমিক'), দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত ('গাব্বু খেলা', 'দ্বিতীয় পৃথিবী', 'শনিবারের বিকেল' এবং 'ঝড়ের খেয়া)', পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ('এরেনা') পম্পু মজুমদার ('বিষ তীর', 'খণ্ডযুদ্ধ', 'খোদার মর্জি'), সঞ্জয় গুহঠাকুরতা ('যুধিষ্ঠির') প্রভৃতি।

৬.

নিজেরা পরিচালনা, অভিনয় কিংবা সংগঠনের সঙ্গে খুব প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন (পরে যুক্ত হয়েছেন এমন ব্যতিক্রম কখনো কখনো দেখা গেছে অবশ্য), অথচ গ্রুপ থিয়েটার বা গণনাট্যকে নিয়মিত নাটক দিয়ে নাটক-দারিদ্র্যের উপশম ঘটানোর সক্রিয় চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন, এমন নাট্যকারদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর একাধিক নাটক কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দলগুলি অভিনয় করেছে, সেগুলি হল 'নটী বিনোদিনী' ও 'আন্তেগোনে', (নান্দীকার) এবং 'গীতরত্ন' (বহুরূপী)। শ্রীঘোষের কল্পনা ও লেখনী কমিক ও বেদনাময় দু দিকেই সমান্তরালভাবে বিস্তারিত হতে পারে। তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গের নাট্যনাটিকার মধ্যে 'দাও ফিরে সে অরণ্য', 'কন্যাকা' এবং পূর্ণাঙ্গ 'রাজার রাজা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিরিয়াস নাটকের মধ্যে 'আত্মজা' এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক। এ ছাড়াও ইতিহাস বিষয়ক 'নীলের পালা', সত্তর দশকের রাজনৈতিক নাটক 'অভিমন্যু', 'একটি রক্তিম স্বপ্ন' ও 'প্রহরার' নাম করা যেতে পারে। এ নাটকগুলিতে তাঁর নাট্যকারের নিরপেক্ষতা কোথাও কোথাও ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। জীবনী-মূলক নাটক 'ডিরোজিও' একাধিকবার অভিনীত হয়েছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই বিন্যাসে আরেকটি স্মরণীয় নাম। গন্ধর্ব গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ে জন্মান্তরিত হন। কিন্তু তাঁর নাট্যকার জীবনের একটি বক্ররেখাময় পরম্পরা আছে। তিনি প্রথমে আরম্ভ করেছিলেন ব্যাক্তর সীমা থেকে, তখন তাঁর মূল মাধ্যম ছিল তথাকথিত কিমিতিবাদী প্রকরণ। 'মৃত্যুসংবাদ' এবং 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' এই ধরনের নাটক। সেগুলি রূপান্তর হলেও এমনই রূপান্তর যে তাতে মূলের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া কঠিন। 'গন্ধরাজের হাততালি', 'কণ্ঠনালীতে সূর্য,' 'দ্বীপের রাজা' ইত্যাদিতে রূপক-প্রতীকের সংক্রমণ প্রবল হয়। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে মোহিত সমাজ-সচেতন বক্তব্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর 'ক্যাপটেন হুর্‌রা', 'বাঘবন্দী', 'নিষাদ' 'স্বদেশী নকশা', 'রাজরক্ত', 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ', 'যাদুদণ্ড' ইত্যাদি নাটকে শ্রেণীসংঘাতমূলক সামাজিক বক্তব্য দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। পরবর্তী নাটক 'ভূত', 'মহাকালীর বাচ্চা', 'বাজপাখি', 'লাঠি', 'মাছি' ইত্যাদিতে মোহিত সম্পূর্ণ রূপেই সংগ্রামী মানুষের নাট্যকার হয়ে ওঠেন। মোহিতের সংলাপে কবিতা ও হাস্যরস এবং তারই পাশাপাশি দৈনন্দিন কথ্য ভাষা খুব সহজে অবস্থান করে। এই শক্তিশালী নাট্যকার ইদানীং একটু নিঃশব্দ—রূপান্তর 'আলিবাবা' এবং 'গালিলেওর জীবন' ছাড়া ফিল্‌মে তাঁর মনোযোগ গিয়েছিল। তাঁর আবার নাটকে ফিরে আসা দরকার।

বহুরূপীর প্রযোজনা 'বর্বর বাঁশী'তে নীতীশ সেন যে সুযোগ পেয়েছিলেন, পরবর্তী নাটক 'অপরাজিতায়' তাকে তিনি সমৃদ্ধ করতে পারেননি। নক্ষত্রের

'নয়ন-কবিরের পালা'তে নাট্যকার নভেন্দু সেন খুবই চমকে দিয়েছিলেন আমাদের। দুঃখের বিষয় তাঁর নাট্যরচনা প্রচুর নয়। সায়ক-এর নাট্যকার চন্দন সেন 'সাধু সঙ্গ', 'আজকের আলাদীন', এবং রূপান্তর 'দুই হুজুরের গপ্পো' লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। গণনাট্য ধারার সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার অমল রায় অনেক নাটক লিখেছেন, বহু দল তাঁর নাটকের উপর নির্ভর করে থাকে। তাঁর 'পাতা নড়ার শব্দ' (১৯৭১-৭২) যুদ্ধবিরোধী নাটক, ভিয়েতনামের পটভূমিকায়। লু-শুন থেকে রূপান্তরিত তিনটি নাটকের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। 'নো পাসারন' স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা, 'গেব্রিয়েল পেরী' নাৎসী-পদানত ফ্রান্সের, 'মৃত্যু নেই' (১৯৭৬) মুসোলিনি সংক্রামিত ইতালির। সব কটিই আন্তর্জাতিক সংগ্রামকে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা। 'ঝড় উঠুক' (১৯৭৮) থেকে জাতীয় আবহে তাঁর মনোযোগ লক্ষ করি। এই ধরনের আরও নাটক 'ললাট লিখন' (১৯৭৮), 'কেন না মানুষ' (১৯৭৬), নচিকেতা (১৯৭৬) 'বন্দীশালার ডাক' (১৯৭৬)। বহরমপুরের প্রান্তিক দলের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানা হে' (১৯৭৮) লোকনাট্যের আঙ্গিকে রচিত ইদানীংকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক। শূদ্রকের দেবাশিস মজুমদার 'অমিতাক্ষর' লিখে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন, 'সমাবর্তন' সে বিস্ময়কে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে।

দিল্লীতে সেবাব্রত চৌধুরীর 'মহাযুদ্ধ' নামে পূর্ণাঙ্গ এবং 'নোটনের মেলাযাত্রা' একাঙ্কটির রূপগত স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। শিশিরকুমার দাসের 'সক্রেটিসের বিচার' একটি চমৎকার নাটক।

৭.

যাঁরা মূলত গল্প-উপন্যাসের লেখক, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাটক লিখেছেন, আবার তাঁদের রচনার নাট্যরূপও জনপ্রিয় হয়েছে। এঁদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর নামই সকলের আগে মনে আসে। তাঁর 'হাজার চুরাশির মা'-র নাট্যরূপ তাঁর নিজেরই, কিন্তু দুটি ছোটগল্প 'জল' (হরিমাধব মুখোপাধ্যায়) এবং 'আজীর'-এর নাট্যরূপও একাধিকবার অভিনীত হয়ে চলেছে। সন্তোষকুমার ঘোষের 'অজাতক' অভিনয় করেছে এন বি এণ্টারপ্রাইজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেন্দ্র-বিন্দু' ও 'গরম ভাত' নাট্যরূপ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ফজল আলি আসছে' উপন্যাসের নাট্যরূপ, থিয়েটার কমিউনের 'প্রস্তুতি' শ্যামল

গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প থেকে নেওয়া। অনুবাদ-রূপান্তরের পাশাপাশি এই নাট্য-রূপদানের ধারাটিও চলেছে, তাতে অন্তত বিদেশের কাছে হাত পাতবার বদনাম হচ্ছে না।

৮.

সব নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে গত তিরিশ বছরের বাংলা নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় কী—তাহলে পালটা প্রশ্ন করতে হয়, কী হিসেবে উল্লেখযোগ্য—সাহিত্য হিসেবে, না নাটক হিসেবে? জীবনদর্শন যাঁর যেমন হোক সাহিত্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে বাদল সরকার, শম্ভু মিত্র, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, উৎপল দত্ত এঁদের নামই করতে হবে। তবে সাহিত্য হিসেবে সুপাঠ্য হওয়ার মধ্যে নাটকের যথার্থ সম্পূর্ণতা নেই—মঞ্চে অভিনীত হয়ে মানুষের মনে আলোড়ন, ভাবনা এবং উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তার ভিন্নতর সার্থকতা। এই লেখক 'উন্নত' সাহিত্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যেই নাটকের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, এমন কথা বিশ্বাস করে না। সেদিক থেকেও কারো কারো নাটক অন্যদের চেয়ে বেশি সফল। তবে এটা লক্ষ করতেই হবে যে, গত তিরিশ বছরে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকার বক্তব্যে জীবনঘনিষ্ঠতা এবং রূপকর্মে নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছেন। আরো বেশি সংখ্যায় আসেননি, এবং তাঁদের প্রজন্মের মধ্যে ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দিলেও আরও টগবগে অনুবর্তী দলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না—এইটেই যা ক্ষোভের বিষয়। তরুণতর দেবাশিস মজুমদারের মধ্যেও যখন একটু অন্যমনস্কতার চিহ্ন দেখি, তখন উদ্বেগ জাগে বই-কী।[৭]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. 'রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ নাট্যশালা', ১৯৮৩, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত।

২. 'গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়', ১৯৮২, অনুষ্টুপ প্রকাশনী দ্রষ্টব্য।

৩. নাটকের দল প্রতিষ্ঠার এবং প্রথম অভিনয়ের তারিখ আমি মূলত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের '*The Story of the Calcutta Theatres* : 1753—1980, K. P. Bagchi & Company. 1982 বই থেকে নিয়েছি। বইটির সাহায্যগ্রহণ অবশ্য এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়।

৪. দ্রষ্টব্য, এলা দত্তের ভূমিকা,
Three Plays, Badal Sircar, 1983. Seagull Books,

৫. আর যে বইটির থেকে আমি অনেক তথ্য নিয়েছি, সেটি প্রভাতকুমার গোস্বামীর 'উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক' (সংস্কৃতি পরিষদ : ১৯৮২)।

৬. এখানে যেসব নাট্যকারের বা নাটকের নাম করা হল না, তা মূলত অনবধানতার জন্য। সকলের নাম ও রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা লেখক তৈরি করার সংকল্প নিয়েছেন, এজন্য (এবং এই প্রবন্ধে অন্যান্য ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য) সকলের সহযোগিতা ও সহায়তা প্রার্থনা করি।

৭. ১৯৮৪-তে প্রকাশিত বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা / দৈনিক বসুমতী ১৩৯১-তে প্রকাশিত।

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার

১.

বিতর্ক থেকে বিতর্ক

১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দিয়ে নতুন বাংলা নাটকের, এবং বাংলা নাট্যপ্রযোজনার নতুন যুগের, সূত্রপাত হলেও যাকে এখন আমরা গ্রুপ থিয়েটার বলি তার আরম্ভ বোধ হয় ১৯৪৮-এ 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠায়। এই প্রথম কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং অধিকাংশত নাগরিক বঙ্গ-সন্তান একত্র মিলিত হয়ে শুধু নাটকের পিছনে সময় ও চেষ্টা ব্যয় করার কথা ভাবলেন। 'বহুরূপী'র প্রয়াস রাজনৈতিক দল বা দর্শনের প্রয়াস থেকে বিযুক্ত হল—যদিও এঁদের প্রথম দিকের (১৯৪৯-৫১) নাটকগুলিতে—'নবান্ন', 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার', 'বিভাব' ইত্যাদির প্রযোজনায়—একটা রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রভাব প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষভাবে লক্ষ করা গেছে। তারিখের দিক থেকে 'বহুরূপী'র আগেই (১৯৪৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উৎপল দত্তের নাটকের দল প্রথমে যার নাম ছিল 'অ্যামেটিঅর শেক্‌সপিরিয়ান্‌স'। তবে এই দল বাংলা থিয়েটারের সদস্য হয়নি, কারণ এঁরা শেক্‌সপিয়ার বার্নার্ড শ'র নাটক ইংরেজিতে অভিনয় করতেন। উৎপল দত্তের নাটকে দীক্ষা জেফ্রি কেণ্ডাল্ (Geoffry Kendall)-এর 'Shakespeariana' দলে। মাঝখানে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর দল মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' এবং উৎপল দত্তের ব্যঙ্গনাটক 'ছায়ানট' করে বাংলা নাটকের জগতে সাড়া ফেলে এর একটি মূল্যবান অংশ হয়ে হয়ে যায়, তার নাম হয় লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ (১৯৫৩)। বাংলায় 'ম্যাকবেথ'-এর অভিনয়ও এই সময়েই হই-চই ফেলে দেয়। পরে এই দশকের শেষ দিকে আই. পি. টি. এ.-র সঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৯ থেকে মিনার্ভা থিয়েটার 'লিজ' নিয়ে উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' ইত্যাদি প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবী চেতনার নাটক শুরু করেন। 'রূপকার' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫-তে, কিন্তু

ষাটের দশকে সুকুমার রায়ের 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী' এবং অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'ব্যাপিকা বিদায়'ই এই দলটির স্মরণীয়তার জন্য মূলত দায়ী থাকবে। এরপর শৌভনিক (১৯৫৭), গন্ধর্ব (১৯৫৭), সুন্দরম্ (১৯৫৭), থিয়েটার ইউনিট (১৯৫৮), চতুরঙ্গ (১৯৫৮) ক্যালকাটা থিয়েটার (১৯৫৯), নান্দীকার (১৯৬০), রূপান্তরী (১৯৬১), চলাচল (১৯৩৬), থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৬৬), নক্ষত্র (১৯৬৬), চেতনা (১৯৭২) থিয়েটার কমিউন (১৯৭২) ইত্যাদি দল এসে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের একটি বিচিত্র ও সমৃদ্ধ প্রতিমূর্তি তৈরি করল।[১]

বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাস রচনা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। বরং একটি আত্মিক বা মানসিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করা যেতে পারে। অর্থাৎ ১৯৪৪ বা ১৯৪৮ থেকে ১৯৮০—এই প্রায় সাড়ে তিন দশকের মধ্যে মনস্ক বাংলা নাটকের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে যে-সব বিরোধ-বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বা এখনও চলছে, যে-সমস্ত মতাদর্শের, পথের বা প্রকরণের নির্দিষ্ট 'ইস্যু' নিয়ে নানা দল বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই চলেছে—সেগুলির একটা উপর-উপর হদিশ নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য ওইসব তর্ক-বিতর্কের বড়ো বড়ো বিষয়গুলি ছাড়া অনেক পার্শ্বিক বা গৌণ প্রসঙ্গও ছিল বা আছে, যেমন নাটকের লোকেদের ফিল্মে অভিনয় করা উচিত কিনা. এবং উচিত হলে কোন্ ধরনের ফিল্মে[২]—সেগুলি যখন কোনো কেন্দ্রীয় বিতর্কের অংশ হয়ে এসেছে তখনই আলোচনা করব, তার বাইরে নয়।

২.

ষাটের বছরগুলির গোড়াতেই বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের মূল প্রবণতাগুলি চিহ্নিত হয়ে যায় এবং আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে দলগুলি কয়েকটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তর্ক-বিতর্ক, নিন্দা-পরিবাদ, কটূক্তি-ভর্ৎসনা চলতে থাকে, আবার কিছু যৌথ প্রোগ্রামে সকলে বা অনেকে একত্র হয়ে কাজ করার উৎসাহও দেখান। প্রধানত রাজনীতি ও রাজনীতিহীনতার তর্ক, তারই সুবাদে অন্যান্য তর্ক নিরন্তর চলেছে এই সময়; বামপন্থী রাজনীতির মধ্যেও বিভিন্ন গোষ্ঠী দেখা গেছে, কিন্তু তার মধ্যে আন্দোলনের সূত্রে ঐক্য ও সংহতির কিছু প্রয়াসও দেখা যায়নি তা নয়। যেমন ১৯৬৫-তে ২৩ সেপ্টেম্বর ভারতরক্ষা আইনে উৎপল দত্তের গ্রেপ্তার এবং ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে বড় সংবাদপত্রে 'কল্লোল' নাটকের বিজ্ঞাপন বন্ধ করায় তীব্র প্রতিবাদ করেছে, ১৯৬৬-তে রবীন্দ্রসদনে জাতীয়

নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য সব রঙের নাট্যদলই বিক্ষোভ দেখিয়েছে, ১৯৬৬-তেই করপোরেশন গ্রুপ থিয়েটারে নাট্য-প্রদর্শনের ট্যাক্স চল্লিশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, এমন-কী ১৯৭৪-এ উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' অভিনয় জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে। ১৯৬৯ থেকে বহুরূপী, নান্দীকার, রূপকার ইত্যাদি কয়েকটি দল মিলে 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' গড়ে তুলে তার অর্থ তোলবার জন্য সম্মিলিত অভিনয়ও করেছে। অর্থাৎ বাদবিবাদের মধ্যেও নানা সূত্রে কিছুটা বোঝাপড়ার মনোভাব এঁরা দেখাননি তা নয়। তবু যে দ্বান্দ্বিকতায় চিহ্নিত ছিল এদের সম্পর্ক, তার একটি ছবি আমাদের কাছে থাকা দরকার। 'ছিল' বলছি এই কারণে যে, এই ১৯৯০-এ সে দ্বন্দ্ব আর ততটা তীব্র নেই। এর মধ্যে একটি গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন তৈরি হয়েছিল, যদিও তা সচল হয়নি। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের একটি সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে। এককালে ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া দলের জন্মদিনে পুরোনো দল ফুলের তোড়া পাঠায়, বা যারা এক সময়ে দল-ভাঙাভাঙিতে পরস্পরের ঘোরতর শত্রু হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে হৃদ্যতা ফিরে আসে। যে বিভাস চক্রবর্তী একসময় 'কলকাতা নাট্যকেন্দ্রে'র (পরে দেখুন) কর্মী হিসেবে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে "নাট্যকেন্দ্রের বন্ধু মনে করি না" বলে সংবাদপত্রে চিঠি লেখেন তিনিই ন-বছর পরে তাঁর নিজের দল অন্য থিয়েটারের উদ্যোগে একটি নাট্যপত্রিকা সম্পাদনার যুগ্ম দায়িত্ব যখন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যাকে দেন, তখন আরেকটা ছবি ফুটে ওঠে, আরেক আবেগ আলোড়িত হয়। এ ছবিটার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, হয়তো এটাই স্থায়ী হবে।

এই বাদবিবাদের নকশাটি তুলে ধরবার আগে সমগ্রভাবে তখনকার কলকাতার বাংলা থিয়েটারের চেহারাটি ছকে রাখা দরকার বলে মনে করি। থিয়েটার কথাটিকে একটু ব্যাপক অর্থে ধরে নিয়ে দেখতে পাই—কলকাতায় সাধারণভাবে চার ধরনের থিয়েটার চলছে যেগুলি সংগঠনের দিক থেকে আলাদা-আলাদা জগতের অন্তর্ভুক্ত, এবং একটি ছাড়া বাকি তিনটির সম্ভবত বিশ্বস্ত, নিজস্ব কিছু দর্শক তৈরি হয়েছে। এই থিয়েটার বা নাট্যসংগঠনগুলি হল ১. যাত্রা, ২. রঙ্গমঞ্চলগ্ন পেশাদার থিয়েটার, ৩. অফিস-পাড়ার থিয়েটার এবং ৪. গ্রুপ থিয়েটার।

যাত্রা

১৯৬১ সালের গোড়ায় শোভাবাজার রাজবাড়িতে এক পক্ষ কাল ধরে যে যাত্রা উৎসব হয় তাতেই পশ্চিমবঙ্গের যাত্রায় নব-জাগরণ। তারপরেই ১৯৬২-তে বিডন স্কোয়ার বা রবীন্দ্রকাননে রাসবিহারী সরকারের উদ্যোগে ৩০ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরেকটি যাত্রা উৎসব হয়। এই সময়ে যাত্রার নানাভাবে জন্মান্তর ঘটে।[৩] দেশবিভাগ ও জমিদারি বিলোপে পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষকের সমর্থন হারানোর পর যে-যাত্রা দুর্দশায় পড়েছিল, তা হঠাৎ জনরুচির পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করতে আরম্ভ করে। জনতার যে-পৃষ্ঠপোষকতা হিন্দি সিনেমাকে (অপ) সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছে, তা-ই যাত্রাকেও ক্রমে দুর্ধর্ষ করে তোলে, এবং বাণিজ্যিক সাফল্যে যাত্রা আর সব-রকম থিয়েটার, এমন-কী বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকেও অতিক্রম করে যায়। ষাটের দশকের প্রথম দিকে মূলত নস্টালজিয়া বা ঐতিহ্যের মোহে কিছু বুদ্ধিজীবীকেও যাত্রা অন্তত দর্শক হতে আকর্ষণ করেছিল, এখনও হয়তো করে—কিন্তু কালক্রমে যাত্রা দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বুদ্ধিজীবী দর্শকের নৈতিক সমর্থন হারায়। তাতে যাত্রার কোনো ক্ষতিই হয়নি, তার কারণ বৃহৎ সংবাদপত্রের সঙ্গে যাত্রার একটি ভাই-ভাই সম্পর্ক কালক্রমে স্থাপিত হয়েছিল এবং 'তুমি আমার স্বার্থ দেখো, আমি তোমার স্বার্থ দেখব'—এই সনাতন নীতি অনুযায়ী যাত্রার দলগুলি বছরে বেশ কয়েকবার (পয়লা বৈশাখের হালখাতা বা অক্ষয়তৃতীয়ায়, রথযাত্রার দিন, পুজোর সপ্তমীর দিন ইত্যাদি) দু-তিন পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকাগুলিকে সহায়তা করে, এবং পত্রিকাগুলিও প্রতিটি যাত্রা পালাকেই 'একটি যুগান্তকারী শিল্প-সাফল্য' বলে সমালোচনা করে অর্থাৎ সার্টিফিকেট দেয়। এই সুবিধাবাদী বিবাহবন্ধনের ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট।

সংবাদপত্রের সঙ্গে এই গাঁটছড়া বাঁধবার আগে যাত্রার জগৎ ছিল মূলত ভিন্ন—তা পেশাদার থিয়েটার বা গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিযোগী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরের খবর আলাদা। সবচেয়ে সচ্ছল, সবচেয়ে সুসংগঠিত ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হয়ে ওঠায় যাত্রা ক্রমে পেশাদার এমন-কী গ্রুপ থিয়েটার থেকে শিল্পী ও কলাকুশলীকে টানতে আরম্ভ করে, এবং নাট্যশিল্পে এক ধরনের 'ব্রেন ড্রেন' শুরু হয়। সত্তরের বছরগুলিতে যাত্রার এই দখলি এলাকার সম্প্রসারণ আমরা সম্পূর্ণ হতে দেখি। গ্রুপ থিয়েটার ও যাত্রার প্রায় খাদ্য-খাদক সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। 'ব্রেন ড্রেন' কথাটি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না এই জন্য যে-সব

'ব্রেন' গ্রুপ থিয়েটার থেকে যাত্রায় গিয়েছেন তাঁরা সাধারণভাবে যাত্রার বাণিজ্যিক শর্ত মেনে, রুচিগত প্রভুত্ব স্বীকার করে, আমোদ ও শিল্পের বিষয়ে যাত্রার অনুশাসন মেনেই সেখানে গেছেন। নিজেদের বুদ্ধি, রুচি বা প্রতিভা দিয়ে যাত্রার দেহে বা আত্মায় কোনো বড় পরিবর্তন আনতে পারেননি। এই ঘটনার ফলেই সত্তরের বছরগুলিতে গ্রুপ থিয়েটারের যে বাস্তব অবস্থা, যাত্রা তার একটি প্রবল পটভূমিকা হিসাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তাকে আর দূরে রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আশির আওতায় যাত্রার সেই ভীতিপ্রদ উপস্থিতি একটু কমেছে বলে মনে হয়। পরে "যাত্রা : প্রিয় পরম্পরা" প্রবন্ধে আমরা যাত্রা বিষয়ে আলোচনা করেছি।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চ

রঙ্গমঞ্চের পেশাদার থিয়েটার ছিল এক সময়ে গ্রুপ থিয়েটারের সাক্ষাৎ প্রতিপক্ষ—তার তলোয়ার-ঘোরানোর একটা বড়ো লক্ষ্য। পেশাদার থিয়েটার কী কী করে তার তালিকা ধরে নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার ঠিক করত সে কী কী করবে না। বাঁধা মঞ্চের নাটক সে বর্জন করবে, বাঁধা মঞ্চের অভিনয়রীতি সে ত্যাগ করবে, বাঁধা মঞ্চের প্রকরণ থেকে সে ভিন্ন পথ খুঁজে নেবে। বস্তুতপক্ষে গ্রুপ থিয়েটারের যা-কিছু মহত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা—তা কিন্তু এসেছে এইসব সংকল্প থেকেই। পেশাদার মঞ্চ জনরুচিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না, শস্তা জনরুচির হাওয়ায় আন্দোলিত হয়। মূলত তার লক্ষ্য লাভ তুলে নেওয়া, কেন-না সব মঞ্চই ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে। কাজেই ওটা একটা ব্যাবসা। কেউ তেজারতি বা কণ্ট্রাক্টরি বা কালোয়ারি ব্যাবসায় টাকা রোজগার করে পেশাদার থিয়েটারে টাকা ঢালে—এটা তার ব্যাবসারই সম্প্রসারণ—নতুন বিনিয়োগ মাত্র। উপরির মধ্যে এই যে, এখানে খানিকটা 'মাংসের কারবার' করে নেওয়া যায়। কাজেই শিল্প পেশাদার মঞ্চের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য জনপ্রিয়তার হাওয়া থেকে লাভের ফসল তুলে নেওয়া। পেশাদার থিয়েটার সেজন্য ধর্ম বা পারিবারিক হৃদয়াবেগ নিয়ে ফলাও বাণিজ্য করবার চেষ্টা করে, মঞ্চে নানা বিভ্রম (অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বারুণী পুষ্করিণী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন-এ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের রোমহর্ষক দৃশ্য, 'সেতু'তে চলন্ত ট্রেন) তৈরি করে 'ভোলে-ভালে' দর্শককে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার সাধনায় তৎপর হয়ে ওঠে। নাটকের সঙ্গে তার কতখানি যোগ, কিংবা ক্ষীণ যোগ থাকলেও তার গুরুত্ব অস্বাভাবিক

পরিমাণে বেড়ে উঠে নাটকের বাকি অংশকে ক্ষুণ্ণ আহত করছে কিনা, এবং দর্শক শেষ পর্যন্ত ওই চমকের স্মৃতিটুকু নিয়েই ফিরছে কিনা— পেশাদার মঞ্চ নিজেকে এ সব প্রশ্ন কখনোই করে না। বস্তুত কঠোর আত্মজিজ্ঞাসা পেশাদার মঞ্চের ধাতে নেই। বুদ্ধিবিবেচনার পথও সে মাড়ায় না, যে-সব সমস্যা সে ধরে তার অতিসরল এবং রক্ষণশীল সমাধান দেয় সে। যেমন বহু ভ্রাতার পরিবারে বউয়ে বউয়ে বিরোধের সংগত বাস্তব জটিলতাকে বিলুপ্তপ্রায় একান্নবর্তিত্বের ধোঁয়াটে আদর্শ দিয়ে ধামাচাপা দেয়, চাকুরে স্ত্রীর স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সমস্যাকে শেষ পর্যন্ত স্বামীর পায়ে মাথা নোওয়ানোর মধ্যে সমাহিত ক'রে পুরুষ-শাসিত সমাজের একচক্ষুতার কীর্তনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বিচার, সংশয়, নাস্তিকতা এবং ভক্তির দ্বন্দ্বে পেশাদার মঞ্চের ভোট পড়ে সবসময় ভক্তির বাক্সে। শ্রমিকের অসন্তোষ বা শ্রমিক-মালিক বিরোধ হাওয়ার খাতিরে যদি এ মঞ্চ দেখাতে কখনো বাধ্য হয় তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে ওঠে মূলত গান্ধিবাদী; অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে মালিকের হৃদয়ের অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটে গিয়ে সব বিরোধের অবসান ঘটে। শহর ও গ্রামের বিরোধে গ্রাম জিতে যায়, একাল ও সেকালের লড়াইয়ে জয়ী হয় সেকাল। যাকে বলে সমস্যার শিঙ ধরে নাড়া দেওয়া—তা পেশাদার মঞ্চ কখনোই করে না। এ মঞ্চ আবার কোনো এক্সপেরিমেণ্টও করে না। অমুক 'স্কোপ' তমুক 'স্কোপ' ইত্যাদি নাম দিয়ে 'পৃথিবীতে প্রথম' বলে বিজ্ঞাপন দিলেও কার্যত দেখা যায় সেগুলি বহু পুরোনো থিয়েটারি প্যাঁচের নকল বা জগাখিচুড়ি। বক্তব্যে আর অভিনয়রীতিতেও এক্সপেরিমেণ্ট এরা সযত্নে পরিহার করে। সাহস দেখায় শুধু একজায়গায়—আরিস্তোতল যাকে 'অপসিস' ('স্পেকটাকল') বলেছেন, সেখানে। আলোর দৃশ্যের বাহাদুরি—শিশু-মনা দর্শকের মন ভোলাবার তাক লাগাবার নানা আজব খেলনা। রুচিও এদের কহতব্য নয়। রুচিকে যদি সৌন্দর্যের (ইস্থেটিক) আর নৈতিক (ময়্যাল) এই দুভাগে ভাগ করি—দুটোতেই পেশাদার মঞ্চের দৈন্য প্রকট হয়ে ওঠে। সৌন্দর্যের রুচির দারিদ্র্য এদের পোস্টার ব্যানার মঞ্চসজ্জা সবকিছুতেই ধরা পড়ে, আর নৈতিক রুচির দারিদ্র্য বার হয়ে পড়ছে ইদানীংকার ক্যাবারেতে কিংবা 'বারবধূ'-মার্কা সুড়সুড়ি-প্রবণ নাট্যপ্রয়াসে। প্রথম দিকে শুধু ক্যাবারের আকর্ষণে লোকে যেতে আরম্ভ করলেও পরে ক্যাবারে দেখে দর্শক ক্লান্ত বিরক্ত হয়েছে। বস্তুত-পক্ষে, বিলিতি নকল হোক আর যাই হোক, বাংলার যে-পেশাদার নাট্য-ঐতিহ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু হয়েছিল তার ট্র্যাজেডি এই যে, তা

শুরু হয়েছিল 'জাতীয় নাট্যশালা' বা ন্যাশনাল থিয়েটার হিসেবে, আর শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল নিছক পেশাদার বা ব্যাবসায়িক থিয়েটার। 'জাতীয়' নাট্যশালা থেকে নেহাৎ রঙ্গশালায় বাংলা পেশাদার থিয়েটারের এই রূপান্তর তার আদর্শচ্যুতি ও দিগ্ভ্রষ্টতার পরিচায়ক। কিন্তু এই নিন্দাও খানিকটা অত্যুক্তি, কারণ ওই 'জাতীয়তার' অভিমান একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র, ঊনবিংশ শতাব্দীতেই পেশাদার মঞ্চে ব্যাবসায়িকতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। খুব সম্প্রতিকালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনাগুলিতে ('নামজীবন', 'রাজকুমার' ও 'ফেরা') অল্পবিস্তর নূতনত্ব থাকলেও সেগুলি চমকপ্রদ ব্যতিক্রম হয়ে উঠতে পারেনি।

এই পটভূমিকায় গ্রুপ থিয়েটার সংগতভাবেই পেশাদার থিয়েটারের থেকে নিজেকে পৃথক মনে করেছে এবং কর্মে ও ভাবনায় সেই পার্থক্য প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। বস্তুতপক্ষে ওই দু ধরনের থিয়েটারের সংগঠন ও চারিত্রিক-অর্থনীতিক পটভূমিই ছিল আলাদা। গ্রুপ থিয়েটার মূলত ছিল পার্ট-টাইম থিয়েটার, এখনও অধিকাংশত তাই। অর্থাৎ এর মধ্যবিত্ত কর্মীরা দিনের বেলায় নানারকম জীবিকায় নিযুক্ত—অধ্যাপক, শিক্ষক, ইন্শিওরেন্স কর্মী, শ্রমিক, ডাক বিভাগের পিওন, সাধারণ কেরানি—কিন্তু সন্ধেবেলায় শিল্পের সমবেত প্রয়াসে একত্র হন। সবচেয়ে নামী থিয়েটার গ্রুপগুলি আই. পি. টি. এ.-র সন্ততি, অর্থাৎ আই. পি. টি. এ.-র নানা খসে আসা জ্যোতিষ্ক মিলে এই সব দল তৈরি করেছে। বহুরূপী তাই, রূপকার, নান্দীকার (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়), গন্ধর্ব (শ্যামল ঘোষ), ক্যালকাটা থিয়েটার (বিজন ভট্টাচার্য) অচলায়তন (সুধী প্রধান), থিয়েটার ইউনিট (শেখর চট্টোপাধ্যায়), রূপান্তরী (জোছন দস্তিদার)—সবই এইরকম নাটকের দল। ফলে এদের প্রযোজনায় ব্যাবসায়িকতার প্রতি অনাস্থা যেমন ছিল, তেমনি ছিল একটি আদর্শবোধ। এই আদর্শবোধের যে দুটি স্তর ছিল—একটি রাজনৈতিক আদর্শবোধ ও একটি শিল্পকেন্দ্রিক আদর্শবোধ—সে কথায় আমরা পরে আসছি। কিন্তু প্রযোজনায় ও বক্তব্যে বহুরূপীর নাটকগুলি নাট্যের এমন উঁচু আদর্শ, সর্বাঙ্গীণ কুশলতার এমন মডেল তৈরি করে দিয়েছিল যে, অনেক দলই এক ধরনের জেদ ও লড়িয়ে মনোভাব নিয়ে কাজে নেমেছিল। নান্দীকার-এর এক-সময়কার 'মটো' যেমন ছিল—'ভালো নাটক করব এবং ভালো নাটক ভালো করে করব।' এদের সম্মিলিত চেষ্টায় যা গড়ে উঠেছিল তা আরেকটি সমান্তরাল

নাট্য-ব্যবসায় নয়, 'নাট্য-অন্দোলন'। অর্থাৎ অনেক লোক নেহাৎ বৈষয়িক উদ্দেশ্যের কোনো প্রয়াসে মিলিত না হয়ে বৃহত্তর, উচ্চতর কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে—তাই এ আন্দোলন। এই লেখক ১৯৬৯ সালে অধুনালুপ্ত একটি পত্রিকায়[৪] "নাট্য-আন্দোলনের সংজ্ঞা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল, তাতে সে নাট্য-আন্দোলনের লক্ষণগুলি মোটামুটি এইভাবে নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিল: ১. অর্থোপার্জন তার প্রধান লক্ষ্য নয়, লোভ বা লাভ নয় তার মূল প্রেরণা। শিল্পসিদ্ধি এবং তারই সঙ্গে সামাজিক উপকার তার লক্ষ্য। শৃঙ্খলা, কঠোর সাধনা, স্থলভে বাজি মেরে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, নিজেদের সম্বন্ধে নির্মমতা রক্ষা করা ও মোহ পোষণ না-করা, প্রযোজনা ও অভিনয়ের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্যক ও সদ্যতম সচেতনতা; ২. নাট্য-আন্দোলন কথাটার মধ্যেই সচলতার ইঙ্গিত রয়েছে। আন্দোলন যেমন যৌথ, তেমনই ভবিষ্যমুখী। এবং তা দুঃসাহসী, পরীক্ষা-প্রবণ। এই দুঃসাহস বেরিয়ে আসে তার বক্তব্যে। বক্তব্য মূলত এস্টাব্লিশমেণ্ট-বিরোধী, বিপ্লবী এবং সমাজের ও জীবনের দীর্ঘকালের চাপা-দেওয়া প্রশ্নগুলিকে খুঁচিয়ে-তোলা। তার পরীক্ষাপ্রবণতা প্রকট হয় নাট্যরূপে—নাটকের গঠনে, মঞ্চসজ্জায়, বিজ্ঞাপনে, হ্যাণ্ডবিল্-এ, বুকলেট্-এ, টিকিটের চেহারায়, দর্শকের সঙ্গে অভিনয়ের বাইরেও যোগ তৈরি করার চেষ্টায়, সেমিনারের আয়োজনে, কোনো ট্যাক্স বা পীড়নমূলক বিধির বিরুদ্ধে সমবেত আন্দোলনে, নাটকের অন্যান্য সহায়ক শিল্পের কর্মীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সন্ধানে, দেশের বৃহত্তর সমস্যাগুলি বিষয়ে সচেতনতায় ও কর্তব্য নির্ধারণে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একটু অন্যভাবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের এই চারটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, তা যোগ করা সংগত বলে মনে করি: "১. বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ; ২. কলকাতার বাইরে নাট্যসংস্কৃতির বিস্তার; ৩. স্বতন্ত্র নাট্যভাষা বা স্টাইলের বিবর্তন; ৪. শুধু নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ সাধন নয়, সামগ্রিকভাবে নাট্যসংস্কৃতির চর্চা।"[৫]

তখন পেশাদার থিয়েটার গ্রুপ থিয়েটারের যে-অর্থে bete noire ছিল, এখন সম্ভবত আর সে-অর্থে ততটা নেই। বহুরূপী প্রথমে মিনার্ভা মঞ্চে পেশাদার শর্তে কিছুকাল দর্শক আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফলতা পায়নি। তারপর ১৯৫৯-র জুন থেকে মিনার্ভা মঞ্চটি ভাড়া নিয়ে উৎপল দত্ত পরিচালিত লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ পেশাদারভাবে নাটক প্রযোজনা করতে শুরু

করে। একথা মানতেই হবে যে, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ এই কাজের ফলে অন্য পাঁচটা পেশাদার মঞ্চের এক সমতলে গিয়ে দাঁড়ায়নি। লিট্‌ল থিয়েটার মিনার্ভায় যে-সব নাটক করেছে তাতে আঙ্গিকের বা মঞ্চ-মায়ার বাহুল্য সত্ত্বেও (একমাত্র 'ভি. আই. পি.' ছাড়া) সবই বক্তব্য-সচেতন দায়-সচেতন নাটক। শেষ দিকের দু-একটি নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে পেশাদার মঞ্চের লাভসর্বস্ব প্রয়াসের সঙ্গে লিট্‌ল থিয়েটারের চেষ্টাকে এক বলে রায় দেওয়া যায় না। অর্থাৎ একটা মাঝামাঝি আপোসরফা করবার চেষ্টা প্রথম থেকেই চলেছে। এই চেষ্টার কথা পরে আমরা আরো বলছি।

অফিস-পাড়ার থিয়েটার

অনেক আগে থেকেই ডালহৌসি-পাড়ার অফিসগুলোতে খুব উৎসাহের সঙ্গে নাটকের আয়োজন হত, এবং বছরে অন্তত একবার কোনো একটা ভালো হল্ ভাড়া করে অন্যান্য দু-পাঁচটা গানবাজনার সঙ্গে সঙ্গে একটা নাটক নামানো হত। কুলোকে বলত যে, কর্তৃপক্ষরা কর্মীদের ইউনিয়ন করা বন্ধ করবার জন্য নাটকের ঢালাও সুযোগ করে দিয়েছে, ফলে এখন বই-বাছাই, অভিনেতা-নির্বাচন, অভিনেত্রীর সঙ্গে চুক্তি, রিহার্সাল ইত্যাদিতে সকলে ব্যস্ত থাকায় আর দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর সময় পায় না। কথাটা যদি সত্য হত তাহলে অফিস-পাড়ার আন্দোলন এত দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সৌভাগ্যক্রমে তা হয়নি, নাটক ও আন্দোলন পাশাপাশি চলছে। আর 'চেতনা'র মতো একটি সমৃদ্ধ ও সচেতন নাটকের দল অফিস-পাড়ার পরিবেশ থেকেই তৈরি হয়ে সত্তরের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের জগতে হেডলাইনের সংবাদ তৈরি করেছে। যাই হোক, অফিস-ক্লাবগুলির নাটকে টাকা পয়সার ব্যাপারটা অনেক নিশ্চিন্ত—'রেভিনিউ'-র উৎস অফিসেরই ফাণ্ড, ফলে বাইরের গ্রুপের মতো অনিশ্চয়তা ও দ্বিধায় তাদের ভুগতে হয় না। এমন একটা সময় ছিল (জানি না এখনও আছে কি না) যে, স্টার থিয়েটার কেবল অফিস ক্লাবকেই তাদের মঞ্চ রবিবার সকালে বা অন্য অবসরের দিনগুলোয় ভাড়া দিত, বাইরের শৌখিন দলগুলোকে দিত না। কারণ সেখানে ভাড়া আদায়ের সুনিশ্চিত গ্যারান্টি, এমন-কী অনেকে পুরো ভাড়াটাই অগ্রিম জমা দিয়ে দিতে পারে, বাইরের দলগুলোর ক্ষেত্রে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ ছিল।

আর্থিক সচ্ছলতা থাকায় অফিস-পাড়ার থিয়েটার একটা দিকে দুভাবে গ্রুপ-

থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রায়ই গ্রুপ থিয়েটার থেকে ডিরেকটর ভাড়া করে নিয়ে গেছে, 'ফুরনে' কাজের চুক্তিতে—অর্থাৎ একটি নাটকের জন্যে একটা বাঁধা অঙ্ক ধরে দিয়ে। উনিশ-শো ষাটের মাঝামাঝি এ অঙ্ক ছিল তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা। রীতিটা অনেকটা ছিল এইরকম : অফিসের একজন নিজস্ব অর্থাৎ 'রেসিডেন্ট' বা 'হাউজ' ডিরেকটর বেশির ভাগ দিন রিহার্সাল করাবেন। আর গ্রুপ থিয়েটারের ওই নামী ডিরেকটর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নামী অভিনেতাও বটে, প্রথমে এসে মূল পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে যাবার পর কেবল মাঝে-সাঝে এসে রিহার্সালের অবস্থা ও অগ্রগতি লক্ষ করবেন এবং প্রয়োজন মতো উপদেশ-নির্দেশ দেবেন। তাঁর এ কাজের দায় ও দাবি তত ভারী কিছু ছিল না, ফলে তাঁর গ্রুপকে এ জন্যে খুব বড়ো কোনো ক্ষতি স্বীকার বা স্বার্থত্যাগ করতে হত না। অনেক সময় এও ঘটেছে যে, রিহার্সালের মাঝপথে একজন বাইরের ডিরেকটর আনবার দরকার পড়ল—অফিসের ডিরেক-টরের অথরিটি সকলে সমান উৎসাহের সঙ্গে মানতে চাইছেন না—তখন তা-ই করা হয়েছে। মহাযুদ্ধের পরে এবং স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম দিকের বছরগুলোয় পেশাদার মঞ্চ থেকে নামী অভিনেতারা অনেক সময় ওই 'ফি'-র বিনিময়ে অফিস ক্লাবের নাটক পরিচালনা করতেন বা তাতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ও করতেন। তবে প্রথম সারির লোকজন বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন বলে দ্বিতীয় সারির অভিনেতাদেরই খুব স্থায়ী সমাদর ছিল অফিস ক্লাবে। প্রসিদ্ধ নাট্যকার পরিচালক ও অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্ত এক সময় অফিস ক্লাবে বিশেষ মান্য ছিলেন, পরে শাজাহান চরিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা ঠাকুরদাস মিত্রও অফিস ক্লাব মহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন বলে শুনেছি। তবে ষাটের বছরগুলি থেকে অফিস ক্লাব ক্রমশ গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করবার চেষ্টা করে। যেমন ভোলটাজ (Voltas) স্পোর্টস ক্লাবের ১৯৮৯-র স্যুভেনিরে লক্ষ করি—১৯৬৩ থেকে এরা মোট বাইশটি নাটক অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে শুধু 'সাজাহান', 'সিরাজদ্দৌলা', 'পথের দাবী', 'মীরকাশিম' পেশাদার মঞ্চকে স্মরণ করায়, বাকি সবই গ্রুপ থিয়েটারের নাটক—'সংক্রান্তি' থেকে 'মুদ্রারাক্ষস' পর্যন্ত।[৬] এর একটা কারণ এই যে, যে-সব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ছেলে অফিসের কর্মী হয়েছে তাদেরই কেউ কেউ হয়তো পাড়ায় নিজেদের গ্রুপ করে নাটক করেছে এবং সেখানে সেই কাজের হিসেব করছে অন্য একটা আদর্শের মানদণ্ডে। তারাই তাদের প্রিয় অভিনেতা-পরিচালকদের নিয়ে আসার জন্যে সচেষ্ট হয়।

অন্যদিকে গ্রুপ থিয়েটার থেকে অভিনেত্রীও ধার করা হত অফিস ক্লাবে। এখানে, বলা বাহুল্য, সেই সব অভিনেত্রীর কথা বলা হচ্ছে যাঁরা অভিনয়কে মূলত জীবিকার একটা অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রুপ থিয়েটারে আর্থিক-সামাজিক পটভূমিকার দিক থেকে সাধারণত দুধরনের অভিনেত্রী থাকে। এক, সদস্যদের পরিবারের মেয়েরা,—কারো স্ত্রী, কারো বোন—যারা কখনো শখ করে, প্রায়ই অন্যের নির্বন্ধাতিশয্যে, দলে যোগ দেয়; নইলে দল চলবে না, নাটক করা সম্ভব হবে না। আর, একটু প্রতিষ্ঠিত দলে অনেক সময় সদস্য হয়েই থেকে যায় সেই সব মেয়েরা যারা অভিনয়কে জীবিকা হিসেবে নিয়েছে। হয় তো অফিসে ইস্কুলে কাজ করার প্রাতিষ্ঠানিক ছাপ তাদের নেই, হয়তো পারিবারিক আর্থিক সংকটে সহায়তা করবার জন্যই অভিনয়ের অপেক্ষাকৃত সুগম জীবিকাটিতে তারা এসে পড়েছে—কিন্তু যদি স্বাধীন ভারতে এই শ্রেণীর উদ্ভব না হত তাহলে গ্রুপ থিয়েটার এবং অফিস ক্লাব দুইই অচল হয়ে পড়ত। আধুনিক বাংলার নাট্য-আন্দোলনে এদের ভূমিকা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। মায়া ঘোষ, দীপালি চক্রবর্তী, মমতা চট্টোপাধ্যায়, শেলী পাল প্রভৃতি অভিনেত্রীরা বাংলার নতুন নাটককে যে সমর্থন দিয়েছেন তা ভোলবার নয়।

এদের আবার অফিস ক্লাবে ডাক পড়ত প্রায়ই। সেখানে এক্ষেত্রেও প্রথমে পেশাদার মঞ্চের অপেক্ষাকৃত গৌণ অভিনেত্রীকে, প্রায়ই কোনো বড় অভিনেত্রীর 'আণ্ডারস্টাডিকে', আমন্ত্রণ করা হত। কিন্তু পরে লক্ষ করি, গ্রুপ থিয়েটারের এইসব অভিনেত্রীর ডাক পড়ছে। তার কারণ তারা তখন নতুন ধরনের নাটকে অভিনয় করে, নতুন চরিত্রের চ্যালেঞ্জ নিয়ে নাম করেছে, ক্ষমতাবান্ নতুন পরিচালকদের হাতে তাদের নতুন ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় তৈরি হচ্ছে। এই সব নাটকজীবী অভিনেত্রীরা হয়তো আগে অফিস-ক্লাবে অভিনয় করেই ট্রেনিং পেয়েছে তৈরি হয়েছে, পরে তারা যোগ দিয়েছে কোনো গ্রুপে—নান্দীকারে, চতুর্মুখে (তখনকার চতুর্মুখ), গন্ধর্বে, নক্ষত্রে, থিয়েটার ওয়ার্কশপে বা এই ধরনের আর পাঁচটা দলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরিচয় তৈরি হয়েছে ওই দলেরই পরিচয় থেকে, অন্য ধরনের গ্ল্যামারও এসেছে। যাই হোক, এইসব অভিনেত্রীরা দলের নাটকেও টাকা নিতে বাধ্য হয়েছে, কারণ অভিনয়ই তাদের সংসার চালানোর অবলম্বন, কিন্তু অফিস ক্লাবের অভিনয় থেকে তারা অনেক বেশি পেয়েছে। দল থেকে অভিনয় পিছু কুড়ি টাকা নিলে অফিস ক্লাব থেকে নিয়েছে হয়তো তার পাঁচগুণ বা দশগুণ। এরাও নিয়মিত রিহার্সাল

করেনি অফিস ক্লাবের নাটকে, বিশেষ বিশেষ দিনে হাজির হয়ে কাজটা উতরে দিয়েছে।

দুক্ষেত্রেই দেখি, নেতৃত্ব ও নির্দেশের জন্যে অফিস ক্লাব তাকিয়ে থেকেছে বাইরের দিকে—প্রথমে পেশাদার থিয়েটারের দিকে, পরে গ্রুপ থিয়েটারের দিকে। নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ওই একই ঘটনা। অফিস-ক্লাবে এক সময় 'শাজাহান', 'মিশরকুমারী', 'পি ডব্লিউ ডি', 'বিশ বছর আগে' 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ইত্যাদি পেশাদার মঞ্চের এমন সব নাটকের অভিনয় হত যেগুলি সাধারণত 'জমে-যাওয়া'র নাটক ; হয় একজন সমর্থ অভিনেতা পুরো ভার বয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা আবেগ সৃষ্টি করতে পারবেন, না হয় তার নিহিত নাটকীয়তার জন্যে দুর্বল অভিনয় ঢাকা পড়ে যাবে। পরে গ্রুপ থিয়েটারের পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত নাটকের দিকে অফিস ক্লাবও আস্তে আস্তে হাত বাড়াতে শুরু করে। তার একটা বড় কারণ এই যে, বারবার ওই নাটক দেখে হাউজের পরিচালক নিজের উপর একটা আস্থা তৈরি করে ফেলেছেন, তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে ওই প্রযোজনায় ব্যস্ত হতে পারবেন। ফলে পরের দিকে উৎপল দত্তের নাটক, কিরণ মৈত্র, রতনকুমার ঘোষ, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, বা জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক, শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ', পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত', এমন-কী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত চেখভের 'চেরি অর্চার্ডের' রূপান্তর 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' পর্যন্ত অফিস ক্লাবে অভিনীত হতে দেখি। দ্বিতীয় কারণ নবজাগ্রত সচেতনতা।

অর্থাৎ, অফিস ক্লাব আনুপূর্বিক পালন করে এসেছে প্রতিধ্বনির ভূমিকা। এর বড় অভিনেতাদের অভিনয় যেমন পেশাদার বা অপেশাদার নানা বড় অভিনেতার অভিনয়ের ছাঁচে ঢালাই করা, তেমনি এর নাটক নির্বাচন, প্রযোজনা সবই প্রায় other-directed, অন্য উৎস থেকে ধার করা। ফলে বাংলা নাটকের ইতিহাসে অফিস-পাড়ার অভিনয় কখনোই তেমনি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল না।

গ্রুপ থিয়েটার

গ্রুপ থিয়েটার সম্বন্ধে আলাদা করে আলোচনার কিছু নেই। এর সাংগঠনিক এবং তাত্ত্বিক পটভূমিকা সকলেরই জানা। মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠন গ্রুপ থিয়েটার, এবং তা সাধারণভাবে নাগরিক। গ্রামে যাত্রার দল বেশি লক্ষ করা যায়, তবে শহরে এখন যাত্রার দল ও গ্রুপ থিয়েটারের সহাবস্থান

অনেক জায়গায় চোখে পড়ছে, বিশেষত মফস্‌সলে। আর গ্রুপ থিয়েটারের নামকরা দলগুলি বেশির ভাগ কলকাতা-কেন্দ্রিক। গত দশ-বারো বছরেই কেবল কলকাতার বাইরের কিছু দল কলকাতার দলগুলির সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো দু-একটি নাটক করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বালুরঘাটের 'ত্রিতীর্থ' দলটির নাম সর্বাগ্রে মনে আসে এ প্রসঙ্গে ; তবে বহরমপুর, দুর্গাপুর, বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, জামশেদপুর, ঘাটশিলা, নৈহাটি ইত্যাদি অঞ্চলের কিছু কিছু দলও নানা সময়ে উঁচু মানের অভিনয় করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কলকাতার বাইরেও নাটকের নিষ্ঠাবান প্রয়াস চলছে। কলকাতার নেতৃত্ব ও প্রেরণা কেউ অস্বীকার করছে না, কিন্তু কলকাতাসর্বস্বতার ভিত খানিকটা ভাঙছে ভালো নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে—সেটা খুবই সুলক্ষণ বলতে হবে।

পশ্চিমবাংলার গ্রুপ থিয়েটারের সংগঠন প্রায় সর্বত্রই এক : কিছু মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়ে মূলত একজনের নেতৃত্বে একত্র হয়ে দল তৈরি করে। মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদস্যদের স্ত্রী, বোন বা বান্ধবী ; আবার কখনো কখনো ওই অভিনয়জীবী মেয়েদেরও নাটকবিশেষে টাকা কবুল করে ডেকে আনা হয়। তারা নাটক করে দিয়ে চলে যায়। নেতৃত্ব যিনি দেন তিনি সাধারণভাবে দলের সবচেয়ে সমর্থ এবং অভিজ্ঞ অভিনেতা। কাজেই প্রায় সব দলই খানিকটা এক-নায়কতন্ত্র মেনে চলে। এর সুবিধে অসুবিধে দুটো দিকই আছে—তার আলোচনা আমরা দল-ভাঙাভাঙির প্রসঙ্গে করব। একাধিকের নেতৃত্ব লক্ষ করা যায়, অর্থাৎ এক ধরনের 'অলিগার্কি' চলে এমন দলের সংখ্যা খুবই কম—তার উদাহরণ হিসেবে অন্তত প্রথম পর্যায়ে থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাম করা চলত। তা যে বেশিদিন চলতে পারে না তার প্রমাণ ওই দলেরও পরবর্তী ভাঙন—বিভাস চক্রবর্তীর আলাদা হয়ে 'অন্য থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা।

এই দলগুলোর মধ্যে প্রধান তফাত নিশ্চয়ই যোগ্যতা, ক্ষমতা, আর্থিক সংহতি সামর্থ্যের ; কিন্তু মূলত বোধ হয় সচেতনতা ও আন্তরিকতার। কোনো দল বছরে দু চারবার অভিনয় করেই তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে, আবার কোনো দল বছরে তিনশো-বার অভিনয় করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এই প্রায় নিয়মিত নাটক করার আকাঙ্ক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রে খুব দীর্ঘদিনের নয়। শখের অভিনয় থেকে এই প্রায়-পেশাদার বহু-অভিনয়ের সম্ভাবনার সঙ্গে নিজেদের প্রয়াসকে যুক্ত করে দেখার চেষ্টাও শুরু হয়েছে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে। বহু-অভিনয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয় যে-ধরনের প্রস্তুতি থেকে

সে-ধরনের মানসিক ও শারীরিক চ্যালেঞ্জ যে-কটি দল নিতে পেরেছিল তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে এবং গৌরব ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তারা বুঝেছে, কেবলমাত্র 'পুশ-সেল'-এ টিকিট বেচে কালে-ভদ্রে নাটক-করতে নিজেদের, জাতির বা থিয়েটারের—কারোই ভালো হয় না, শক্তি ও চেষ্টার অপচয় হয় মাত্র। নাটক সম্বন্ধে এই ক্রমবর্ধমান সিরিয়াস মনোভঙ্গির জন্যে বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ এবং নান্দীকার—এই তিনটি দলের কৃতিত্ব সর্বাধিক।

গ্রুপ থিয়েটারে নাট্য-সংক্রান্ত কাজকর্ম প্রায় সকলেরই 'পার্ট-টাইম' কাজ—এও সকলেরই জানা। বিদেশে, বিশেষত শিল্পোন্নত ও সচ্ছল দেশগুলোয় নাটকের লোকেরা সর্বক্ষণের কর্মী—স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শৌখিন নাট্যচেষ্টা বাদ দিলে। এখানে বেশির-ভাগ দলে নাট্যকর্মীদের অভিনয়-পিছু কোনোরকম টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। তবে নান্দীকার একসময় প্রতিটি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের হাতে 'গাড়ি ভাড়া বাবদ' কিছু গুঁজে দিত—সাড়ে চার টাকা থেকে কুড়িটাকা পর্যন্ত—প্রত্যেকের কাজের গুরুত্ব অনুসারে। এটা তখনও অন্য দলে ছিল বলে শুনিনি। উৎপল দত্তের দল তার আগেই মিনার্ভায় স্টেজ লিজ নিয়ে অভিনয় শুরু করে দিয়েছেন, কাজেই তাঁদের আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একটু অন্যরকম ছিল। নিজেরা স্টেজ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করলে গ্রুপ থিয়েটারের হাতে প্রায় কিছুই থাকে না, অধিকাংশত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। হলের ভাড়া বেড়েছে, বহুল-প্রচারিত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের খরচাও সাঙ্ঘাতিক বেড়ে গেছে, ফলে হল ভাড়া নিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, টিকিট ছাপিয়ে, মেক-আপম্যান (অনেক দলে অবশ্য নিজস্ব মেক-আপম্যান বা লাইট-ম্যান তৈরি করে নেওয়া হয়েছে,), লাইটম্যান, ড্রেসার, প্রপার্টিম্যান ইত্যাদির মজুরি দিয়ে, কেবল 'হাউজ ফুল' হলেই হয়তো টাকাটা টায়েটোয়ে উঠে আসে। তাহলে নতুন প্রডাকশনের খরচা আসবে কোত্থেকে, যদি কলকাতায় নিজেদের আয়োজনে শো করে টাকা উদ্বৃত্ত না থাকে? সে খরচার টাকা আসে 'কল্ শো' থেকে—যেখানে আয়োজক বা উদ্যোক্তারা অন্য—নাটকের লোকেদের ভাষায় 'পার্টি'। সেই 'কল্ শো' থেকে যে আয় হয় তাই নতুন নাটকের প্রস্তুতিতে ঢালা হয়। তবে ধারধোরও বেশ ভালোই হয় দলগুলোর।

নিজে নাটকের দলে থাকার সময় যা লক্ষ করেছি তা এই যে, একদল লোক যতটা ভালোবেসে, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে নাটক জিনিসটাকে গ্রহণ করেছে, দেশের বেশির ভাগ লোকেরই সে নিষ্ঠা বা শৃঙ্খলা বা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোনো

ধারণা নেই। 'কল্ শো'তে গিয়ে যখন দেখা গেছে স্টেজের পিছনে খোলা আকাশের নিচে গ্রিনরুম, এবং গ্রিনরুমে ফুলশয্যায় পাওয়া কাঠের ছোট আয়না মেক-আপের জন্যে দেওয়া হয়েছে, সেখানে দলের অভ্যন্তরীণ ডিসিপ্লিন ও আন্তরিকতার সঙ্গে বাইরের উপভোগ-বিলাসী লঘুচিত্ততার বিরোধটা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। ফলে এখন গ্রুপ থিয়েটারগুলোর কনট্রাক্ট-ফর্মে অনেক-রকমের শর্ত দেওয়া থাকে—গ্রিনরুমের মাপ পর্যন্ত। তাতে এক ধরনের সিরিয়াস মানসিকতা গড়ে উঠছে বলে মনে হয়—সেটা একটা বড় লাভ।

গ্রুপ থিয়েটারে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সংকীর্ণ এবং অনিশ্চত থাকায় একটা ক্ষতি এই হয়েছে যে, এখানে বেশ একটা অংশ অস্থায়ী কর্মী। বেকার অবস্থায় নাটক করছে, চাকরি-বাকরি পেলে বসে যাচ্ছে; মেয়েরা, কখনো ছেলেরাও বিয়ে হয়ে গেলে নাটক করা ছাড়ছে—এমন দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি। তারই মধ্য দিয়ে কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটার মনে রাখবার মতো অনেক প্রযোজনা করেছেন—এ কৃতিত্ব সামান্য নয়। গরিব দেশে সম্বলহীন উপকরণহীন পরিবেশে এটুকুও যে করা গেছে তা যথেষ্ট কৃতিত্বের কথা। 'নবান্ন' থেকে 'রক্তকরবী' হয়ে 'অমিতাক্ষর' বা আজকের 'মাধব মালঞ্চা কইন্যা' পর্যন্ত সেই গৌরবের ইতিহাস।

এবার বিতর্কের মধ্যে ঢুকে পড়া যাক।

প্রথম বিতর্ক : রাজনীতি বনাম শিল্প

এই বিতর্কেরই অন্য নাম দাঁড়িয়েছে 'গণনাট্য' বনাম 'সৎনাট্য'। বলা বাহুল্য এ তর্কের বয়েস বঙ্গপ্রদেশের নাট্য-আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে অনুযোগ অভিযোগ শুরু হলেও তর্কটা জমে ওঠে ছয়ের দশকের গোড়ার দিকেই বেশি করে, যখন বহুরূপী সম্প্রদায় সৎ নাট্য কথাটা চালু রাখেন, নান্দীকার পিরানদেল্লোর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', রূপকার 'ব্যাপিকা বিদায়' ইত্যাদি অরাজনৈতিক নাটক করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। নান্দীকারের শ্লোগান দাঁড়ায় 'ভালো নাটক'। ফলে 'নবান্ন'-এর অভিনয় থেকে গণনাট্যের একটি ধারা প্রায় অব্যাহতভাবে চলে এলেও, ১৯৪৮-এর পর বহুরূপী 'সৎ নাট্যে'র শ্লোগান দেন, এবং ষাটের দশকে এসে তা 'গণনাট্য' ও 'নবনাট্য'—এ দুটি পরস্পর-বিবদমান ধারায়

বিভক্ত হয়ে যায়। চেহারাটা ছকে ফেললে এইরকম দাঁড়ায়

১৯৪৪ →১৯৪৮ →১৯৬০

গণনাট্য→সৎনাট্য→নবনাট্য

সৎনাট্য-এর পক্ষে কেউ স্বেচ্ছায় এবং স্বনির্বাচিতভাবে এসে পড়েন, যেমন বহুরূপী সম্প্রদায়। আবার কোনো দলকে তাদের ইচ্ছার বা দ্বিধার বিরুদ্ধে ওই দিকে ঠেলে দেওয়া হয়—যেমন নান্দীকার। পরে অবশ্য নান্দীকারও বলতে থাকেন, "ভালো নাটক করব, ভালো নাটক ভালো করে করব।"

যে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (Indian Peoples' Theatre Association সংক্ষেপে I.P.T.A., মুখের কথায় 'ইপ্টা') ১৯৪৪-এ 'নবান্ন' নামিয়ে বাংলার থিয়েটারে নতুন ভাবনা ও রীতির সূত্রপাত করে, তা যে তখনকার ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একটি জনসংগঠন, এ খবর নিশ্চয়ই অনেকের কাছে নতুন নয়। সুতরাং 'নবান্ন' থেকে যে নতুন ধরনের নাট্যপ্রয়োগরীতি ও নাট্যভাবনার সূত্রপাত, তা প্রথমে 'নবনাট্য' নাম পেলেও স্বরূপত ছিল গণনাট্য। সহজ কথায়, সে প্রযোজনা ছিল গণমুখী। দেশের মানুষকে তৎকালীন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, বড় বড় সংকট (যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে) যারা সবচেয়ে বেশি পীড়িত হয় সেই সর্বহারা শ্রেণীকে তার শত্রুপক্ষগুলিকে চিনিয়ে দেওয়া, সেই সঙ্গে প্রতিরোধ ও সংগ্রামে আহ্বান করা ও প্রবর্তনা দেওয়া—গণনাট্যের এই হল মোদ্দা কাজ। বস্তুত এই কাজের বেশির ভাগটা করে নাটকটি নিজে—তার গল্প, চরিত্র ও সংলাপ নিয়ে; প্রযোজনার অংশটি অতিরিক্ত, তার কাজ নাটককেই স্পষ্ট ও প্রখর করে তোলা। শ্রীমিত্রের নির্দেশনায় 'নবান্ন' সেই অমোঘ অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল, চটে তৈরি সেট দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের রিক্ত ছবির সঙ্গে সার্থকভাবে মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছিল ফর্ম ও কন্‌-টেনটের একটি অত্যাশ্চর্য সম্মিলন। কিন্তু ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হল, এবং ১৯৪৮-এই বহুরূপী সম্প্রদায়ের জন্ম হল গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে আলাদা হয়ে। এ দুটি ঘটনার মধ্যে যোগ আছে কিনা তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে শ্রীশম্ভু মিত্র সম্বন্ধে একথা তাঁর প্রতিপক্ষীয়দেরও বলতে শুনেছি যে তিনি মূলত রাজনীতির লোক ছিলেন না, ছিলেন নাটকের লোক।[৭] যতদূর জানি, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও তিনি হননি কোনো সময়ে। ফলে গণনাট্য থেকে সৎনাট্যে চলে আসা সে অর্থে তাঁর পক্ষে আদর্শচ্যুতি নয়, এবং সেজন্যে তাঁকে গালমন্দ করারও কোনো যুক্তি নেই।

তবে এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখি যে, বামপন্থী রাজনীতির দ্বারা শ্রীমিত্র গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং যে-নাটকই তিনি বহুরূপীর প্রথম পর্যায়ে করছেন সে-নাটকেই বক্তব্য মূলত গণমুখী বা জীবনমুখী। তা অত্যাচার ও পীড়নের ছবি তুলে ধরে, এবং প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করে। 'ছেঁড়া তার', 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'বিভাব' ইত্যাদি নাট্য-নাটিকায় এর ব্যত্যয় দেখি না। এমন-কী 'রক্তকরবী' নাটকের শেষে শ্রমিকদের হাতে লাল নিশান তুলে দেওয়ার জন্য তিনি একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের নাট্য-সমালোচকের ভর্ৎসনাও লাভ করেন। তার পরে এমন কিছু একটা নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিবেশে ঘটে গিয়েছিল যার ফলে তিনি ক্রমশ ব্যক্তির সমস্যার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন, এবং বহুজনের সমস্যা থেকে ক্রমশ একার সমস্যায় চলে আসেন। আমার এই ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে, কিন্তু বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনার তালিকা এই ব্যাখ্যাটিকে আকর্ষক ও লোভনীয় করে তোলে। আমার ধারণা 'দশচক্র' (প্রথম প্রযোজনা ১৯৫৪) থেকেই এই প্রবণতার আরম্ভ। এই সব নাটকে অবশ্য মার্ক্সীয় অর্থে জনগণ যাকে বলা হয় তার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য নেই, কিন্তু প্রায়ই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি দল বা গোষ্ঠীর সক্রিয় চক্রান্ত দেখানো হয়, এবং ব্যক্তিকে বহুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে স্থাপন করে, বহুর কুটিলতা, নির্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি প্রতিপাদন করা হয়। সাধারণ অর্থে আমরা যাকে ট্রাজেডি বলি, তার একটি ভিত্তি এই ধরনের দ্বন্দ্ব। শ্রীমিত্র রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের নাটক থেকে যেমন এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করবার সুযোগ খুঁজেছেন তেমনি নিজের কিছু কিছু নাটকে মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয় দেখিয়েছেন, 'ঘূর্ণি'-তে যেমন—এবং শেষ পর্যন্ত 'চাঁদ-বণিকের পালা' নামে শক্তিশালী নাটকটিতে ব্যক্তির পক্ষ নিয়ে জনতার এবং আশ্বাসের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর মধ্যেও একটি অর্ধবৃত্তাকার পরিক্রমা আছে। 'দশচক্র'তে ব্যক্তি লড়াই করেছিল সমাজের এবং মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে; কিন্তু চাঁদ-বণিক মূলত তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার ('সমুদ্রে অভিযান') সম্পূর্ণতার জন্যে সমাজ ও প্রতিবেশের সঙ্গে লড়াই করে, আহত ও বিধ্বস্ত হয় এবং শেষে ফ্যানটাসির মধ্যে নিজের জয়কে সন্ধান করে।[৮]

বহুরূপী যখন সৎনাট্যের কথা বলতে শুরু করেন তখন এই বক্তব্যের দিক ছাড়াও আরেকটা দাবি ছিল—পৃথিবীর নানা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে বাংলায় এনে দিশি সাজে পরিবেশন করা এবং বলা যে, সচেতন দল হিসেবে সমস্ত

পৃথিবীর নাট্য-ঐতিহ্যের এঁরা উত্তরাধিকারী। পরে নান্দীকারও এই কথা নিজের জন্যে তুলে নেয়। বহুরূপীর একটি অসামান্য উপার্জন এই ছিল যে, অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে এই দলটি ছিল সবচেয়ে ডিসিপ্লিন্‌ড দল, নাটককে যথার্থ সাধনার বস্তু হিসেবে এই একটিমাত্র দলই তখন গ্রহণ করেছিল, এবং প্রযোজনাগুলি বাংলায় সব শ্রেণীর নাটকের লোকেদের কাছে মডেল হিসেবে প্রতিভাত হত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পরে লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনাগুলোও প্রয়োগকুশলতার অন্য ধরনের একটি আদর্শ তৈরি করে। বিশেষত মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নেবার পরে 'অঙ্গার', কল্লোল', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'মানুষের অধিকারে', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'তীর' ইত্যাদি নাটকে প্রয়োগ-কল্পনার বিশালতা, বৈচিত্র্য, প্রসেনিয়াম মঞ্চকে বজায় রেখেও তার মধ্যে নানা ব্যাপ্তি আনার চেষ্টা, 'ক্রাউড সিন' বা ভিড়ের দৃশ্যকে ('তিতাস'-এ মেলার দৃশ্যটি যেমন) পশ্চিমি অর্কেস্ট্রার ধরনের কঠোর ও সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে বাঁধা, দৃশ্যপট পরিবর্তনের অসামান্য কারুকর্ম, চার্ট, ম্যাপ, চলচ্চিত্র ইত্যাদির ব্যবহারের নতুনত্ব-যোজনা ইত্যাদি অনেক কিছুই দর্শককে বুঝিয়ে দেয় যে, বিরাট এবং তুচ্ছ সব কিছুই একটি সযত্ন দৃষ্টির অধীনে রাখা হয়েছে এই সব প্রযোজনায়। অবশ্য একথা বলতেই হবে যে, নিজের হাতে একটি স্টেজ থাকাতেই উৎপল দত্ত অনেকরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পেরেছিলেন তাঁর নাটকে, বিশেষত সেট-নির্মাণে ; অন্য দলগুলোর সেই সম্বল ছিল না। পরে নান্দীকারও, মূলত অভিনয়ের জোরে, বাঙালি দর্শকের সামনে সুপ্রযোজিত নাটকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল।

কিন্তু বহুরূপী ও নান্দীকারের প্রযোজনার লক্ষ্য রাজনীতি ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বক্তব্য-প্রধান নাটক থেকে, বিশেষত ভারত বা বাংলাদেশের তখনকার সমসাময়িক ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে, দূরে সরে যায়। ফলে আদিতে গণনাট্যের লোকদের নিয়ে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও (নান্দীকার তৈরির সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি, এবং নান্দীকার গোষ্ঠীর প্রথম নামও বোধ হয় ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ : নান্দীকার শাখা), এই দুটি দল পরে কলাকৈবল্যপন্থী বা শিল্পপন্থী বলে গণনাট্য পন্থীদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়।

গণনাট্য-পন্থীরা যে দল হিসেবে সংহত ছিলেন তা নয়। প্রথমত ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের তখন প্রায় ছত্রভঙ্গ অবস্থা,—কেন্দ্রীয় সংগঠন বলতে কোনো

কিছুরই অস্তিত্ব নেই। অসংখ্য প্রধান বা নেতৃস্থানীয় অভিনেতা-পরিচালকরা স্বাধীন দল করেছেন (শম্ভু মিত্র—'বহুরূপী', বিজন ভট্টাচার্য—'ক্যালকাটা থিয়েটার', সুধী প্রধান 'অচলায়তন', পরেশ ধর—'দশরূপক', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—'নান্দীকার', শেখর চট্টোপাধ্যায়—'থিয়েটার ইউনিট' ইত্যাদি), আর কেউ কেউ গেছেন ফিল্মে (অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ—'ছিন্নমূল' ছবির অবিস্মরণীয় স্রষ্টা)। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতির দল ভেঙে গেছে, বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' নামক যাত্রাটির ক্ষণিক দীপ্তিও তখন নির্বাপিত। আমি ১৯৫৭ সালে রঙমহলে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নানা শাখার একটি সম্মেলন দেখেছিলাম। তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য-প্রধান নাটকের সঙ্গে একটি দল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'ও অভিনয় করেছিল মনে আছে। গণনাট্য সঙ্ঘের বিজ্ঞাপিত আদর্শের সঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা'কে মিলিয়ে নিতে সেদিন অসুবিধে হয়েছিল, এখন তত হয় না। উনিশ-শো ষাটের দশক পর্যন্ত গণনাট্য সঙ্ঘের যে সব শাখা সবচেয়ে সক্রিয় ছিল তার মধ্যে শ্রীচিররঞ্জন দাস পরিচালিত দমদম শাখাটির নাম সর্বাগ্রে করা যায়।

কিন্তু উনিশ-শো ষাটের গোড়ায় ও মাঝামাঝি সময়ে গণনাট্য বনাম নবনাট্যের তর্কে চিররঞ্জনরা পুরোভাগে ছিলেন না। ছিলেন উৎপল দত্তের লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, জোছন দস্তিদারের 'রূপান্তরী', শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'থিয়েটার ইউনিট'। ১৯৬৫-র জুলাইয়ে 'রূপান্তরী'র আহ্বায়ক ভূমিকায়, এবং থিয়েটার ইউনিট, শিল্পীমন, লোকসংস্কৃতি সংঘ, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ এবং ম্যাস থিয়েটারের সহযোগে যে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা গঠিত হয়েছিল তার সংবিধানে তখনকার অন্যতম সমস্যার ছবিটি এইভাবে তোলা হয়েছিল যে, সরকারি চেষ্টা চলছে—"শিল্পী ও শিল্পীসংস্থানের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নানা প্রলোভন, উপঢৌকন ও খেতাব বিতরণ মারফৎ তাদেরকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রসাদপুষ্ট, চাটুকারে পরিণত করার ব্যাপক প্রয়াস। উপরন্তু গণনাট্য আন্দোলনের মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে যে সমস্ত সুবিধাবাদী, আপোষপন্থী নাট্যসংস্থা, নাট্যকার ও নাট্যকর্মী আজ গণনাট্যের পরিবর্তে "নবনাট্য" সৃষ্টি করার উদ্যম চালাচ্ছেন, সেইসব দল ও ব্যক্তির ব্যভিচারের বিরুদ্ধে এই সংস্থা অবিচ্ছিন্ন আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। যেসব ধারার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালাবার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ

দেওয়া হল :

—ঘৃণ্য সমাজবিরোধী পুরাতন নাটককে ক্ল্যাসিক্যাল হিসেবে পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, যথা ব্যাপিকা বিদায়, বাবু প্রভৃতি।

—নাট্য আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে এই মিথ্যা ও অভিসন্ধিমূলক প্রচারের সঙ্গে "সৎ-নাটক" আখ্যায় অসৎ নাটকের চরিত্র গোপন।

—আধুনিক ইওরোপীয় নাটকের নামে ইওনেস্কো, পিরানদেল্লো ও বেকেটের মতন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে লেখকদের জনবিরোধী ধারার আমদানি।

—জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতি-জ্ঞাপনেই নাটককে সীমিত রেখে, সেই দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের প্রশ্ন এড়িয়ে, গিয়ে কার্যতঃ জনগণকে আত্মসমর্পণের দিকে ঠেলে দেয়া।

—প্রতিক্রিয়াশীল, পেশাদার নাট্যশালাগুলিতে সরাসরি সমাজবিরোধী ভাবধারার প্রচার।

—শ্রমিক, কৃষককে নাটকের চরিত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে না দিয়ে বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্তের কাহিনীতে নাটককে আবদ্ধ রাখা।"[৯]

তবে এছাড়াও পার্শ্বিক আক্রমণের বিষয় কিছু ছিল তাঁদের, যেমন—

১. সৎ নাট্যপন্থীরা (বিশেষত বহুরূপী) নিউ-এম্পায়ারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে নাটক করেন, গ্রামে মাঠে ময়দানে জনতার কাছে নাটক করতে যান না। ২. বহুরূপী কেন্দ্রীয় সরকারি সাহায্য নিয়ে নাটক করেন।

এ কথা ঠিক যে, শ্রীশম্ভু মিত্রের সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক প্রথম দিকে সৌজন্যমূলক থাকলেও পরে, পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করে। যতদূর মনে পড়ছে ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের লোকসভা কেন্দ্র বসিরহাটে গিয়ে উদয়শংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু বক্তৃতা দেন এবং শ্রীশম্ভু মিত্র আবৃত্তি করেন। এই ঘটনা তখন কমিউনিস্টদের খুবই উত্তেজিত করেছিল। পরে স্বপন মজুমদার খুব কড়া বিশেষণ-বিক্ষুব্ধ ভাষায় লিখেছেন—"তৎকালীন ভারতীয় পেশাদারি কম্যুনিস্ট সাংবাদিকতার ক্লীব আক্রমণনীতির সব ক্লিন্নতাই ফুটে উঠেছিল তাঁদের রচনায়। এমনকি গোপাল হালদারের মতো প্রবীণও দলীয় হুকুমতের কাছে তাঁর বিচারবুদ্ধি বন্ধক দিয়েছিলেন সেদিন।"[১০] শ্রীমজুমদার এই ঘটনাও জানান এবং তাই অভিযোগ করেন যে উৎপল দত্ত শেখর চট্টোপাধ্যায়রা যে "নেমেছিলেন বামপন্থী প্রার্থীদের প্রচার অভিযানে" তারা তো গালাগাল পাননি, বরং

"পেয়েছিলেন সম্ভ্রম।" তাঁর বোধ হয় এই সরলপ্রাণ বিশ্বাস আছে যে, উৎপল দত্তরাও রাজনীতি প্রচার করছেন, শম্ভু মিত্রও রাজনীতিকের হয়ে তাঁরই কবিতা আবৃত্তি করে প্রচার করছেন—সুতরাং দুটোই সমান শ্রদ্ধেয় বা অশ্রদ্ধেয় হওয়া উচিত। কে কোন্ পক্ষে আছেন সেটা বড় কথা নয়। এই একবিংশ শতাব্দীর প্রাঙ্ মুহূর্তে এমন সাদা প্রাণের বিশ্বাস একটু সংশয় জাগায়। শ্রীমজুমদারই অবশ্য পরে তাঁর গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় দেখান যে, ১৯৫৬ থেকে বহুরূপী অনুদান পেতে আরম্ভ করেছে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত অনুদান পেয়েছে যথাক্রমে ৮৫০০, ৫০০০, ৫০০০, ১২৬০০, ১২০০০, ২৫৫০০, ৭০০০ এবং ১৭৯১৩ টাকা। এবং ১৯৬৪-র অনুদানহীন বছরটি বাদ দিলে ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত প্রতি বছরই অনুদান পেয়েছে বহুরূপী, কমের দিকে ৬০০০ টাকা থেকে বেশির দিকে ৭২৩৪০ টাকা পর্যন্ত। এর একটা বড় উৎস নিশ্চয়ই সংগীত নাটক অকাদেমি।

তা ছাড়া শুনেছি, টাকা-পয়সার ব্যাপারে কড়াকড়ির (বহুরূপী সাধারণভাবে নাটক অভিনয়ের তিনদিন আগে সমস্ত টাকা নিঃশেষে চুকিয়ে দেবার দাবি জানাত বলে জনশ্রুতি) জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দু-একটি অনুষ্ঠানে বহুরূপী নাটক করা শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেয়। এসব ঘটনাও সৌহার্দ্যের সহায়ক হয়নি। কাজেই বহুরূপীর উপর আক্রমণের অর্থ বোঝা যায়। হুমায়ুন কবীর পরে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হয়ে বহুরূপীকে আনুকূল্য করেছেন, এমন ভাবা যেতে পারে।

কিন্তু এই আক্রমণের ব্যাপারে গণনাট্য-পন্থীরা সব সময় সৌজন্য, সুবিবেচনা, এমন-কী সততার পরিচয় দেননি—দুঃখের সঙ্গে একথাও বলতে হয়। যে-জন্যে বহুরূপীর দুর্নাম—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়া—সে 'অপরাধ' গণনাট্য-পন্থীদের পুরোধা দল উৎপল দত্তের লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপেরও ছিল, শুনেছি তাঁরাও প্রায় একই সময়ে হাজার হাজার টাকা নিয়েছিলেন, সম্ভবত 'কল্লোল' প্রযোজনার জন্যে। কিন্তু সে-তথ্য সেই সময়ে তেমনভাবে প্রকাশিত হয়নি। পরে তো কেন্দ্রীয় সরকারি টাকা অনেক দলেরই হস্তগত হয়েছিল, নান্দীকার যার মধ্যে প্রধান। তখন টাকার আরো সম্ভাব্য উৎস ছিল। আমার মনে আছে ইউ. এস. আই. এস. বা মার্কিন তথ্য সংস্থা থেকে স্থানীয় একটি প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে নাটকের দলগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, যে-কোনো মার্কিনি নাটক করলেই প্রতিটি অভিনয়ের খরচা বাবদ কিছু টাকা মিলবে—চারশো-সাড়ে চারশোর মতো। সুখের বিষয়, এক অসীম

চক্রবর্তী পরিচালিত চতুর্মুখ সম্প্রদায় (‘জনৈকের মৃত্যু’—আর্থার মিলারের ‘ডেথ অব এ সেলসম্যান’ অবলম্বনে; ‘পতনের পর’—ওই নাট্যকারেরই ‘আফটার দ্য ফল’ অবলম্বনে) ছাড়া যতদূর জানি আর কোনো দল সে প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। তা ছাড়া পরে ম্যাক্সমুলার ভবন থেকেও বাংলা নাটকের দলগুলিকে আমন্ত্রণ করা হয়। প্রথম দিকে বামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত কিছু দল সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, কিন্তু পরে শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটার ইউনিটই প্রায় ম্যাক্সমুলার ভবনের হাউজ ট্রুপ-এ পরিণত হয়। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ও একজন কট্টর গণনাট্য-পন্থী ছিলেন, একটি যুব-উৎসবে বক্তৃতায় প্রতিক্রিয়াশীল নাটক করার জন্যে নান্দীকারকে এক হাত নিয়েছিলেন মনে পড়ছে। পশ্চিম জার্মানির প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের প্রতিষ্ঠান ম্যাক্সমুলার ভবনের টাকার সঙ্গে তিনি তাঁর বামপন্থাকে কীভাবে অ্যাডজাস্ট করতেন জানি না। তবে তাঁর পক্ষে এবং যে-দলগুলি ম্যাক্সমুলারে নাটক করেছে তাদের পক্ষে, একটা কথা বলবার আছে যে, নাটক নির্বাচনে তাঁরা ইচ্ছেমতো স্বাধীনতা নিয়েছেন এবং যেসব নাটক করেছেন তাঁরা, বেশির ভাগ ব্রেশ্‌টের নাটক,—সে-সব নাটককে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যাবে না।

নান্দীকার যখন চতুর্দিক থেকে এইভাবে গালমন্দ খাচ্ছে তখন এই লেখক নান্দীকারের সদস্য। সেজন্যে ভেতর থেকে জানি যে, ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র’ নাটকটির নির্বাচন কোনো সজ্ঞান প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য থেকে করা হয়নি। মূলত নাটকটি ফর্ম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে আকর্ষণ করেছিল এবং অভিনয়ের চ্যালেঞ্জওয়ালা কয়েকটি ভূমিকা ছিল—ফলে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত দর্শককে আকর্ষণ করবে ভেবে নাটকটি নামানো হয়ে যায় এবং ওই নাটকটিই নান্দীকারকে দল হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। পরে নান্দীকার আরেকটি ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ নাটক করে—‘শের আফগান’ (পিরানদেল্লোর ‘এনরিকো কার্তো’ অবলম্বনে)—সেও খানিকটা বাধ্য হয়ে। দল ভাঙবার পর (১৯৬৬-তে শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর একটি বড়ো গোষ্ঠী বেরিয়ে গিয়ে থিয়েটার ওয়ার্কশপের পত্তন করে) আবার দলকে দাঁড় করানোর জন্যে। অজিতেশ কতকগুলো নাটককে আলাদা বেছে রেখেছিলেন, বলতেন ‘এগুলো দল ভাঙার পরবর্তী নাটক। এমনিতে করব না, কিন্তু দল ভেঙে গেলে নামাতেই হবে’। এই নির্বাচনে রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের অভাব হয়তো ছিল, কিন্তু নাটকের দলের দৈনন্দিন অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে যাঁরা

যুক্ত তাঁরাই জানেন, কখনো কখনো অজ্ঞাতসারে কিছু আপোস করতে হয়। নান্দীকার সেই মুহূর্তে বাইরের কোনো সাহায্য পায়নি, কোনো ভবনের সঙ্গেও কখনো গাঁট ছড়া বাঁধেনি। উৎপল দত্তের মুখনিঃসৃত (এই রকমই শুনেছি) একটি ইংরেজি বাক্যাংশ তখন খুব শোনা যেত—'স্ট্র্যাটেজিক ফ্লেক্সিবিলিটি'—সেটা সৎনাট্য-পন্থীদের বেলায় মহাপাপরূপে গণ্য হয়েছে, কিন্তু গণনাট্য-পন্থীদের বেলায় হয়নি।

আমি এই কথাগুলি লিখছি খামোখা পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবার জন্য নয়, বামপন্থাকে, অর্থাৎ আমার নিজের পন্থাকে, হেয় করার জন্যও নয়; খানিকটা এখনকার বিতর্কের পটভূমিটি দেখিয়ে দেবার জন্য, আর খানিকটা নিরপেক্ষভাবে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে, নাটকে রাজনীতির বিতর্কে স্বনির্বাচিত গণনাট্য-পন্থীরা দুর্ভাগ্যক্রমে যাকে 'ফেয়ার প্লে' বলে তা সব সময় মেনে চলেন নি। বামপন্থাকে শক্তিশালী করার জন্যে তার দরকার ছিল। এখন তা আরো বেশি করে দরকার, কারণ রাজনৈতিক দিক থেকে এ রাজ্যে বামপন্থার একটি শক্ত ভিত তৈরি হয়েছে এবং বামপন্থী আচরণবিধি ও বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেরও একটি উন্নত ও প্রাপ্তবয়স্কোচিত আদর্শ তৈরি করতে হবে। চিররঞ্জন দাসদের পক্ষে তবু এ কথা বলা যায় যে, তাঁরা যা 'প্র্যাকটিস' করেছেন তাই 'প্রিচ' করেছেন, কিন্তু 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'র কোনো কোনো মুখপাত্র সম্বন্ধে এমন সরল দাবি করা সম্ভব নয়।

আসলে কোন্ নাটক 'প্রগতিশীল', কোন্ নাটক তা নয়—এ নিয়ে বহু ক্ষেত্রে বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যেও মতৈক্য দেখা যায়নি, ফলে বামপন্থী সমালোচনা অনেক সময় বিশ্বাস্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। নান্দীকার যখন আরনল্ড ওয়েস্কারের 'রুট্স' অবলম্বনে 'যখন একা' প্রযোজনা করে তখন পরপর দুটি শো-তে দুজন বামপন্থী নাট্যকর্মী সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করে গেলেন—একজন নাটকটিকে অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং অন্যজন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল সাব্যস্ত ক'রে—এও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক, বা বহুরূপী-র 'অয়দিপাউস' নিয়েও বামপন্থীদের একই রকম সমস্যা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ক্লাসিক রচনা সম্বন্ধে বামপন্থী সমালোচনার ক্ষেত্রে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে কোনো স্পষ্ট নীতি তৈরি হয়নি বলে নানা জটিলতার জন্ম হয়েছে। টলস্টয়ের 'পাওয়ার অব ডার্কনেস' অবলম্বনে নান্দীমুখ-এর 'পাপপুণ্য' নিয়ে সম্ভবত এই রকমই একটি সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার একটি সংখ্যায় শ্রীচিররঞ্জন দাস প্রযোজনাটির নানা

সুখ্যাতি করেও শেস পর্যন্ত অভিমান প্রকাশ করেছেন জীবনধর্মী নাটকের প্রযোজনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা নিয়োজিত হল না বলে। অন্যার্থ, 'পাপ-পুণ্য' জীবনধর্মী নাটক নয়। বাঙালি পাঠকেরা অনেকেই হয়তো জানেন না যে, নাটকটিকে নিয়ে এই সিদ্ধান্তের সংকটে সোবিয়েত রাশিয়াকেও পড়তে হয়েছিল এক সময়[১১]। লুনাচারস্কির লেখায় সে ইতিহাস পাই। এ ছাড়া পরেও লেনিনগ্রাদের নাটক সংগীত ও চলচ্চিত্র শিল্পের রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটুট থেকে ১৯৬৪ সালে 'ক্লাসিকা না ৎসেনে' বা ক্লাসিকের অভিনয় বিষয়ে। একটি বই বার করা হয়েছে তাতে ক্লাসিকের অভিনয় ব্যাপারে যে-সব তত্ত্বগত সমস্যা উঠেছে তার বিচার করা হয়েছে। সে বইয়ে টলস্টয়ের এই নাটকটি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে বলে শুনেছি। তাতে নাটকের আকিম চরিত্রের ব্যাখ্যায় সোবিয়েত পরিচালকদের 'রুচিহীন সমাজতান্ত্রিকতা' বা vulgar sociologism-এর নিন্দা আছে, এবং পরে তাকে 'positive hero' হিসেবে দেখানোর চেষ্টাও হয়েছে বলে পড়া গেল। ক্লাসিক্স সম্বন্ধে বঙ্গীয় মার্ক্সীয় সমালোচকদেরও একটা নীতি নির্ধারণ করা দরকার ছিল। সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার ওই সংবিধানে যে সব বিদেশী নাট্যকারের নাম অনুমোদিত হয়েছিল, তাঁরা হলেন ও'কেসি, ব্রেশ্‌ট, ওডেট্‌স, আর্থার মিলার, ভিশ্‌নেভস্কি, বেন্‌-চি তুং "প্রমুখ প্রবর্তিত বলিষ্ঠ সংগ্রামী নাট্যসম্ভার", [৫]। শেক্‌সপিয়ার থেকে চেকফ পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল নাটককে বেছে বিপ্লবী শর্তে তা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

রাজনীতি বনাম শিল্পের তর্ক পরে দুটি খাতে বেশি করে বয়ে চলেছে। এক, গ্রামে যাওয়া না-যাওয়াকে কেন্দ্র করে; দুই, প্রসেনিয়াম নাটক বনাম অঙ্গন মঞ্চের হঠাৎ ঘনিয়ে ওঠা লড়াইয়ে। এ দুটি তত্ত্বের গতিবিধি একটু অনুসরণ করা যায়, তবে দ্বিতীয় বিতর্কের বিচার আমরা ভিন্ন একটি নিবন্ধে করছি।

গ্রামে যাওয়া / না-যাওয়া

শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায় ইডেন গার্ডেনে যুব-উৎসবের মঞ্চ থেকে উনিশ-শো ষাটের গোড়ায় একবার বজ্রগর্জনে বহুরূপী নান্দীকার ইত্যাদি দলকে ধিক্কার দিয়েছিলেন নিউ এম্পায়ারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামে নাটক করার জন্য। বহুরূপীর পক্ষে কথা বলার আমি কেউ নই, কিন্তু তখনকার নান্দীকার অন্য সব দলের মতোই বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে গিয়ে নাটক করেছে, কম বেশি

দুর্গম অঞ্চলেও। কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সূত্র থাকলে কষ্ট অনেক বেশি স্বীকার করেছে, অর্থ অনেক কম নিয়েছে, কখনো খরচার বেশি কিছুই নেয়নি। আমার মনে আছে একবার কোনো একটি নাট্যোৎসবের সঙ্গে কংগ্রেস দলের যোগ ছিল বলে লোভনীয় প্রস্তাব সত্ত্বেও আমরা তা বাতিল করে দিয়েছিলাম। বস্তুতপক্ষে সেই মুহূর্তে কারা দূর দুরান্তে গ্রামের একেবারে ভিতরে গিয়ে অভিনয় করে এসেছেন সেকথা জানতে ইচ্ছে করে। তাঁদের তালিকা নিশ্চয়ই খুব বড় হবে না—কারণ ১৯৭৮ সালেও থিয়েটার ওয়ার্কশপ আয়োজিত একটি সেমিনারে শেখরবাবুকে একই দুঃখ করতে শুনলাম, কেউ গ্রামে যাচ্ছে না। সত্যিই তো। সকলেই শহরে আধা-শহরে যাচ্ছে—ট্রেনে বা বাসে করে যেখানে যাওয়া যায়, নয়তো আমন্ত্রণে দিল্লি বম্বে আমেদাবাদ লখনউ পাটনা ঘুরে আসছে। লটবহর সেট ফ্ল্যাট প্রপার্টির বোঝা মাথায় করে পায়ে হেঁটে তো আর যাওয়া যায় না। তা ছাড়া আরও কথা আছে। গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীরা কলকাতার বাইরে যান অধিকাংশত শনি-রবিবারে। সেই দেড়দিনের সফরে আর কতদূর যাওয়া চলে, অন্তত সোমবার এসে অফিসে স্কুল কলেজে হাজিরা তো দিতে হবেই। এমন কোনো জায়গায় কী করে যাওয়া যাবে যেখানে যেতে-আসতেই তিন দিন লাগে—ধরা যাক সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে? যদি ছুটি নিতেই হয়, তাহলে দিল্লি বম্বের জন্যে ছুটি না নিয়ে গোসাবার জন্যে কে ছুটি নেবে? যাত্রার মতো পেশাদার হলে নিজেদের বা চার্টার্ড বাসে চড়ে কয়লাখান অঞ্চল হয়ে উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরা পর্যন্ত চক্কর লাগানো যেত, ব্রডওয়ের মঞ্চে পাকাপাকিভাবে নামানোর আগে নিউ ইয়র্কের পেশাদার দল যেমন একসময় 'রোড্স' এ বেরিয়ে পড়ত। আর শহরের একটি মঞ্চের সঙ্গে যাঁরা বাঁধা পড়ে গেছেন এবং সেই মঞ্চের উপযোগী নানা প্রযোজনা করেছেন তাঁদের পক্ষে গ্রামে বেরোনো তো আরো অসম্ভব। 'অঙ্গার' বা 'কল্লোল-এর বিশাল সেট নিয়ে কি গ্রামে যাওয়া যায়? সুতরাং গ্রামে যাওয়া মুখের কথা নয়। ওই সেমিনারে চেতনা'র অরুণ মুখোপাধ্যায় বরং সাদামাঠা স্পষ্ট কথায় এই দাবিটির ভিতরকার ফাঁক ধরিয়ে চেষ্টা করেছিলেন।

তাহলে গ্রামের মানুষ কী করবে? দূর গ্রামের মানুষ—দূর অর্থাৎ দুর্গম গ্রামের মানুষ। ভৌগোলিক ভাবে কলকাতা থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন গ্রাম আছে যেখানে থেকে কলকাতায় পৌঁছোতে প্রায় দু'দিন লাগে। সেখানে নাটক যাওয়া তো দূরের কথা, কোনো হাতুড়ে ডাক্তারও যায় না।

সেই সব গ্রামে যাওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে কেউ সংশয় পোষণ করে না, কিন্তু গণনাট্য নিয়েই বা ক-জন গেছেন সেখানে? বস্তুত 'গ্রামে যাওয়া' কথাটি একটি অস্পষ্ট ধোঁয়া তৈরি করেছে, ঠিক কোথায় কীভাবে যেতে হবে, গিয়ে কী কী করতে হবে, যে গ্রামে ডাক্তার ওষুধপত্র, রেশনের গম, পানীয় জল পৌঁছোয় না সেখানে শুকনো নাট্যসংস্কৃতিকে নিয়ে গিয়ে কী হবে—তা কিন্তু কেউ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব নেয়নি। একমাত্র রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নাট্যদল,—যাঁদের পথ-নাটিকা তৈরি আছে এবং রাজনৈতিক কারণে যাঁদের গতিবিধি ব্যাপক—তাঁদের পক্ষেই দূর-দূর গ্রামে যাওয়ার একটা সজ্ঞান পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব—ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ যেমন একসময় বেশ কিছু গ্রামে গিয়েছে, পাঁচ-দশ মাইল হেঁটেও গেছে। আর যেতে পারে বাদল সরকারের 'শতাব্দী' বা খড়দার 'লিভিং থিয়েটার' ইত্যাদির মতো দল—যাঁদের নাটক করার জন্যে শুধু মানুষগুলোকে নিয়ে গেলেই হল—কিছু বয়ে নিয়ে যাবার দরকার নেই। গ্রুপ থিয়েটারের যেসব দল সেরকম নাটক তৈরি করে রাখছে, চেতনা যেমন—তারাও এরকম ভারহীন চলাফেরা করতে পারে। পরিবহণ একটা পেলেই হল। কিন্তু সব গ্রুপ থিয়েটার সবরকম নাটক নিয়ে গ্রামে পৌঁছুতে পারবে না। যেমন থিয়েটার এয়ার্কশপের 'নরক গুলজার' বা 'মহাকালীর বাচ্চা' নিয়েই সহজ নয় সেই অর্থে গ্রামে যাওয়া। তাহলে বলে দিতে হবে বাস বা ট্রাকের আওতায় যেসব গ্রাম পড়ে শুধু সেখানে গেলেই চলবে। মনে পড়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপকেই সম্ভবত 'কল্লোল' সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিতে হত—'এই নাটক মিনার্ভা মঞ্চে ছাড়া আর কোথাও অভিনীত হবে না।'

ফলে গ্রামে যাওয়ার তর্কটার শেষ পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হয়নি। রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি 'কমিটেড', রাজনৈতিক দল-সংশ্লিষ্ট গণনাট্যের দলগুলি ছাড়া গ্রুপ থিয়েটারের প্রায় সকলেই lip service দিয়েছেন, কিন্তু যাবার বেলায় সকলেই গ্রাম কথাটার একটা সুবিধেজনক ও সংকীর্ণ অর্থ করে নিয়েছেন—ক. কলকাতার বাইরের কোনো জায়গা; খ. যা বাস-ট্রাকের চলাচলের পথে পড়ে, গ. যেখানে ইলেকট্রিক আলো ও মাইক্রোফোনের সুবিধে পাওয়া যায়; এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, ঘ. যেখানে নেবার মতো 'পার্টি' আছে, যারা দলের কল্ শো-র খরচা দিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। নিজেদের উদ্যোগে গ্রামে—এমনকী এই সংকীর্ণ অর্থের গ্রামেও—গিয়ে নাটক করে এসেছেন এমন দলের কথা তো শুনিনি। বরং প্রয়াত স্নেহাংশু আচার্যের মুখে একবার

শুনেছিলাম, কোনো একটি নামকরা অভিনেতা-প্রযোজকের দল বজবজের সাতগাছিয়াতে শ্রীজ্যোতি বসুর নির্বাচন কেন্দ্রে নাটক করতে গিয়ে প্রথমেই যাতায়াত-বাবদ আটশো টাকা চেয়ে নিয়েছিলেন। নাটক করার জন্য অবশ্য কোনো টাকা তাঁরা নেননি।

দ্বিতীয় বিতর্ক : শৌখিন, না পেশাদার

আমরা দেখেছি যে, গ্রুপ থিয়েটার মূলত পার্ট-টাইম উপজীবিকা। এই চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের ইতিহাসে এই থিয়েটারে নাটককে পুরোপুরি জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এবং অন্য কোনো চাকরি নেনান—এমন লোক সংখ্যায় খুব কম। গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্রই বোধহয় সর্বপ্রথম কেবলমাত্র নাটক করাতেই আত্মনিয়োগ করেন ; কিন্তু তাতে সংকুলান হত না বলেই তাঁদের বহুবার ফিলমে প্রযোজনা পরিচালনা অভিনয় করতে হয়েছে, শম্ভু মিত্রকে রবীন্দ্র-ভারতীতে অধ্যাপনা করতে হয়েছে, কখনো ফেলোশিপ গ্রহণ করতে হয়েছে সংগীত নাটক অকাদেমী বা বিশ্বভারতীর। পরে উৎপল দত্ত শোভা সেনকে অজস্র ফিলমে অভিনয় করতে হয়েছে। থিয়েটারের অনেক পরিচালক অভিনেতাকে যাত্রায় যোগ দিতে হয়েছে, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্যন্ত। সাম্প্রতিক কালে কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী অধ্যাপনা বা দূরদর্শনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর নাটকে এসে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু শুধুমাত্র নাটকের আয়ে তাঁদের পুরো সংসার চলেছে—এমন কথা বোধহয় বলা যাবে না।

সুতরাং নাটক বিষয়টিকে যাঁরা জীবনে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে এই প্রশ্ন প্রথম থেকেই ছিল যে, জীবন বা কর্মের অংশ কতটা দেওয়া যায় নাটককে? কারণ নাটকের সঙ্গে পার্ট-টাইম বা অস্থায়ী সম্পর্ক থাকলে শিল্পী বা নাটক কারো পক্ষেই খুব একটা সুরাহা হয় না। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের এইটে একটা বড় সমস্যা। এখানে যত লোক আসে অধিকাংশই চিরস্থায়ী ভাবে সারাজীবন নাটক করার বাসনা নিয়ে আসে না, আসে দুদিনের শখ মিটিয়ে নেবার জন্যে। যদি সকলেই সেভাবে নাটক করতে চাইত আমাদের অর্থনীতিতে তার সুযোগও হত কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে গ্রুপ থিয়েটারের লোকদের প্রথম দিকে একটা রোমান্টিক আদর্শবাদও ছিল—টাকার জন্যে বা লাভের জন্যে নাটক করব না। ফলে একধরনের শ্রম, কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগ

চালু হয়েছিল—আদর্শের বা আনন্দের জিনিসকে কেরিয়ারে অনুবাদ করতে চায়নি অনেকে। সেটা গ্রুপ থিয়েটারের 'ইমেজ'কে উজ্জ্বল করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মাশুলও গুনে দিতে হয়েছে, ড্রপ-আউটের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে। বিয়ে করে কিংবা চাকরি পেয়ে দল ছেড়েছে ছেলেমেয়ে। কিংবা শরীরে রক্তের জোর কমে এলে অনেকেই অবসর নিয়েছে। অনেকেই আবার গ্রুপ থিয়েটারে এসেছে ফিলমে পৌছোবার আগে অ্যাপ্রেন্টিসগিরি করতে বা ফিলমের লোকেদের চোখে পড়বার আশায়। ফলে গ্রুপ থিয়েটারের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশই ভাসমান—তখনও ছিল, এখনও আছে। ফলে তার ভিত্তি নড়বড়ে থেকে গেছে।

এ থেকে পরিত্রাণের রাস্তা কী? শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র উৎপল দত্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রপ্রসাদ বিভাস যে-আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঝাঁপ দিতে পারেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতে সেই আত্মবিশ্বাস, এবং তাকে মদত দেওয়ার মতো অভিনয়সামর্থ্য ক-জনের আছে? তবু এক সময় শুনেছি বহুরূপীতে নাকি একটা জাতিভেদ-প্রথা তৈরি হয়েছিল। দূরে ট্রেনে কোথাও যেতে হলে, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র যেতেন ফার্স্ট ক্লাসে, তারপরে কিছু লোক সেকেণ্ড ক্লাসে, এবং বাকিরা তখনকার থার্ড ক্লাস কামরায়। দু-একজনের জন্যে চিকেন স্যাণ্ডউইচ এসেছে ম্যানেজারসাহেবের কোয়ার্টার থেকে, বাকিদের কপালে চা-বিস্কুটের বেশি জোটেনি। স্বপন মজুমদার অবশ্য এটাকে "গুরুজন"দের জন্য "স্বচ্ছন্দতাবিধানের চেষ্টা" হিসেবে দেখেছেন।[১২] এটা নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারে অন্যান্যরা হাসাহাসি করেছে, বহুরূপীকে 'বহু Rupee' বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছে কেউ আড়ালে। কিন্তু শহিদ হয়ে যাওয়া বা রণে ভঙ্গ দেওয়া এবং অন্যদিকে 'প্রফেশনাল' হওয়া—এ দুয়ের অতিরিক্ত কোনো মধ্যপন্থা আবিষ্কার করতে পারেনি। উৎপল দত্তের পরিচালনায় লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ১৯৫৯ থেকে মিনার্ভায় এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নান্দীকার ১৯৭১ থেকে রঙ্গনায় লিজ পেয়ে নিয়মিত অভিনয় শুরু করে। জানি না তাঁদের মধ্যে কী ধরনের জাতিভেদ প্রথা তৈরি হয়েছিল। নান্দীকার আগে 'গাড়ি ভাড়া বাবদ' কিছু কিছু টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, সেকথা বলেছি। তাতে সমস্যার সমাধান হলে পরে রঙ্গনা নেওয়ার দরকার হত না। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাগুইআটি স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়েন 'হাটে বাজারে' ফিলমটিতে জনপ্রিয়তা পাবার পর—কিন্তু তাঁকেও ফিলম এবং নাটক এই দু-নৌকোয় পা দিয়েই চলতে হয়েছে। হাত পাততে হয়েছে

যাত্রার কাছেও। অর্থাৎ শুধু নাটক করে বুদ্ধিজীবী সমাজে হই-হই ফেলেও ভদ্র গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করা যায় না, সেটা স্পষ্ট। এ সত্য শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই নিজের নিজের মতো করে বুঝেছেন—উৎপল দত্তকেও তো তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে হচ্ছে। এ বিষয়টা বাঙালি দর্শকেরা যথেষ্ট বুঝেছেন কিনা সন্দেহ।

এর মধ্যে একটি নতুন প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল শখ, অনুরাগ ও জীবিকাকে মেলানোর, সেটি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটার বা কলকাতা নাট্যকেন্দ্র। ১৯৮০ সালের অক্টোবরের শেষে বেরটোল্ট ব্রেশ্‌টের 'গালিলেওর জীবন' নাটকটি নিয়ে এঁদের প্রযোজনার ইতিহাসের আরম্ভ হল। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন পূর্ব জার্মানির ভাইমার রিপাবলিকের রাষ্ট্রীয় নাট্যশালার রেসিডেন্ট ডিরেক্টর ফ্রিট্‌স বেনেভিট্‌স।

এই দলটির গঠন খুব কৌতূহলোদ্দীপক। নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, কর্নিক (জোছন দস্তিদারের এখনকার দল), শূদ্রক, থিয়েটার কমিউন এই কয়েকটি দল থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী ও অশোক মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, জোছন দাস্তদার, দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত প্রভৃতিরা এবং দলের বাইরে থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় (নাটক), তাপস সেন, কনিষ্ক সেন (আলো), এবং শম্ভু মিত্র ও শাঁওলী মিত্র (অভিনয়) এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের কাজকর্ম খুব সুসংগঠিত ও গোছানো। যতদূর জানা গেছে, এইসব ব্যক্তি ও দল সম্পূর্ণ 'প্রফেশনাল' ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানে এসে যুক্ত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, ঠিক হয়েছিল কে, প্রতিটি ব্যক্তি পারিশ্রমিক পাবেন, এবং সুনির্দিষ্ট ও পরিষ্কার চুক্তির শর্ত মেনে নিজের নিজের কাজ করবেন।

এর মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে পড়ল। তার একটি, এতে এই দলগুলির এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারের কী লাভ হবে? এর একরকম উত্তর তৈরি ছিল—আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ভারতবিখ্যাত কিছু শিল্পীকে নিয়ে একটা ভালো নাটক হচ্ছে, সেটাই কি যথেষ্ট ভালো ব্যাপার নয়? ধুমধাম করে হাউজ ফুল হল—এতো বাংলা থিয়েটারেরই পুষ্টি। ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে অসংগত অবসরজীবন থেকে বার করে এনে উত্তর কালের দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল—সেটাই বা কম কী? তবে দলের সবচেয়ে সমর্থ অভিনেতারা অন্যত্র ব্যস্ত থাকলে দলকে অন্তত কিছুটাও ক্ষতি স্বীকার

করতে হবে—সে ক্ষতিপূরণ করার কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল জানি না।

দ্বিতীয়ত, এঁদের শুরুর সময়ে কয়েকটি বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। টিকিটে এঁরা কী যেন ভেবে 'Right of Admission Reserved' ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে যে-কাজের নজির নেই। প্রশ্ন হল, ওই বুলিটি না ছাপিয়েই তো গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয় চলেছে এতকাল, আজ এঁরা ঐ 'এলিট' মনোভাবের শিকার হলেন কেন? পরে কথাটি টিকিট থেকে তুলে দেওয়াতে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন স্বীকারোক্তি করা হয়েছিল যে, না, কাজটা ঠিক হয়নি।

তারপরে প্রথম কয়েকটি শো'র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ টিকিট এঁরা নিজেদের স্বজনবন্ধু ও 'শুভানুধ্যায়ীদের' জন্যে রেখেছিলেন। শ্রীযুক্ত তাপস সেনকে ওই টিকিট—যা পয়সা দিয়েই কিনতে হয়েছিল, আমন্ত্রণ-পত্র নয়—দেবার সময় এঁরা বলেছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বা ধরণী ঘোষকে ওই টিকিটের ভাগ দেওয়া চলবে না। কেন? আনন্দবাজার পত্রিকায় চিঠি লিখে (৭.১২.৮০) এঁরা জানালেন যে, শমীক এবং ধরণীবাবুকে এঁরা কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের 'শুভানুধ্যায়ী' মনে করেন না। শমীকের অপরাধ শমীক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক আপত্তি তুলেছে—তাই সে কলকাতা নাট্যকেন্দ্রেরও শত্রু হল। আর স্টেটসম্যানের নাট্য-সমালোচক ধরণীবাবুর অপরাধ স্পষ্টতর। গ্রুপ থিয়েটার আবার ধরণীবাবুর bete noire। উনি যে-কোনো প্রসঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারকে একহাত নিয়ে নেন। এমন-কী পরলোকগত অসীম চক্রবর্তী কেন 'বারবধূ'র মতো অপনাটক করতে গেলেন, তার মূলেও ধরণীবাবু গ্রুপ থিয়েটারের বদমাইশি আবিষ্কার করেছেন—মুর্শিদাবাদে হল না বৃষ্টি, তার মূলে আছে কমিউনিস্টি'র ধরনে। কিন্তু শমীকবাবু তো জানতাম অনেক দলকেই সাহায্য করেছেন নানা ভাবে, দিন পেরিয়ে যাবার পর সংগীত নাটক অকাদেমীর গ্র্যান্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করে, কল্ শো পাইয়ে দিয়ে, উৎসাহব্যঞ্জক সমালোচনা লিখে, সুভেনিরে বিজ্ঞাপন দিয়ে ইত্যাদি। তাঁকে প্রতিপক্ষ বলে মার্কা মেরে দেওয়া কি একধরনের ঋণশোধ?

যে যত বড়ো শত্রু হোক, কাগজে তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা রুচিহীনতার পরিচয়। বন্ধু শমীকের সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার মতের অমিলের এলাকা আছে। গ্রুপ থিয়েটার সম্বন্ধে ধরণীবাবুর প্রায় কোনো বক্তব্যেই আমার সমর্থন নেই। তবু প্রকাশ্যভাবে এঁদের persona non-grata বলে ঘোষণা করার মধ্যে নাট্য আন্দোলনের অগ্রগতির কোনো চিহ্ন নেই। আর বিজ্ঞাপনে আলাদা করে শম্ভু মিত্রের একটি star billing দিয়ে যে-জিনিস করা হয়েছিল

তাতে 'শোলে' জাতীয় multi-starrer বম্বে ছবির অনুষঙ্গ মনে আসে। বেশির ভাগ দর্শকও সেইভাবেই নাটকটি দেখতে যাচ্ছিল বলে একটি রিপোর্টও দেখেছিলাম। নানা মহলে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল তাও জেনেছিলাম—এবং গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ ও বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিহীন কিছু কিছু এদের কাজে লক্ষ করা গেছে।

তবু এ চেষ্টাকে অবান্তর বলা যাবে না। গ্রুপ থিয়েটারের এবং নাট্য-আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে এই চেষ্টার কিছু অসংগতি দেখা গেছে, যে-সব প্রশ্ন উঠেছে সবগুলোর স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। কিন্তু যদি শখ ও জীবিকার দ্বন্দ্বের একটা সমাধান এই চেষ্টা থেকে হত, কোনো একটা পথ খুলে যেত, সেটারই যথেষ্ট সার্থকতা থাকত। ওই প্রয়াস যে একটি নাট্যপ্রযোজনাতেই দম ফুরিয়ে ফেলল, তাতে তার ভিতরকার দুর্বলতা ধরা পড়ল বই কী। এ সত্ত্বেও এই বিষয়ী লক্ষ্যের পাশাপাশি বহু বাঙালি যুবক শুধু আদর্শের জন্যে অর্থ শ্রম ও শক্তিক্ষয় করে যাবেন আরো দীর্ঘকাল। গ্রুপ থিয়েটারের চরিত্রও আস্তে আস্তে বদলাবে, যেমন বদলেছে পেশাদার থিয়েটারেরও চরিত্র। ক্যাবারের পাশাপাশি কিছু পরিচ্ছন্ন ও সচেতন নাটকও তো পেশ করেছে ঐ মঞ্চ।

তৃতীয় বিতর্ক: দল ভাঙা ভালো না খারাপ

গ্রুপ থিয়েটারে দল ভাঙার ইতিহাসও খুব পুরোনো। আই. পি. টি. এ. যে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার মূলে কতটা রাজনৈতিক বা তাত্ত্বিক যুক্তি ছিল জানি না, কিন্তু আলাদা হয়ে বহুরূপী-র সংগঠন নিশ্চয়ই রাজনৈতিক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বা দলীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে যাওয়ার, উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তারপর বহুরূপী ভেঙে রূপকার (১৯৬৩), নান্দীকার ভেঙে থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৬৬) এবং পরে নান্দীমুখ (১৯৭৭), লিটল থিয়েটার ভেঙে চলাচল, পরে পি. এল. টি., গন্ধর্ব ভেঙে নক্ষত্র, নক্ষত্র থেকে থিয়েটার কমিউন ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সকলেরই চোখের সামনে। বহুরূপী সব মিলিয়ে ন-বারের মতো ভেঙেছে।

দল ভাঙার পদ্ধতিও সব ক্ষেত্রে একরকম নয়। কোথাও দলের মূল অভিনেতা-পরিচালকের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে অন্য দল তৈরি করেন। রূপকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চলাচল তৈরি হয়েছিল এই ভাবেই। আবার কোথাও দলের প্রধান অভিনেতা-পরিচালক বেরিয়ে আসেন

কিছু বিশ্বস্ত সঙ্গীকে নিয়ে : মূল দলটি তখন অন্য কারো নির্দেশনায় সমান্তরাল-ভাবে অভিনয় করতেই থাকে। এ ধরনের ঘটনা তত বেশি নয়। নান্দীকার থেকে নান্দীমুখের উদ্ভব ঘটেছে এই ভাবে—অ্যামিবার ভাগ হওয়ার মতো করে। কিছু ক্ষেত্রে পুরোনো দলের ভস্মাবশেষের ওপরে নতুন দল তৈরি হয়েছে। উৎপল দত্তের লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ বিলুপ্ত হয়ে হয়েছে পিপ্‌লস লিট্‌ল থিয়েটার। এটা মূলত নামের পরিবর্তন, এবং বাইরে থেকে যতটা বোঝা সম্ভব তাতে মনে হয়, দলনেতার রাজনৈতিক 'কমিট্‌মেণ্টে'র একটা ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে 'পিপ্‌লস' কথাটির মধ্যে। অন্যত্র আবার কিছু লোক দল ছেড়ে গিয়ে হারিয়েও যায়—কিন্তু সেটা দল ভাঙার ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক নয়।

কী কারণে, কতভাবে দল ভাঙে তার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করার জায়গা এটা নয়। আমরা শুধু লক্ষ করব যে, বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটারে দল ভাঙা একটা সহজ এবং পৌনঃপুনিক ঘটনা। এক নাটকের বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছিলেন, এরই নাম ডায়ালেকটিক্‌স! দ্বিতীয়ত লক্ষ করার বিষয় এই যে, এ সত্ত্বেও সকলেই ঘটনাটা অপছন্দ করেন, দল ভাঙাকে গর্হিত কাজ বলে মনে করেন। ফলে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দোষারোপ করতে থাকেন, আর অন্যরাও, বিশেষত শুভানুধ্যায়ীরা, চেষ্টা করেন প্রথমদিকে দুপক্ষকে কোনো একটা বোঝাপড়ায় নিয়ে আসতে—নান্দীকার থিয়েটার ওয়ার্কশপের ক্ষেত্রে যেমন শ্রীশম্ভু মিত্র খুব চেষ্টা করেছিলেন। আবার শ্রীউৎপল দত্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধরনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "দল ভেঙে গেছে কী বলছেন? বলুন কিছু লোক দল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে! বাঘের বাচ্চার মতো লড়ে যান!"

বেশির ভাগ সময় দল যে কোনো তাত্ত্বিক বা মতাদর্শের কারণে ভাঙে তা নয়। ভাঙে একই দলে অন্য একটি বা একাধিক ব্যক্তিত্ব প্রধান হয়ে ওঠে বলে, personality clash থেকে। সেক্ষেত্রে 'দল ভাঙা ব্যাপারটা খারাপ'—এই সিদ্ধান্তকে প্রাচীন মূল্যবোধের ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়, খানিকটা মধ্যবিত্ত ভণ্ডামির মতো। যা অনিবার্য কিংবা প্রত্যাশিত—তাকে খারাপ বলে মার্কা দেগে দিলেই তা বন্ধ হয়ে যাবে না। এ যেন ডিভোর্স ব্যাপারটা শুনে আঁতকে ওঠার মতো। তা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যদি বা পূর্বজন্মে বা স্বর্গে ঠিক হয়ে থাকে, নাটকের দলের লোকেদের সম্বন্ধ তো আর সেভাবে কেউ বেঁধে দেয়নি। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে পুরোনো ধারণাকে আঁকড়ে ধরে না থেকে অন্য একটা দিক থেকেও জিনিসটা দেখার চেষ্টা করা যায়। দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেও

থিয়েটার ওয়ার্কশপ যদি 'রাজরক্ত' বা 'চাক-ভাঙা মধু'র মতো নাটক উপহার দিতে পারে, নান্দীমুখ তৈরি করেও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি 'পাপ-পুণ্য'-এর মতো নাটক প্রযোজনা করতে পারেন, ভাঙা দল নিয়ে অশোক মুখোপাধ্যায় থিয়েটার ওয়ার্কশপে তেড়েফুঁড়ে উঠতে পারেন 'বেলা অবেলার গল্প' নিয়ে, কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভাস চক্রবর্তী করতে পারেন অসামান্য 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা', কিংবা বহুরূপী থেকে সরে আসা রমাপ্রসাদ বণিক করেন 'আগশুদ্ধি', শাওঁলি মিত্র করেন 'নাথবতী অনাথবৎ'—তাহলে তো গ্রুপ থিয়েটারই সমৃদ্ধ হয়, বাংলা থিয়েটারেরই আখেরে লাভ হয়। দল ভাঙার ফলে যে-সব মানবিক সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলির প্রতি সমবেদনা জানানো এক কথা, আর দল-ভাঙাকে (অর্থাৎ দুটি দলে আলাদা হয়ে যাওয়াকে) এক কথায় বাজে ব্যাপার বলে দেওয়া অন্য কথা। হয়তো অনেক কিছুর মতো এক্ষেত্রেও ভবিষ্যতের হাতেই বিচারের ভার তুলে দেওয়া ভালো। কিছু ব্যক্তি অবশ্য হারিয়ে যাবেই, অভিনয়-ক্ষমতার অভাবে হোক, নতুন সংগঠন গড়ে তোলার সামর্থ্য না থাকার দরুনই হোক।

এই প্রবন্ধে মূলত আলগাভাবে কতকগুলি বিতর্কের ছবি তুলে ধরা হল। আরো বিতর্ক আছে, সেগুলি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঐতিহাসিক তথ্য এ প্রবন্ধে সব সময় প্রতিটি ।ডটেইলে যথাযথ নাও থাকতে পারে—কিন্তু তর্কের ধারাগুলি সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের লেখক এমন একটি ব্যক্তি যার আলাদা-আলাদা কারণে শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত উভয়েরই ভালো প্রযোজনা বা অভিনয় ভালো লাগে, এবং যে দুজন সম্বন্ধেই শ্রদ্ধা পোষণ করে। তবে এই শ্রদ্ধা ভক্তিরস নয়, সমালোচনার অধিকার সঁপে দেওয়া আত্মনিবেদন নয়। ফলে শম্ভু মিত্রকে সে যেমন নানা বিষয়ে সমালোচনা করেছে তেমনি নিজেকে বামপন্থী মনে করলেও নাটকের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত ও অন্যান্য কয়েকজন বামপন্থীদের সমালোচনা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেনি। তাতে হয় তো কোনো পক্ষকেই খুশি করা যাবে না, কিন্তু তাতে এই লেখক নিজে অসুখী বোধ করার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছে না।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. বলা বাহুল্য, ১৯৬৬ পর্যন্ত কেবল প্রধান দলগুলির নামই এখানে উল্লেখ করছি। তালিকায় পূর্ণাঙ্গতা আমাদের লক্ষ্য নয়। ১৯৪৫-তেই যে কলকাতায় বাহাত্তরটি 'সিরিয়াস' গ্রপ ছিল, একথা উৎপল দত্ত আমাদের

(কোন্ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানি না) জানিয়েছেন (দ্রষ্টব্য : রমেশ থাপার সম্পাদিত *Seminar*-এর ৩২ সংখ্যার [এপ্রিল ১৯৬২] Trends Today অংশে কলকাতার থিয়েটারের উপর শ্রীদত্তের রিপোর্টটি, ২৭ পৃষ্ঠা)। অন্য দিকে ১৯৭২-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার' বইয়ে (সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত) ঠিকানা পাওয়া যায় এমন নাট্য সংগঠনের সংখ্যা আড়াইশো বলে উল্লেখ করা হয়েছে—অবশ্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের হিসেবে (৮৮ পৃষ্ঠা)।

২. যেমন প্রয়াত কেয়া চক্রবর্তী একবার নান্দীকার-এ কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যদি ফিলমে অভিনয় করতে তাঁর ডাক আসে তাহলে সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের ফিলমের ক্ষেত্রেই তিনি রাজি হবেন, চিত্ত বসুর ফিল্‌মের জন্য নয়। পরে কিসের চাপে তাঁকে এই কঠোর মানদণ্ড শিথিল করতে হয়েছিল তা আমরা জানি, তার আপতিক এবং মর্মান্তিক পরিণতিও আমাদের সকলেরই জানা। এই তর্ক যতক্ষণ ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ অগ্রাধিকারের অন্তর্গত, ততক্ষণ তা আমাদের আলোচনার বাইরে থাকবে।

৩. সূত্রধার লিখিত "ছেঁড়া খাতায় কালের ইতিহাস", 'দেশ', বিনোদন সংখ্যা, ১৩৭৭ দ্রষ্টব্য। ১৯৭৬-এর 'অমৃত' সাপ্তাহিকের একটি সংখ্যায় লেখা চিত্তরঞ্জন ঘোষের "যাত্রাবদল" এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭৬-এর যাত্রা উৎসব-এর স্মারক পুস্তিকায় অসীমকুমার ঘোষের "যাত্রা" প্রয়োগে আধুনিক চিন্তা" (৪১-২) দ্রষ্টব্য।

৪. প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল প্রবীর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংকলন' পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৩৭৬)। বন্ধুবর শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বহুরূপী' ৩১-৩২ যুগ্ম-সংখ্যার ১০৬-১০ পৃষ্ঠায় (জুলাই ১৯৬৯) ঐ নামটি গ্রহণ করে আরেকটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন। তাতে এই অধমের লেখা থেকে যে-বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেন তা থেকেই আমি কথাগুলি উদ্ধার করেছি। আগেকার ভাষার আবেগ-উচ্ছ্বাস সামান্য কাট-ছাঁট করতে হয়েছে, তবে খুব একটা বদলাইনি।

৫. ওই, ১০৮ পৃ.।

৬. উৎপল দত্তের 'কুঠার' নাটকের অভিনয় উপলক্ষ্যে ভোলটাস স্পোর্টস ক্লাবের স্যুভেনির, ১৯-২০ ডিসেম্বর, ১৯৮৯।

৭. পেশাদার মঞ্চে তিনি প্রথমে অভিনয় করতেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' নাটকে অভিনয় করেছিলেন, সম্ভবত রঙ্‌মহলে,—বইয়ের ভূমিকালিপি থেকে সে খবর পাওয়া যায়।

৮. শ্রীশম্ভু মিত্রের মুখে এই নাটকটির পাঠ যাঁরা শুনেছেন তাঁদের সমালোচনা বেশ কয়েকদিন স্তব্ধ ও অভিভূত থাকে—তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। তবে 'চাঁদ-বণিকের পালা' বহুরূপী প্রযোজনা করেনি, এবং তার সৎ নাট্য সম্পর্কিত দাবি এই নাটক লেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই উচ্চারিত হয়েছে।

৯. সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার সংবিধানের জেরক্স কপি থেকে। ১-২ পৃ.

১০. দ্র. স্বপন মজুমদার, ১৯৮৮, 'বহুরূপী', কলকাতা, বহুরূপী, ৫১ পৃ.

১১. দ্র. জন গ্যাস্‌নার ও এডোয়ার্ড কুইন সম্পাদিত 'দ রিডার্স এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্লড ড্রামা', ১৯৬৯, নিউ ইয়র্ক, টমাস ওয়াই ক্রোয়েল কম্পানি, পৃ. ৭৩৪।

১২. ওই, ১২০ পৃ.

থার্ড থিয়েটার, ফোর্থ থিয়েটার

১.

ষাটের বছরগুলির শেষ দিকে প্রখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকার (জ. ১৯২৫) একটি নতুন নাট্যরীতির উদ্ভাবন করে, এবং সেই রীতিতে নাটক রচনা ও অভিনয় করে বেশ হই-চই ফেলে দেন। তাঁর এই নতুন কাজ অচিরেই সারা ভারতবর্ষে পরিচিতি লাভ করে, বিভিন্ন অঞ্চলে—হায়দারাবাদ, ব্যাঙ্গালোর থেকে মণিপুর পর্যন্ত দেশের নানা প্রান্তে বাদলবাবু তাঁর নতুন নাট্যরীতি ও নাট্যদর্শন বিষয়ে বক্তৃতা ওঅর্কশপের জন্য আমন্ত্রিত হন, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য দল তাঁর কাজের দীক্ষা গ্রহণ করে এই নতুন রীতিতে অভিনয়ের উদ্যোগ নেয়। কয়েক বছরের মধ্যেই থার্ড থিয়েটার একটি অভিনব ও বিকল্প নাট্যরীতি হিসাবে গণনীয় হয়ে ওঠে, ফলে বিতর্কেরও উদ্ভব ঘটে। বিতর্কের একটা কারণ বাদলবাবু এবং প্রথমদিকে তাঁর প্রবল সমর্থক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচলিত প্রসেনিয়াম-নির্ভর নাট্যরীতির বিরুদ্ধতা। বাদলবাবু কাজে প্রসেনিয়ামের নাটককে সম্পূর্ণ বর্জন করেন, এবং শমীক তাঁর নাট্যতাত্ত্বিক আলোচনায় বর্তমান ভারতীয় পটভূমিকায় প্রসেনিয়ামবদ্ধ নাটকের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন, ফলে প্রসেনিয়ামপন্থীরাও বাদলবাবুর নাট্যরীতি ও নাট্যদর্শনকে আক্রমণ করতে দেরি করেননি। সেই তর্ক সত্তরের বছরগুলিতে বেশ উত্তাল ছিল, এখন মুখোমুখি বাদপ্রতিবাদ কমে এসেছে। বাদলবাবু নিজে কোনো বিতর্কে পক্ষ নেন না কিন্তু তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধ এখনও বেশ প্রবল[১], এবং নিজের কাজ ও বিশ্বাসে তিনি অবিচল; অন্যদিকে 'মেইনস্ট্রিম' নাটকের পক্ষ থেকে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও নাট্যরীতি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার শেষতম নিদর্শন পাই হীরেন ভট্টাচার্যের এই কথাগুলিতে—"প্রসেনিয়ামের বিরুদ্ধে থার্ড থিয়েটার জেহাদ ঘোষণা করেছেন আধুনিককালে নাট্যকার বাদল সরকার। তিনি বিপ্লবের দোহাই দিয়ে অ্যানটি প্রসেনিয়াম শ্লোগান তুলেছেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁর বিপক্ষেই রায় দেয়। জনগণের সংগ্রামী নাটক প্রসেনিয়ামে

অভিনীত হলে কেন তাকে বর্জন করতে হবে তার কোনো সন্তোষজনক কারণ বাদলবাবু দেখাননি, তিনি বলেছেন যে, শহরে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বিপ্লবের কথা বলা মানে ভস্মে ঘি ঢালা—কেননা ওখানকার দর্শক মধ্যবিত্ত—যার কোনো বিপ্লবী চরিত্র নেই। শহরের শ্রমিক কর্মচারীর, থিয়েটার-দর্শকের ভূমিকার কথা তিনি এড়িয়ে গেছেন। বিপ্লবের স্তরভেদে তথাকথিত মধ্যবিত্তের যে নানা ইতিবাচক ভূমিকাও আছে সেটাও অস্বীকার করেছেন।"[২]

কিন্তু আমরা এখনই এক পক্ষের কথা তুলে বিতর্কের ছবিটি একপেশে করে দেখাব না। বাদলবাবু গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার, এই লেখক ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ত্যাগ ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণ করে, এবং তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ করে না। ফলে ভারতীয় নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বাদলবাবুর উদ্ভব ও ভূমিকাটি সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা আগে করে নিতে হবে। সেজন্যে এই নিবন্ধে কিছুটা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হচ্ছে প্রথমে, পরে আমরা বাদলবাবুর নাট্যতত্ত্ব সংক্রান্ত বিতর্কে গিয়ে পৌঁছাব।

২.

বাদলবাবুর সিভিল এনজিনিয়ারিং ডিগ্রি (১৯৪৭), সেই সূত্রে মাইথনে (১৯৫৩-১৯৫৭), লণ্ডনে (১৯৫৭-১৯৫৯), কলকাতায়, ফ্রান্সে (১৯৬৩-৬৪), নাইজিরিয়ায় (১৯৬৪-৬৭), পরে আবার কলকাতায় কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের চাকরি (১৯৬৭), এবং শেষে চাকরি ছেড়ে পুরো-পুরিভাবে নাটকের কাজে নেমে পড়া (১৯৭৭), এর একটা কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত আছে। একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে[৩] তিনি বলেছেন, "আমি নাটক লেখার অনেক আগে নাট্যকর্মে গেছি।" সম্ভবত ১৯৪৫ নাগাদ কলকাতায় তাঁরা ENACA অর্থাৎ Entirely Novice Artist's Cultural Association[৪] নামে একটি দল গড়ে তুলেছিলেন। তার জন্য গলস্‌ওয়ার্দির নাটকের একটি বঙ্গীকরণ করেছিলেন ওই বছর। তার পরে কর্মসূত্রে মাইথনে থাকার সময় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে তাঁরা একটি 'রিহার্সাল ক্লাব' গড়ে তোলেন ১৯৫৩-৫৪ নাগাদ, যার লক্ষ্য ছিল, শুধু নাটকের রিহার্সাল হবে, কিন্তু সে নাটক স্টেজ করা হবে না। কিন্তু ক্রমাগত রিহার্সাল দিতে দিতে যখন নাটক সকলেরই সম্পূর্ণ মুখস্থ হয়ে গেল তখন অগত্যা স্টেজ করার কথা ভাবতেই হল। এই "বিশ্বাসঘাতকতা"-য় অনেকে প্রথমে বেঁকে বসলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন এবং

নাটক বেশ ভালো হল। বাদলবাবু নিজেই জানিয়েছেন মাইথনের নাট্যকর্ম নেহাৎ বিনোদনের জন্য। কিন্তু তখনই বাংলা নাটকের, বিশেষত অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাব তাঁকে বেশ পীড়িত করে, এবং ১৯৫৬ সাল নাগাদ তিনি নিজেই নাটক লিখতে আরম্ভ করেন।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে আমি বাদলবাবুর নাট্যকর্মকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলাম: ১৯৫৬-১৯৬২—মূলত হাস্যরসাত্মক নাটক ও বঙ্গীকরণের পর্যায়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে চারটি নাটক লিখেছেন তিনি—'সলিউশন এক্স', 'রাম শ্যাম যদু', 'বড়পিসীমা' এবং 'শনিবার'। প্রথম দুটি মার্কিন চলচ্চিত্রের গল্পের কাঠামো নিয়ে লেখা, তৃতীয়টিও বিদেশী নাটকের বঙ্গীয় রূপ, শেষেরটি মৌলিক। 'কবিকাহিনী' এবং 'বল্লভপুরের রূপকথা' চরিত্রের দিক থেকে এই পর্যায়ের অন্তর্গত।

খানিকটা এর পরবর্তী পর্যায়ে, ১৯৬২-র 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে, যে-ধরনের নাটকের দেখা পাই আমরা সেগুলিতে ফর্মের সম্পূর্ণ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসেছে, প্রচলিত সুসংগঠিত নাটকীয় আখ্যান গড়ে তোলার পদ্ধতি বাদলবাবু বর্জন করেছেন, এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সংকট, শূন্যতা, স্ববিরোধ, আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিকতা, কিংবা স্বপ্ন ও দৈনন্দিনতার দ্বন্দ্বের বিষয় তাঁর নাটকের উপজীব্য হয়ে উঠছে। সংলাপে কখনও কখনও কবিতা আসছে এই পর্বে, যেমন 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'সারারাত্তির' (১৯৬৩)-এ—কবিতা দিয়ে ব্যক্তির খুব অন্তরঙ্গ কথাগুলিক প্রকাশ করবার চেষ্টা হচ্ছে। মূলত বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার অন্তঃসারহীন ছবিটি ফুটে উঠেছে এসব নাটকে। 'যদি আর একবার' (১৯৬৬) বিদেশী নাটকের ছায়ায় একটি হালকা রসের নাটক—এটিই এ ধারায় একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু বাকি নাটকগুলি, অর্থাৎ 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৭), 'শেষ নেই' (১৯৭৩), 'বাকি ইতিহাস', 'ত্রিংশ শতাব্দী' ইত্যাদিতে হালকা থিম আর নেই, বরং 'বাকি ইতিহাস' থেকেই একটি মানবিক দায়বদ্ধতার কথা জেগে উঠছে। মধ্যবিত্ত স্বার্থপরতা ও এই মানবিক দায়বোধের দ্বন্দ্বের ধারাটি এবার শুরু হচ্ছে, এবং একটি ছোট শ্রেণীর দ্বিধাসংকট ও তা থেকে জাত ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রশ্ন থেকে আস্তে আস্তে মানবিক দায়বোধের একটি স্পষ্ট, সক্রিয় প্রোগ্রাম তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এ থেকে বাদলবাবুর পরবর্তী 'কমিটমেণ্ট'-এর নাটকগুলিতে পৌঁছে যাওয়ার পথটি জটিল নয়। আহত অভিমান, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসা, তা থেকে এক ধরনের

প্রত্যয়ে উত্তরণের এই পথটিকে আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি। 'স্পার্টাকুস' (১৯৭২), 'প্রস্তাব' (১৯৭৩) 'মিছিল', 'ভোমা', (১৯৮১) 'বাসি খবর', 'সুখপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯৮১), 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', 'হট্টমালার ওপারে' (১৯৭৭) ইত্যাদি নাটক প্রসেনিয়াম মঞ্চ ছেড়ে আসার পর অঙ্গন মঞ্চের জন্য বিশেষভাবে লেখেন বাদলবাবু।

আমরা যেভাবে পরিষ্কার তিনটে পর্যায়ের ভাগ দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই বাদলবাবুর ক্ষেত্রে ঠিক তিনটি পরিচ্ছন্ন ধাপে এরকম বিবর্তন ঘটেনি। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তাঁর কাজের মধ্যে 'ওভারল্যাপিং' আছে, তা থাকাই সম্ভব।[৫] কিন্তু বাইরে থেকে যখন দেখি তখন এ তিনটি স্তর আলাদা হয়েই থাকে। একটা স্তর হালকা কমেডি রচনার, আরেকটা স্তর মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের নানা দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসের নানা সংকট বিষয়ে মনোযোগী, এবং তৃতীয় স্তর সোজাসুজি এক ধরনের প্রোপাগাণ্ডা থিয়েটারের নাটক তৈরি ও অভিনয়ের দ্বারা চিহ্নিত।

৩.

কিন্তু বাদল সরকার শুধু নাট্যকার নন, নাট্যকর্মীও বটেন। আমরা দেখব যে, তাঁর নাটকের দল সংগঠন ও নাটক পরিচালনা-প্রযোজনার অভিজ্ঞতা একদিকে, এবং অন্যদিকে তাঁর দেশবিদেশের নাটক দেখা ও বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ কীভাবে তাঁর নাট্যচিন্তার বিবর্তনে সাহায্য করেছে। তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে নানা জায়গায় বিস্তৃতভাবে বলেছেন বা লিখেছেন, ফলে আমরা মূলত তাঁরই বয়ান ধরে তাঁর নাট্যকর্মের বিবর্তনের পিছনকার পটভূমিটি গড়ে তোলবার চেষ্টা করব।

যখন বাদল সরকার কলকাতায়, মাইথনে এবং পরে আবার কলকাতায় শতাব্দী প্রতিষ্ঠা করে নাট্যকর্ম চালিয়েছেন তার প্রথম অংশে অন্তত ১৯৬৯-র আগে পর্যন্ত, যখন তাঁর কাছে থিয়েটার যে একটা অস্ত্র—এ প্রত্যয় তেমন করে জেগে ওঠেনি। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি সাক্ষাৎকারে[৬] তিনি বলেছেন, "ফলে যখন থিয়েটারটা নিয়েছি তখন যেন একটা বিকল্প পন্থার মতো নিয়েছি, থিয়েটার যে সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে ঠিক তেমনই বিশ্বাস থেকে থিয়েটারে আসিনি তখন। ভালো থিয়েটার করব, এটাই ছিল মূল লক্ষ্য, তার মধ্য দিয়ে কিছু সত্যকে তুলে ধরব, অতটা। সরাসরি সমাজপরিবর্তনের ব্যাপারটা

মাথায় ছিল না। এটা হল খানিকটা থিয়েটার সম্পর্কে পুরো বিশ্বাস না থাকার ফল। যখন আমি প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক করতাম তখন সত্যিই থিয়েটারের জোরটা অনুভব করতে পারিনি। বুঝিনি থিয়েটার কী করতে পারে।" শমীক একটু পরে এই কথাটির একটু ব্যাখ্যা করার ধরনে মন্তব্য করেছেন—"যখন আপনি প্রথম থিয়েটারে এসেছেন, প্রসেনিয়াম থিয়েটারে, সে সময় আমার মনে আছে, আপনার থিয়েটারের কাজ এবং আপনার রাজনৈতিক-ভাবাদর্শগত দায়বদ্ধতা বা দায়বোধ, এ দুটোর মধ্যে একটা বিভাজন বিদ্যমান ছিল। থিয়েটারে তখন আপনার শ্রেষ্ঠ কাজ ফার্স বা লঘু কমেডির ক্ষেত্রে।"[৭]

প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্গনমঞ্চে "নেমে আসা"-র দুটি সূত্র আছে। প্রথমত স্টেজবদ্ধ নাটকের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁর সক্রিয় অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটেছে দেশেবিদেশে নাটক দেখায়, বড় বড় নাট্যরথীদের সঙ্গে আলাপে, অন্যদিকে তাঁর নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে কতকগুলি আপতিক ঘটনাও ঘটেছে, যা তাঁর প্রসেনিয়াম ছাড়ার ইচ্ছেটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। এই সূত্রদুটিকে তিনি তাঁর *The Third Theatre* বইয়ে বেশ বিশদভাবেই বলেছেন। তার "A Thinking Process" নামক তৃতীয় অধ্যায়ে প্রসেনিয়াম মঞ্চের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁর ইতস্তত চিন্তার বিবরণ দিয়েছেন। এই চিন্তার কথা আমরা পরে আরও বিস্তৃতভাবে বলব, এখানে তার মূল সূত্রগুলি হল—স্বভাববাদী কিংবা বাস্তববিশ্বের সেট-সেটিং-এর ব্যবহার করে নাটক করার এখন আর কোনো অর্থ হয় না, এই ফিল্‌ম আবিষ্কারের পরে। এখন বাস্তবিকতার রস ফিল্‌ম যেভাবে দিতে পারে, থিয়েটার তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। কিন্তু থিয়েটারের সুবিধে এই যে থিয়েটারের অভিনয় জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে—এখানে "a live person communicates directly to another live person.[৮] ফিল্‌মে তা সম্ভবই নয়। দু নম্বর হল, থিয়েটারের যারা দর্শক, তারা প্রত্যাশাও করে না ওই নিখুঁত বাস্তবিকতা নাটকের কাছে। প্যাকিং বাক্সের স্তূপ দিয়ে পর্বত বোঝানোর চেষ্টা করা হয় নাটকে, তাকে দর্শকেরা শুধু মেনে নেয় তাই নয়, তা থেকে তারা একটা বাড়তি মজাও ("extra kick") পেয়ে যায়। তৃতীয়ত, অভিনেতার শরীর, স্বর ও ব্যক্তিত্বকে থিয়েটারের শর্ত মেনে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়, ফিলমে তা যায় না। অর্থাৎ শরীরের একটা যোগ্য ভাষা তৈরি করা যায়। চতুর্থত, সিনেমার তুলনায় খরচ দারুণ কমিয়ে আনা যায় থিয়েটারে। সেই সঙ্গে মঞ্চ ভেঙে, আলোকিত বৃত্ত তুলে দিয়ে

দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের দূরত্বটিকেও উধাও করে দেওয়া যায়।

অথচ এই সব সুবর্ণ-সম্ভাবনাগুলিকেই প্রসেনিয়াম থিয়েটার এতদিন উপেক্ষা করে এসেছে। ভারতে এটা আরও বিস্ময়কর লেগেছে বাদলবাবুর কাছে, কারণ ভারতে আছে লোকনাট্যের বিপুল বৈচিত্র্য।

'দ থার্ড থিয়েটার' থেকে আমরা জানতে পারি,—এই চিন্তাগুলি বাদলবাবুর মনে আগেই তৈরি হয়েছিল, পরে যাত্রা, তামাশা, ভাওয়াই, নৌটঙ্কী, কথাকলি, ছউ ও মণিপুরী নাট্য ও নৃত্য দেখে এই চিন্তার ভিত্তি আরও সবল হয়। লণ্ডনে ১৯৫৭ আর প্যারিসে ১৯৬৩-তে তিনি থিয়েটার-ইন-দ-রাউণ্ড ধরনের মঞ্চে নাটক দেখেন, সেই সঙ্গে দেখেন জোয়ান লিটলউডের নাটক ওই লণ্ডনেই, ১৯৬৯-এ দেখেন মস্কোর তাগাঙ্কা থিয়েটারে ইয়ুরি ল্যুমিবফ্-এর প্রযোজনায় 'দ গুড্ পার্সন অফ সেৎজুয়ান,' 'গালিলেও,' 'টেন ডেজ দ্যাট শুক দ ওয়ার্লড'; ওখানেই গোর্কির 'মা'-এর রিহার্সাল দেখারও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এ ছাড়া দেখেন প্রাহাতে সিনোহেরনি ক্লাব-এর নানা প্রযোজনা আর ইয়ারি (Jari)-র মূকাভিনয়। আরও দেখেন পোলাণ্ডের ব্রোক্ল-তে থিয়েটার ল্যাবরেটরি-তে ইয়ার্জি গ্রোটাউস্কির নাটক Apocalypsis cum Figuris। এই সব নাট্য-কর্ম দেখার পাশাপাশি তাঁর আলোচনা করবারও অবকাশ ঘটেছে বিভিন্ন নাট্যপ্রযোজক-পরিচালকের সঙ্গে। গ্রোটাউস্কির সঙ্গে একটি দীর্ঘ ইনটারভিউর কথা তিনি বিশেষভাবে বলেছেন। পরে ১৯৭১-র জুন থেকে ১৯৭৩-র মে পর্যন্ত জবাহরলাল নেহরু ফেলোশিপের সহায়তায় তিনি আবার বিদেশে গিয়ে প্রসেনিয়াম-বিদ্বেষী রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে কাজ করেন, আলোচনা করেন লিভিং থিয়েটারের জুলিয়ান বেক আর তাঁর স্ত্রী জুডিথ ম্যালিনা-র সঙ্গে। ততদিনে অবশ্য তাঁর নিজের প্রসেনিয়াম ভাঙার কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। পরের অধ্যায়েই দেখি তিনি খবর দিচ্ছেন ১৯৬৯-তে তাঁর শতাব্দী দলটির পুনর্গঠনের—আমাদের মনে আছে যে এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৭-তে। কিন্তু প্রথম দিকে প্রসেনিয়ামেই নাটক করেছে শতাব্দী, বাদলবাবুর জনপ্রিয় কমেডিগুলির সফল অভিনয় আমরা দেখেছি তাদের।

প্রথম বড় পরিবর্তন ঘটল ১৯৭১-এ। বাদলবাবু গৌরকিশোর ঘোষের বড় গল্প 'সাগিনা মাহাতো'র নাট্যরূপ দিলেন প্রসেনিয়াম মঞ্চের বাইরে অভিনয়ের জন্য। তাঁর আগের নাটকাবলি থেকে 'সাগিনা মাহাতো'র তফাত এইখানে যে, এতে অঙ্ক আর দৃশ্যের ভাগ রইল না, সময়ক্রম ভেঙে দেওয়া হল,

স্থানমাত্রাও সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। একই সঙ্গে একই অভিনয়ক্ষেত্রে নানা জায়গা বোঝানো হল। এতে জোর দেওয়া হল দলগত অভিনয়, মূকাভিনয়, ছন্দবদ্ধ গতিভঙ্গি, গান আর নাচের উপর, তাতে উচ্চারিত ভাষার গুরুত্ব অনেক কমিয়ে আনা গেল। সেট বলতে বোঝাল কতকগুলি সহজে তৈরি আর বহন করার মতো দু তিন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা নিচু বাক্স জাতীয় প্ল্যাটফর্ম।

'সাগিনা মাহাতো' প্রসেনিয়াম মঞ্চেও কয়েকবার হয়েছিল, কিন্তু এই নাটক থেকেই বাদলবাবু প্রসেনিয়াম ত্যাগ করার তাগিদ বোধ করলেন। ১৯৭১-এর ২৪ অক্টোবর তারিখে মধ্য কলকাতার এবিটিএ হলে তাঁর প্রথম প্রসেনিয়াম-ভাঙা অভিনয় হল।[৯] চেয়ারগুলিকে তাঁরা হলের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিলেন, কিছু রাখলেন স্টেজের উপর। চারপাশে দর্শকদের বসবার জায়গা হল, মাঝখানটা হয়ে গেল ফাঁকা অভিনয়ের জায়গা। তবে দর্শকদের বসবার জায়গার আশেপাশেও প্রচুর জায়গা ছিল। ফলে অভিনেতারা শুধু মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় অভিনয় করছেন তা নয়, তাঁরা দর্শকদের পাশে বা পিছন দিয়েও চলাফেরা করে অভিনয়ক্ষেত্রকে অনেকটা বিস্তারিত করে নিলেন, দর্শকরা হয়ে উঠলেন কিছুটা অভিনয়েরই অন্তর্গত।

এখান থেকেই আরম্ভ হল 'অঙ্গনমঞ্চে'র অভিনয়। অঙ্গনমঞ্চ বাদলবাবু প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটারের এক "বিশেষ রূপ", আর একটি রূপ যেমন 'মুক্তমঞ্চ'। বাদলবাবুর কথায় অঙ্গনমঞ্চের "রূপটি হোলো একটি ঘনিষ্ঠ থিয়েটারের, যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক দর্শক অভিনেতাদের খুব কাছে আছে, একই তলে আছে, একই আলোয় আছে ; যেখানে দর্শকদের সামনে ছাড়াও পাশে পিছনে যাওয়া যাচ্ছে, দর্শকদের চোখে চোখ রেখে একান্তে কথা বলা যাচ্ছে, দর্শকদের ধরাছোঁয়ার আওতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।"[১০]

অঙ্গনমঞ্চের ধারাবাহিকতায় এর পরে অল্প একটু ছেদ পড়ে। পরের বছর জুনে (১৯৭২) শতাব্দী অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তিন তলায় ৮৫০ বর্গফুটের মতো একটি মেঝে পায় নাটকের জন্য। ৫ নভেম্বর তারিখে উদ্‌বোধনের দিন তাঁরা কোনো নাটক করেননি, কিন্তু আগ্রহী দর্শক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে একটি প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন করেন, এবং ৫ থেকে ৭ নভেম্বর বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তাঁরা একটা 'ওপ্‌ন হাউজ' অর্থাৎ খোলা আমন্ত্রণ গোছের ব্যাপার করেন। এখানে তাঁরা শুভানুধ্যায়ী কিছু

দর্শক-সদস্য নিয়ে একটি অন্তরঙ্গ কমিউনিটি থিয়েটার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন। প্রথম পর্যায়ে ৩২৫ জন সাধারণ সদস্য আর ১৪ জন আজীবন সদস্য গৃহীত হয়। এঁরা বছরে একটা চাঁদার বিনিময়ে (প্রথম ৩০০ সদস্যের জন্য ভর্তি ফি চার টাকা, বার্ষিক চাঁদা ছ টাকা, পরের ২০০ সদস্যের জন্য ভর্তি ফি ছ-টাকা), যে-কোনো তিনটি অভিনয় দেখতে পাবেন। তার পরে প্রতি শো-র জন্য তাঁদের এক টাকা করে দিতে হবে, আর যদি তাঁরা কোনো অতিথি নিয়ে আসেন তাঁদের দর্শনী দিতে হবে তিন টাকা। আর যিনি সদস্য নন এমন একক দর্শকের দর্শনী পাঁচ টাকা, কিন্তু মঞ্চে সিট থাকলে তবেই তাঁকে টিকিট দেওয়া যাবে। আজীবন সদস্যের চাঁদা দুশো টাকা।

অ্যাকাডেমিতে অঙ্গনমঞ্চের অভিনয় শুরু হল বাদলবাবুর লেখা 'স্পার্টাকুস' নাটক দিয়ে। ১২ নভেম্বর ১৯৭২ থেকে প্রতি রবিবার।

অ্যাকাডেমির অঙ্গনমঞ্চের বৈশিষ্ট্য কী ছিল? বাদলবাবু তাঁর ইংরেজি বইটিতে আসবাব, আলো, ধ্বনি, আসন—এই চারটি ভাগে ভাগ করে তার আলোচনা করেছেন। অভিনয়ে ব্যবহৃত আসবাব সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, দর্শকরা যেহেতু চেয়ারে বসছে বিশেষ বিশেষ জায়গায়, সেহেতু অভিনয়ে কোনো চেয়ারের ব্যবহার হয়নি। ব্যবহার হয়েছে 'লেভেল' বা স্তরের—তিনটি পৃথক উচ্চতার (দশ ইঞ্চি, আঠারো ইঞ্চি আর আঠাশ ইঞ্চি) বেঞ্চ ধরনের আসবাবের। আলোতে বিশেষত্ব এই ছিল যে, উপর থেকে বিশেষ ধরনের 'শেড' দেওয়া ষোলোটি বালব্ জ্বলত—১০০, ৬০ আর ৪০ ওয়াটের। ডিমার স্পট ইত্যাদির ব্যবহার হয়নি। তারের সাহায্যে আলোর মুখ এদিক-ওদিক সরানো চলত। সাধারণ এই ঢালা আলোর ব্যবহারের সাহায্যে নাটক করার চেষ্টার পিছনে যে একটা ঘটনা আছে, তার কথা বাদলবাবু সবিস্তারে বলেছেন তাঁর এ বইয়ে। 'সাগিনা মাহাতো'র অঙ্গনমঞ্চে প্রথম অভিনয়ের দিনই নাটকের একটা বিশেষ আকর্ষক মুহূর্তে এবিটিএ হলের আলোর ফিউজ পুড়ে যায়। এই নাটকে স্পটলাইটের ব্যবহার করছিলেন তাঁরা। আধ মিনিটের মতো সম্পূর্ণ অন্ধকার, তাতেই অভিনয় চলছে—এমন সময়, নাটকের স্পটলাইট নয়, হলের সাধারণ আলো—এখানে ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লাগানো কয়েকটা ফ্লুরেসেণ্ট টিউব লাইট জ্বলে উঠল, প্রায় পাঁচ মিনিট এই ঢালা আলোতেই অভিনয় চলল, তারপর জ্বলে উঠল স্পটলাইটগুলি। পরে বাদলবাবুরা যখন দর্শকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন তখন বুঝতে পারলেন যে দর্শকরা আলোর ওই হেরফের নিয়ে বিন্দুমাত্র

মাথা ঘামাননি, তাঁরা যেমন নাটক দেখার তেমনই দেখে গেছেন। তখন বাদলবাবুর এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হল যে, অঙ্গনমঞ্চের নাটকে অভিনয়ের সঙ্গে দর্শকদের সংলগ্নতা ("Involvement") আরও বেশি, ফলে পরের অভিনয়গুলিতে আলোর ব্যবস্থা আরও সরল করার সাহস পেলেন তাঁরা।

ধ্বনির বিষয়ে দেখা গেল যে, অ্যাকাডেমির ওই ঘরটাতে প্রতিধ্বনি হয়। তখন তাঁরা একটু ভাঁজ-করা চটের পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন খালি দেওয়ালগুলির উপর। ব্যাপারটাতে কাজও হল চমৎকার, আবার জিনিসটা দর্শনীয়ও হল।

দর্শকের আসন তাঁরা আলাদা আলাদা নাটকে আলাদা আলাদা ভাবে বিন্যাস করতেন, মাঝখানের অংশে মেঝেটাকে ফাঁকা রেখেই। এতে অভিনেতা-দর্শকদের সম্পর্কের মধ্যে বেশ একটা সচলতা এল। বাদলবাবু তাঁর ইংরেজি বইটির ২৮ ও ৫৬ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে 'সাগিনা মাহাতো', 'স্পার্টাকুস' ও অঙ্গনমঞ্চে করা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের মঞ্চ ও দর্শকের আসন পরিকল্পনার নক্‌শা দিয়েছেন; তার কোনো কোনো নাটকের বইয়েও—যেমন 'মিছিল'-এ[১১] মঞ্চ পরিকল্পনার নক্‌শা আছে। তাঁর ইংরেজি বইটিতে 'প্রস্তাব' নাটকের অভিনয় আর মঞ্চ পরিকল্পনার বর্ণনাও দিয়েছেন এইভাবে—Platforms were laid in the shape of a 'T' on the floor. The spectators were let in one by one, and they found me spread-eagled on the platform, blindfolded, with my wrists and ankles tied with strong ropes. The ropes stretched to the four corners of the room, with the other ends secured to the walls. There were one strong light on the top of the platforms[১২]. এই ধরনের অভিনয়-ক্ষেত্র আর দর্শকবিন্যাসের ফলে যে অভিনেতা আর দর্শকদের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ, অন্তরঙ্গ যোগ তৈরি হয়ে যায়—এ কথা বাদলবাবু বারবার করে বলেছেন।

থার্ড থিয়েটারের একটি বিশেষ রূপ যেমন অঙ্গনমঞ্চ, তেমনই আরেকটি বিস্তার হল 'মুক্তমঞ্চ'। মুক্তমঞ্চ হল চার দেওয়ালের বাইরে খোলা জায়গায় থার্ড থিয়েটারের নাটকের অভিনয়ক্ষেত্র। সাম্প্রতিককালে নির্বাচনী নাটকের বাইরে মাঠে, ময়দানে নিয়মিত নাটক করারও যে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তা বাদলবাবুরা আরম্ভ করেননি কিন্তু পরবর্তীকালে বাদলবাবুর থার্ড থিয়েটার-পন্থীরাই সেই আন্দোলনে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১ নাগাদ কার্জন পার্ক বা সুরেন্দ্রনাথ পার্কে সিলুয়েট নাট্যগোষ্ঠী প্রতি শনিবার খোলা মাঠে নিয়মিত নাটক

করতে আরম্ভ করে। বাদলবাবুরা শিলুয়েট দলকে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান, অন্যদিকে শিলুয়েটও শতাব্দীকে সুরেন্দ্রনাথ পার্কে অভিনয়ের আমন্ত্রণ জানায়। তাতে সাড়া দিয়ে ১৭ই মার্চ ১৯৭৩ তারিখে তারা সেখানে 'স্পার্টাকুস' অভিনয় করেন। এ অভিনয় সম্বন্ধে বাদলবাবুর মনে নানা সংশয় ছিল, অঙ্গনমঞ্চের অন্তরঙ্গ দর্শকঘনিষ্ঠতা না থাকায় মূলত মজা দেখতে দাঁড়িয়ে-যাওয়া পথচারী দর্শকদের কাছে সে নাটক কেমন লাগবে সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু পাঁচশোরও বেশি লোক নিঃশব্দ হয়ে সে অভিনয় দেখল, এবং বাদলবাবু লক্ষ করলেন দর্শকদের যতটা বিক্ষিপ্ত ভাবা গিয়েছিল তারা ততটা বিক্ষিপ্ত নয়। 'স্পার্টাকুস'-এর সেই সফল অভিনয়ের, বাদলবাবুদের প্রথম 'মুক্তমঞ্চে' অভিনয়ের চৎকার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন—

The performers found a new kind of involvement. The grass-covered earth, the sun in the sky, the people sitting on the ground,—all these gave a new meaning to the play, particularly (for) those who had the role of slaves. The bits of dry grass and patches of dirt on the bare bodies of the slaves covered with sweat, accentuated by the spots of blood from the scratches caused by pebbles on the ground, made it a play of blood and sweat as it was supposed to be."[১৩]

বাদলবাবু যাকে 'মুক্তমঞ্চ' নাম দিয়েছেন, তার জন্ম এখানেই হল বলা চলে। যদিও ঐতিহাসিকতার দিক থেকে 'মুক্তমঞ্চ' প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁর নয়, কিন্তু তাকে থার্ড থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করা, থার্ড থিয়েটারের আর একটি সম্প্রসারণ হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা দেওয়া, বলা যেতে পারে থার্ড থিয়েটারের জন্য মুক্তমঞ্চের ধারণাকে আত্মসাৎ করা—বাদলবাবুর কৃতিত্ব। তিনি এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, "তৃতীয় থিয়েটারের আর একটি রূপ আছে। নমনীয়, বহনীয় এবং সুলভ বলে তৃতীয় থিয়েটারকে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে গ্রামের মাঠে বা হাটে, বস্তির আঙিনায়, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বাগিচায়। সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'হাজার পাঁচ হাজার মানুষ জড়ো হওয়া বিচিত্র নয়। অভিনয়ের ক্ষেত্র আর দর্শকদের আসনে সম্পর্ক ইচ্ছামতো নির্ধারিত করবার উপায় থাকে না সেখানে অনেক সময়েই, ঘনিষ্ঠ থিয়েটারের মতো ধরা-ছোঁয়ার

আওতায় পাওয়া যায় না বেশির ভাগ দর্শককে।" এটুকু বলার পর বাদলবাবুর মনে হয়েছে এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, তবু কি এ তৃতীয় থিয়েটার থাকবে—যেখানে দর্শক আর অভিনেতা এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছে? বাদলবাবু সে প্রশ্ন নিরস্ত করে জোর দিয়ে বলেন, "অবশ্যই তৃতীয় থিয়েটার। তৃতীয় থিয়েটারের আর একটি রূপ সেটা······। অঙ্গনমঞ্চের চেয়ে এর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য কম নয় কোনো মতেই। অঙ্গনমঞ্চে ঘনিষ্ঠতার কারণে যোগাযোগের যে তীব্রতা যে গভীরতা লাভ করেছি, তা হয়তো হারাচ্ছি মুক্তমঞ্চে, কিন্তু তা পুরণ হয়ে যাচ্ছে একটি ঘটনায়। সেটা হলো—অঙ্গনমঞ্চে দর্শকদের নিমন্ত্রণ করে আনতে হচ্ছে নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, আর মুক্তমঞ্চে নাট্যগোষ্ঠী চলে যেতে পারছে দর্শকদের কাছে। মানুষ দর্শক হয়ে বিশেষ স্থানে আসবে, এ অপেক্ষায় না থেকে, যেখানে মানুষ থাকে, কাজ করে, সেইখানে নিজেরাই পৌঁছে থিয়েটার করে তাকে দর্শকে পরিণত করা যাচ্ছে। অনেক ব্যাপক হচ্ছে থিয়েটারের ক্ষেত্র, বিষয়বস্তু পৌঁছে দেবার ক্ষেত্র।"[১৪]

বাদলবাবুরা যে এখনও মুক্তমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেন তার সংবাদ দুর্লভ নয়। বরং কলকাতা শহরেই তাঁদের অভিনয় মাঝে মাঝে অনিয়মিত ও বিরল হয়ে পড়েছে। আমরা লক্ষ করি, বাদলবাবুর কোনো কোনো নাটক গ্রামেই প্রথম অভিনীত হয়েছে, যেমন 'মিছিল' অভিনীত হয়েছিল রামচন্দ্রপুর গ্রামে, ১৯৭৪ সালের ১৪ই এপ্রিল। বাদলবাবুর একটি লেখায় "সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কিনারায় একটি গণ্ডগ্রাম" (রাঙ্গাবেলিয়া?), "বর্ধমান জেলার কাপাসটিকুরি", "উত্তর চব্বিশ পরগনার সুটিয়া", "রামচন্দ্রপুর" ইত্যাদি নাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেখতে পাই, বুঝতে পারি তাঁর মুক্তমঞ্চ বেশ ছড়িয়ে আছে গ্রামাঞ্চলে।

৪.

আমরা এবার একটু পিছিয়ে যাই। থার্ড থিয়েটারের দুটি রূপের পরিচয় আমরা নিয়েছি উপরে, কিন্তু থার্ড থিয়েটার কী, থার্ড থিয়েটার কেন—এইসব নানা প্রাথমিক প্রশ্ন এখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

'থার্ড থিয়েটার' কথাটি যে বাদলবাবুর নিজের সৃষ্টি নয় একথা আমি আগে অন্যত্র দেখিয়েছি, পরে রফিকুল ইসলাম ছদ্মনামের ব্যক্তিটিও এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১৫] মার্কিনি নাট্য-সমালোচক রবার্ট ব্রুস্টাইনের এই নামে

একটি বই বেরিয়েছিল ১৯৬৯ সালে,[১৬] ওই নামের মূল প্রবন্ধটি লেখা ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ব্রুস্টাইন বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের থিয়েটারের কথা। সেদেশের নাটকের দুটি ধারা—দুটি চরম ধারা চলছিল—"excessive lightness" আর "excessive heaviness-এর, একদিকে চিন্তাহীন বক্তব্যহীন ফুর্তিসন্ধানী কমেডি, অন্যদিকে মূলত বুদ্ধিজীবী নাট্যগোষ্ঠীগুলির গম্ভীরমুখ বক্তব্যপ্রধান নাটক। আবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্লান্তিকর নাট্যকর্মের তুলনায় ইংল্যাণ্ড আর ইয়োরোপের জীবন্ত নাট্যপ্রযোজনার কথাও স্মরণ করেন ব্রুস্টাইন। যাই হোক, ওয়াশিংটনের লিংকন সেন্টারে একদিকে reality-পন্থী এবং অন্যদিকে joy-পন্থী—মার্কিনি নাট্যজগতের দুই warring faction-এর সঙ্ঘর্ষ লক্ষ করেছেন তিনি, বলেছেন যে, সরকারি সংস্কৃতির দোকানে (অর্থাৎ লিংকন সেনটারে) এ দুয়ের সংশ্লেষ (synthesis) হওয়া সম্ভব নয়। তার পরেই জানাচ্ছেন, "Fortunately, America has a third theatre, supported primarily by the young, which combines the youthful properties of intensity, exuberence and engagement."[১৭] তিনি বলছেন জুলিয়ান বেক আর জুডিথ ম্যালিনার লিভিং থিয়েটারের কথা, বলছেন ভিয়েতনামের "অসহনীয়" যুদ্ধের বিরোধী তরুণদের সজীব নাট্যকর্মের কথা। বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন 'ভিয়েট্রক্', 'ডাইনামাইট টুনাইট' এবং 'ম্যাকবার্ড' নাটকের।

সম্প্রতি দেখছি ডেনমার্কের নাট্যপরিচালক ইউজেনিয়ো বারবা (Engenio Barba)-ও থার্ড থিয়েটার কথাটিকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাছে প্রথম থিয়েটার হল "the commercial and subsidized theatre", দ্বিতীয় থিয়েটার হল "the established avant-garde"। প্রথম থিয়েটার তাঁর মতে "blooming but deadly," আর দ্বিতীয় থিয়েটার "has abandoned the actor for the director." কিন্তু তাঁর থার্ড থিয়েটার মানুষের অন্তর্জীবনের বাণী নিয়ে দর্শকদের আক্রমণ করে, বুদ্ধি বা চিন্তা দিয়ে নয়, দর্শক এক গভীরতার উপলব্ধি দিয়ে সে বাণীকে পায়। বার্বা-র মতে গ্রোটাউস্কি-র কাজেই এই থিয়েটার তার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি লাভ করেছে,[১৮] পিটার ব্রুকের কাজেও তার আভাস মিলেছে। সে থার্ড থিয়েটারের আরও কিছু লক্ষণ দিয়েছেন বারবা, তার জন্য Roose-Evans-এর বইটি দ্রষ্টব্য।

বলা বাহুল্য, বাদলবাবুর থার্ড থিয়েটার সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে তিনি শুধু

একটি নাম যদি নিয়ে থাকেন ক্রুস্টাইনের সূত্র থেকে, তাতে তাঁর কৃতিত্বের হেরফের হয় না, তাঁর কাজের মূল্যও কমে না। ক্রুস্টাইনের থার্ড থিয়েটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ স্থান ও মুহূর্ত নির্ভর, বাদলবাবুর থার্ড থিয়েটার ভারতবদ্ধ।

সে বিষয়টি বাদলবাবুই আমাদের বিশদ করে বুঝিয়ে দেন। তাঁর ইংরেজি বই 'দ থার্ড থিয়েটার' এবং বাংলা 'থিয়েটারের ভাষা'তে, অন্যান্য বেশ কিছু প্রবন্ধে ও সাক্ষাৎকারে।

বাদলবাবুর মতে থার্ড থিয়েটার একটি 'দর্শন', একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব। এর পিছনে আছে ভারতের বর্তমান রাজনীতি-অর্থনীতি, বিশ্বগত রাজনীতি-অর্থনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তা, এবং সেই সঙ্গে একটি praxis বা প্রয়োগের প্রকল্প। বাদলবাবুর দর্শনের এই প্রয়োগাত্মক দিকটিই হল থার্ড থিয়েটার। তাঁর রচনার বক্তব্য বা content এর মধ্য থেকে তাঁর দর্শন বেরিয়ে আসে, আর তাঁর ফর্ম সেই বক্তব্যকেই তীক্ষ্ণ, তীব্র ও অবশ্যগ্রাহ্য করে তোলে—এমনই তাঁর দাবি। অর্থাৎ তাঁর কনটেণ্টই তাঁর ফর্মকে ডেকে এনেছে, এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। তাঁর কনটেণ্টকে তাঁর ফর্ম ছাড়া অন্য কোনো রীতিতে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। এই সূত্রে এমন প্রশ্ন হয়তো করা সম্ভব যে, ফর্ম ও কনটেণ্টকে যদি বাদলবাবু এমনই অচ্ছেদ্য ও পরিণয়বদ্ধ বলে মনে করেন তবে কী করে 'সাগিনা মাহাতো', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' 'বল্লভপুরের রূপকথা'কে আগে প্রসেনিয়ামে করবার পর আবার থার্ড থিয়েটারের জন্য ভেঙে নেন, যেমন নেন গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন'কে বা ব্রেশ্‌টের 'ককেশিয়ান চক সার্ক্‌ল'-কে 'গণ্ডী' নাটকে। এই ইঙ্গিতই কি তাহলে করতে হবে তাঁকে যে গিরিশচন্দ্র বা ব্রেশ্‌ট তাঁদের যথার্থ ফর্মটি খুঁজে পাননি, কেবল থার্ড থিয়েটারের মধ্যে দিয়েই সে সব নাটকের প্রগাঢ় মূল্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে? আমরা এই তাত্ত্বিক কচকচির মধ্যে না গিয়ে থার্ড থিয়েটারের প্রয়োগাত্মক দিকটি আগে বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

বাদলবাবুর নাট্যরীতি যদি তৃতীয় থিয়েটার হয় তাহলে প্রথম আর দ্বিতীয় থিয়েটার কী? গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গড়ে-ওঠা লোকনাট্য হল প্রথম থিয়েটার। ভারতের শহুরে থিয়েটার, যে-থিয়েটার মূলত ইংরেজের থিয়েটারের অনুকরণে তৈরি হয়েছে, এবং ইয়োরোপীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এবং নাট্যরচনার সমস্ত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছে, তাই হল দ্বিতীয় থিয়েটার।

বাদলবাবুর মতে দুয়ের নিজস্ব শক্তি যেমন আছে তেমনই দুর্বলতাও প্রচুর। শহুরে থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কথা বাদলবাবু খুব সবিস্তারেই বলেন—আমরা সেগুলিকে পরে লক্ষ করব। গ্রামীণ থিয়েটারের দুর্বলতা হল তাতে পশ্চাদ্‌মুখী মূল্যবোধের রক্ষণ—"the ideas and the themes...... remain mostly stagnant and sterile, unconnected with their own problems of emancipation—social, economic and cultural"[১৯] 'থিয়েটারের ভাষা'তে আরও স্পষ্ট করেন কথাটিকে—"...... লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ পিছিয়ে থাকা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধে ভারাক্রান্ত। দেবদেবীর জয়গান, রাজারাজড়ার উপাখ্যান সেখানে। অর্থাৎ এ জীবনে উপবাস অত্যাচার অবিচার সবই ঈশ্বরের লীলা বা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ধরে নিয়ে সহ্য করা, পরলোকে বা পরজন্মে মুক্তি আছে, সুখ আছে। অথবা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, রাজভক্তি পরমধর্ম, সুতরাং রাজা খারাপ হলে একমাত্র পথ হোলো ভালো রাজা আনা, এবং সেটাও ঈশ্বর করবেন, প্রজাদের কিছু করবার নেই। এ ছাড়া আছে সতীসাধ্বী স্ত্রী ও সর্বংসহা মাতার উজ্জ্বল চিত্র এঁকে এদেশের মেয়েদের প্রকৃত অবস্থাটা—পুরুষপদানত, নিকৃষ্ট, গৃহবন্দী, সামাজিক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অবস্থাটা—সুন্দর মোড়কে ঢেকে রাখা।"[২০] এ বইয়ের অন্যত্র যাত্রার বিষয়ে ইঙ্গিত করে তিনি বলছেন যে, লোকনাট্য "নাট্য-ব্যবসায়ীদের বিক্রয়পণ্যে পরিণত হচ্ছে"।[২১] সুতরাং বাদলবাবুর লক্ষ্য হল এ দুইয়ের বাইরে তৃতীয় একটি থিয়েটারের প্রবর্তন—"What we need to do is to analyse both the theatre forms to find the exact points of strength and weakness and their causes, and that may give us the clue for an attempt to create a Theatre of Synthesis—a third theatre.[২২] এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বাদলবাবু প্রথম আর দ্বিতীয় রীতিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণ অভিনব ও অভাবিত কোনো নতুন থিয়েটারের সৃষ্টি করতে চান না, বরং দুয়ের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলিকে বর্জন করে, এবং দুয়ের 'মিলন' বা 'সিনথেসিস' ঘটিয়ে তাঁর তৃতীয় থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। ফলে থার্ড থিয়েটার প্রসঙ্গে তিনি 'a theatre of synthesis' কথাটা একাধিকবার ব্যবহার করেন, বলেন তাঁর চেষ্টা হবে "to create a link between the two...[২৩]

কিন্তু যখন থার্ড থিয়েটারের আপেক্ষিক সুবিধাগুলি নির্দেশ করেন বাদলবাবু,

তখন তিনি পাশে দাঁড় করান শহুরে থিয়েটারকে। বিশেষ করে শহুরের থিয়েটারের যে-অংশ প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত, তাকে। প্রথমত এই থিয়েটারের —গ্রুপ থিয়েটারের, গণনাট্য ধারার—সামাজিক-রাজনৈতিক সদুদ্দেশ্য বা সৌকর্য সম্বন্ধে যেমন, তেমনই তার দর্শকদের আন্তরিকতা সম্বন্ধেই তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে। তিনি বলেন, "শহরের থিয়েটারে প্রগতিশীল ভাবধারার প্রকাশ যতোই হোক, মধ্যবিত্ত দর্শকের মনে বড়ো জোর একটা মানসিক উত্তেজনা ঘটে, বিবেকের তুষ্টি ঘটে, বিশেষ কোনো সক্রিয় ভূমিকা সে নিতে পারে না সমাজ পরিবর্তনের কাজে।"[২৪]

৫.

এইবার নেহাৎ প্রাকরণিক দিক থেকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যে বিষয়গুলি বাদলবাবুর কাছে তার সীমাবদ্ধতা বলে মনে হয়েছে, সেগুলি লক্ষ করা যাক। বাদলবাবুর মতে প্রসেনিয়ামের যেটি প্রধান ত্রুটি তা হল, অভিনেতা আর দর্শকের মধ্যে এক স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের স্থাপত্য তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন; দেখেছেন যে, প্রথমত অভিনয়স্থল যে-স্টেজটি, সেটি দর্শকদের আসনের চেয়ে উঁচু জমিতে থাকে, খানিকটা 'নিরাপদ দূরত্বে'। অভিনেতারা আর দর্শকরা পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান করে নাটক চলার সময়, ওই দূরত্ব মাঝখানে রেখেই। যেন দুটো অপরিচিত ও আলাপহীন সম্প্রদায়। স্টেজের ওই ছবি-ফ্রেম আর পর্দা অভিনেতাদের আরও আলাদা করে দেয়। বাদলবাবু পরে যোগ করেন যে, নাট্যগৃহের অন্যত্রও অভিনেতা আর দর্শকের সহজ মেলামেশার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। গ্রিন-রুম আর উইংসের ভিতরটা থাকে অভিনেতাদের দখলে, অন্যদিকে লবি থেকে বুকিং অফিসে দর্শকদের সঞ্চারণ—দুয়ের মেলবার জায়গা কই? কাজেই অভিনেতাদের কাছে দর্শকরা হল মুখহীন পরিচয়হীন এক মানবস্তূপ মাত্র, আর দর্শকের কাছে অভিনেতারা এক নির্বাচিত কুশলী কলাবিদ্, তাদের বিনোদনসৃষ্টির কর্তা। তারা কেউ কারও কাছে জ্যান্ত মানুষ নয়, তারা সোজাসুজি কথা বলতে পারে না পরস্পরের কাছে। বাদলবাবু বলেন, "থিয়েটার তো একটা ত্রৈমাত্রিক জিনিস। এভাবে তাকে দ্বিমাত্রিক করে দুর্বল করা হল।" এর মূলে আছে ধনতন্ত্রের দান—এই ছবি-স্টেজ ধনতন্ত্রের সমবয়সী।[২৫]

ওই Level আর location-এর বিচ্ছেদের সঙ্গে থাকছে আলো দিয়ে তৈরি

করা বিচ্ছেদ। দর্শকরা থাকছে অন্ধকারে, অভিনেতারা আলোকিত বৃত্তে। যেন অভিনেতাদের বুঝতে দিতে নেই যে দর্শকেরা হাজির সেখানে, দর্শকদের যেন নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিতে হবে অভিনেতাদের জন্য, এমন-কী এক দর্শক যেন বুঝতে পারবে না তার পাশে আছে আরও একজন, আরও অনেক দর্শক।

হয়তো এরই সঙ্গে বাদলবাবু যোগ করতে পারতেন অভিনেতাদের চরিত্রানুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ আর রূপসজ্জার কথা—যা দর্শক থেকে তাদের আরও বেশি করে আলাদা করে দেয়। বাদলবাবু তারও মাত্রা কমিয়ে এনেছেন তৃতীয় থিয়েটারের নাটকে, এবং নাটকের চরিত্রের সম্ভাব্য পোশাকের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা খুব কম ক্ষেত্রেই করেছেন। অর্থাৎ অনুকরণাত্মক বা mimetic সাজসজ্জা একরকম বর্জনই করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত 'স্পার্টাকুস'। রোমান সেনেটরের পোশাকে যেমন বাদলবাবু শাদা পাজামা পাঞ্জাবির উপর একটি হাতকাটা কলারহীন জহর-কোট ধরনের পরে নেন, তেমনই তাঁর সঙ্গিনী বাঙালি নারীর শাড়ি-পড়া পোশাকেই দিব্যি অভিনয় করে যান, তাতে দর্শকের বিষয়টা অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

অভিনেতা আর দর্শকদের মধ্যবর্তী দূরত্বের এই বেড়া ভাঙবার জন্য বাদলবাবুদের বেশ কিছু সক্রিয় প্রোগ্রাম নিতে দেখি। অভিনয়ের পরে তাঁরা দর্শকদের সঙ্গে আলোচনা করেন নিয়মিত, যেমন করেছিলেন এবিটিএ হলে ওই আলোর ফিউজ হঠাৎ পুড়ে যাবার পর। অ্যাকাডেমির তিনতলায় অঙ্গনমঞ্চের নাটক হিসেবে 'স্পার্টাকুস'-এর নিয়মিত অভিনয় শুরু করবার আগে তিনটি দিন 'ওপন হাউজ' ঘোষণা করাও নিশ্চয়ই তাঁদের ভাবী দর্শকদের সঙ্গে মেলামেশা করার একটা ভালো উপলক্ষ্য তৈরি করেছিল। তা ছাড়া গ্রামে তাঁরা যেখানেই যান, সেখানেই দর্শকদের প্রতিক্রিয়া তাঁদের উজ্জীবিত করে। বছর তিনেক আগে প্রকাশিত 'পরিক্রমা ১৯৮৬' বইয়ে আটটি তৃতীয় থিয়েটারের দলের গ্রামে গ্রামে পরিক্রমার যে বিবরণ আছে[২৬] তাতেও দর্শকদের মতামত যথেচ্ছভাবে সাজিয়ে দেওয়া আছে। এই মতামতের মধ্যে গ্রহণ এবং সমালোচনা দুইই লক্ষ করা যায়। বাদলবাবু নিজে একরকমভাবে ওই অল্পবিস্তর সমালোচনার ব্যাখ্যা করেন,[২৭] সে সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে, দর্শকদের সঙ্গে আলোচনার পথটা তাঁরা খোলা রেখেছেন। আর এই দর্শকের চরিত্র সম্বন্ধেও বাদলবাবুর ধারণা স্পষ্ট, যেমন তিনি বলেন, "বাঙালী দর্শক কথাটার মধ্যে

ধরেই নেওয়া হয়েছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত (বা উচ্চবিত্ত) লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক দর্শক। সে দর্শকও আছেন তৃতীয় থিয়েটারের। এই সেদিন অবধি প্রতি শুক্রবার নামমাত্র চাঁদা দিয়ে (ছিয়াশি সালেও এক টাকা), বা না থাকলে কিছু না দিয়ে, অঙ্গনমঞ্চে ঘরের মেঝেয় করা অভিনয় দেখতে তাঁরা এসেছেন ; সামিল হন তাঁরা দমদম, মধ্যমগ্রাম, কাঁচড়াপাড়া, কৃষ্ণনগর, বারুইপুর, সুভাষ-গ্রাম এবং আরো বহু জায়গায় করা নাট্যোৎসবে ; পার্কে, ফাঁকা জমিতে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, অফিসে, ব্যাঙ্কে টেবিল চেয়ার সরিয়ে সাজানো আসরের নাট্যানুষ্ঠানে।"[২৮] কিন্তু তাঁর আসল দর্শক এঁরা নন। অন্য দর্শক, যারা "বাড়ি থেকে খেজুর পাতায় বোনা চাটাই" বগলে করে নিয়ে আসে, যাদের মধ্যে থাকে ভূমিহীন খেতমজুরদের দল।

৬.

তৃতীয় থিয়েটারের নাটকও যে প্রসেনিয়ামের নাটকের চেয়ে অন্যরকম হবে তা বাদলবাবু নানা জায়গায় ইঙ্গিত করেছেন। যখন অঙ্গনমঞ্চের জন্য 'সাগিনা মাহাতো'র নাট্যরূপ দিলেন তখন তা আর তাঁর আগের নাটকগুলির মতো হল না। নাটকের অঙ্ক আর দৃশ্যের "যান্ত্রিক" বিভাজনকে তিনি বর্জন করলেন, সময়ের নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতাকে ভেঙে দিয়ে আগের ঘটনা পরে বা পরের ঘটনা আগে আনবার স্বাধীনতা নিলেন, স্থানগত ঐক্যের ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একই মঞ্চে নানা জায়গায় ঘটনা দেখানোর ব্যবস্থা করলেন। গল্প বলার দায় থেকে অব্যাহতি খুঁজে নিলেন, 'চরিত্র' রচনার দায়িত্বও এড়িয়ে গেলেন। গল্পের বদলে এল 'বিষয়' বা 'থিম', একক চরিত্রের বদলে এল ছাঁচ বা 'প্রোটোটাইপ'। 'স্পার্টাকুস' সম্বন্ধে তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন—"সেখানে ঘটনা বেশি—ফলে এখানে আমি চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। আইডেন্‌টিফিকেশনের প্রয়োজনে চরিত্র। কিন্তু আমি চরিত্র থেকে চরিত্রের আদলে বা prototype-এ চলে যেতে পারি। একটা পুরনো নাটক থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক্—'এবং ইন্দ্রজিৎ'। অমল, কমল, বিমল, নির্মল নামগুলিতে কবিতার মিল আছে ; অনেকেরই এরকম নাম হয়—এখানে এগুলি নেওয়া হয়েছে ইচ্ছে করেই। এরা চরিত্র নয়, 'প্রোটোটাইপ'—এখানে স্টাণ্ট দেবার ইচ্ছে নেই। অমল, বিমল, কমল—এরা পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য—interchangeable। এদের মধ্যে একজন আছে যার অন্য একটা নাম—ইন্দ্রজিৎ। ইন্দ্রজিৎ

প্রোটোটাইপ—অর্থাৎ বাকিরা যা ভাবছে সেখানে সে একটু আলাদা, তার মনে কতকগুলি প্রশ্ন আছে যা অন্যদের নেই আর সে কারণেই (সে) ইন্দ্রজিৎ। পুরো ব্যাপারটাই প্রোটোটাইপের মধ্য দিয়ে বলতে পারি অর্থাৎ ন্যাচারালিস্টিক নাটকে নির্দিষ্ট পরিচয় দিয়ে দর্শকের কল্পনায় ভর করে বোঝানো থেকে বিরত হয়ে এখানে আমি বলতে পারছি যে, এরা আসলে এক একটা আদল—অনেকের বিশেষত্বের কথা বলছি, কোনো নির্দিষ্ট একজনের নয়।"[২৯] পরে প্রোটোটাইপ-কেও সরিয়ে এল 'গ্রুপ'—খানিকটা কোরাসের ধরনে, যেমন 'মিছিল'-এর কোরাস, 'ভোমা'-র 'এক' থেকে 'ছয়' পর্যন্ত নামহীন নম্বরওয়ালা চরিত্র, 'বাসি খবর'-এর কোরাস, 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস'-এ শিক্ষক ও ছাত্রদের দল।

বাদলবাবুর আলোচনা থেকে যতটা বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে ১৯৭২ এর ফেব্রুআরিতে করা শতাব্দীর একটি ওআর্কশপ থেকে বাদলবাবুর নতুন নাটকতত্ত্ব আর একটু শক্তি লাভ করে। মার্কিনদেশের লা মামা থিয়েটারের পরিচালক অ্যান্টনি সারচিয়ো (Serchio) ও বছর মার্চ মাসে শতাব্দী দলকে নিয়ে যে ওআর্কশপ করান, তাতে দলের প্রতিটি অভিনেতার সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে, এবং এমন পটভূমিকা তৈরি হয় যাতে পুরো দলটিই যেন একটি নাটক লিখে ফেলছে, নাটকটি আর একটিমাত্র নাট্যকারের ব্যক্তিগত রচনা থাকছে না। 'থিয়েটারের ভাষা'তে এই কথাটাই আর একবার বলেন 'ভোমা' নাটকের নাট্যায়ন প্রসঙ্গে—

> "ছ' জন—হ্যাঁ ছ'জন অভিনেতাই হয়তো পারে পুরো নাটকটাকে অভিনয় করতে। আবার দশ পনেরো কুড়ি জনও অভিনয় করতে পারে। ছেলেরাও পারে,—মেয়েরাও পারে, ছেলে মেয়ে মিলেও পারে। চেহারা বা বয়সে কিছু আসে যায় না।
>
> কে করবে নাট্যায়ন ? একজন নির্দেশক ? হাঁা, সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র নির্দেশকের নির্দেশের উপর ভরসা করে নির্বিকার চিত্তে অভিনয় করলে কি এ নাটক পৌঁছোবে দর্শকের কাছে ? যে লজ্জা, বিস্ময়, অপরাধ-বোধ, যে অভিজ্ঞতা, যে চেতনা, যে অনুসন্ধিৎসা এই নাটক লেখার তাগিদ এনেছে, সে তাগিদ যদি শুধু নির্দেশকই নয়, প্রতিটি অভিনেতাও অনুভব না করে, যদি তাদের প্রত্যেকে মনে না করেন এ নাটক তারই লেখা নাটক, তবে কি নাট্যাভিনয় সার্থক হবে ?"[৩০]

চরিত্রের ব্যক্তিগত প্রাধান্য বাদলবাবুর খুব কম নাটকেই বিচ্ছিন্নভাবে থাকছে এখন। তাঁর নিজের ভূমিকাটি কখনও কখনও হয়তো একটু আলাদা হয়ে আসে, দলের বাইরে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু গ্রুপ-অ্যাকটিং-এর উপর তিনি তাঁর নাটকে নির্ভর করেন অনেক বেশি। এই জন্যই 'শূদ্রক'-কে বলেন—"আমাদের নাটকে interestingly সব—অনেকগুলো নাটকেই প্রত্যেকেরই সমান ভূমিকা। সমান ভূমিকা মানে হচ্ছে একবার প্রবেশ করল—অভিনয় করতে আরম্ভ করে, অভিনয় যখন শেষ হল তখন বেরুল। মাঝখানে প্রবেশ প্রস্থান নেই। কথা বলুক, না বলুক ভূমিকা তার একটা আছে। সব পার্ট সমান। বড় পার্ট ছোট পার্ট বলে কিছু নেই।"[৩১]

বাদলবাবুর নাটকের ভাষা তাঁর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এমনি সাধারণ-ভাবেই মুখের ভাষার উপর নির্ভরতা কমিয়ে এনেছেন বাদলবাবু। এর অর্থ এই যে, স্বভাববাদী বা অন্যান্য নাটকে যেমন পাত্রপাত্রীরা খুব গুছিয়ে কথা বলে, সে কথার দ্বারা দ্বন্দ্বসংঘাতময় নাটকীয়তা তৈরি করে এবং শেষ পর্যন্ত নাটকের গল্পের কাঠামোটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, বাদলবাবুর নাটকের সংলাপ সেই গুছিয়ে কথা বলার ধরনে তৈরি হয় না। তাঁর সব নাটক একরকম না হলেও —যেমন 'হট্টমালার ওপারে'-তে কোরাসের ভূমিকা নেই, এবং দুটি চরিত্র অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে আসে—তবু সে সব নাটকের মধ্যে দীর্ঘ নাটকীয় সংলাপ যেমন নেই বললেই চলে, সে সংলাপের বাক্যগুলিও বেশ ছোট ছোট, অনেক সময় অসম্পূর্ণ। যেমন 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস'-এ—

ব্রিটানিয়া। সোনামণিরা আরও মোটা হচ্ছে।

[ঘুরে গেল]

কর্তা। চা-বাগান কফি-বাগান রাবার-বাগান! ভারতে সস্তা মজুর। ভারতে পুঁজি পাঠাও।

[ঘুরে গেল]

শিক্ষকরা। কু-উ-উ-উ-উ

ব্রিটানিয়া। আরও মোটা হচ্ছে।

[রেলগাড়ি থামল]

শি-১। রেলরাস্তা—

শিক্ষকরা। তৈরি।

[ছাত্ররা ক্লাসে ফিরে বসল]

ব্রিটানিয়া। আরও মোটা হচ্ছে! আরও পুঁজি, আরও কল, আরও মাল—আমার সোনামণিদের কি হবে?[৩২]

কাটা-কাটা এই সংলাপে কিছুটা শ্লোগানের stuccato সংগঠন আছে, রেডিয়ো-টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিংবা ফেরিওয়ালাদের বা মিনিবাসের 'হেল্‌পার'দের সংবাদ-প্রধান ঘোষণার আদল আছে। বাদলবাবু যখন সংবাদ বা তথ্য হাজির করেন তখন একই সংবাদকে অনেকের মুখে এইভাবে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে দেন, তাতে গান, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি এনে, কখনও মৌখিক নানা ধ্বনি ও স্বরভঙ্গি জুড়ে ('মিছিল'-এ যেমন বুড়োর একটি সংলাপ "ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা ইয়া হু-উ-উ!" দিয়ে শুরু হচ্ছে) তাকে চিত্তাকর্ষক করেন। আংশিক পুনরাবৃত্তি এবং বাক্যগঠনে সমান্তরালতার (parallelism) ব্যবহার তাঁর বক্তব্যকে তীরভূমিতে সমুদ্রের ঢেউয়ের বারংবার আছড়ে পড়ার মতো বারবার পাঠকের কাছে ধাক্কায় ধাক্কায় পৌঁছে দেয়। যেমন 'মিছিল'-এ খোকার সংলাপে—

খোকা। আমি খুন হয়েছি! আমি। এই যে এখানে! আমি খুন হয়েছি। আমি। আমি। এই যে—আমি! আমাকে মেরে ফেলেছে। আমি মরে গেছি। এইমাত্র। এইমাত্র খুন হয়েছি আমি। আমি খুন হলাম আজ। আমি খুন হয়েছি গতকাল। আমি খুন হয়েছি পরশু! তরশু। গত সপ্তায়। গত মাসে। গত বছর! আমি খুন হই রোজ। রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ। আমি খুন হব কাল। পরশু, তরশু, আসছে সপ্তায়। আসছে মাসে, আসছে বছর! আমি! আমি! দেখতে পাচ্ছ না কেন? শুনতে পাচ্ছ না কেন? আমি! আমি! এই যে এখানে—আমি—খুন হয়েছি—মরে গেছি—রোজ খুন হই—রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ—[৩৩]

তাঁর নিজের সংলাপ-রচনা সম্বন্ধে ক্রান্তিক গণসংস্থার ওই সাক্ষাৎকারটিতে একটু বিবৃত করেই বলেন বাদলবাবু। আমরা তার বেশ খানিকটা যদি তাঁর নিজের ভাষাতেই শুনে নিই, তবে দেখি যে তিনি ডায়ালগ, অর্থাৎ দুজনের উক্তি-প্রত্যুক্তিময় কথাবার্তা থেকে ওই 'প্রোটোটাইপ' চরিত্রের তাগিদে চলে যান 'টিপিক্যাল ডায়ালগ'-এ। তা ন্যাচারালিস্টিক হলেও নাটকের বাস্তিক

কথাবার্তা অনুসরণ করা হয় না তাতে। "যদি প্রতিটি বাক্য আলাদা আলাদা করা যায়, তার ধারাবাহিকতা দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এ কথাগুলির আলাদা কোনো মূল্য নেই—সত্যিকারের ডায়লগ নয়, টিপিক্যাল ডায়ালগ। এ ধরনের ডায়ালগ মিছিল নাটকেও আছে। না ভেবেই বলে দেয়, কথার কোনো আঁচড় পড়ে না বলেই বলে দেয়। এ ধরনের কথা বেছে বেছে এক একটা সিরিজ করা আছে—প্রতিটি সিরিজে এক এক ধরনের ডায়লগ দিয়ে যাওয়া পাশাপাশি, পরপর। এটা কিন্তু প্রোটোটাইপ—বিভিন্ন ধরনের প্রোটোটাইপ ; নানা ধরনের মিছিল আসছে, সব কটাই আদল ; এতে কিন্তু পটভূমিকা বড় করে দেয়, সর্বজনীন প্রকৃতিটা (universal nature) নিয়ে আসা যায়।"[৩৪]

এর পরে বাদলবাবু জানান যে, আজকের সমস্যার বিরাটত্ব, তার variation ধরবার জন্য কোনো কোনো নাটকে যে-ভাষা ব্যবহার করেন তা ন্যাচারালিস্টিক নয়, সেখানে বাস্তবিকতাকে প্রায় বর্জনই করেন তিনি, কারণ আলাদা আলাদা চরিত্রের কথাবার্তার মধ্যেও কোনো ধারাবাহিকতা নেই। 'মিছিল'-এ একজন বলছে—"শেয়ালদা স্টেশনের কাউণ্টারের সামনে একটি বৃদ্ধ মরেছে",—আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "শেয়ালদা স্টেশনে বুকস্টলের পেছনে একটি শিশু জন্মেছে।" এতে উক্তি-প্রত্যুক্তির চেহারাটা নেই। কিন্তু দুজনে মিলে একটা ছবি তুলে ধরেছে। আর-একজন সঙ্গে সঙ্গেই বলছে—"ছাড়ো শেয়ালদা স্টেশন···V I P Road ধরো, চলো Dum Dum Airport." শেয়ালদায় উদ্‌বাস্তুদের মৃত্যুর কোনো গুরুত্ব নেই। এর পরের জন যোগ করছে "গরমে দার্জিলিং, পুজোয় কাশ্মীর···See India! See India!"—সব নিয়ে মধ্যবিত্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভনের একটা ছবি—যা zigsaw puzzle-এর মতো টুকরো সাজিয়ে তৈরি হচ্ছে। বাদলবাবুর মতে "এটা ডায়লগ নয়, একটা টেক্‌নিক।"[৩৫] সরাসরি দর্শককে বলা।

সাধারণভাবে উচ্চারিত ভাষার প্রাধান্যই কমে আসে তাঁর নাটকে। তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের ভাষা বলতে তিনি বোঝেন "বাংলা-হিন্দী-ইংরিজী নয়, মুখোস-পরা মানুষের সাজানো ভাষা নয়, স্বভাবের ভাষা, মানুষের ভিতরের সত্তার ভাষা।"[৩৬] 'শূদ্রক'-এর সাক্ষাৎকারে এই কথাটা আরও স্পষ্ট করেন তিনি—"আমরা কথিত ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না। আর একটা ভাষাও আছে সেটা দিয়ে কথিত ভাষাকে জোরদার করতে চাই। কাজেই, শরীরের

কিছু সম্ভাবনা আছে—potentialities। আমি কী—আমার শরীর কী করতে পারে বা না পারে—তার training ওই workshop-এর মধ্য দিয়েই আসে। কিন্তু ওই যে বলেছিলাম শরীরটা একমাত্র জিনিস না—শরীর আর মন। সুতরাং তার পরেই আসবে শরীর আর মনের যোগসূত্রটা। বিষয়বস্তু আছে নাটকে—বিষয়বস্তুর জন্য নাটকটাকে গ্রহণ করলাম। এই নাটকটাকে আমাদের দর্শকের কাছে পৌছে দেওয়া। পৌছে দেবে কে? অভিনেতার শরীর। অভিনেতার বাচনভঙ্গি। তাই না? বাচনশক্তি শরীরের একটা অংশ।… তাহলে সেই শরীরটাই interpret করছে বিষয়বস্তুটা।"[৩৭]

বাদলবাবু বলেন, থিয়েটারের যে সব উপকরণ এখন স্বীকৃত—দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, শব্দযন্ত্র—সেগুলি "প্রয়োজনীয়" হলেও "অপরিহার্য" নয়। কারণ সেগুলি কমালে বা বাদ দিলে থিয়েটার দরিদ্র হয়তো হতে পারে, কিন্তু থিয়েটারের অস্তিত্বটা ঘুচে যাবে না, "যেমন যাবে যদি অভিনেতা তার দেহ নিয়ে উপস্থিত না থাকে প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠানে।"[৩৮] একটু পরেই আবার তিনি জুড়ে দেন, থিয়েটার ওইসব উপকরণের অভাবে দরিদ্রও হবে না, বরং ওই উপকরণ বর্জনই তৃতীয় থিয়েটারের তৃতীয় থিয়েটার হয়ে ওঠার শর্ত, তার নিজস্বতা। তার "সমস্ত জোরটা" ওই মানবদেহের উপর, থিয়েটারের ওই অপরিহার্য উপকরণের উপর।"[৩৯] "ভাষা শব্দটিকে যদি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যায়, তবে দৃষ্টির ভাষা, মুখভাবের ভাষা, অঙ্গভঙ্গী বা অঙ্গ সঞ্চালনের ভাষা, স্পর্শের ভাষা, সুরের ভাষা, চীৎকার আর্তনাদ হুঙ্কার ইত্যাদি নানা শব্দের ভাষা, ছবির ভাষা—ইত্যাদি সব কিছুই এসে পড়ে। 'থিয়েটারের ভাষা'—এই শব্দ সমষ্টিতে ভাষা শব্দটি ব্যাপক অর্থেই গৃহীত হয়।"[৪০]

তাঁর নাটকে মানবদেহের এই ভাষাকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার বিবরণও তিনি দেন এই 'থিয়েটারের ভাষা' বইটিতেই। 'ভোমা' নাটকের নাট্যায়নের ভাষার বর্ণনা তিনি দেন এইভাবে—

> "গাছ কেটে জঙ্গল হাসিল করে ভোমারা। জঙ্গল, কাঠুরে, গাছ। গাছ থেকে বীজ, বীজ থেকে গাছ। অভিনেতারা বীজ, হাত-পা গুটিয়ে বীজ হয়ে শুয়ে বসে আছে মাটিতে। মৃদু কণ্ঠে একটা সুর। মাটির রসে প্রাণ পেয়ে বীজ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে মহীরূহে। খাড়া বা ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে বাহু আকাশের দিকে মেলে অভিনেতারা গাছ হয়েছে, ডালে পাখির কাকলি, পাতায়

> হাওয়ার শিস। দুটি গাছ মানুষ হয়ে, কাঠুরে হয়ে, গাছের গোড়ায় কুঠার চালাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে তাদের গাছ কাটা কবিতা, "মারো জোয়ান—হেঁইও, জঙ্গল কাটো—হেঁইও, বাঘের থাবা—হেঁইও, সাপতাড়ুয়া—হেঁইও, কুমীর-মারা—হেঁইও, জঙ্গল হাসিল—হেঁইও, আবাদ ওঠে—হেঁইও।" গাছ পড়ছে, মানুষ-গাছ, ধরাধরি করে তাকে শোয়ালো কাঠুরেরা। তারপর লাঙ্গল-চাষ, বীজ রোয়া, ফসল কাটা, অবশেষে সব অভিনেতা মিলে একটা কারখানা, যন্ত্র চলছে হুশ হুশ ঘটাং ঘট্! হাত পা শরীর যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, কঠিন ঋজু শক্তিমান কিন্তু নিষ্প্রাণ গতি। তারই মধ্যে একটি যন্ত্রাংশ, এক নম্বর অভিনেতা, বললো—'আমি জানি।' আর একটি যন্ত্রাংশ বললো—'কী জানো?' এক নম্বরের কথার প্রতিক্রিয়ায় এমনি করে কথা বললো 'দুই' 'তিন' 'চার' 'পাঁচ' 'ছয়'। অবশেষে তারা গর্জে উঠলো সমস্বরে—'তবে যে বললে জেনেছো?' যন্ত্র থামলো, শেষ হোলো। 'বাজে বোকো না' বলে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা, বসেছে বা শুয়েছে নির্বিকার ভঙ্গিতে। নির্বিকার একটি উক্তি—'মাছের রক্ত ঠাণ্ডা।' তার জবাবে এক নম্বরের হতাশা কঠিন কণ্ঠ—'মানুষের রক্তও ঠাণ্ডা।'[৪১]

বাদলবাবু জানেন যে ন্যাচারলিস্টিক অভিনয়ে মানুষের চলাফেরা গতিবিধি অঙ্গভঙ্গি সব কয়েকটিমাত্র ছকে বাঁধা, তা, যেসব শারীরিক সচলতা সামাজিক-ভাবে স্বীকৃত, তার বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় থিয়েটার ন্যাচারালিস্টিক অভিনয়কে উপেক্ষা করে বলেই তাতে শরীরের ভাষা এমন বিচিত্র ও বহুমুখী হয়ে উঠতে পারে, সামাজিক দেহভঙ্গির বাঁধা ছক অস্বীকার করেই। এইভাবে বাদলবাবু নাটকে উচ্চারিত ভাষার সঙ্গে ইঙ্গিতের ভাষা বা প্রান্তভাষাকে (paralanguage) ব্যবহার করেন, আবার শরীর দিয়ে নানা সচল প্রতীক তৈরি করে, কণ্ঠস্বরের দ্বারা নানা আবহ তৈরি করে—নাটকের ভাষাকে সম্প্রসারিত করেন। এ সব কাজ বাদলবাবু প্রথম করছেন এমন দাবি তিনি করেননি, লোকনাট্যের প্রভাবের বিষয়ে তিনি ইঙ্গিতও করেছেন। কিন্তু এসব নিয়েই তাঁর নাটক একান্তভাবে তৃতীয় থিয়েটারের নাটক হয়ে ওঠে।

আঙ্গিক অভিনয় সম্বন্ধে এই অতি-সচেতনতা কি আঙ্গিকতা-সর্বস্ব চেহারা নেবার দিকে যাবে? বাদলবাবু সেই বিপদ সম্বন্ধে উদাসীন নন। তাই

তাঁকে বলতে দেখি—"এই নাট্যশৈলীর উদ্ভব নাটকের বিষয়বস্তুর তাগিদে। কনটেণ্ট থেকে আসছে ফর্ম।"[৪২] থার্ড থিয়েটার একটা দর্শন—"সেটা একটা Philosophy-র ব্যাপার :...এটা ফর্মের ব্যাপার নয়।"[৪৩] আমাদের বর্তমান যে ধারা—Commitment বলতে পারি, যে আমাদের কাছে নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাথমিক—বিষয়বস্তু হচ্ছে আরম্ভের জায়গা—Primary point...নাট্যশৈলী আসছে তারপরে। আগে content,—তারপরে ফর্ম—তার ফলে বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে exploration—বিভিন্ন নাট্যশৈলী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা, যাতে—এখন যে নাটকটা, যে কথাটা বলতে চাই, এই নাটকীয় মাধ্যমে—সেই কথাগুলো কী করে আরও তীব্রভাবে, আরও কার্যকরী-ভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়—এই যে করাটা—তার ফলে একটা কী বলব, জীবন্ততা কথাটা বাংলা কি না জানি না—liveliness—অর্থাৎ পুরোনো হচ্ছে না—এমন নয় যে একই ধরনের নাটক একইভাবে করে যাচ্ছি—আমাদের প্রতিটি বিষয়বস্তুই যেন খানিকটা চ্যালেঞ্জ...এটাও কিন্তু একটা মুক্তি।[৪৪]

৭.

থার্ড থিয়েটার যে একটা দর্শন বা ফিলজফি—এ কথাটি বাদলবাবু নানা জায়গায় উচ্চারণ করেন। সব দর্শনেরই ভিত্তি অর্থনীতিনির্ভর সমাজ-সংগঠন, কাজেই বাদলবাবুর সে সংক্রান্ত ইতিহাসবিশ্লেষণ থার্ড থিয়েটারের ওই তাত্ত্বিক ভিত্তিটি বোঝবার পক্ষে জরুরি হয়ে ওঠে। এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী তথা ঔপনিবেশিক শোষণ এবং তার ফলশ্রুতি—যেমন গ্রামকে শোষণ করে শহরগুলির বেড়ে ওঠা, শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদ, আদিবাসী-নির্যাতন, স্বার্থসন্ধানী ও ভোগপরায়ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, এই শ্রেণীর সুবিধাবাদ, অমানবিক উদাসীনতা ইত্যাদি তাঁর নাটকে ঘুরে ফিরে আসে। বাদলবাবুর চিন্তা মার্কসবাদ অনুসারী, তবে মার্কসবাদ কথাটাও তিনি উচ্চারণ করেন না কোথাও, আর কোনো রাজনৈতিক দলে বা সংগঠনে তিনি যুক্ত নেই। শুনেছি এক সময়ে, চল্লিশের বছরগুলিতে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে সংগঠিত পার্টির কোনো প্রয়োজন তিনি তাঁর নিজের নাটকের প্রোগ্রামে স্বীকার করেন না। গ্রামে নাটক করতে গেলে প্রায়ই তাঁদের "আপনারা কোন্ পার্টির" কিংবা "আপনারা অমুক পার্টির লোক কি না?"—

এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁরা বলতে চেষ্টা করেন তাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের নন। 'শূদ্রক'-এ বাদলবাবু বলেছেন, "রাজনৈতিক ভাবনার দিক থেকে আমাদের কতকগুলো point এ agree করার দরকার হয়। আমরা দলগতভাবে কোনোদিন কোনো party-র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। থাকার সম্ভাবনাও নেই। দলে যারা আসে তারা দলের সঙ্গে আছে, দলের নাটকগুলি করছে, কারণ কতকগুলি সত্য সম্বন্ধে তারা একমত। কতকগুলো সত্য প্রচার করা দরকার—এ সম্বন্ধে তারা একমত। সেইখানে আমরা একত্র হয়েছি। দলের মধ্যে হয়তো এমনভাবে কেউ থাকতে পারে যারা খানিকটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে হয়তো একজনের সঙ্গে আরেকজনের বিরোধটাও থাকতে পারে। কিন্তু, সেইজন্য আমরা যে নাটকটা করছি, এটা কিন্তু broadbased, সেখানে সকলে মিলে একত্রে করছি, সেটা আমরা করছি। আমাদের দলে একটা নিয়ম আছে—ওই member কথাটায় কেন জোর দিচ্ছি, কতটা জোর দিচ্ছি বোঝা যাবে। একটা নাটক যখন নেওয়া হবে, সেই নাটকটা সম্বন্ধে যদি প্রত্যেকে একমত না হয় তাহলে নাটকটা নেওয়া হবে না। যদি একজনও dissident থাকে, সে মনে করে এই নাটকটা শতাব্দীর করা উচিত নয়—যুক্তি তার কাছে চাওয়া হবে, অন্যেরাও যুক্তি দেবে। যদি কিছুতেই যুক্তিটাকে resolve করা না যায়, তাকে convince করা না যায়, তাহলে সাময়িকভাবে সেই নাটকটা মুলতুবি থাকবে। এটা immaterial যে, সেই নাটকটাতে সে অভিনয় করছে, কি করছে না।...এখন অবধি দেখা গেছে, আমাদের মধ্যে এমন একটা জায়গা তৈরি হয়েছে, যেখানে আমরা ওই রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, কতকগুলো broad জায়গাতে মিলিত হতে পারি।"[৪৫]

এই ইনটারভিউতেই বাদলবাবু জানান, যাঁরা তাঁদের গ্রামে অভিনয় করতে আমন্ত্রণ করেন তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় আগে থেকে অনেকক্ষেত্রে জানতে পারেন না। এমন হয়েছে যে, কংগ্রেসি হেডমাস্টার ও স্কুলশিক্ষকরা তাঁদের ডেকে নিয়ে আপ্যায়ন করেছেন কিন্তু নাটকগুলি দেখার পর তাঁদের পছন্দ হয়নি। আবার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মানুষের ডাকেও তাঁরা গিয়ে নাটক করে এসেছেন। কখনও কখনও রাজনৈতিক রেষারেষির মাঝখানে পড়ে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়তেও হয়েছে তাঁদের। এসবের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে গ্রামপরিক্রমার নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, "আমরা

ওইরকম কোনো একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলে যেতে চাই না। আমরা চাই, আমরা কতগুলো basic truth-কে—সেগুলো আমরা প্রচার করছি, এবং যার নিমন্ত্রণেই হোক—আমরা সেটাই করব।"[৪৬]

তবু বাদলবাবুর একাধিক নাটকে যেমন কংগ্রেসি শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে আক্রমণ আছে, তেমনই বামপন্থী রাজনীতির প্রতি একধরনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লক্ষ করি। ধরা যাক, 'মিছিল' নাটকের 'কর্তার' চরিত্রে কংগ্রেসি নেতার বেশ চিত্তাকর্ষক ক্যারিকেচার তৈরি করেছেন বাদলবাবু। কিন্তু তার পরেই শ্রমিক ও ছাত্রদের মিছিলের 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' কিংবা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিকে তিনি বিদ্রূপের লক্ষ্য করে তোলেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশী' প্রথম ভাগের ব্যঞ্জনবর্ণের ছড়ার পঙ্‌ক্তির সঙ্গে একজোড়া করে জিন্দাবাদ জুড়ে দিয়ে—"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি—জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!"—এইভাবে "ঠাকুরদাদার শুকনো গাল—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ" পর্যন্ত চলে। এই প্যারোডির দ্বারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক জরুরি অস্ত্র তার স্লোগানকে বাদলবাবু যেখানে নামিয়ে আনেন সেখানে তাঁর নিজের একধরনের রাজনীতিও আভাসে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই নেতিবাচক বীক্ষার নিজের দাঁড়াবার কোনো শক্ত জমি নেই বলেই হয়তো 'মিছিল'-এর উপসংহার কিছুটা অলীক ও আরোপিত মনে হয়।

বাদলবাবুর যে 'দর্শন'—তার একটি দিক হচ্ছে তাঁর ইতিহাস বিশ্লেষণ—ভারতের ইতিহাসের পাঠ। এই ইতিহাস সুখপাঠ্য নয়। তিনি লক্ষ করেছেন, সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষে নগরে ও গ্রামে বিচ্ছেদ ছিল, গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির অধীন। গ্রাম সামন্তপ্রভুকে ফসলের একটা অংশ কর দিত, প্রভু তার বদলে সেচ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তার নিজেরই স্বার্থে। যুদ্ধবিগ্রহের অস্বাভাবিক উপলক্ষ্য ছাড়া গ্রামের শাসনব্যবস্থা আর অর্থনীতিতে ওপরওয়ালারা "সচরাচর হাত দিত না।" শহরের সঙ্গে বা অন্য গ্রামের সঙ্গে গ্রামের "বলতে গেলে কোনো আদাপ্রদান ছিল না।" অর্থনীতিতে টাকার প্রচলনও খুব একটা ছিল না। এই অবস্থায় "নগরে ও গ্রামে সংস্কৃতির দুটি সমান্তরাল ধারা চলেছে"—সামন্ত সংস্কৃতি আর গ্রামীণ সংস্কৃতি। সামন্তযুগে শোষণের যে চেহারা ছিল তাতে "একধরনের সামঞ্জস্য বজায় থাকে, গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে যায় না।"[৪৭]

কিন্তু ব্রিটিশ আমলে সামন্ততান্ত্রিক শহরের (রাজা বা সামন্তপ্রভুর ঘাঁটি ছিল

মন্দিরকেন্দ্রিক শহর বা তীর্থস্থান, বাণিজ্য-কেন্দ্র) বদলে নতুন এক ধরনের "ঔপনিবেশিক শহর" গড়ে উঠল। তার প্রধান কাজ হল "গ্রামাঞ্চল থেকে কাঁচাখনিজ ও কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে বিদেশ থেকে শিল্পজাত তৈরি মাল এনে আবার গ্রামাঞ্চলে বিক্রির জন্য পাঠানো"[৪৮] অর্থাৎ গ্রামকে শোষণ। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খাতিরে মালিকানাভিত্তিক জমিদারি প্রথার প্রবর্তন এই শোষণের আরেকটা রাস্তা খুলে দিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে যে নতুন শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হল তারা ব্রিটিশ রাজের হাতে ওই শোষণেরই এক অস্ত্র হয়ে উঠল। নিজেদের ক্ষেত্রে শিক্ষা, সমাজসংস্কার, সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দেখালেও গ্রামীণ কৃষকদের সংগ্রামকে হয় উপেক্ষা, না হয় বিরোধিতা করল। এই মধ্যবিত্তদের মধ্যেই পরে যারা প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত হল, তারাও খুব একটা সফল হল না, কারণ "এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের আসল চেষ্টা সর্বদাই নিজেকে আর এক ধাপ উপরে তোলা, এবং এই ক্ষুদ্র স্বার্থ তাকে বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে অন্ধ করে রাখে, তাই সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সামগ্রিক মুক্তির পথে না গিয়ে সে অন্যকে ডিঙিয়ে একা একা উপরে উঠবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। ফলে শহরের থিয়েটারে প্রগতিশীল ভাবধারার প্রকাশ যতোই হোক, মধ্যবিত্ত দর্শকের বড়জোর একটা মানসিক উত্তেজনা ওঠে, বিবেকের তুষ্টি ঘটে, বিশেষ কোনো সক্রিয় ভূমিকা সে নিতে পারে না সমাজপরিবর্তনের পক্ষে।"[৪৯] গ্রামের মানুষ যা পাচ্ছে সেই লোকনাট্য তাকে পশ্চাদ্‌মুখী করে রাখছে, ওদিকে প্রগতিশীল শহুরে নাটক যে-মধ্যবিত্ত দর্শকের কাছে পৌঁছোচ্ছে সে শ্রেণী গ্রামের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে না। অন্যদিকে গ্রামের মানুষের সংস্কৃতিও—বিশেষভাবে লোকনাট্য (বাদলবাবু যাত্রার কথা মনে রেখেই বিশেষভাবে বলেছেন) শহরের মানুষদের ব্যাবসায়িক পণ্য হয়ে উঠছে, শস্তা শহুরে ফিল্‌মও গ্রামের বাজারে পৌঁছে গেছে, গ্রামকে শোষণ করছে।

আমরা মার্কসীয় ইতিহাস দৃষ্টির সঙ্গে বাদলবাবুর দৃষ্টির তুলনার মধ্যে যাব না। বাদলবাবুর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণের বিষয়ে এই প্রবন্ধের প্রথমে হীরেন ভট্টাচার্যের কথা আমরা মনে রাখব। বাদলবাবু অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একটা "অতি ক্ষুদ্র অংশ জ্ঞান-বুদ্ধি-চেতনার মাধ্যমে ঐ সিঁড়িভাঙা অঙ্কটার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে যে, এমন একটা দুনিয়া তৈরি করা দরকার যেখানে কারুরই সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে

পড়বার ভয় থাকবে না, উপরে উঠবার প্রাণান্তকর তাগিদ থাকবে না, বস্তুত সিঁড়িটাই থাকবে না।"[৫০] কিন্তু যেটা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, বাদলবাবু কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দলের সহায়তা বা সংযোগ ছাড়াই সমাজপরিবর্তনের কথা ভাবতে বা ভাবাতে চান, কেবল নাটক নামক হাতিয়ারটিকে নিয়ে নিজেদের change agent-এর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে যে একটা পরস্পর-নির্ভরতা গড়ে ওঠা দরকার তা বাদলবাবুর কাছে, ততটা গুরুত্ব পায় না।

গ্রামের মানুষের কাছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বেশিরভাগ পীড়িত, শোষিত, দরিদ্র নাগরিকের কাছে, তাঁদের সংগ্রামের লক্ষ্য, পদ্ধতি ও প্রয়োজনকে পৌছে দিতে হবে যে-নাটক নিয়ে, তার নিজের অর্থনীতির ভিত্তিটাও তাই যে আলাদা হওয়া দরকার, তাও বাদলবাবু জানান আমাদের। প্রকরণের দিক থেকে গ্রামের নাটক অঙ্গনমঞ্চের নাটক থাকছে না, হয়ে উঠছে মুক্তমঞ্চের নাটক—এ কথা আমরা আগে জেনেছি। এই মুক্তমঞ্চের নাটক একই সঙ্গে হয়ে উঠছে 'ফ্রি থিয়েটার'। অর্থাৎ এ থিয়েটার আর্থিক দায়ের বোঝা কমিয়ে আনছে; বিজ্ঞাপন, পোস্টারিং, বড় স্টেজ ভাড়া, জটিল আলোকসম্পাত, রূপসজ্জা, পোশাক, প্যাণ্ডেল খাড়া করা, চেয়ার ভাড়া করা—এসবকে এড়িয়ে যাচ্ছে বলেই দর্শককে দামি টিকিট কেনার দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারছে। "একটা খরচ খুবই কমিয়ে আনতে পারছে, ফলে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেওয়া যে-ক্ষেত্রে থিয়েটার দেখতে পাবার পূর্বশর্ত নয়, তাই ফ্রি থিয়েটার। টাকা যা আসবে তা আসবে দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত দান হিসেবে, প্রবেশের বিনিময়মূল্য হিসেবে নয়। সে দান চাইব, খুশিমনে গ্রহণ করব, শুধু যে খরচের টাকা দরকার বলে, তাই নয়। সে দান থিয়েটারে দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রতীক।"[৫১] তৃতীয় থিয়েটারে দর্শকের অংশ গ্রহণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্রি থিয়েটারের আরেকটি শর্ত অবশ্যই সচল থিয়েটার। বড় সেট নয়, প্রসেনিয়ামে বাঁধা থাকা নয়, শুধু অভিনেতার দেহ কণ্ঠস্বর সম্বল করে বাসে বা ট্রেনে চড়ে গ্রামে গিয়ে নাটক করে আসা। অবশ্য এর ফলে এও দাঁড়ায় যে, কেবল বর্ষাহীন ঋতুতেই, অর্থাৎ যাত্রার "ষষ্ঠী (দুর্গাপুজোর) থেকে জষ্ঠি"-র মধ্যেই তৃতীয় থিয়েটারের নাটক গ্রামের মানুষ দেখতে পাবে। অন্য সময়ে গ্রামে তা নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে।

৮.

শুধু অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়ের একটা প্রাথমিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে 'অঙ্গন' পত্রিকায় নবপর্যায় ১ম সংখ্যাতে (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৭)। আমরা তা থেকে সমস্ত তথ্য নিয়ে অঙ্গনমঞ্চ অভিনয়ের একটা বিবরণ খাড়া করবার চেষ্টা করি।

এর আগেই আমরা জানিয়েছি যে সিল্যুয়েট নাট্যগোষ্ঠী ১৯৭১-এ সুরেন্দ্রনাথ (কার্জন) পার্কে প্রথম মুক্তমঞ্চের অভিনয় শুরু করেন। এঁরা প্রথম অভিনয় করেন 'মুক্তি আশ্রম' নাটক, আর যে-তারিখে সেই প্রথম অভিনয় হয় তা ১১ ডিসেম্বর। এই 'মাঠমঞ্চের' থিয়েটারের পরে সিল্যুয়েটের আমন্ত্রণে এসে অভিনয় করে শতাব্দী, বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কশপ, তমলুকের ব্রাইট ফিউচার, নিরীক্ষণ, শিল্পী ফৌজ, সি পি এ টি ইত্যাদি দল। পরে বাটানগরের দলটি প্রতি শনিবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অভিনয় করতে থাকে, শ্রীবিদূষক নামে একটি দল ১৯৭৩-এর অক্টোবর থেকে শহীদ মিনার, বি বা দী বাগ, হাজরা পার্ক, শেয়ালদা স্টেশন ইত্যাদি জায়গায় অভিনয় করতে থাকে। একটু পরে টালা-পার্কেও অভিনয় আরম্ভ হয়। এঁরা সকলেই সাধারণভাবে বামপন্থী বিশ্বাস পোষণ এবং প্রচার করতেন, তার ফলে এঁদের উপর তৎকালীন সিদ্ধার্থ রায় শাসিত কংগ্রেসি সরকারের দমন-পীড়ন চলে। ১৯৭৪-এর বিশে জুলাই পুলিশের আক্রমণে সুরেন্দ্রনাথ পার্কে প্রবীর দত্ত নামে একটি তরুণের মৃত্যুও হয়। তা সত্ত্বেও থিয়েটার লাইবর, মেঘমন্দ্র, নটসেনা, প্রতিবিম্ব, সংশপ্তক ইত্যাদি গোষ্ঠী সুরেন্দ্রনাথ পার্কে অভিনয় করে যেতে থাকে। থিয়েটার লাইবর ১৯৭৫-এর ২ এপ্রিল থেকে হিন্দ সিনেমার উলটোদিকে সপ্তাহে প্রায় সাত দিনই অভিনয় করতে থাকে। শতাব্দী এত দিন সুরেন্দ্রনাথ পার্কের মুক্তমঞ্চের অভিনয়গুলি ছাড়া মূলত অ্যাকাডেমির তিনতলায় ওই অঙ্গনমঞ্চেই অভিনয় করেছিলেন। হঠাৎ তার ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে, ১৯৭৪-এর ২৪ সেপ্টেম্বর সেখানে শেষ অভিনয় করে চলে আসেন। ১৯৭৫-এর ২৪ মে থেকে তাঁরা অ্যাকাডেমিরই উলটোদিকের মাঠে মাঠ-মঞ্চের বা মুক্তমঞ্চের অভিনয় আরম্ভ করেন প্রত্যেক শনিবার। বাদলবাবুর জবানিতে পাই, "ঐ জরুরি অবস্থার সময় অন্য দলগুলি কার্জন পার্কে নিজে থেকেই শো বন্ধ করে দেয়। আমরা ঐ অবস্থাতেও অ্যাকাডেমির সামনের মাঠে তিন রবিবার (?) চালিয়েছি, তারপর পুলিশ সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বন্ধ করে দেয়।"[৫২]

১৯৮৬ সালের ৩ অক্টোবর কলকাতার নানা জায়গায় অঙ্গনমঞ্চের অভিনয় বন্ধ রেখে বাদলবাবুদের মুক্তমঞ্চে অভিনয়ের নতুন এক পর্যায় আরম্ভ হয়। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, "কলকাতায় নিয়মিত অভিনয় আপাতত বন্ধ রেখে আমাদের এখন থেকে অভিনয় হবে প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে এবং অন্যত্র আমন্ত্রণের ভিত্তিতে। এছাড়া কলকাতার দর্শকদের জন্য বছরে একাধিকবার বিশেষ নাট্যোৎসব হবে।"[৫৩] 'শূদ্রক'-এর সাক্ষাৎকারে বাদলবাবু এই সিদ্ধান্তের পটভূমিটি ব্যাখ্যা করেছেন—"সিরিয়াস থিয়েটারের দর্শকই as a whole কমে আসছে। অ্যাকাডেমির দোতলা বন্ধ হচ্ছে, কেমন? আমরা অ্যাকাডেমির সামনে মাঝে-মাঝে leaflct বিলি করি—আমরা টের পাই কত দর্শক আসে না আসে অ্যাকাডেমিতে—আবার আমাদের থিয়েটারেও লোক কমে যাচ্ছে। গণ্ডী যখন প্রথম নামে, তখন গণ্ডীর আগামী দুটো শো fully booked হয়ে যেত, সে দিন আমাদের নেই। এখানেও কমে আসছে। অথচ নাটক হয়তো অত তাড়াতাড়ি produce করতে পারছি না। খেটে করতে হয়। সেটাও যোগ হল। দুটো factor যোগ করে আমরা ১৩-১৪ বছর পরে কলকাতা থেকে regular theatreটা তুলে দিলাম। তার মানে এই নয় যে কলকাতার দর্শককে আমরা reject করলাম। একেবারেই তা না। আমরা পদ্ধতিটা বদলালাম। এখন আমরা ঠিক করলাম, season যেটা—season-এ open air theatre করতে গেলে dry seasonটাই season—অর্থাৎ মোটামুটি অক্টোবর নভেম্বর থেকে আরম্ভ করে মার্চ এপ্রিল—এই সময়টা। প্রতি রবিবার, যেদিন আমাদের সকলের ছুটি—আমরা কোথাও না কোথাও অভিনয় করব। এবং সেখানে গ্রামের নিমন্ত্রণকে তো বরাবরই আমরা priority দিয়েছি—এখনও দেব। কিন্তু সীমাবদ্ধ করছি না। শহরে নিমন্ত্রণ থাকলেও করব। করব—কোথাও না কোথাও। নিমন্ত্রণ যে-রবিবার থাকবে না, সে রবিবারে আমরা বেরিয়ে পড়ব, আন্দাজমতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে আমরা থিয়েটার করব।...দুটাকার টিকিটে যতদূর যাওয়া যায়, গিয়ে, আমরা পথে একটা স্টেশনে নেমে পড়ব। সেখানে আজকাল টিকিট চেকিং হয় না—বেরিয়ে একটুখানি গ্রামে করে এলাম—এসে আবার ট্রেনে উঠে, ওই একই টিকিটে তার পরেরটায় গিয়ে আবার করব।"[৫৪]

মুক্তমঞ্চের একটা পরিপূরক প্রকল্প হিসেবে এঁরা আরম্ভ করেছেন—'পরিক্রমা'। পায়ে হেঁটে একটা পথ ধরে গ্রামে গ্রামে যাওয়া, অভিনয় করা,

গ্রামবাসীদের আতিথ্যে থাকা ও ফিরে আসা। প্রথম পরিক্রমায় বেরিয়েছিল শতাব্দীর সহযাত্রী আরও সাতটি দল—এরিনা, থিয়েটার গ্রুপ, পথসেনা, পিপল্‌স আর্ট থিয়েটার—অশোকনগর, ঋতম্, ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক পরিষদ, তীরন্দাজ, হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা। ১৯৮৬-র মার্চ মাসের ২৮, ২৯, ৩০ তারিখে এঁরা "নাটক গান নিয়ে গ্রামের পথে পথে তিন দিন" ঘুরে আসেন। কর্ণাটকের সমুদায় নামক নাট্যগোষ্ঠী এইরকম গ্রাম পরিক্রমা করে নাটক করেন, তারা বলেন 'জাঠা'। বাদলবাবু তাদের সঙ্গে ওআর্কশপ করে ফিরে এসে এই গল্প করায় এটিজি বা অঙ্গন থিয়েটার গ্রুপ-এর দেবাশিস চক্রবর্তী ('অঙ্গন' পত্রিকার সম্পাদক) নিজেদের জন্যও এই ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, নিজে একা খানিকটা গ্রামে ঘুরে ফিরে দেখে এসে ব্যাপারটার সম্ভাবনা বিষয়ে বাদলবাবুদেরও উৎসাহী করে তোলেন। তারপর বাদলবাবুর কবিতার পঙ্‌ক্তি অনুযায়ী "দরগা, মোল্লাডাঙা, সুটিয়া, চারঘাট, কাঁচদহ দক্ষিণ, কপিলেশ্বরপুর" ইত্যাদি গ্রামে পর্যটন ও অনুষ্ঠান করেন পঁচাত্তর জনের এই বাহিনী। বছরে দুটো করে এঁদের এ ধরনের পরিক্রমা করার পরিকল্পনা ছিল। ১৯৮৭-র ১৩, ১৪ ও ১৫ নভেম্বর হাওড়া ও হুগলির বিভিন্ন গ্রামে (দক্ষিণ রাজাপুর—জাবেদা পোতা—তেলিহাটী—বাঘাণ্ডা—পূর্ব গোবিন্দপুর—সীতাপুর—রাতোগ্রাম—বোরহল) পরিক্রমার খবর পাই।[৫৫]

অঙ্গনমঞ্চের ইতিহাসে ফিরে যাই আমরা। আগেই বলেছি যে অঙ্গনমঞ্চ পদ্ধতিতে "পরীক্ষামূলক" প্রথম অভিনয় ঘটে ১৯৭২-এর ১৮ জুন, কলকাতার এ বি টি এ হলে। ২৪ অক্টোবর ওই হলেই একই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়। অঙ্গনমঞ্চের নিয়মিত অভিনয় শতাব্দী আরম্ভ করে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তিন তলায়। এখানে পরপর অভিনীত হয় 'সাগিনা মাহাতো', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৭. ১২. ৭২—প্রথম অভিনয়), 'স্পার্টাকুস' (২৮. ১. ৭৩), 'আবু হোসেন' (২৪. ৬. ৭৩), 'প্রস্তাব' (৭. ১০. ৭৩), 'মুক্তিমেলা' (১১. ১. ৭৩), 'মিছিল' (১৬. ৪. ৭৪), 'ত্রিংশ শতাব্দী' (৬. ৮. ৭৪)। হল ভাড়া হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়ায় ২৪ সেপ্টেম্বর এখানে শেষ অভিনয় করে শতাব্দী অ্যাকাডেমির অঙ্গনমঞ্চ ত্যাগ করে।

এরপরে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল (৪. ১১. ১৮) ও মে (২. ৯. ১৬) মাসে প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে 'ভোমা' নাটকের "আণ্ডারগ্রাউণ্ড" অভিনয় হয়। ওই বছরের ২৩ এপ্রিল থেকে পাশাপাশি কলেজ স্কোয়ারের বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির

ঘরেও নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়। এখানে 'ভোমা', 'মিছিল', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'স্পার্টাকুস', 'প্রস্তাব' ছাড়া নতুন নাটক অভিনীত হয় 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' (১৭ ২. ৭৬)। এছাড়া হয় "মাঠের নাটক" 'ভানুমতী কা খেল', 'রূপকথার কেলেঙ্কারি', 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' (১৮. ২. ৭৭), 'ভাঙা মানুষ' (৮. ৪. ৬৭), 'মাণিক কাঞ্চন' ও 'হট্টমালার ওপারে' (২২. ৭. ৭৭), 'ক্যাপ্টেন হুররা' (২২. ১১. ৭৭), 'গণ্ডী' (১২. ৫. ৭৮), 'বাসি খবর' (৬. ৭. ৭৯)। এ পর্যায়ের অভিনয় শেষ হয় ২২ জানুআরি ১৯৮০—"কর্তৃপক্ষের আইনগত কিছু বাধার কারণে।" থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির এই মঞ্চে ঋতম্, থিয়েটার লাইবর এবং লিভিং থিয়েটারও নিজেদের উদ্যোগে পৃথক পৃথক অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

থিয়েটার লাইবর কিন্তু অন্যত্র নিজেদের একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে অভিনয় শুরু করেছিলেন অঙ্গনমঞ্চের। সে জায়গাটা হল বিবেকানন্দ রোড ও বিধান সরণির মোড়ের কাছে YMCA-র দোতলা, অভিনয় শুরু হয়েছিল ১৯৭৯-এর ফেব্রুআরিতে। তা বছরখানেক চলেছিল। ১৯৭৮-এর ফেব্রুআরি থেকে খড়দার সুরেন্দ্রকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি শনিবার নিয়মিত অভিনয় করেছেন প্রবীর গুহের পরিচালনায় লিভিং থিয়েটার।

জানুআরি থেকে শতাব্দীকে আগস্ট পর্যন্ত বিরতি নিতে হল। ১৯৮০-র পয়লা আগস্ট ২ লিণ্ডসে স্ট্রিটের দোতলার 'সিন্ধু ভবন'-এ আরম্ভ হল অঙ্গনমঞ্চের নব পর্যায়। এখানেও শতাব্দীর সঙ্গে যোগ দিলেন ঋতম্, পথসেনা। "অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হল মালিকদের অসহযোগিতায়" এখানে শেষ অভিনয় হল ১৯৮৪-র ১৩ জুলাই।

১৯৮৫-তে আবার এঁরা ফিরে এলেন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে। এখানে পথসেনা আর ঋতমের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে এল এরিনা থিয়েটার। এখানে থার্ড থিয়েটারের শেষ অভিনয় ৩ অক্টোবর, ১৯৮৬। তারপরেই গ্রামে অভিনয়ের সংকল্প ঘোষণা, যার খবর আমরা আগে দিয়েছি। অঙ্গনমঞ্চে এখন যে-সব দল যুক্ত আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণনগরের তীরন্দাজ, বরিশার অঙ্গন থিয়েটার গ্রুপ, কাঁচড়াপাড়ার পথসেনা, মধ্যমগ্রামের সমিধ, হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা, হাওড়ার ঋতম্, মালদার প্রতিকণ্ঠ ও সংগ্রাম, ইত্যাদি। খড়দার লিভিং থিয়েটার প্রসেনিয়াম বিরোধী, কিন্তু বাদলবাবু এঁদের থার্ড থিয়েটারের দল মনে করেন না। 'শূদ্রক'-কে তিনি বলেন "যেমন ধরুন

অনেকেরই ধারণা—প্রবীর গুহ লিভিং থিয়েটারে যে থিয়েটার করে, আমরাও তাই করি। কারণ নাট্যশৈলীর দিক থেকে অনেকগুলো মিল আছে। ফিলসফির দিক থেকে একেবারেই মিল নেই।"[৫৬]

৯.

থার্ড থিয়েটারের অস্পষ্ট পূর্বসূরী হিসেবে নানা নাট্যপ্রয়াসকে চিহ্নিত করা গেলেও, এর সামগ্রিক তত্ত্বটি বাদল সরকারেরই উদ্ভাবন, এবং এর প্রয়োগাত্মক দিকটিও মূলত তাঁরই নির্মাণ।[৫৭] প্রথমে যা ছিল অঙ্গনমঞ্চের ধারণাতে সীমাবদ্ধ পরে তার সঙ্গে মুক্তমঞ্চের ধারণার যোগ ঘটালেন তিনি, 'থিয়েটারের ভাষা' বইয়ে তা আমরা দেখেছি। বাদলবাবু যে-সমস্ত দাবি করেছেন সেগুলি নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যেমন বাদলবাবুর হয়ে বন্ধুবর শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অগ্রাধিকার নির্দেশ করেছিলেন কয়েক বছর আগে যে, রাজনৈতিক থিয়েটারই এখন করা সবচেয়ে বেশি করে দরকার এবং রাজনৈতিক থিয়েটার করতে হলে থার্ড থিয়েটারের মতো মোক্ষম আর কিছু নেই।[৫৮] এই বক্তব্য এক সময়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল, প্রসেনিয়াম পন্থীদের উষ্মা জাগিয়েছিল। বস্তুত বাদলবাবুর চেয়ে বেশি করে বিতর্কের কেন্দ্রে শমীকই দাঁড় করিয়েছিলেন এই নাট্যরীতিকে। তার জন্যে তাঁর ভাগ্যে কিছু লাঞ্ছনাও জুটেছে।[৫৯] এই তর্কটিতে যোগ দিয়ে এই লেখক 'থিয়েটার বুলেটিন'-এর ওই সংখ্যায় যে প্রবন্ধটি লিখেছিল ("বাক্স বনাম চাতাল", পৃ. ৩৪-৪৩),[৬০] তার মূল কথাগুলো নিচে, খুব অল্প পরিবর্তন করে, সাজিয়ে দেওয়া হল।

শমীক প্রসেনিয়াম-বদ্ধ গ্রুপ থিয়েটারগুলির জন্য কিছু কর্তব্য নির্দেশ করেছেন, সেই সঙ্গে এ জাতীয় থিয়েটারের সীমাবদ্ধতার দিকে আঙুল দেখিয়েছেন। তাঁর কথাকে আমি এইভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছি :

> এই সময়ে অন্য সব ধরনের নাটক ছেড়ে রাজনৈতিক নাটক করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, এবং রাজনৈতিক নাটকের জন্যেই প্রসেনিয়াম মঞ্চের চেয়ে অঙ্গনমঞ্চ অনেক বেশি উপযুক্ত। তার কারণ—

ক. অঙ্গন-মঞ্চ "অভিনেতার কলাকৌশল দেখানোর আখড়া" নয়, তার একটি "সামাজিক ভূমিকা" আছে।

খ. প্রসেনিয়াম মঞ্চ নগর-বদ্ধ, অঙ্গনমঞ্চ স্বচ্ছন্দে গ্রামে যেতে পারে। গ্রাম শহরের ব্যবধানকে ভাঙতে অঙ্গনমঞ্চ যত সহজে পারে প্রসেনিয়াম

তত সহজে পারে না। আর ভারতবর্ষের এখনকার বাস্তব অবস্থায় মধ্যবিত্তদের এক্তিয়ার ছেড়ে থিয়েটারের গ্রামে যাওয়া, গ্রামের মানুষের কাছে অর্থনীতি-রাজনীতি-ইতিহাস ও বর্তমানের ব্যাখ্যা পৌঁছে দেওয়া অনেক বেশি জরুরি।

গ. প্রসেনিয়াম মঞ্চ অর্থাৎ কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারগুলি যে-প্রসেনিয়াম মঞ্চের বাঁধনে বদ্ধ তারা, প্রকাশ্যত ব্যাবসায়িক মঞ্চ না হলেও ব্যাবসার গেরোতে তাদের শেষ পর্যন্ত আটকে পড়তে হয়। নাটক করে টাকা না ওঠাতে পারলে পরের নাটকটা করা সম্ভব হয় না, অন্তত 'কল্ শো'গুলোতে মোটা লাভ রাখতেই হয়, নইলে দল চলে না। আবার একই নাটক বারবার যাতে করা যায়, অর্থাৎ যাতে দর্শকের গরম চাহিদার বিষয় তাকে করে তোলা যায়, (নইলে 'কল্ শো' করার ডাক আসবে না) সে জন্যে কিছু দর্শক-মনোরঞ্জক জিনিস তাতে আনতে হয়—তা সে আলো, পোশাক, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির কায়দা-কানুন হোক, বা গান, নাচ বা অন্য কোনো চটক হোক। অর্থাৎ এ এক বিষাক্ত চক্র যার মধ্যে একবার ফেঁসে গেলে আর বেরোবার উপায় নেই। অস্তিত্বরক্ষার জন্যেই গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে খানিকটা ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হয়, লাভ-লোকসানের কথা ভাবতে হয়।

ঘ. আবার ওই অস্তিত্ব, কিংবা অর্জিত 'ইমেজ' রক্ষা করার জন্যে সরকারি দাক্ষিণ্যের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হয় কোনো প্রসেনিয়াম-বদ্ধ দলকে। এদের কপালে জোটে কেন্দ্রীয় সরকারের "সংস্কৃতি-দপ্তর ও সংগীত নাটক অকাদেমীর শাঁসালো অনুদানগুলি"। জুটেছে জরুরি অবস্থার মধ্যে এবং জরুরি অবস্থার পরে। সরকারি টাকা হজম করে কি এসব দলের পক্ষে খুব স্পষ্ট রাজনৈতিক কথাবার্তা বলা সম্ভব—যদি সে রাজনীতি অনুদানের উৎস যে কেন্দ্রীয় সরকার, তার দলীয় রাজনীতির বিপক্ষে যায়? ওই অবস্থায় বিপ্লবী থিয়েটার এরা কী করে গড়ে তুলবে? "যে থিয়েটার সামাজিক অসাম্য ও অন্যায়কে আক্রমণ করবে, সে-থিয়েটার স্বভাবতই প্রাতিষ্ঠানিক দাক্ষিণ্য আশা করতে পারে না।" "শত্রুর কাছে হাত পেতে শত্রুকে আঘাত করা যায় না।" তাদের "টিঁকে থাকার তাগিদেই সাবধানী হতে" হয়।

'গ' ও 'ঘ' যুক্তির মোদ্দা কথা হল যে, প্রসেনিয়াম-বদ্ধ থিয়েটার মিতব্যয়ী থিয়েটার নয়, খরচের প্রবণতা রয়েছে তার চরিত্রের মধ্যে। এবং তাই এস্টাব্লিশমেণ্টের সঙ্গে নানা আপোশ করে তাকে চলতে হয়। আপোশ করতে হয় বলার কথাতেও। কলকাতার ক্রান্তিক গণসংস্থা আয়োজিত আলোচনা সভায় (১৯৮২) বাদলবাবুর ভাষণের তিনটি শব্দ ব্যবহার করে বলা যায়—এ থিয়েটার হল "flexible, portable, inexpensive."[৬১] অঙ্গনমঞ্চের থিয়েটার মিতব্যয়ী এবং নিরাভরণ, সে উপকরণবাহুল্য বর্জন করে, স্থাপত্য, সাজসজ্জা, আলো ও পোশাকের জৌলুস উড়িয়ে দিয়ে সে থিয়েটার শুধু একটিমাত্র উপাদানের উপর সবচেয়ে বেশি করে নির্ভর করে—সেটি সম্ভবত থিয়েটারের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান—অভিনেতার শরীর। এবং এ থিয়েটার র‍্যাডিক্যাল।

ঙ. প্রসেনিয়াম মঞ্চে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে একটা দূরত্ব থেকেই যায়, প্রাচীনপন্থীরা তাকে 'শৈল্পিক' দূরত্ব বলে থাকেন। ওই যে অলীক কিংবদন্তিমূলক সংস্কার যে, দর্শক অদৃশ্য দেওয়ালের আড়ালে বসে লুকিয়ে নাটকের পাত্রপাত্রীদের জীবনযাত্রা দেখে ফেলছে, অনেকটা দরজার চাবির ফুটোয় চোখ সেঁটে রাখা voyeur-এর মতো —সেটা এই তত্ত্বেরই বিবরণ মাত্র। দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে পাত্র-পাত্রীদের, কিন্তু পাত্রপাত্রীরা দর্শকদের দেখতে পাচ্ছে না, কারণ অডিটোরিয়ামের আলো নেবানো। আর দর্শকরা যাতে পাত্র-পাত্রীদের আরো ভালো করে তাদের সাজানো জীবনক্ষেত্রে দেখতে পারে সেজন্য মঞ্চে রাখা হয়েছে অজস্র আলো, কোনো কোনো আলো চরিত্রের সঙ্গে চলাফেরা করছে, তার মুখটিকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলছে, কোনো ঘটনার অংশকে উদ্ভাসিত করছে, বর্ণের নানা আভাস এনে, নানা বাস্তব বা স্বপ্নের মায়াবিভ্রম তৈরি করে দর্শকের চোখদুটিকে আটকে রাখছে। এই একই কাজে লাগছে প্রেক্ষাপট, মঞ্চের নানা সাজ ও উপকরণ, চরিত্রগুলির রূপসজ্জা ও পোশাক-আশাক, নেপথ্য থেকে ভেসে আসা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ বা গান ইত্যাদি। সবই তৈরি করছে দর্শক ও পাত্রপাত্রী এই দু-পক্ষের মধ্যে দূরত্ব, বিসদৃশতা। অঙ্গনমঞ্চের লক্ষ্য ঠিক উল্টো। সে আনতে চায় দর্শককে পাত্রপাত্রীর "ঘনিষ্ঠ কাছে", যাতে 'জনসংযোগ

হয়ে ওঠে "মানুষে মানুষে দর্শকে অভিনেতায় প্রত্যক্ষ সংলাপ সংযোগ"। সেজন্যে অঙ্গনমঞ্চে পাত্রপাত্রী ও দর্শকেরা একই আলোর অংশীদার। এমন কী 'আলোর বৃত্ত'ও নেই পাত্রপাত্রীদের জন্যে। দুপক্ষই দুপক্ষকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ফলে "ভিড়ের একজন হয়ে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্যে সায় দিয়ে বা না দিয়ে আস্তে আস্তে সরে আসা যায়, অন্ধকারে নিজের একাকিত্বে লুকোনো যায়। অঙ্গন মঞ্চে সেই সুযোগ নেই।"

চ. প্রসেনিয়াম থিয়েটারের "আমদানি হয়েছিল ভারতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবেই। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রাম-শহরের যে-বৈষম্য ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবদান, সেই বৈষম্যের উপরই দাঁড়াল আমাদের থিয়েটার। এই থিয়েটার একদিকে যাত্রা, নৌটঙ্কী, তামাশা, ভাওয়াই-এর ধারাকে সম্পূর্ণত অস্বীকার করল, অন্যদিকে নিজেকে এমনই অস্বাভাবিক আকর্ষণীয় করে তুলতে থাকল যে, শহরের থিয়েটার হল গ্রামের বিত্তবানদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার,—অভিভূত করে দেবার সার্কাসের তাঁবু। থিয়েটারের এই ইতিহাসের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যা গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে বা গ্রামীণ চেতনাকে থিয়েটারে প্রবেশই করতে দেবে না। গ্রাম যদি বা কখনও এই থিয়েটারে আসে, তাও আসে শহরের মানুষের ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, নয়তো শহরের মানুষ গ্রামকে যে-রূপে দেখতে চায়, সেই রূপের আদলে"।[৬২]

আমার বিচারে, শমীকের সমস্ত যুক্তির আয়োজন ঘটেছে একটি মৌলিক প্রস্তাবের উপস্থাপনার জন্যে, একটি 'প্রায়োরিটি' নির্দেশের জন্য। সেটি কী, না—এখন রাজনৈতিক বা "প্রতিবাদী" থিয়েটার করাটাই গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রাথমিক কাজ, ভারতবর্ষের এখনকার রিয়্যালিটি তাই দাবি করে। আর রাজনৈতিক বক্তব্য পৌছে দিতে হবে সহজে, যথার্থ ভারতে অর্থাৎ গ্রামে এবং তার জন্যে অঙ্গনমঞ্চের মতো স্বচ্ছন্দ বাহন আর কিছু নেই।

এ বক্তব্যের প্রথমাংশের সঙ্গে, অর্থাৎ এখানকার বাস্তব ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় রাজনৈতিক বা শমীকের ভাষায় "প্রতিবাদী থিয়েটার" করা যে খুবই উচিত—এ সম্বন্ধে এই লেখকের মতো গ্রুপ-থিয়েটারের অনেকেই যে একমত হবেন, এতে সন্দেহ নেই। শমীক যাঁদের বলছেন "পরীক্ষাপ্রবণ

থিয়েটার" তাঁদের হয়তো একটু দ্বিধা হবে কথাটা পুরোপুরি মেনে নিতে। প্রথম প্রশ্ন এবং প্রথম বিভ্রান্তির অবকাশ তৈরি হয় ওই অগ্রাধিকারের মাত্রা নিয়ে। শমীক কি প্রত্যক্ষভাবে যে-নাটক রাজনৈতিক নয় তাকে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে বলছেন? আমরা দেখার সুযোগ পাব না 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর' বা, ধরা যাক, 'অলীকবাবু'? বাংলায় সোফোক্লেস বা শেক্‌সপিয়ার, ইবসেন, কিংবা চেখফ করতে পারব না আর? এতটা নিষ্ঠুর হবেন শমীক? আমার এ প্রশ্নের মধ্যে যে খানিকটা 'শিল্প'-বিলাসী মধ্যবিত্ততা উঁকি দিচ্ছে তা আমি বুঝি, তবু আমার এ দাবির সমর্থন আছে নাটকের ইতিহাসে। পৃথিবীর কোনো দেশে, বিপ্লবের কোনো পর্যায়ে, ঠিক এমনটি কি ঘটেছে কখনো? লেনিন বা মাও ৎসে-তুং জানতেন বিপ্লব একটা সুনির্দিষ্ট, বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটি অব্যাহত নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা নিরন্তর ঘটতেই থাকবে, যার কোনো উপসংহার নেই। এমন একটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে-সব দেশ তাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী নীতি তৈরি করছে, সেই রাশিয়ায় বা চীনে কি কখনো বলা হয়েছে যে, সেখানে শুধু 'অ্যাজিট-প্রপ' থিয়েটারই চলবে, আর কিছু নয়? তথাকথিত 'মুক্ত' দুনিয়াতে বহুনিন্দিত স্ট্যালিনের দুর্ধর্ষ শাসনকালেও দেখছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্তরঙ্গ সময়ে সোশ্যালিস্ট বাস্তবতার অজস্র নাটকের পাশাপাশি, যুদ্ধে নিজের নিজের শহর থেকে উৎখাত উদ্‌বাস্তু হয়েও, মস্কো আর্ট থিয়েটারের একটি দল মিন্‌স্ক্‌-এ করছে শেরিডানের 'দ স্কুল কর স্ক্যাণ্ডাল', (ওই সময়েই হিটলার আক্রমণ করেছে রুশদেশ)। মস্কোতে ১৯৪২-এ মালি (Maly) থিয়েটার নামাচ্ছে বার্নার্ড শ'র 'পিগ্‌মেলিয়ন', মলিয়েরের 'ডন জুয়ান', ১৯৪৩-৪৪-এর সিজনে শেক্‌সপিয়রের 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', 'অ্যানটনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা,' 'টুয়েলফ্‌থ নাইট' অভিনয়ের তোড়জোড় করছে। লালফৌজের নিজস্ব দল মস্কো সেন্ট্রাল থিয়েটার দেখাচ্ছে শেক্‌সপিয়রের 'দ্য টেমিং অব দ্য শ্রিউ' এবং গোলডস্মিথের 'শি স্টুপ্‌স টু কংকার'—কখনো যুদ্ধের ফ্রন্টে গিয়ে। লেনিনগ্রাডের কমেডি থিয়েটার এই ধ্বংস ক্ষয় ও রক্তপাতের মধ্যেও তার নামের জন্যে লজ্জিত বোধ করছে না, বা বন্ধ করছে না কমেডির অভিনয়।[৬৩] চীনেও কি মুক্তির পর দেশের প্রাচীন অপেরা-ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়নি? একথা খুবই ঠিক যে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সামাজিক বক্তব্য পৌছে দেওয়া হয়েছে চাষীদের 'লিভিং নিউজপেপার'গুলোর মধ্যে দিয়ে, মুক্তি-যুদ্ধের ঠিক পরে-পরেই গড়ে উঠেছে এক ধরনের জনশিক্ষামূলক নাটক—অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক উইলফ্রেড

বার্চেট-এর লেখায় যার খবর পাই। 'গেট নম্বর ৬' নাটকটি ডক-শ্রমিকেরা নিজেরাই লিখছে এবং প্রয়োজনা ও অভিনয় করছে। গণমুক্তির ফলে হীন-জীবিকা থেকে উদ্ধার পাওয়া বারবণিতারা নিজেদের জীবন দিয়ে নাটক লিখে অভিনয় করে মানুষকে বোঝাচ্ছে কত ভয়ংকর এবং অভিশপ্ত ছিল সে জীবন। তিয়েন-ৎসিন-এর প্রাক্তন পকেটমাররাও অভিনয় করছে তাদের জীবন নিয়ে লেখা নাটকে।[৬৪] কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিনীত হয়েছে শেক্‌সপিয়র, মলিয়ের, চেখফ্, শ, ইবসেন—অজস্র দলে, অসংখ্য শহরে। প্রাচীন অপেরা-ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে প্রসিদ্ধ অভিনেতা মেই ল্যান-ফ্যাং-কে ১৯৫৫-তে একই সঙ্গে 'চীনা অপেরা গবেষণা কেন্দ্র' এবং 'পিকিং অপেরা স্কুল'-এর অধ্যক্ষের সম্মান দিয়ে।[৬৫] সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে অবশ্য পরে অবস্থা খানিকটা বদলে যায়, কিন্তু বিপ্লব-সাধনের প্রথম বছরগুলিতে চীনের থিয়েটারের বৈচিত্র্যের কোনো অভাব ছিল না। আর জার্মান দখলদার বাহিনীর প্যারিস দখল করে থাকার সময় সেখানকার রেডিয়োতে 'ডাকঘর'-এর অভিনয় হয়েছে, সেকথাও তো মনে পড়ে। সেটা 'চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান'-গোছের ব্যাপার নয়! পারি নগরীর মানুষদের নৈতিক বল বজায় রাখার জন্য তার দরকার ছিল।

আমি আবার বলছি, বৈচিত্র্যের জন্য বৈচিত্র্য আমার কাম্য নয়। কিন্তু প্রতিবাদী থিয়েটারের নামে এক ধরনের কড়া ইউনিফর্মিটি চাপিয়ে দিলে বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একটু সংকীর্ণ করে দেখা হয় বলে আমার ধারণা। ইতিহাসের এসব তথ্য শমীকের কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশি আছে। এবং এটাও মানি যে, শুধু এসব তথ্য দিয়ে রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রয়োজন এবং তার অগ্রাধিকারের উপস্থিত দাবিকে অস্বীকার করা যাবে না। শমীক আমাদের গ্রুপ থিয়েটারগুলির লক্ষ্যের ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেছেন, তার মনোযোগের একটি আবশ্যিক ক্ষেত্র নির্দেশ করেছেন, এজন্যে তাত্ত্বিকভাবে তাঁকে সমালোচনা করা গেলেও তাঁর কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না।

তবে আবার এও ঠিক যে, রাজনৈতিক থিয়েটার যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের হাত ধরে না চলে, এবং সে রাজনৈতিক বিপ্লব-প্রয়াস যদি সফল না হয়, তবে থিয়েটার—সে যতই সচেতন ও দায়িত্বশীল হোক, তা একা বিপ্লব এনে দিতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ায় প্রলেতারীয় নাটক 'লুদ্রুক্' এমন জনপ্রিয় ছিল যে, তার মধ্য দিয়ে সহজেই সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করতে

পেয়েছিল গণচেতনার নব জাগরণের এক সুবিস্তৃত কাঠামো। ১৯৭৫-র বীভৎস গণহত্যার পর লুব্রুকের সে ভূমিকা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে[৬৬]।

আসলে রাজনৈতিক থিয়েটার করার যৌক্তিকতাকে গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলির বেশির ভাগই যে স্বীকার করছে, এবং নিজের নিজের ধরনে তাদের প্রত্যেক্যেই যে রাজনৈতিক থিয়েটার করছে তাও আমরা জানি। সুতরাং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক থিয়েটার করতে হবে, এ কথায়ও গ্রুপ থিয়েটারের উষ্মা বোধ করার কোনো কারণ নেই।

সমাস্যাটা দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রারম্ভিক শর্ত হিসেবে অঙ্গনমঞ্চকে জুড়ে দেওয়ায়। এতে গ্রুপ থিয়েটারের অনেকেই, যাঁদের অনেকেই আবার আই. পি. টি. এ'র ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় থিয়েটার করেছেন, ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবছেন, 'তবে কি এতদিন ভুল থিয়েটার করলুম? শোনো কথা একবার।' শমীক যখনই অঙ্গনমঞ্চকে বেশি নম্বর দিচ্ছেন তক্ষুনি একটা ইভ্যালুয়েটিভ জাজমেন্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে—অঙ্গনমঞ্চ ভালো, প্রসেনিয়াম তত ভালো নয়। প্রসেনিয়াম-সেবীরা স্বভাবতই এতে ক্ষুণ্ন বোধ করছেন। এঁদের বেশির ভাগই আক্ষরিক অর্থে পেশাদার নন, থিয়েটারের উপর ভর দিয়ে এঁদের জীবিকা নির্বাহ হয় না—আধা-নাগরিক-ঔপনিবেশিক-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অন্যান্য বৃত্তিতে জুড়ে থেকে, অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেন এঁরা সচেতন থিয়েটারের জন্যে। এটা যাঁরা গ্রুপ থিয়েটারের কাছাকাছি থাকেন তাঁরা সকলেই জানেন। সব দায়দায়িত্ব ছেড়ে মিশনারি উন্মাদনায় রাজনৈতিক থিয়েটার নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ানো যেমন এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি আবার লাভ-ক্ষতির বিবেচনার গভীর গাড্ডায় সকলে গিয়ে পড়েছেন, এমন কথা বললেও এঁদের উপর খুব সুবিচার করা হবে না।

আমার কখনো কখনো মনে হয় এরিক বেন্‌ট্‌লি যাঁদের 'ব্রডওয়ে ইন্‌টেলিজেনশিয়া'[৬৭] নাম দিয়েছেন শমীক হয়তো গ্রুপ থিয়েটারের লোকজনকে খানিকটা তাদের সঙ্গে এক করে দেখছেন। যে-লোক থিয়েটারকে ব্যাবসা হিসেবে নিয়েছে, ব্রডওয়ের সেই ক্রোড়পতি প্রযোজকের সঙ্গে ব্রডওয়ের বুদ্ধিজীবীর তফাত হল, ক্রোড়পতি থিয়েটার-বণিক "Serves Mammon whereas the Broadway intellectual serves God and Mammon"[৬৮] বেন্‌ট্‌লি ব্রডওয়ের বুদ্ধিজীবী থিয়েটার কর্মীদের কাছে এক ধরনের 'heroism' আশা করেছিলেন। কিন্তু থিয়েটার গিল্ড, প্লেরাইট্‌স কোম্পানি, থিয়েটার ইনকরপোরেটেড বা

আমেরিকান রেপারটরি থিয়েটারের প্রযোজনায় সে ধরনের heroism-এর দেখা না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, বেন্‌ট্‌লি স্বীকার করেছেন যে, এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই idealism আছে এক ধরনের—আমেরিকান রেপার্টরির থিয়েটারের অভিনেতারা স্বেচ্ছায় প্রাপ্যের চেয়ে কম বেতন নেয়—, তাদের 'Zeal' এবং 'Seriousness'-ও আছে, তবু বেন্‌ট্‌লি প্রশ্ন করেছেন "What signs are there that anyone in the New York theater is willing to be heroic?"[৩৬৯] শমীকেরও গ্রুপ থিয়েটারের কাছে প্রত্যাশা কি অনেকটা এইরকম? পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের স্বচ্ছলতার মধ্যে থেকেও নিউ ইয়র্কের থিয়েটারের লোকজন যদি 'বেপরোয়া' হতে না পারে, এই গরিব দেশের (নিম্ন) মধ্যবিত্ততার কবলগ্রস্ত থিয়েটারকর্মীদের কাছ থেকে সেই শৌর্য কী করে আশা করি? অবশ্য আমি এই কথাগুলি শমীক ভাবছেন বলে যে ভেবে নিচ্ছি তা ঠিক নাও হতে পারে। যদি তা না হয়, তাহলে আমার ওই প্রশ্নটিও ফিরিয়ে নিতে হবে।

এবার রাজনৈতিক থিয়েটারের ব্যাপারে অঙ্গনমঞ্চের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার দাবিটি যাচাই করা যাক। নাটকের ইতিহাস কি সে দাবিকে খুব জোর দিয়ে সমর্থন করে? এমন-কী বামপন্থী নাটকের ইতিহাস? 'লিভিং নিউজপেপার' বা 'অ্যাজিট-প্রপ' থিয়েটার বোধ হয় সংগঠনের দিক থেকে অঙ্গনমঞ্চের সবচেয়ে কাছের জিনিস ছিল, কিন্তু চীনে বা রুশদেশে তার ভূমিকা এই মুহূর্তে কতটুকু? সেখানে তো প্রসেনিয়াম মঞ্চেরই জয়জয়কার।

শমীক অবশ্য বড়লোক এবং গরিব দেশের, নগরবহুল ও গ্রামবহুল দেশের মধ্যে তফাতটির কথা খেয়াল রাখতে বলেন, কাজেই ইউরোপ-আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেওয়া সবসময় সংগত হবে না। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্যের থিয়েটার এবং দক্ষিণ বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার থিয়েটারের মধ্যে একটা চরিত্রের প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্যের থিয়েটার যেখানে তার সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার একটা প্রান্তিক অংশ মাত্র, ভারত, ইন্দোনেশিয়া বা এই সব অঞ্চলের থিয়েটার মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তাদের অস্তিত্বের একটি ঘনিষ্ঠ অংশ, প্রায় অবশ্যকৃত্য আচার-অনুষ্ঠান বা রিচুয়ালের মতো। আমাদের লোকনাট্যের স্থায়িত্ব, প্রসার, সচলতা ইত্যাদির কথা ভাবলে এ কথায় সন্দেহ জাগে না। বেশিরভাগ লোকনাট্য অঙ্গনমঞ্চের কাছাকাছি, ফলে গ্রামে অঙ্গনমঞ্চের গতিবিধি যত সহজ, প্রসেনিয়ামের দৌড়োনো তত সহজ নয়। কিন্তু ভারতের আদি অঙ্গনমঞ্চ-

গুলি—যাত্রা ইত্যাদি—যেমন রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে পরিহার করেও সচল থাকতে পারে, তেমনি প্রসেনিয়াম মঞ্চও অনায়াসেই রাজনৈতিক নাটক নামাতে পারে। ব্রেশ্‌ট থেকে আরম্ভ করে সোবিয়েত ও চীনভূমির প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক নাটকই প্রসেনিয়ামের আশ্রয়ে পরিবেশিত হয়েছে। প্রসেনিয়াম মঞ্চের এই কৃতিত্ব তো ঐতিহাসিক রেকর্ড, কাজেই আজ কেন তাকে কলঙ্কের ভাগী হতে হবে? যে মঞ্চে 'নবান্ন' নামানো হয়েছিল সেই মঞ্চকে আজ দুর্বল সামাজিক দায়িত্ববোধের নিন্দা শুনতে হচ্ছে, এটাই খুব আশ্চর্যের।

ভারতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে দূরত্ব বা বিভেদ সর্বত্র একরকম নয়। আবার পশ্চিমবাংলাতেও গ্রাম অঞ্চলবিশেষে কখনও শহর থেকে সুগম, কোথাও দুর্গম। অঙ্গনমঞ্চ সব গ্রামে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছোতে পারে কিনা সেটাও লক্ষ করতে হবে। আমি অবশ্য ওই সব পরিসংখ্যানের মধ্যে যাব না যে, প্রসেনিয়ামে একসঙ্গে দুহাজার দর্শক নাটক দেখে আর অঙ্গনমঞ্চে দেখে দেড়শো জন, কাজেই প্রসেনিয়াম একবারেই বহুগুণ বেশি লোকের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসেই আমরা দেখেছি যে সরকারি দাক্ষিণ্য নিয়েও প্রতিবাদী নাটক করা হয়েছে। উৎপল দত্তই তা করেছেন। এ তথ্য হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, মিনার্ভা থিয়েটার চালানোর সময় লিটল থিয়েটার গ্রুপ সংগীত নাটক অকাদেমীর মোটা সাহায্য পেয়েছিলেন।[৭০] 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'মানুষের অধিকারে' যে ধরনের নাটক তা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে সরকার-বিরোধী এবং বিপ্লব-প্ররোচক নয়—শমীক একথা বলতে পারেন। কিন্তু সরকার বিরোধী নাটকই কি একমাত্র রাজনৈতিক নাটক? আর প্রসেনিয়ামে বা শহরের থিয়েটারে গ্রাম সরলীকৃত বা শহরের মানুষের ধারণা অনুযায়ী ছাঁটকাট করা চেহারা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়—একথাও সম্পূর্ণ মেনে নিতে দ্বিধা হয়। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক সম্বন্ধেও কি শমীক এই কথা বলবেন?

প্রসেনিয়ামও তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মিতব্যয়ী হতে পারে। চেতনার 'সমাধান' নাটকটির কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। কিন্তু অঙ্গনমঞ্চের মিতব্যয়কে সে ছুঁতেই পারে না, এখানে নিশ্চয়ই অঙ্গনমঞ্চের জিত। আসলে প্রশ্ন ছিল—একটি আরেকটির বিকল্প কি না। এর স্পষ্ট উত্তর, না। বাদলবাবু ব্রেশটের 'ককেশীয় খড়ির গণ্ডি' করেছেন অঙ্গনমঞ্চে—অসাধারণ হয়েছে সে রূপান্তর; কিন্তু অত চমৎকার এবং বিশ্বাসযোগ্য কি তিনি করে তুলতে পারবেন 'মাদার কারেজ ও তার সন্ততি' কে? গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থস'-কে? আর রাজ-

নৈতিক নাটকের বাইরে গেলে তো অঙ্গনমঞ্চ অথই জলে পড়বে—বিশেষ করে ১৮৫০-এর পরবর্তী ইয়োরোপের রিয়ালিস্টিক-ন্যাচারালস্টিক নাটকগুলির কথা যদি ধরি। অর্থাৎ যে-কোনো ধরনের নাটক এই form-এ করা যায়—বাদলবাবুর এই দাবি একটি বিশেষ অর্থে ঠিক নয়। প্রসেনিয়াম মঞ্চের যে-কোনো নাটককে অঙ্গনমঞ্চের নাটকে অনুবাদ করা সম্ভব নয়।

প্রসেনিয়ামে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে 'দূরত্ব' যতটা কল্পনা করা হয় ততটা নিশ্চয়ই নয়। নাটকের অভিনেতারা জানে যে, মঞ্চের নিচে হাঁ করা অন্ধকারের মধ্যে দর্শকেরা বসে আছে, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে যখন তারা স্তব্ধ বসে, হাসির কথায় তারা হাসছে, দারুণ অভিনয়ে কেউ ফুকরে উঠছে 'সাবাস!' বা 'ব্রাভো!' হলে কথা না শোনা গেলে চেঁচাচ্ছে 'লাউডার।' এই উপস্থিতির অনুভবটি না থাকলে অভিনেতার অভিনয় খোলে না অনেক সময়, দর্শকের ওই উপস্থিতির সঙ্গে একটা উত্তপ্ত হৃদ্যতা তৈরি হয়ে গেলে আবার অভিনয় দারুণ জমে যায়। কাজেই 'দূরত্ব' কথাটা একটা মিথ। জুলিয়ান বেক তাঁর লিভিং থিয়েটারে বা গ্রোটাউস্কি তাঁর 'গরিব' থিয়েটারে এই দূরত্ব যে ভাবে ভাঙবার চেষ্টা করেন, তা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক থিয়েটারের কর্মীদের লক্ষ্য নয়। দর্শকের রুচি, শিক্ষা, সম্ভ্রমকে আঘাত করে তাদের একধরনের স্যাডিস্টিক মনোধর্ষণের বিষয় করে বিশেষত বেক যে ভাবে দর্শক-অভিনেতার মধ্যেকার পাঁচিল ভাঙেন, সেটা আমাদের দেশের পটভূমিকায় সম্ভব নয়। এর চেয়ে পিটার শুম্যানের ব্রেড অ্যাণ্ড পাপেট থিয়েটারের পদ্ধতি অনেক ভালো।[৭১] শুম্যান বলেন, "You can't shock the audience. That will only disgust them".

আমরা যারা দু ধরনের নাটকই দেখেছি—প্রসেনিয়াম এবং অঙ্গনমঞ্চের—তাদের মনে এই সংশয় আছে যে, দর্শক ও পাত্রপাত্রীর "ঘনিষ্ঠ কাছে" আসা এবং "মানুষে মানুষে দর্শকে অভিনেতায় প্রত্যক্ষ সংলাপ সংযোগ"-এর "জন-সংযোগ" তৈরি হওয়ার দাবিটি হয়তো একটু বিস্ফারিত। সত্যি অঙ্গনমঞ্চের নাটক দেখে দর্শক সেই মুহূর্তে committed হয়ে পড়ে? এ তো প্রায় ভোজ-বাজির মতো কাণ্ড। আমি জানিনা শমীক এ কথা প্রমাণ করবেন কী করে। প্রসেনিয়ামও তার নিজের মতো করে দর্শককে নানাভাবে নাটকের আওতায় আনবার চেষ্টা করেছে—কোরাস বা সূত্রধার বা স্টেজ ম্যানেজার চরিত্র তৈরি করে, অভিনেতাদের দিয়ে সোজাসুজি দর্শক সম্ভাষণ করিয়ে, মঞ্চের অংশটাকে

বাড়িয়ে দর্শকদের মধ্যে ঢুকিয়ে, অভিনেতাদের দর্শকের মধ্যে বসিয়ে কিংবা অডিটোরিয়ামে অভিনয় ছড়িয়ে দিয়ে—সে সব কায়দাকানুনের লিস্টি নেহাত ছোট হবে না। দর্শকের আবেগ ও চিন্তার ওপর প্রসেনিয়ামের নাটকের প্রতিক্রিয়া অঙ্গনমঞ্চের নাটকের চেয়ে কম—ওরকম সিদ্ধান্তের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে আমি জানি না। পরে এ নিয়ে আরেকটু বলছি আমরা।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের যুক্তিটিও সম্ভবত একটু আবেগাশ্রিত। থিয়েটার যদি ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার হয়, ভারতবর্ষের এখনকার ডাকব্যবস্থা, রেলব্যবস্থা, বিদ্যুৎশক্তি, গল্প-উপন্যাস বা হাওড়ার ব্রিজও তাই। যদি এই থিয়েটার শুধু ঔপনিবেশিক স্বার্থকেই সেবা করত তাহলে ১৮৭৬-এ নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করবার প্রয়োজন হত না, বা জেল-জরিমানা হত না নাটকের লোকদের।

কথা হল, তবে কি অঙ্গনমঞ্চই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অবান্তর একটি উদ্ভাবন? এখানে আমি আবার একটি প্রবল 'না' উচ্চারণ করতে চাই। অঙ্গনমঞ্চ ইদানীংকালের ভারতীয় থিয়েটারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, এবং প্রসেনিয়ামপন্থীরা সে কথা অস্বীকার করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবেন। অঙ্গনমঞ্চের হাতিয়ার হিসেবে অনেক যোগ্যতা আছে, তার সবলতা ও তীব্রতা অনেক বেশি। দুর্গম গ্রামে যদি যেতেই হয়, 'নরক গুলজার' কিংবা 'খড়ির গণ্ডি' বা 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নিয়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক সহজে সেখানে বহন করা যাবে 'গণ্ডী' বা 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' বা 'ভোমা'। আর শহরের গ্রুপ থিয়েটারকে কখনো কখনো যে 'spectacle-এর মোহ পেয়ে বসে তাও তো মিথ্যে নয়।

আর শুধু গ্রামে কেন, শহরের পথঘাটে খোলা জায়গায় যদি অভিনয় করতে হয় ওয়েস্কারের 'সেণ্টার ফরটি-টু'র ধরনে, তাহলেই বা প্রসেনিয়াম কোন্ কাজে আসবে? আমার মনে হয়, এখন কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারগুলির এ ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার সময় এসেছে যে, প্রেক্ষাগৃহের বাঁধা দর্শকের বাইরে ছড়ানো দর্শকের কাছেও পৌছুতে হবে। তার জন্য তৈরি করতে হবে আলাদা নাটক। তার নাম অঙ্গনমঞ্চ না হয়ে যাই হোক না কেন। অর্থাৎ রেপারটরিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে প্রসেনিয়ামের বাঁধন থেকে। প্রসেনিয়ামের জন্য কিছু নাটক থাক, আবার অঙ্গনমঞ্চের জন্যেও তৈরি করা হোক কিছু নাটক। কয়েকটি দল সেভাবে প্রস্তুতও হচ্ছেন জানি। অন্যদিকে বর্তমান বামপন্থী সরকার যেসব মঞ্চ তৈরি করছেন তার মধ্যেও প্রসেনিয়ামের বাঁধাধরা ফ্রেম-ভাঙা কিছু স্টেজ

তৈরি হোক, এ আমি দেখতে চাই।

আমার মত প্রসেনিয়াম ও অঙ্গনমঞ্চের মধ্যে কোনো either-or সম্পর্ক নেই। একটির বিনিময়ে বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়। শিল্পের দিক থেকে মঞ্চভাবনার একটি সংগত ও সম্ভাবনাপূর্ণ সম্প্রসারণ হল অঙ্গনমঞ্চ। গ্রুপ থিয়েটারগুলি কেন তাকে অবহেলা করবে? দুয়ের বিরোধটাই আমার কাছে দরকারের চেয়ে অনেক বেশি ফাঁপানো মনে হয়। অঙ্গনমঞ্চের পৈঠায় দাঁড়িয়ে প্রসেনিয়ামকে বক দেখানো যেমন আড়াই হাজার বছরের অভিনয়ের ঐতিহ্যকে লঘু করে দেখা, তেমনি প্রসেনিয়ামের ছাউনিতে বসে অঙ্গনমঞ্চের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনাগ্রহী থাকা চিন্তার একধরনের জড়ত্বের পরিচায়ক। শমীক এই বিরোধ ঘটিয়ে তুলেছেন কি না আমি জানি না। আমি কিন্তু তাঁর কথাগুলিকে চূড়ান্ত condemnation হিসেবে না দেখে একজন মনস্ক মানুষের সতর্কবাণী হিসেবে বিবেচনা করতে চাই, এবং সেখানেই তাঁর মতামত আমার কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে। তিনি আমাদের কারো কারো 'যা-করছি-বেশ-করছি' গোছের আত্মপ্রসাদ ধরে নাড়া দেন, তার জন্যে রেগে না উঠে তাঁর কাছে আমাদের একটু কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা মনে পড়ে: "বাংলা থিয়েটার বয়সে তিনপুরুষ হলেও মঞ্চের কাঠামো পরিবর্তন খুব বেশি হয়নি। বৈদ্যুতিক আলো ও মঞ্চ ঘোরাবার রীতি প্রবর্তিত হলেও মঞ্চ আসলে সেই 'ছবির ফ্রেম' প্রকৃতিরই রয়ে গেছে। মঞ্চ নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা করবার বলিষ্ঠতা এখনো থিয়েটারের জন্মায়নি"[৭২]।

১০.

কিন্তু বাদলবাবুর নাট্যরীতি নিয়ে আরও সমস্যা আছে। তাঁর নাটকের পাঠ এবং অভিনয় থেকে পাঠক-দর্শকের এমন একটা ধারণা প্রায় অবশ্যম্ভাবী যে, এ নাটক তাঁরই সমশ্রেণীর নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সম্ভাষণ করে লেখা। নাটকের সংগঠন, ভাষাভঙ্গি, বক্তব্যবিন্যাস, প্রসঙ্গ নির্বাচন—সবই যেন লক্ষ করে এই শ্রেণীকে। গ্রামের মানুষদের জন্য যে সম্ভাষণ, তা এই নাটকগুলিতে স্পষ্টতই অনুপস্থিত। বাদলবাবু সংলাপেও ন্যাচারলিজ্‌ম ভেঙে এগোতে চান প্রায়ই, কিন্তু যেখানে তা করেন না, সেখানেও তা গ্রামীণ মানুষের সহজ-বোধগম্যতাকে লক্ষ করে না। অর্থাৎ এসব নাটকের যে নাট্যকার-দর্শক সম্পর্ক,

তার চেহারা সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত বাগ্‌বিনিময়ের। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা হয়তো একটু বিশদ হবে। ধরা যাক, 'ভোমা' নাটকের এই অংশটি—

পাঁচ। আপনারা কারা?

চার। মহামায়া এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া।

পাঁচ। কি তৈরি করেন?

চার। তৈরী করি স্যার ডিজেল পাম্পসেট—শ্যামবার্ড, পাঁচ হর্স-পাওয়ার।

পাঁচ। সে তো শ্যামসন অ্যাণ্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানীর?

চার। আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্যামসন ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানীর। আমরাই সাপ্লাই দিই।

পাঁচ। পার্টস?

চার। পার্টস নয় স্যার, পুরো সেট অ্যাসেম্ব্‌ল করে। ওদের নেম-প্লেটটাও আমরা লাগিয়ে দিই। স্পেসিফিকেশন লিটারেচারও তৈরী করে ছেপে দিই।

[মেসিন থামলো]

দুই-তিন-ছয়। শ্যামবার্ড! শ্যামবার্ড!

এক। ডিজেল পাম্পসেট!

দুই-তিন-ছয়। শ্যামবার্ড! শ্যামবার্ড!

এক। মাত্র চার হাজার ছশো পঁচিশ টাকা।

চার। আমরা পাই আড়াই হাজার ওদের কাছ থেকে। কিন্তু নগদ পাই না, ওদের বিক্রি হলে তবে দেয়। নতুন সেট তৈরি করার পুঁজি নেই স্যার, তাই ধার চাইছি।

পাঁচ। ব্যাঙ্কের ইণ্টারেস্ট রেট এখন চোদ্দ পার্সেণ্ট।

চার। জানি স্যার, চোদ্দ পার্সেণ্ট। সেই জন্যেই চাইছি। বাজারে পঁয়ত্রিশ পার্সেণ্টের নীচে পাই না।

পাঁচ। অ্যাসেট কি আছে?

চার। অ্যাসেট স্যার—কারখানার শেডটা—

পাঁচ। কতো বড়ো?

চার। এগারোশো স্কোয়ার ফুট...[৭৩]

কিংবা 'মিছিল'-এ স্পষ্টত ম্যাচারালিজ্‌ম-ভাঙা সংলাপ-নিক্ষেপ—

এক। সাঁইত্রিশ টাকা কুড়ি। আটত্রিশ পঞ্চাশ। পঁয়ত্রিশ টাকা পঁচাত্তর। ত্রিশ পার্সেন্ট। সেভ্‌ন এ্যাণ্ড হাফ পার্সেন্ট। লগ্নী। আমানত। চালান। ভাউচার। শেয়ার। বোনাস। ডিভিডেণ্ড। ইকুইটি। লিকুইডেশন।

দুই। টন। হন্দর। পাউণ্ড। কিলোগ্রাম। ফুট। মিটার। গ্যালন। পাঁইট। লিটার। ডজন। গ্রোস। বস্তা। পেটি। ওয়াগন। প্যাকেট। ফাইল। কুইণ্টাল।

ছয়। ফোর সিক্স থ্রি ফাইভ টু ফোর। ইয়েস স্যার। হ্যালো, কথা বলুন। হ্যালো, ট্রাঙ্ক কল ফ্রম বম্বে। হ্যালো, থ্রি ফোর এইট টু ডাব্‌ল ফোর। কথা বলুন। হ্যালো হ্যালো—আউট অফ অর্ডার। হ্যালো। আপনি ছেড়ে দিন। হ্যালো। এন্‌গেজড। হ্যালো, লাইন বিজি, হোল্ড অন প্লীজ।[৭৪]

এই সংলাপের বিশেষ্য-সর্বস্ব ভঙ্গি ও যতিবহুল বিন্যাসের কথা শুধু বলছি না, এর মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা-জগৎ পরিবেশিত হচ্ছে, তা কি গ্রামের নিরক্ষর মানুষের জন্য, যে-দর্শকের বর্ণনা বাদলবাবু এইভাবে দেন—"সারা গ্রাম মন্থন করে, ছেঁড়া প্যাণ্ট, ছেঁড়া ফ্রক / অগণন গুঁড়োগাঁড়া, শিশুকোলে জনক-জননী / খালি গায়ে খালি পায়ে খালিপেট চাষার পল্টন"[৭৫]—তাদের জন্য?

আমরা জানি "নিরক্ষর" মানে "অশিক্ষিত" নয়, গ্রামের জনসাধারণের কাছে যা আমরা দুর্বোধ্য বলে মনে করছি তা শহুরে মানুষের নিজস্ব, সীমাবদ্ধ দুর্বোধ্যতার ধারণাপ্রসূত, এমনও হতে পারে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, গ্রামের মানুষের বোধগম্যতার ধারণাই বাদলবাবুর শহুরে শিক্ষিত বোধগম্যতার ধারণা থেকে জন্মেছে? আমরা আবার এমনও বলছি না যে, বাদলবাবুর নাটকের সবটাই গ্রামের মানুষের, অর্থাৎ বাদলবাবুদের বর্ণিত বা উদ্দিষ্ট দর্শকদের কাছে দুর্বোধ্য। নিশ্চয়ই এর মূল বক্তব্যটা তাঁদের কাছে পৌঁছোয়। কিন্তু তবু বেশ কিছুটা যে অস্পষ্ট থেকে যায়, তার খোঁজ তো 'পরিক্রমা' থেকেই আমরা পেয়ে যাই। সেখানে কিছু দর্শকের প্রতিক্রিয়া ইতস্তত তোলা হয়েছে। আমরা পর পর তার কয়েকটি তুলে দিই—

"বিষয়বস্তু বোঝা গেছে, আঙ্গিকে বোঝার অসুবিধা ('শানা বাউরির কথকতা')[৭৬]

"আপনারা অনেক সময় হাত-পা নাড়াচ্ছিলেন, বুঝতে পারছিলাম না।"[৭৭]

"একবার দেখলে দ্বিতীয়বার দেখতে আর ইচ্ছে হবে না।"[৭৮]

"বক্তব্যটা ভালোভাবে পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু আঙ্গিকের সাথে বক্তব্যের মিল নেই।"[৭৯]

"যে কোন দর্শক বারবার কি এই নাটক দেখতে চাইবেন?"[৮০]

"নাটক ('শিশুদের রক্ষা করো') বুঝতে অসুবিধা হয়েছে।"[৮১]

"আমি বুঝেছি, কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝবে না।"[৮২]

বলা বাহুল্য, এর উলটো বক্তব্যও প্রচুর আছে, এবং বাদলবাবু 'স্থাস' চতুর্থ বার্ষিকীর প্রবন্ধে[৮৩] বারবার তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। 'পরিক্রমা'-র এক প্রতিবেদনে দুলাল কর "সাধারণ মানুষ বুঝবে না"—এই মন্তব্যের সূত্র ধরে বলেছেন "আমরাও যে সংশয়মুক্ত ছিলাম, তেমন নয়। কিন্তু সব সংশয় ধুয়ে মুছে গেলো। আমরা শিক্ষিত সমাজ শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝি"[৮৪] 'পরিক্রমা'য় দেখা গেছে, কিছু কিছু দর্শক বাদলবাবুদের সঙ্গেই গ্রামের পর গ্রাম হেঁটেছেন, থেকেছেন। তবু এখানে মনে হয় একটা আত্মজিজ্ঞাসার দরকার থেকেই গেছে।

এটাও ঠিক যে, কোনো কোনো নাটকে বাদলবাবু এই নাগরিক ও মধ্যবিত্ত বাতাবরণ, এই সংবাদপত্রধর্মী অভিজ্ঞতা-নিক্ষেপ থেকে সরে আসেন, যেমন 'হট্টমালার ওপারে' বা 'উদ্যোগ পর্বে' বা 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী'তে। সেখানে তাঁর অভিষ্ট দর্শক নিশ্চয়ই তাঁর অনেক কাছে আসে।

আরেকটি বিষয়ে বাদলবাবুর কথায় একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে। তাত্ত্বিক প্রশ্ন হলেও এর জবাব তৈরি থাকা দরকার। দর্শকের মধ্যে দাঁড়িয়ে, দর্শকের পাশে বা পিছনে ছুটে, দর্শকের কানে কানে কথা বলে অভিনয় করায় দর্শকের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনেক বেশি হয় বলে বাদলবাবু এবং শমীক উভয়েই দাবি করেন। প্রসেনিয়ামে এটা হয় না, কাজেই প্রসেনিয়াম অচল। তাহলে কি বলতে হবে থার্ড থিয়েটার সমস্ত শিল্পের মধ্যে একেবারে চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠ (তম) শিল্প? আমরা তো দেখি চলচ্চিত্রে দর্শকদের এই involvement নেই; সেখানে যারা চলচ্চিত্র তৈরি করে তাদের সঙ্গে দর্শকদের দেখাশোনাই হয় না। এমন-কী যাঁরা committed চলচ্চিত্র-নির্মাতা তাঁদেরও তাহলে নিরুদ্যম বোধ করা দরকার, কিংবা চলচ্চিত্র ছেড়ে দিয়ে থার্ড থিয়েটারে নেমে পড়া দরকার, কারণ

থার্ড থিয়েটারের মতো কার্যকর আর তো কিছুই নেই। যাঁরা গণসংগীত করেন তাঁদের গণসংগীত তাহলে দর্শককে তেমনভাবে উদ্‌বেলিত করতে পারে না যেমন পারে থার্ড থিয়েটার? যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁদের শিল্পও তুলনায় পঙ্গু? সেক্ষেত্রে তাঁদের শিল্পের দারিদ্র্যে মুহ্যমান হয়ে তাঁদের থার্ড থিয়েটার করতে আসতে হবে? আমরা তো দেখি প্রসেনিয়ামের একটু-আধটু সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কলকাতার উষা গাঙ্গুলি তাঁর 'লোককথা'তে দর্শকের মধ্যে যে-আলোড়ন জাগান সে-আলোড়ন থার্ড থিয়েটারের বহু নাটকেই অনুপস্থিত থাকে। কারণ সে-নাটকের আবেদনও অনেকটাই বুদ্ধির কাছে থেকে যায়। সফদার হাশমির পথনাটিকাগুলিও আমাদের অনেক বেশি উদ্দীপিত করে। তাই হয়তো শেষ দিকে লোক-আঙ্গিকে নাটক তৈরি করার মধ্য দিয়ে ('লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', 'উদ্যোগ-পর্ব') বাদলবাবু তাঁর প্রচলিত নাট্যরীতি থেকে একটু সরে আসার চেষ্টা করেন।

শমীক ১৯৮০ নাগাদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাব আয়োজিত 'সেমিনারে'র এক বক্তৃতায় এক অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। খিদিরপুরের এ স্টক কোম্পানির লক-আউট ও শ্রমিকদের লড়াই নিয়ে শ্রমিকদেরই লেখা ও অভিনয় করা ('আজ বিশমাস'?) নাটকের কথা টেনে এনে তিনি হঠাৎ শেষ কথা বলার মতো করে বলেছিলেন, "ও নাটক দেখতে দেখতে আপনা থেকেই দর্শকদের হাত পকেটে চলে গেল, প্রসারিত কাপড়ে আমরা সবাই দিলুম পাঁচ টাকা দশ টাকা করে, যা হয়তো অন্য সময়ে কেউ দিতে চাইতুম না।" অর্থাৎ নাটক করে দর্শকের হৃদয় গলিয়ে তবেই সাহায্য পাওয়া যাবে, নইলে নয়। এখানেই সংগঠিত রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার আর একটা রাজনীতি যেন জেগে ওঠে, যা কোনো আন্দোলনকেই সাহায্য করে না, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও না।

চতুর্থ থিয়েটার

১১.

"তৃতীয় থিয়েটারের দর্শক" প্রবন্ধের শেষ দিকে বাদল সরকার বলেছিলেন,

"কিন্তু তৃতীয় থিয়েটারের শেষ কথা তো এই নয় যে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ কাজকর্মের অবসরে থিয়েটার তৈরি করে গ্রামে বস্তিতে ঘুরবেন। শেষ কথা—গ্রামের মানুষ, কারখানার মানুষ, বস্তির মানুষ, নিজেরাই নিজেদের জীবন

নিয়ে নাটক তৈরী করবেন, দেখাবেন নিজেদের মতো মানুষকে। সেই পদ্ধতি শুরু হয়ে গেছে সুন্দরবনের এক গণ্ডগ্রামে, খিদিরপুরের এক তালাবন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে—তা নিজের চোখে দেখেছি। শুনেছি তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটকের গ্রামের কথা।"[৮৫] এই অংশে আমরা সারা পৃথিবী জুড়েই যে সেই আরেক ধরনের থিয়েটারের কাজ চলছে, মূলত তার কথাই বলব। এই চতুর্থ এক ধরনের থিয়েটার তৃতীয় বিশ্বে ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে, কলকাতাতেও তার প্রাথমিক উদ্‌গম লক্ষ করা যাচ্ছে। এই থিয়েটারের ইংরেজি নাম 'পপুলার থিয়েটার', বাংলায় গণনাট্য থেকে শুধু নামে আলাদা করার জন্য জন-নাট্য আখ্যা দিতে পারি। দু একটি অভিনয় দেখে এবং কাগজপত্র পড়ে যা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে এ নাট্যরীতি শহরের বাঁধা থিয়েটারের সঙ্গে কোনো প্রতি-যোগিতায় কখনও নামবে না। এ নেহাত কেজো থিয়েটার, তার 'শিল্প' হয়ে ওঠার তেমন কোনো তাগিদও নেই। এর প্রধান প্রবক্তা ক্যানাডার অধ্যাপক রস্ কিড বলেন, জননাট্য আসলে গণনাট্যই; তাঁর একটি লেখার শিরোনামই হল "পপুলার থিয়েটার—পিপলস থিয়েটার"।

রস কিড-এর আলোচনা[৮৬] থেকেই দেখি, এ নাটক তৈরি হয় আমরা যাদের সচরাচর দর্শকদের দলে ফেলি তাদের নিয়েই। এইরকম 'মুক্তনাটক' করে থাকেন, প্রতিবেশী বাংলাদেশের একটি নাট্যগোষ্ঠী আরণ্যক; আরণ্যক-এর প্রতিনিধি মামান হীরা কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। এক আলোচনায় তিনি তাঁদের প্রস্তুত জন-নাটকের প্রোগ্রামটি বর্ণনা করলেন। তাঁরা ঢাকা শহরের দল, দলে ছাত্র অধ্যাপক অফিস কর্মচারী সবাই আছেন। ঢাকার বাঁধা মঞ্চেও তাঁরা নাটক করে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের দল দেশের প্রায় দেড়শটি গ্রামে গিয়ে সাতদিন দশদিন ধরে থেকেছে, থেকে গ্রামবাসীদের জীবনের সঙ্গে জড়িত কোনো বিষয় নিয়ে সেখানেই একটি নাটকের মোটামুটি ফ্রেম তৈরি করেছে, এবং গ্রামবাসীদের দিয়েই সে নাটক অভিনয় করিয়েছে। যেমন কুমিল্লার এক গ্রামে গিয়ে এঁরা দেখলেন, কৃষি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার পথটা চাষীর পক্ষে বেশ ঘোরালো। পথে অজস্র দালাল দাঁড়িয়ে আছে, তারা পরের লোকটির কাছে নিয়ে যায় এবং সেজন্যে দস্তুরি নেয়; প্রত্যেককে এই 'দস্তুরি' ও বড়কর্তাদের ঘুষ দিয়ে সে যখন ব্যাঙ্কের ঋণ হাতে পায় তখন জমিতে ধান-পাট বোনার সময় চলে গেছে, চাষ শুরু করার উপায় নেই আর। তখন সে হয়তো হাতের টাকাটা মেয়ের বিয়েতেই খরচ করে বসে,

জমি অনাবাদি পড়ে থাকে। পরের বছর যখন ফসল বিক্রি করে ব্যাঙ্কের কিস্তি জমা দেবার কথা তখন সে নিঃস্ব, এবং ফলে তার বাস্তুভিটে বাঁধা পড়ে, জমিজিরেত থেকে এভাবে অল্পদিনের মধ্যেই সে উৎখাত হয়ে যায়।

গ্রামে গিয়ে সেখানকার চাষী, প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন বর্গাদারদের সঙ্গে মিশে (মধ্যস্বত্বভোগী বা সচ্ছলদের সংসর্গ এঁরা সচরাচর এড়িয়ে চলেন) এঁরা তাদের জীবনের একটি মূল সমস্যাকে ধরবার চেষ্টা করেন এবং তাকেই বিস্তারিত করে একটা আলগা নাটকের কাঠামো তৈরি করেন। এবং ওই চাষীরাই অভিনয় করেন সে নাটকে, শহরের অভিনেতারা নয়। কারণ ঘটনা ও চরিত্রগুলি চাষীদের চেনা, কাজেই তাঁরা নিজেরাই খাড়া হয়ে দালাল বা পঞ্চায়েত নেতা বা ব্যাঙ্কম্যানেজারের ভূমিকা নেন। কোন্ অবস্থায় এরা কী করেছিল বা বলেছিল তা চাষীদের জানা, তাদের চরিত্রের টাইপটিও চেনা, কাজেই অনেকে নিজেই এগিয়ে এসে বলে, আমি জানি অমুক চরিত্র কী করেছে বা বলেছে এই বিষয়ে, কাজেই এর অভিনয়টা করে দেখাতে পারি। আরণ্যক গোষ্ঠী মানিকগঞ্জ-আরিচার হাইওয়ে নির্মাণের সময় সেখানকার মেয়ে শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম খাদ্য দেওয়া নিয়ে নাটক করেছে। ওই 'ফুড-ফর-ওয়ার্ক' প্রোগ্রামে পুরুষদের যেখানে সপ্তাহে তিন সের করে গম দেওয়া হত সেখানে মেয়ে-শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছিল দেড় সের করে। যুক্তি, মেয়েরা কম খাটতে পারে (তাদের খিদেও কম?)। এর প্রতিবাদে মেয়ে-পুরুষ উভয় দলই কাজ বন্ধ করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই কাজের কনট্রাক্টর মেয়ে-শ্রমিকদেরও তিন সের করে গম দিতে বাধ্য হয়। কর্মবিরতির ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গ্রামের এক হেডমাস্টার। ইনি আবার ছিলেন বর্তমান অঞ্চল প্রধান বা ডিরেকটার-এর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। নাটকে এই সব শ্রেণীসংঘাত বেরিয়ে আসে এবং মজুররা নিজেরাই ডিরেকটার, কনট্রাক্টর এবং সেই হেডমাস্টারের অভিনয়ে অংশ নেয়।

পরিচিত পৃথিবীর এই দুটি উদাহরণ থেকে জননাট্যের মূল চরিত্রটির খানিকটা আঁচ পাওয়া গেল আশা করি। এ নাট্য শিল্পিত নাটক নয়, দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে রিহার্সাল দিয়ে, অতি সতর্কতা ও কল্পনার সাহায্যে প্রয়োগ-পরিকল্পনা করে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে (এবং আজকালকার কোনো-কোনো গোষ্ঠীর ফ্যাশন অনুযায়ী 'রাইট অব অ্যাডমিশন রিজার্ভড' ছেপে), টিকিট বিক্রি করে দেয়ালবদ্ধ মঞ্চে মুখ্যত প্রমোদ-শিকারি একদল দর্শকের সামনে

উপস্থিত করা হয় না। এ নাটকের সঙ্গে থার্ড থিয়েটারের কিছুটা মিল আছে, অমিলও কম নয়। থার্ড থিয়েটারেও অভিনেতা এবং দর্শকদের মধ্যে তফাতটা বজায় থাকে। অভিনেতারা একটা আলাদা দল, তারা শহর-গ্রামের মানুষদের মধ্যে যায়, অভিনয় করে, কখনো কখনো তাদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করে, কিন্তু কখনোই দর্শকদের দিয়ে অভিনয়ের উদ্যোগ নেয় না, দর্শকদের মধ্যে গিয়ে সাত-আটদিন বাস করে তাদের গল্প নিয়ে নাটকও খাড়া করে না। অর্থাৎ প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতোই থার্ড থিয়েটারের ক্ষেত্রেও অভিনেতা ও দর্শকেরা দুই ভিন্ন দলে থাকে—কদাচিৎ তারা পরস্পরের ভূমিকা ভাগাভাগি বা বদলাবদলি করে।

১২.

আজ তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে এই পপুলার থিয়েটারের আন্দোলন প্রসার লাভ করছে। নিকারাগুয়ায় ফাতাস্মা বলে একটি জায়গার খবর পাই সেখানকার প্রতিনিধি অ্যালান বোল্টের একটি চিঠিতে। সেখানকার থিয়েটার-কর্মীরা অভিনয়ের ওয়ার্কশপ করতে করতে বিপ্লবে অংশ নেয়। এল এসপিনোতে তারা কণ্ট্রা প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য শহরের লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়, এল তাবলন্‌-এ থিয়েটারের দল ভুট্টার সমবায় খামারে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে ভুট্টা তোলার কাজে হাত লাগায়, তারপর তারা নাটক দেখায়। কাঁধে তাদের রাইফেল বাঁধা—প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ যে-কোনো মুহূর্তে হতে পারে, তাই তারা সর্বদা প্রস্তুত। নিখ্‌তায়ালেরোর একটি নাট্যদল ওই আক্রমণ এড়াতে রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দূর-দূরান্তের গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়।

নিকারাগুয়াতে প্রতিবেশী হণ্ডুরাসের আগ্রাসী আক্রমণ যেমন চলেছে, তেমনই চলেছে বিপ্লববিরোধী তৎপরতা। দুটি আক্রমণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের ও সামরিক চক্রের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, দেশের এই অশান্তি ও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কোথায় তার সাংস্কৃতিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে তা নয়—যেখানে যেখানে সবচেয়ে তীব্র যুদ্ধের কেন্দ্র সেখানে সেখানেই সাংস্কৃতিক উদ্যোগ-আয়োজন-পরিবেশনও সবচেয়ে বেশি চলেছে। শয়ে শয়ে 'থিয়েটার ব্রিগেড' তৈরি হয়েছে। ছাত্ররা হাজারে হাজেরে তৈরি করেছে 'উৎপাদন বাহিনী'। প্রায় ন-হাজার ছাত্র এক বার এই বাহিনী নিয়ে কফি-খেতে কফি তুলতে গেল। থিয়েটার ব্রিগেডগুলি তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল, তারা নাটক করে বিপ্লবের চেতনায় দীক্ষিত করবে

নিকারাগুয়ার নর-নারীকে। সেই সঙ্গে ডিসেম্বরের জাতীয় থিয়েটার উৎসবের জন্যও তারা প্রস্তুতি চালাবে।

মানুষের সামাজিক-আর্থনীতিক রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রাম থেকে থিয়েটারের মতো একটি সাংস্কৃতিক কাজ যে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন নয় তার প্রমাণ তৃতীয় বিশ্বের ফিলিপিন্‌সের জননাট্য। 'নিউ থিয়েটারের' একটি সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৯৮৩: ক্যারিবিয়ান সংখ্যা) খুব নাটকীয়ভাবে সেখানকার তুকলাস দলের একটি নাটকের পটভূমিকা নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৮৩-র গোড়ায় ফিলিপিনসের কেন্দ্রীয় এলাকার দ্বীপ সমর-এ একজন ডাক্তারকে সেখানকার সৈন্যবাহিনীর লোকেরা গুলি করে মেরে ফেলে। তাঁর নাম ড. ববি দেলা পাজ, ফিলিপিনস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাশ করা। ডিগ্রি পেয়ে ববি সমর-এর গরিব মানুষদের চিকিৎসা করতে চলে যান। সমর তখন ফিলিপিনসের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লড়াইয়ের মস্ত বড় একটি ঘাঁটি —সেখানকার গ্রামগুলি এই লড়াইয়ে উত্তাল। এখানকার গরিবদের মধ্যে কাজ করতে গেল যে ডাক্তার সে সঙ্গে সঙ্গে স্বৈরাচারী সামরিক বাহিনীর কাছে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। ফলে তাকে অবিলম্বে খুন করা হল।

এই খুনের কয়েক সপ্তাহ পরে ম্যানিলার ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অডি-টোরিয়ামে ববির আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পুরোনো সহপাঠী আর সহকর্মীরা মিলে তার একটা স্মরণ-সভার আয়োজন করে। একদিকে সরকারি প্রচার ববির জীবন ও মৃত্যুকে কলঙ্কিত করে চলেছে প্রতিদিন, অন্য দিকে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র, শ্রমিক, অন্যান্য বৃত্তিজীবী এবং কিছু ধর্মীয় নেতা ওই অডিটোরিয়ামে ববির স্মৃতিকে শ্রদ্ধা ও মমতা জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছে, তার মৃত্যুর রহস্য মানুষকে জানাবার সংকল্প নিয়েছে। এরই মধ্যে সেই তুকলাস্ (আবিষ্কারক) দলের ছাত্র আর পেশাজীবী সদস্যরা ববির জীবনকাহিনী তুলে ধরেছে নাটকের মধ্যে। তার মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার দিনটি থেকে ঘাতক সৈন্যের গুলিতে নিহত হওয়া পর্যন্ত টুকরো টুকরো দৃশ্য উপস্থিত করল তারা। পঞ্চাশ মিনিট ধরে তিরিশ জনের ওই দল গানে, মূকাভিনয়ে, যৌথ আবৃত্তিতে নিঃস্বের সেবায় আত্মাহুতি দেওয়া ঐ ডাক্তারের জীবন অত্যন্ত তীব্র স্পষ্ট চেহারায় ফুটিয়ে তুলল। পাঁচ হাজার মানুষ সে নাটক দেখছে আর কাঁদছে, নাটকের শেষে হত্যার প্রতিবিধানের ডাকে উদ্দীপ্ত হচ্ছে, ঘাতক সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা গড়ে তুলছে বুকের মধ্যে। শেষে যখন ববির মৃতদেহ এসে পৌঁছাল

স্টেজে তখন সমস্ত দর্শক জনতা দাঁড়িয়ে উঠে আবেগময় হাততালিতে সেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংবর্ধনায় আচ্ছন্ন করে দিল।

ম্যানিলাতে এখন যেখানেই প্রতিবাদ সমাবেশ হয় সেখানেই গান ও আবৃত্তির সঙ্গে নাটকেরও অভিনয় হয়। নিউক্লিয়ার ফ্রি ফিলিপিনস কোয়ালিশন-এর এক সমাবেশে ছাত্রদের একটি নাটকের দল অভিনয় করল পারমাণবিক বোমার ধ্বংসতাণ্ডব বিষয়ে একটি নাটক। তারই মধ্যে উচ্চারিত হল মার্কিন সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আরেকটি সিম্পোজিয়ামে সেনট্রাল লুজান অঞ্চলে কৃষকদের উপর সামরিক বাহিনীর অত্যাচার বিষয়ে নাটক দেখানো হল, উপজাতীয়দের ধর্মীয় সমাবেশে হয়তো প্রদর্শিত হল উপজাতিদের সংগ্রামের নাট্যচিত্র। মেট্রো ম্যানিলার গরিবদের বস্তি এলাকায় সিপা নামে একটি সংগঠন বস্তিবাসীদের নিয়েই নাটক তৈরি করেছে, সে নাটক বস্তির জীবনকেই ঘিরে লেখা। 'লাগুমা দ বে' উপসাগরের তীরে জেলেরা তাদের দুরবস্থার জন্য যখন নিরুপায় হা-হুতাশ করছিল, তখন তাদের ছেলেরা নাটক করে দেখাল যে, একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তিতেই তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ফিলিপিনস এডুকেশন্যাল থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (PETA)-র অন্তর্ভুক্ত কলিনংগন আসম্‌ল মানুষের বাস্তব জীবন-সমস্যার সঙ্গে যুক্ত এ ধরনের প্রচুর নাটক করে চলেছে।

আফ্রিকার কেনিয়াতেও নানা দমন-পীড়নের মধ্যে জননাট্যের প্রসার ঘটছে। এখানকার আন্দোলনে যাঁদের নাম সকলের আগে আসে তাদের দুজনেরই নাম ন্গুগি। একজন ন্গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো এবং আরেকজন ন্গুগি ওয়া মিরি। প্রথম জন লেখক, দ্বিতীয় জন বয়স্ক শিক্ষার কর্মী। কেনিয়ার কামিরিথু অঞ্চলে একটি নাট্যদল তৈরি করে এঁরা এধরনের নাটক করছিলেন, তখন সরকার এই দলটিকে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং চাষী, শ্রমিক ও বেকারদের এই সংগঠনটির রেজিস্ট্রেশন ছিনিয়ে নেয়। ন্গুগিদের দু জনেরই চাকরি চলে যায়, থিয়োঙ্গোর জেল হয়। ১৯৭৮-এ মুক্তি পেয়ে তিনি কামিরিথুতে এসে দেখেন সে থিয়েটার ধ্বংস করা হয়েছে, নাটকগুলি সবই নিষিদ্ধ।

এর একটি ইতিহাস আছে। আফ্রিকার সমস্ত গ্রামের মতোই কামিরিথুতেও প্রচুর বেকার, অল্প বেতনের কর্মী এবং ভূমিহীন মানুষের সংখ্যাধিক্য এবং সেখানে চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলতে কিছুই নেই। তখন কামিরিথু এডুকেশন্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের মানুষ

শুধু থিয়েটার করার জন্য ৩০০০ দর্শকের একটি খোলা মঞ্চ তৈরি করে। ওখানে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্রেও ভিড় জমে। দুই ঙুগির পরিচালনায় কামিরিথুর মানুষেরা কিকুয়ু ভাষায় 'ঙাহিকা ন্দিন্দ' ("আমার যখন খুশি বিয়ে করব") নামে একটি নাটক নামায়। কেনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম নিরক্ষর চাষী ও মজুরেরা নিজেরা অভিনয় করে পুরোদস্তুর একটা নাটক খাড়া করে। সে নাটক ধনী আর দরিদ্রের চিরপরিচিত বৈষম্যের ছবি তুলে ধরে—এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ভর্তি হলে তার অভিনয় হয়। তার পরেই তার উপর সরকারি নিষেধের খড়্গ নেমে আসে, বয়স্ক শিক্ষা ছাড়া সেণ্টারের আর সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঙুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর জেল হয়।

থিয়োঙ্গো মুক্তির পরে কামিরিথুতে ফিরে এলেন। য়ুনিভার্সিটিতে তাঁর চাকরি আর রইল না, কিন্তু সেণ্টারে যুক্ত রইলেন তিনি। আবার কামিরিথুর লোকদের নিয়ে নাটক তৈরি করলেন 'মইতু ঞুগিরা' (মা আমাকে গান শোনাও)। ১৯৭১-এর ফেব্রুআরিতে নাইরোবির ন্যাশনাল থিয়েটারে তার অভিনয় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ অভিনয়ে সরকারের লাইসেন্স পাওয়া গেল না, এবং নাইরোবিতে জাতীয় নাট্যশালার সামনে যখন অভিনয়ের দলবল এসে পৌঁছল তখন তারা দেখল যে, নাট্যশালার দরজায় তালা ঝুলছে, পুলিশবাহিনী টহল দিচ্ছে তার সামনে। কিন্তু কামিরিথুর দল এখানে একটা অদ্ভুত কৌশলে সরকারের চোখে ধুলো দিল, আইনের ফাঁদে তাদের ধরা আর সম্ভব হল না। তারা নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যমঞ্চে দশ দিন ধরে নাটকটির 'রিহার্সাল' করল। তাতেই দশ হাজারের মতো লোক এসে সে নাটক দেখে গেল। সে নাটক সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের সঙ্গে আফ্রিকার মানুষের প্রতিরোধ নিয়ে লেখা।

কামিরিথুর সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে চোদ্দ বছরের কিশোর পর্যন্ত এ নাটকে অভিনয় করেছে। বৃদ্ধেরা এসে যুবকদের গাঁয়ের পুরোনো দিনের গান শিখিয়েছে, কিংবদন্তী শুনিয়ে নাটকের কাহিনী তৈরিতে সাহায্য করেছে। ষাট বছর বয়সের হরা ওয়া কিয়ারিয়ে বলেছেন, "আমার মনেই হয়নি এ নাটকে আমি অভিনয় করছি। চাষী, মজুর আর বেকার হিসেবে আমাদের যে জীবন, সেই জীবনের মধ্যেই আছি—এ ছাড়া আমার অন্য ভাবনাই আসেনি।"

কামিরিথুর শাসনপীড়ন নয়, তার জয় থেকে জননাট্যের শিক্ষা নেবার আছে —এ কথা বলেছেন রস্ কিড—জননাট্যের সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক। কেনিয়ার

মতো প্রতিকূল পরিবেশ সব জায়গায় নেই—কিন্তু সেসব দেশেও দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষা এবং নতুন চেতনায় মানুষকে দীক্ষিত করার জন্য জননাট্যের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। দোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে 'দ মুভমেণ্ট ফর কালচারাল অ্যাওয়ারনেস' বা (M. C. A.) জননাট্যের একটি স্থায়ী প্রোগ্রাম নিয়েছে। জ্যামাইকাতে জেলখানার কয়েদিদের টেনে আনা হচ্ছে জননাট্যের অভিনয়ে, সেখানেই মনোরোগীদের চিকিৎসাতেও মনো-নাটক বা 'সাইকোড্রামা'-র অভিনয় হচ্ছে। ওই দেশে সিস্টার্ন থিয়েটারে কালেকটিভ চিনি-শিল্পে নিযুক্ত মেয়ে-মজুরদের নিয়ে নাটকের অভিনয় হচ্ছে।

১৩.

ভারতবর্ষেও এ ধরনের নাটকের উদ্‌গম লক্ষ করা যাচ্ছে। কলকাতার CCCA বা 'কমিউনিকেশন ফর কালচারাল অ্যাকশন' গ্রামে গিয়ে এই ধরনের 'সচেতক' বা বিবেক-উদ্‌বোধক নাটক করছেন—এ নাটকের মূল লক্ষ্যই হল রস্‌ কিড-এর ভাষার 'conscientizasion'। ১৯৮৪-র জুনে ব্যাঙ্গালোরে একটি সেমিনারে গিয়ে এই ধরনের আরো অনেক গোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে এই লেখকের পরিচয় হয়েছে। অন্ধের সেকেন্দ্রাবাদের কালচারাল ফোরাম খ্রীষ্টীয় জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান রুর‍্যাল ডেভলপমেণ্ট অ্যাডভাইজরি সারভিস-এর অঙ্গ। এরা শুধু যে নাটক করে তা নয়, জননাটকের ওয়ার্কশপ সংগঠন করে এবং দূর দূর গ্রামে 'ব্যাটল্‌শিপ পোটেমকিন', 'পথের পাঁচালী', 'মন্থন', 'অঙ্কুর', 'চোখ', 'ওকা উরি কথা', 'মা ভূমি' ইত্যাদি সিনেমাও নিয়ে দেখায়।

এদের সকলের উদ্দেশ্য ও নাট্যপ্রকরণ যে একরকম তা নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে সকলেই বামপন্থী হলেও তাদের মধ্যে অল্প-স্বল্প রকমফের আছে। কারো লক্ষ্য নেহাৎ গ্রামোন্নয়ন এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে বর্তমান-সচেতনতা ও অধিকারবোধ সঞ্চার, কেউ আবার সময় ও অবস্থা বিশ্লেষণ করে শ্রেণী-সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। ব্যাঙ্গালোরে ওখানকার প্রসিদ্ধ পথনাটিকার সংগঠক ও পরিচালক অনন্তমূর্তির সঙ্গে আলাপ হল। তিনি প্রায় দশ হাজার পথনাটিকার অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলে অবাক লাগল এই কারণে যে, রাজনীতি তাঁর পছন্দ নয়, তিনি শুধু মানুষের অভাব-অভিযোগ-সমস্যার ছবি তুলে ধরতে চান।

ফলে ইদানীংকার নানা পথনাটিকায় রাজনৈতিক বক্তব্য তিনি অনুমোদন

করেন না। তাঁর বক্তৃতায় তিনি সমালোচনা করলেন দক্ষিণের বিখ্যাত নাট্য-পরিচালক প্রসন্নের একটি নাটকের—সে নাটকে ব্যাঙ্গালোরের কংগ্রেস (ই) নেতার ছিনতাইয়ের ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছিল। সে নাটক দর্শকদের একটি ছোট অংশ খেপে গিয়ে বন্ধ করে দেয়, তাতে অনন্তমূর্তি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে নিয়ে সেমিনারে তাঁকে চেপে ধরা হলে তিনি বলেন, দর্শকদের উৎপাত তিনি সমর্থন করেন না, প্রসন্নর নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়েও তাঁর কোনো মন্তব্য নেই—কিন্তু প্রসন্ন যে দর্শকের সঙ্গে মুখোমুখি কতাবার্তা না বলে চুপচাপ নাটক বন্ধ করে দলবল গুটিয়ে চলে গেলেন, এতেই তাঁর আপত্তি।

অনন্তমূর্তি নিছক পথনাটক করেন, তিনি 'জননাট্য' বা এই ধরনের কোনো নামকরণের মধ্যে যেতে চান না। বাংলাদেশের 'আরণ্যক' গোষ্ঠী আবার মনে করেন, শ্রেণীসংগ্রামের কথা না বললে নাট্যকর্মী হিসেবে তাঁদের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁদের নাট্যপদ্ধতির নাম তাঁরা দিয়েছেন 'মুক্তনাটক'। এই মুক্তনাটক নিয়ে গ্রামে পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি আমরা মান্নান হীরার রচনা[৮৭] থেকে তুলে দিই।

"(গ্রামে গিয়ে) প্রথম দিন থেকেই আমরা তিনচারটে দলে ভাগ হয়ে যাই—সঙ্গে থাকে গ্রামেরই বিভিন্ন বয়সী কিছু ব্যক্তি। অনেক সময় চেয়ারম্যান, মেম্বার বা গ্রামীণ মোড়লদের লেজুড়বৃত্তি করে এমন লোকও দলে ভিড়ে যায়। প্রথমত আমরা গ্রাম নিরীক্ষা করি। এর মধ্যে থাকে সেই গ্রামে কতজন ভূমিহীন, কতজন দিনমজুর, গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের মজুরি-প্রথা, বর্গাপ্রথার স্বরূপ, ইত্যাদি বিষয়—বিভিন্ন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এর জবাব পাওয়া যায়। আলোচ্য যে কোনো এলাকায় মুক্তনাটকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান সেই বিশেষ এলাকার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং শোষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেওয়া। এই ধারণা ব্যতীত মুক্তনাটকের কাজ সম্ভব নয়। আর সে কারণেই সে এলাকার শ্রেণীসম্পর্ক স্পষ্ট ভাবে বুঝতে না পারলে পরবর্তীতে তা বাধার সৃষ্টি করে। দিনের বেলায় গ্রামের লোকেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। দলগুলি তাদের কর্মস্থলে যায়, তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়, বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রামে নাটক করবার কথা বলে। এক্ষেত্রে তাদের প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়—কিন্তু যখন বলা হয় এ নাটকে অভিনয় করবে এ গ্রামেরই নিরক্ষর লোক, কোন লিখিত পাণ্ডুলিপি করে এ নাটকের কাহিনী হবে না তখন তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকখানি কমে যায়।

তারা পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা থেকে বলে—এ কি করে সম্ভব, লেখাপড়া না জানলে কি করে নাটক হবে ? তা ছাড়া নাটকে প্রথম দরকার বই, তারপর নায়ক-নায়িকা। এসব ধারণার সঙ্গে প্রথমে শুরু হয় মুক্তনাটকের বিরোধ। তাদের অত্যন্ত বিনয় ও সহজ পদ্ধতিতে মুক্তনাটকের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় গ্রামের অধিকাংশ লোককে একত্রিত করা। আর সে প্রয়োজনেই সাধারণত সন্ধ্যার পর কোনো এক বিশেষ স্থানে যেমন স্কুল ঘর, ক্লাব ঘর অথবা বাজার বা হাটে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সমবেত গ্রামবাসীর কাছে মুক্তনাটকের উদ্দেশ্য ও আদর্শ আলোচনা করবার জন্য প্রথম দিনের এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

হীরা অভিজ্ঞতা সূত্রে লক্ষ করেছেন যে, গ্রামের গরিব মানুষ তাঁদের সমস্যাকেই প্রথমত চিহ্নিত করতে পারেন না। তারপর তারা খুব সঙ্কোচের সঙ্গে একটা দুটো ঘটনার সূত্রবিস্তার করেন—এইভাবে নাটক তৈরি হতে থাকে। তাতে যথাবিধি শোষকশ্রেণীর বাধাও আসে এবং হীরার উক্তি—“কম বেশি হামলা সব জায়গায় এসেছে এবং তা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে।” মান্নান হীরা মুক্তনাটকের কর্মীর যেসব গুণাবলি থাকা দরকার মনে করেন সেগুলি এই :

১. শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষপাতী শ্রেণীচেতনা।

২, মানসিক প্রস্তুতি।

৩. শ্রমজীবী শ্রেণীর সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেই নিরিখে শত্রু চিহ্নিত করা।

৪. শ্রমিক শ্রেণীর ভিতরের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণগুলি খুঁজে দেখা এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

৫. গ্রামীণ শোষণব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় শোষণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

৬. মুক্তনাটককে শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

৭. বাস্তবের সঙ্গে চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে নাটকগুলি উপস্থাপনা করা।

৮. গ্রামীণ শোষকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহার করা।

৯. নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পর (দর্শকের সঙ্গে) বিষয়গত আলোচনা এবং উপস্থাপনাগত ত্রুটিনির্ণয় করা।

১০. মাধ্যমটির নিয়মিত পরিচর্যা করা।

১৪.

পপুলার থিয়েটারের উপর ১৯৮৩-তে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে জননাট্যের সংজ্ঞা নতুন করে বিশ্লেষণ করা হয়। বলা হয়, জননাট্য হল জনসাধারণের নিজের নিয়ন্ত্রিত একটি বাহন। এ বাহন জনসাধারণেরই ভাবনা, সমস্যা ও বিশ্লেষণকে প্রতিফলিত করে। এ বাহন ব্যাপকভাবে প্রচারিত অন্যান্য মিডিয়ামের প্রচারকে প্রতিরোধ করে। এ বাহন জনসাধারণের নিজের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন এবং ঋদ্ধি সাধন করে, তাদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেয়। এতে পণ্ডিতের চাপানো ধারণার বদলে জনসাধারণের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা, সমস্যা ও প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়। এ বাহন লোকশিক্ষা দিয়ে দেশ ও জনসাধারণের মধ্যে সংহতি আনে। বাস্তবকে মূর্ত করে বিশ্লেষণে সাহায্য করে, প্রতিদিনের বাস্তবের আভ্যন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বকে ধরিয়ে দেয়। রস্ কিড এরই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জননাটক বিনোদন হিসেবেও যেন মানুষের আগ্রহকে ধরে রাখে। এখানে পিপলস থিয়েটার প্রসঙ্গে রোম্যা রোল্যাঁর কথারই যেন পুনরাবৃত্তি করেন তিনি। জননাট্যে ব্যবহৃত হবে আঞ্চলিক ভাষা—তাতে গ্রামের মনুষের কাছে সে নাটক সহজে গৃহীত হবে। বিষয়বস্তুতে জোর পড়বে স্থানীয়তার উপর, বিশেষ জায়গার বিশেষ সমস্যার উপর।

বস্তুতপক্ষে জননাটক নাটক ও সমাজপরিবর্তনের কর্মসূচিকে একই প্রোগ্রামের অন্তর্গত করে দেখে। দর্শক ও অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব ভেঙে দেয়। এই মুহূর্তে 'শিল্প' হয়ে ওঠার জন্য তার কোনো দায় নেই। কিন্তু কে বলতে পারে, নাটক ও জীবন যদি এভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায়, এর মধ্য থেকেই বড় কোনো নাট্যকার বা নাট্যশিল্পী বেরিয়ে আসবে কি না। তার সম্ভাবনা বড় কম নয়।[৮৮]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. যেমন ২৬ ফেব্রুআরি, ১৯৮৯-র আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় পাতায় 'অন্য থিয়েটার : মুখ ও মুখোশ' নামক রবিশঙ্কর বলের একটি সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক নিবন্ধে ছোটখাটো ব্যঙ্গের খোঁচা ছাড়া তিনি কোনো বড় বিতর্কে যেতে চাননি।

২. "প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও পথনাটক : প্রভেদ ও সম্পর্ক", 'গণশক্তি', ১১ এপ্রিল, ১৯৮৯, ৬ পৃ.

৩. 'শূদ্রক' সংকলন ৭, তপন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

৪. সালটা সঠিক না হতেও পারে।

৫. 'শূদ্রক' সংকলন ৭, পনেরো পৃ.

৬. দ্র. "তৃতীয় থিয়েটার বিষয়ে, আরো একবার", 'অঙ্গন', সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, ৪৯ পৃ.

৭. ওই, ৫৯ পৃ.

৮. *The Third Theatre,* 1978, Calcutta, Published by the author, p. 17.

৯. সূত্র ৮, p. 27. 'অঙ্গন' (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নবপর্যায় ১ম সংখ্যা) নাট্যপত্রে কিন্তু বলা হয়েছে "শতাব্দী অঙ্গনমঞ্চ পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম অভিনয় করেন ১৯৭২ সালের ১৮ জুন কলকাতার এবিটিএ হলে, সাগিনা মাহাতো নাটকটি।" ৫ পৃ.

১০. বাদল সরকার, ১৩৯০, 'থিয়েটারের ভাষা', কলকাতা, অপেরা, ৫৮ পৃ.

১১. দ্র. 'মিছিল', ১৯৭৪, কলকাতা, অপেরা, ৫ পৃ.। 'দ থার্ড থিয়েটার' 75 পৃষ্ঠাতেও এই একই ছবি আছে।

১২. 'দ থার্ড থিয়েটার', p. 73.

১৩. ওই, p. 59.

১৪. 'থিয়েটারের ভাষা', ৫৮-৫৯ পৃ.

১৫. অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'থিয়েটার বুলেটিন' (থার্ড থিয়েটার বিশেষ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, ১৯৮০)। অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ঈগল'-এর ১৯৭৮-এর শারদ সংখ্যায় আমি ক্রুস্টাইনের বইটির কথা প্রথম উল্লেখ করি।

১৬. নিউ ইয়র্কের Alfred A Knopf প্রকাশিত।

১৭. ওই, p. 7-8.

১৮. দ্র. James Roose-Evans, 1989, *Experimental Theatre,* 4th edn., London, Routledge, p. 165. এখানে দ্রষ্টব্য যে, রুজ-ইভান্সের বইয়ের প্রথম সংস্করণে (1970, New York, Avon Books) এ বিষয়টা ছিল না।

১৯. *The Third Theatre*, p. 3

২০. 'থি. ভা', ১৪-১৫ পৃ.

২১. ওই, ২২ পৃ.

২২. *The Third Theatre*, p. 2

২৩. ওই, p. 3.

২৪. 'থিয়েটারের ভাষা', ১৬ পৃ.

২৫. দ্র. "থার্ড থিয়েটার", গৌতম পাল (সম্পা) 'রূপান্তরের পথে', ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮২, (২-৮), ৩ পৃ.। এটি কলকাতার ক্রান্তিক গণসংস্থা আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় বাদলবাবুর ভাষণের সংক্ষিপ্তসার। লেখার কপি আমি অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষের সৌজন্যে পেয়েছি।

২৬. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৯৮৬) ও দেবাশিস চক্রবর্তী-র দ্বারা বারুইপুর থেকে প্রকাশিত।

২৭. 'শূদ্রক'-এর পূর্বোক্ত ইণ্টারভিউটি দ্রষ্টব্য।

২৮. দ্র. "তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালী দর্শক", সত্য ভাদুড়ী সম্পাদিত 'স্যাস : ৪', (জুলাই ১৯৮৭), ২৪ পৃ.

২৯. ২৫ পাদটীকার সূত্র, ২ পৃ.

৩০. 'থি. ভা', ৫১-৫২ পৃ.

৩১. 'শূদ্রক', পূর্বোল্লেখ, ২৬ পৃ.

৩২. অপেরা প্রকাশিত, ১৩৮৮, ৪২-৪৩ পৃ.

৩৩. অপেরা প্রকাশিত, ১৩৮৫, ১০ পৃ.

৩৪. ২৫ পাদটীকার সূত্র, ৭ পৃ.

৩৫. ওই, ৭-৮ পৃ.

৩৬. 'থি. ভা', ৭৯ পৃ.

৩৭. 'শূদ্রক', পূর্বোল্লেখ, ২৪-২৫ পৃ.

৩৮. ২৫ পাদটীকায় উল্লেখ।

৩৯. ওই, ৮ পৃ.

৪০. 'থি. ভা', ৩৫ পৃ.

৪১. ওই, ৩৫ পৃ.

৪২. ওই, ৪৫ পৃ.

৪৩. ওই, ৫০-৫১ পৃ.

৪৪. ওই, ৫৫ পৃ.

৪৫. 'শূদ্রক', পূর্বোল্লেখ, ২১ পৃ.

৪৬. ওই, ১৯ পৃ.

৪৭. ওই, ২৭ পৃ.

৪৮. ওই, ২৮ পৃ.

৪৯. 'থি. ভা', ১১ পৃ.

৫০. ওই, ১৩ পৃ.

৫১. ওই, ১৫-১৬ পৃ.

৫২. ওই, ৬৭ পৃ.

৫৩. ওই, ৭০-৭১ পৃ.

৫৪. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার, ৫৭ পৃ.। যতদূর মনে হয় বাদলবাবুর স্মৃতি ভুল করেছে, ওটা শনিবার হবে, রবিবার নয়। মুক্ত-মঞ্চে গ্রামে গিয়ে রবিবার অভিনয় করা সংগত ও স্বাভাবিক, কিন্তু কলকাতা শহরের কেন্দ্রাঞ্চলে রবিবার অভিনয় হয়েছিল ভাবা মুশকিল।

৫৫. দেবাশিস চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অন্য রীতির নাট্যপত্র অঙ্গন', নবপর্যায় ১ম সংখ্যা, মার্চ ৮৭, ৫ পৃ.

৫৬. 'শূদ্রক', পূর্বোল্লেখ, ২১ পৃ.

৫৭. লেখকের সিদ্ধান্ত

৫৮. 'অন্য রীতির নাট্যপত্র অঙ্গন', দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুআরি, ১৯৮৮, ২৪ পৃ.

৫৯. যেমন 'কলকাতা নাট্যকেন্দ্র' নামে প্রতিষ্ঠানটির তৎকালীন নেতারা কাগজে প্রকাশ্য চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে শমীক প্রসেনিয়াম মঞ্চের, তথা গ্রুপ থিয়েটারের তথা কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের "শুভানুধ্যায়ী" নন। পরে অবশ্য এই সমীকরণ বদলে গেছে।

৬০ দ্র. 'নান্দনিক' (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯) পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক নিবন্ধ "অঙ্গনমঞ্চের নাটক"। অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'থিয়েটার বুলেটিন' (থার্ড থিয়েটার বিশেষ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট, ১৯৮০)-এ পুনর্মুদ্রিত।

৬১. 'ঋতম' প্রথম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যায় তাঁর "অঙ্গনমঞ্চ: রাজনৈতিক

বিবেচনা" প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি তাঁরই সৌজন্যে আমি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

৬২. 'থিয়েটার বুলেটিন', পূর্বোল্লেখ।

৬৩. সোবিয়েত থিয়েটারের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কর্মধারার এসব তথ্য পেয়েছি —Joseph Macleod-এর *Actors Across the Volga*, (London, George Allen & Unwin Ltd., 1946) বইটি থেকে, দ্র. pp. 115-63.

৬৪. Burchett, W. G., 1952, *China's Feet Unbound*, Melbourne, World Unity Publications.

৬৫. Snow, Lois, W., 1972, *China on Stage*, New York, Random House, pp. 3-21.

৬৬. লুব্রুক-এর বামপন্থী ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে জেম্‌স এল পিকক-এর *Rites of Modernization* বইটি (Chicago, University of Chicago Press, 1968) থেকে।

৬৭. *In Search of Theatre*, New York, Vintage Books 1959, pp. 3-22.

৬৮. ওই, p. 6.

৬৯. ওই, p. 18

৭০. এ সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

৭১. বাদলবাবুদের পদ্ধতির সঙ্গে শুম্যানের দলের কাজকর্মের কিছু মিল আছে। তাঁরাও রাস্তাঘাটে অভিনয় করেন—জোন লিট্‌ল্‌উডের এই নির্দেশ মেনে যে, "The world is full of theatre. It's not in theatre", তবে হয়তো চতুর্থ থিয়েটারের সঙ্গে এ কথার মিল আরও বেশি। শুম্যানরা বিশ্বাস করেন যে, যারা কোনোকালে থিয়েটার দেখতে যায়নি তারাই থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ দর্শক। তারা ঘরে অভিনয়ের দর্শনী নেন এক ডলার, বাইরে অভিনয় বিনা দক্ষিণায়। তবে শুম্যানের দলের অভিনেতারা মুখোশ পরে, সাজপোশাকও পরে। আর তারা অভিনয়ের শেষে দর্শকদের মধ্যে রুটি বিলি করে। দ্র. James Roose-Evans, 1971, *Exprimental Theatre*, New York, Avon Books, pp. 121-30.

৭২. 'থিয়েটার প্রসঙ্গে' ([illegible]) প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, কলকাতা।

৭৩. পৃ. ১৮-১৯।

৭৪. পৃ. ২১-২২।

৭৫. 'পরিক্রমা', পূর্বোল্লেখ, পৃ. ২

৭৬. ওই, ১৮ পৃ.

৭৭. ওই, ২১ পৃ.

৭৮. ওই ২৮ পৃ.

৭৯. ওই।

৮০. ওই ২৮ পৃ.।

৮১. ওই ৪৭ পৃ.

৮২. ওই ৫০ পৃ.

৮৩. "তৃতীয় থিয়েটারের দর্শক", পূর্বোল্লেখ।

৮৪. 'পরিক্রমা', ৫০ পৃ.

৮৫. পূর্বোল্লেখ, ৩০ পৃ.

৮৬. 'কমিউনিকেশন ফর কালচারাল ফোরাম' প্রকাশিত রস্ কিড-এর *The Popular Theatre* দ্র.

৮৭. 'মুক্ত নাটক' প্রবন্ধ সংকলনের (আরণ্যক নাট্যদল ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৩-তে প্রকাশিত) প্রবন্ধ "মুক্ত নাটক কিছু অভিজ্ঞতা"।

৮৮. চতুর্থ থিয়েটার বিষয়ে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন সঞ্জীব সরকার, মান্নান হীরা ও রঞ্জিত রায়চৌধুরী।

কেন এই দারিদ্র্য

উনিশ-শো যাটের গোড়া থেকে অনুবাদ, রূপান্তর বা বিদেশী নাটকের বঙ্গীকৃত চেহারা যখন জনপ্রিয় হতে শুরু হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই নানা আপত্তি উঠল। কেন গ্রুপ থিয়েটারের জনপ্রিয় দলগুলি এত বেশি বিদেশী নাটক করবেন? কেন দেশের ভালো নাটকগুলির দিকে ফিরে তাকাবেন না? কেন নতুন নাট্যকারদের ভালো নাটক লেখার এবং মঞ্চে তা অভিনীত হতে দেখবার সুযোগ দেবেন না? কেন এই অন্ধ অনুকরণ-স্পৃহা?

কুড়ি বাইশ বছর পরে যখন পেছন ফিরে তাকাতে হয়, তখন দেখি এই অনুযোগের মধ্যে কিছু ছিল বিভ্রান্ত বিদ্বেষ, কিছু ছিল নাটকের দলগুলির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সততা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা। এটা ধরে নেওয়া উচিত ছিল যে, বহুরূপী, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি দল সত্যি-সত্যি বাংলা নাটকের দরিদ্র ঐতিহ্যকে আরো দরিদ্র এবং দিগ্‌ভ্রষ্ট করার সজ্ঞান সংকল্প নিয়ে বিদেশী নাটকের রূপান্তর অভিনয় করতে নামেনি। তখন নাট্য-আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে এইটে বুঝেছিলাম যে, পুরানো বাংলা নাটক বাংলা গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে তেমন করে রসদ জোগাতে পারছে না। এমন-কী বক্তব্যের জন্য যে-সব পুনরুজ্জীবন বা 'রিভাইভ্যাল' হচ্ছে সেগুলিও নিয়মিত একটানা অভিনয় করা সম্ভব নয়। গণনাট্য সঙ্ঘের তরফ থেকে 'নীলদর্পণ', লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'সধবার একাদশী' নতুন করে প্রস্তুত এবং উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু বক্তব্যের জোর বা সমাজ-সমালোচনার মজাও সে-সব নাটকের আয়ু ওই সময় দীর্ঘ করে তুলতে পারেনি। বোঝাই যাচ্ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর, দেশভাগের পর, পশ্চিমবাংলার শারীরিক ও মানসিক চেহারা বদলানোর পর—তার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এমনই একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেছে যে, 'ক্লাসিক' নাম দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর পুরোনো নাটক, তার মধ্যে দু-চারটি যতই ভালো হোক, বাংলার নতুন সচেতন থিয়েটারকে দৈনন্দিন খাদ্য জোগাতে পারে না। সে থিয়েটার রাজনৈতিক হোক, অরাজনৈতিক হোক—গণনাট্য হোক আর

নবনাট্য হোক। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ পেশাদার মঞ্চের বাইরে নিয়মিত নাটক যে করা উচিত এবং সম্ভব, এবং নাটককে যে একটা সিরিয়াস চেষ্টা ও পরিশ্রমের বিষয় করা চলে—তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। আগে যেখানে পুজো বা অন্যান্য উপলক্ষ্যে তু-একমাস যেমন-তেমন করে রিহার্সাল দিয়ে, সেই সঙ্গে উৎসব ও আমোদের মেজাজে পান চিবিয়ে আড্ডা দিয়ে নাটক নামানোই ছিল একমাত্র অ-পেশাদার উদ্যোগ, সেখানে পেশাদার মঞ্চের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যসংস্কৃতি, ইংরেজিতে যাকে বলে viable alternative—গড়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য সেই বিচ্ছিন্ন, সাময়িক, নিষ্ঠাহীন, মৌলিকতাহীন নাট্যসংস্কৃতির জন্য আলাদা করে নাটক লিখতে কোনো নাট্যকার এগিয়ে আসবেন না। পুজোপার্বণের 'শৌখিন' নাটক বা 'শখের নাটক—'শখ' এবং 'শৌখিন' কথা তুটি এ জায়গায় আমরা চমৎকার কাজে লাগিয়েছি—বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে হত বটে, কিন্তু তার মূল আদল ছিল পেশাদার মঞ্চেরই নাটক। ওই 'আত্মদর্শন' বা 'দেবলাদেবী', বা 'সাজাহান' বা 'মিশরকুমারী' বা 'রাতকানা' বা 'চন্দ্রগুপ্ত'। এ নাট্যসংস্কৃতি নতুন নাট্যকারের জন্ম দিতে পারে না, পুরোনো নাট্যকারকেও নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। ফলে স্বাধীনতার আগের নাটক, যে-নাটক গণনাট্য সঙ্ঘের কাজের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়নি, তা মূলত পেশাদার মঞ্চের দিকে তাকিয়ে লেখা হয়েছে। তার টেকনিক্যাল উৎকর্ষ যদি কিছু ঘটে থাকে তা ওই কারণে, কিন্তু তার তুর্বলতাগুলিও ওই একই সম্বন্ধের পরিণাম।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন পেশাদার মঞ্চের ওই যাকে বলে viable alternative—তা তৈরি করতে। তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটু এলিটিজ্‌মের ছোঁওয়া লেগেছে কচিৎ কখনো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চার আড়ালে ক্রমশ একটি জীবনদর্শন গড়ে উঠছে এমন দেখতে পাই। নাটক নেহাৎ অবসরের বিনোদন নয়, বৎসরান্তের সাময়িক শখ নয়, অনেকদিন পর পর বন্ধুবান্ধব একত্র হয়ে হই-হই পান-ভোজন ফুর্তিটুর্তির গৌণ উপলক্ষ্য মাত্র নয়, তা জীবনের পক্ষেও জরুরি—এই বোধটি রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেষ্টার মধ্যে ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছে। অর্থাৎ আমাদের জীবনের কাজ তুরকমের : এক, [illegible] সাধারণ কাজকারবার—বাজারহাট, আপিস ইশকুল আদালত রান্না খাওয়া ঘুমোনো ; অন্যদিকে কল্পনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ। এই দ্বিতীয় কাজটি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে যাকে pleasure principle বলে শুধু তা-ই তৃপ্ত করার

কাজ নয়, তা শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রথম দায়গুলিকেই সুন্দর ও অর্থময় করে তোলে—রবীন্দ্রনাথের এই যেন ছিল ধারণা। তাই তাঁকে আশ্রমে মৃত্যুশোকের মধ্যেও নাটক করতে দেখি, তাঁর মতো ব্যস্ত ও অক্লান্ত রচয়িতা যে-সময়ে আরো অনেক কবিতা, গল্প উপন্যাস, গান বা নাটক রচনা করতে পারতেন তারই মূল্যবান সব অংশ ব্যয় করে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিহার্সাল করতে দেখি, শান্তিনিকেতনের ঋতুচক্রকে নাটকের এবং অভিনয়ের মালা পরিয়ে দিতে দেখি। নাটক বিষয়ে এই যে ঐকান্তিক অভিমুখিতা তা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের একটা অনিবার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে আমরা কিছু উৎকৃষ্ট নাটক পাই—বাংলা সাহিত্যের কিছু উজ্জ্বলতম নাটক। এটা আমাদের সৌভাগ্য, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক—জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতনের এই নাট্যসংস্কৃতির ধারা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো নাট্যকারের আবির্ভাবের আয়োজন করতে পারেনি। সম্ভবত এই সব উদ্যম মূলত রবীন্দ্রনাথেরই প্রকাশের আধার ছিল এবং অন্যেরা তাঁর নেত্রপ্রতিঘাতী বিভায় আচ্ছন্ন ছিলেন বলেই। বিশেষ এক শ্রেণীর প্রতিভা বিশেষ এক প্রতিবেশে বিশেষ এক শ্রেণীর দর্শকদের জন্য যে-নাটক রচনা ও অভিনয় করল, তা একদিকে যেমন পেশাদার মঞ্চের নাট্যসংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল, তেমনই বহুরূপীর 'রক্তকরবী' অভিনয়ের আগে পর্যন্ত কোনো জনপ্রিয় বা বৃহত্তর দর্শকমুখী নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে পারল না। ফলে রবীন্দ্রনাথের নাটক গড়ে তুলতে পারেনি কোনো যথার্থ প্যারালাল থিয়েটার। সে নাট্যধারা সূত্রপাতের কৃতিত্ব গণনাট্য সঙ্ঘেরই প্রাপ্য। আমাদের মনে পড়ে, পেশাদার মঞ্চ রবীন্দ্রনাথের নতুন ধরনের নাট্যরূপের দিকে হাত বাড়াতে কখনোই তেমন আগ্রহী হয়নি। বরং রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে-অংশ তা অধিকার করবার চেষ্টা করেছিল তা ঐতিহ্যাগত নাট্যরূপের ধারা, তাতে আছে 'চিরকুমার-সভা', 'শেষ রক্ষা', 'বিসর্জন'। একা শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'তপতী' অভিনয় করে আংশিক দুঃসাহসের পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। এর পাশাপাশি মনে পড়ে যে স্তানিস্লাভ্স্কি একবার রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' প্রযোজনা করার কথা ভেবেছিলেন—তাঁর ডায়েরি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কিন্তু এভাবে শিশিরকুমার ও স্তানিস্লাভ্স্কির তুলনা করা প্রথম জনের প্রতি অবিচার করা—কারণ শিশিরকুমার কাজ করেছেন একটি মূলত সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশের আধা নাগরিক সংস্কৃতির নড়বড়ে পেশাদার নাট্যসংস্কৃতির মধ্যে, আর

স্তানিস্লাভস্কি 'যাত্রা' করার কথা ভাবছেন বিপ্লবোত্তর সোবিয়েত রুশে, যেখানে নাট্যালয় সরকারি সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষণে নিরুদ্বিগ্ন, অভিনেতা-প্রযোজক-নাট্যকর্মীর ব্যক্তিগত অর্থনীতি যেখানে সুনিশ্চিত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে।

গণনাট্য সঙ্ঘই পেশাদার মঞ্চের সমান্তরাল একটি নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলে। কিন্তু এই কাজ সে যে খুব সচেতনভাবে, কোনো বৈষয়িক উদ্দেশ্য নিয়ে, সজ্ঞান পরিকল্পনা করে সমাধা করেছে তা নয়। গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আরো সীমাবদ্ধ ছিল। নাটক তার কাছে ছিল অস্ত্র—সমাজের তৎকালীন বাস্তবকে বোঝানোর, ইতিহাসকে বিশ্লেষণের, শ্রেণীর সম্পর্ক জ্ঞাপনের, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের উৎসাহ জোগানোর অস্ত্র। সংগতভাবেই এই রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে যে-নাটক এর সদস্যরা করেছেন তার মধ্যে পেশাদার মঞ্চের একটা viable alternative তৈরি করার কোনো সচেতন পরিকল্পনা নেই। তাহলে তাঁরা নতুন মঞ্চ ফেঁদে বসতেন কলকাতায় বা অন্যান্য শহরে, সেখানে স্থায়ী দল গড়ে তুলতেন—'কম্পানি' নাম দিতেন কিনা জানি না সে-দলের—এবং স্থায়ী সমান্তরাল নাট্যচর্চার পিছনে সময় ও উদ্যম ব্যয় করতেন। সেটা তাঁরা করেননি, কোনো বিশেষ মঞ্চের সঙ্গে তাঁরা স্থায়ী লিজ বা নিয়মিত অভিনয়ের অনুষঙ্গের সূত্রে বেঁধেও ফেলেননি নিজেদের। বরং, এক প্রসিদ্ধ 'নবান্ন'-এর পরবর্তী ব্যতিক্রম ছাড়া, নাটক নিয়ে গেছেন কলকাতার বাইরের মানুষের কাছে। গণনাট্যের ধারা পরে যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের নাট্যচর্চাও এই একই সূত্র বজায় রেখেছে। তাঁদের নাট্যসংস্কৃতি মূলত itenerant।

গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙে যখন গ্রুপ থিয়েটারগুলি তৈরি হল তখনই কলকাতায় আসল সমান্তরাল নাটকের জন্ম হল বলতে পারি। গ্রুপ থিয়েটারগুলিও ভ্রাম্যমাণ ছিলেন যথেষ্ট। শহরে, আধা-শহরে, কখনো-কখনো গ্রামেও সকলে গেছেন, এখনও অনেকে গিয়ে থাকেন। কিন্তু কোমর বেঁধে নাটক করতে শুরু করা—তা সে বক্তব্যের জন্যই হোক, আর শিল্পের জন্যই হোক—তার সূত্রপাত হল স্বাধীনতার পরে। এবং নাটক-পিছু দলগত প্রয়াস, উদ্যম এবং নিষ্ঠার পরিমাণও অনেকটাই বেড়ে গেল। আগেকার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিট্যুট বা 'স্যাটারডে,' / 'সানডে' ক্লাবগুলির নাট্যচর্চার মতো তা রইল না সাময়িক, বা পেশাদার মঞ্চের নাটক নির্ভর, বা মূলত শৌখিন আনন্দের উপলক্ষ্য। পুরোনো পারম্পর্যশৃঙ্খলার একটা ধারা হয়তো চলে এল এই গণনাট্য বা নবনাট্যের

দলগুলির মধ্যে। সেই সঙ্গে এল মূলত একটা চিন্তা এবং বিশ্বাস যে নাটকটাও একটা কঠোর আনুগত্য ও যত্নের বিষয় হতে পারে, সারা বছর ধরেই তা করা যেতে পারে। যাঁরা 'গণনাট্য' পন্থী, তাঁরা বক্তব্যের দিক থেকে গুরুত্ব দিলেন নাটকের উপর, যাঁরা 'নবনাট্য' পন্থী, তাঁরা 'শিল্প'-এর উপর দিলেন মূল জোরটা।

দলের সংখ্যা বেড়ে গেল অনেক। দশ-বারো বছরে নাটকের দলের সংখ্যায় প্রায় বিস্ফোরণ ঘটল। কিন্তু নাটক কই, ভালো, তাৎপর্যপূর্ণ, তখনকার রিয়্যালিটির যোগ্য বাহন যে বাংলা নাটক, তা কই? বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাটক—যা সমসাময়িকতার প্রতি বেশি তন্ময় থেকে তাদের সমকালীন দায়িত্ব পালন করেছে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই বহু লক্ষ্য বহু চিন্তা ও বহু উদ্দেশ্যের অসংখ্য দলের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেনি, তা এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার খাদ্য জোগান দিয়ে উঠতে পারল না। অনেক দল হয়েছে, অনেক দল অনেকবার করে অভিনয় করার কথা ভাবছে, রেপারটরি গড়ে তোলবার জন্য এদের মধ্যে বেশ কিছু দল তিন-চারটি নাটকের পর্যায়ক্রমী অভিনয় করবে বলে স্থির করছে, এবং লক্ষ্যের বিভিন্নতার দরুন অন্য দলের উপস্থাপিত নাটক থেকে ভিন্ন ধরনের নাটক, সেই সঙ্গে রেপারটরির ধর্ম অনুযায়ী নিজেদের নাটকের মধ্যেও বিচিত্র ধরনের নাটক করার চিন্তা করছে—এইভাবে নাটকের সহস্রগুণ চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে—সে চাহিদা জোগান দেবে কোন্ বাংলা নাটক? এই শূন্যতার মধ্যে ঢুকে পড়ল বিদেশী নাটকের রূপান্তর। পিছনের দরজা দিয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে ঢোকেনি, ঢুকেছে তাদের বক্তব্য ও কর্মের স্বাভাবিক গৌরবেই। বহুরূপীর 'দশচক্র' (ইবসেন : শান্তি বসু), 'পুতুল খেলা' (ইবসেন : শম্ভু মিত্র), সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে' (লেডি গ্রেগরি), লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'নীচের মহল' (ম্যাকসিম গোর্কি : উমানাথ ভট্টাচার্য) থেকে শুরু করে নান্দীকারের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' (পিরানদেল্লো : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত), 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (চেকফ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়), থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'ললিতা' (জাঁ পোল্ সার্ত্রে : সত্যেন মিত্র), 'ছায়ায় আলোয়' (শন ও' কেসি : অশোক মুখোপাধ্যায়), শতাব্দীর 'গণ্ডী' (ব্রেশ্‌ট : বাদল সরকার), নান্দীকারের 'খড়ির গণ্ডী' (ব্রেশ্‌ট : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত), নান্দীমুখের 'পাপ-পুণ্য' (টলস্টয় : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়), '৩৩ তম জন্মদিবস' (হ্যারল্ড পিন্‌টার :

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়.) পর্যন্ত রূপান্তরের এক প্রায় অনবচ্ছিন্ন ধারা চলে এসেছে। আশির বছরগুলিতেও সে প্রবণতা কমেনি—চেনামুখের 'ইচ্ছেগাড়ি' বা গান্ধারের 'নীলাম নীলাম' যার প্রমাণ।

অথচ এর মধ্যে যে 'প্রতিশ্রুতিবান্' বাঙালি নাট্যকার আসেননি তা নয়। বাদল সরকার এসেছিলেন অনেক আশ্বাস নিয়ে, যেমন এসেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। অথচ দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই অন্তত মৌলিক নাটক লেখায় এঁদের ক্লান্তি লক্ষ করা যাচ্ছে। একমাত্র মনোজ মিত্র এখনও সক্রিয়, গ্রুপ থিয়েটারকে তিনি অভিনয়যোগ্য ভালো নাটক সরবরাহ করে চলেছেন, সেটা একটা আশ্বাসের কথা। এক সময় যারা নাট্য-আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন সেই উমানাথ ভট্টাচার্য বা অজিত গঙ্গোপাধ্যায় আজ নীরব। সেদিন হঠাৎ হই-চই ফেলে দেওয়া নভেন্দু সেনের প্রায় অজ্ঞাতবাস চলছে। নাটকের এই অভাবের জন্যই অভিনেতা-পরিচালকদের নাটক লেখার কথা সংগতভাবেই ভাবতে হয়েছে, ফলে শম্ভু মিত্র লিখেছেন 'ঘূর্ণি' বা 'চাঁদ বণিকের পালা', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সওদাগরের নৌকা', জোছন দস্তিদার 'গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ'।

অবশ্য এ ধরনের তালিকা আমরা এ নিবন্ধে তৈরি করতে বসিনি। বাংলা নাটকের সংখ্যা ও গুণগত দারিদ্র্যের কারণ কী, তার অনুসন্ধান করাই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথম কারণ হিসেবে চোখে পড়ে ওই প্যারালাল থিয়েটারের অভাব—যা ১৮৭২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত বাংলা নাট্যসংস্কৃতির প্রধান অসম্পূর্ণতা।

দ্বিতীয় কারণ আমার যা মনে হয়, নাটকের পশ্চিমি মডেলের উপর আমাদের আত্যন্তিক নির্ভরতা। নাটকের মূল 'ভর' দ্বন্দ্ব বা conflict, একথা হয়তো তত্ত্বগত ভাবে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রায় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত আমাদের নাট্যকারদের কাছে দ্বন্দ্বের ধারণা ছিল খুব প্রাথমিক ধরনের। সাদা-কালো, ভালো লোক-খারাপ লোক, নিরিমিষ লোক-মাতাল, উদার-স্বার্থপর—এই সহজ বিরোধেরই অবতারণা করা হয়েছে অধিকাংশ নাটকে। এই বহির্দ্বন্দ্ব বা external conflict-এর সরল ছক বাংলা নাটককে দীর্ঘদিন বাড়তে দেয়নি। যাঁরা বিদেশী নাটকের অনুকরণের জন্য গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বিরক্ত বোধ করছেন তারা বোধ হয় এই আরো বড় ক্ষতিটার দিকে তেমন নজর দেননি। সে ক্ষতি হয়েছে নাটকের পশ্চিমি মডেলের হুবহু অনুকরণের ফলে। গিরিশচন্দ্র যখন 'বিল্বমঙ্গল' বা 'চৈতন্যলীলা'

লেখেন তখন তিনি ভারতবর্ষের চরিত্রের কিছুটা কাছাকাছি থাকেন। তিনিই যখন 'প্রফুল্ল' বা 'মীরকাশিম' বা 'বলিদান' লিখতে যান তখন তিনি নাটককে বেঁধে ফেলেন সীমাবদ্ধ পশ্চিমি দ্বন্দ্বের ছকে। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রায় সরল উচিত-অনুচিত ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে এসে দাঁড়ায়। যদিও তিনিই (হয়তো মনোমোহন বসুর দৃষ্টান্ত থেকে উৎসাহ পেয়ে) কোনো কোনো চরিত্রের ভিতরকার চেহারা এবং তার বাচিক (verbal) প্রকাশের মধ্যে একটা আপাত-দ্বন্দ্ব তৈরি করে জটিলতার আর একটা মাত্রা খাড়া করবার চেষ্টা করেছেন—করিম চাচা বা বিদূষক-এ ('জনা', 'পাণ্ডব গৌরব') যেমন, কিন্তু তার বেশি আর এগোয়নি আমাদের দ্বন্দ্বের ধারণা।

অথচ দ্বন্দ্বের কি একটা চেহারা? আততি বা টেনশন (যাকে ইংরেজিতে suspended conflict বলা যায়) দ্বন্দ্বের আর-এক রূপ। এই টেনশন নিয়ে আশ্চর্য নাটক গড়ে তোলেন চেকফ তাঁর 'চেরি অর্চার্ড'-এ কিংবা স্যামুয়েল বেকেট তাঁর 'ওয়েটিং ফর গোদো'-তে। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'-তে, 'রক্তকরবী'-তে। পেশাদার মঞ্চের একচেটিয়া দখলের সময় এই দীর্ঘায়িত টেনশনের ব্যবহার খুব কমই হয়েছে বাংলা নাটকে। পণ্ডিতেরা বিলিতি বই পড়ে 'নাটকীয়তা'র একটা মারদাঙ্গা-হই হই গোছের ধারণা তৈরি করেছেন নিজেদের মনে, এবং রায় দিয়ে আসছেন যে বাঙালির জীবনে 'নাটকীয়তা' নেই। নাটকীয়তা কি শুধু দৈহিক—যে মারামারি কাটাকাটিতে তার প্রকাশ হবে? তা কি কেবল বাচনিক (verbal) যে, সংলাপের প্রখর তরোয়ালবাজির মধ্য দিয়ে দর্শককে তা সবসময় চেয়ারের উপর খাড়া করে বসিয়ে রাখবে? দুটি মানুষের নিঃশব্দ চাপা ক্রুদ্ধ দৈনন্দিনতায় তার প্রকাশ নেই? আবার বাইরের প্রকট নাটকীয়তাই কি আমাদের দেশে কম? কিন্তু ইয়োরোপের নাটক ক্রমশ তার সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সত্য আবিষ্কার করতে থাকে যে, শুধু পুরোনো ধরনের দ্বন্দ্ব দিয়ে কাজ চলছে না, তার নতুন নতুন চেহারা আনা দরকার। ফলে ইয়োরোপের নাটকও ওই ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই বদলায়। আরেক ধরনের বদল ঘটেছে নাটকের বইয়ের বাইরে, স্টেজের ব্যাকরণে। গর্ডন ক্রেগ এক সময় ভেবেছিলেন অভিনেতাদের উৎখাত করবেন স্টেজ থেকে, তার জায়গা নেবে নানা রঙের দৃশ্যপট। লাল পটের সঙ্গে নীল বা সবুজ পটের সংঘাত তৈরি করবেন তিনি। অ্যারিস্টটল যাকে 'অপ্‌সিস' বা spectacle বলেন এ তারই অঙ্গ। প্রসেনিয়াম স্টেজের সীমানা ভেঙে বা বাড়িয়ে দর্শকের বাঁধাছকের প্রত্যাশার

নতুন ছন্দ তৈরি করা হল, তাতেও নাটকীয়তার সৃষ্টি হল। অভিনেতারা দর্শকদের মাঝখানে থেকে উঠে আসছে, মার্কিনদেশের Hair নাটকের মঞ্চে দেয়ালে ঝোলানো দড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে যাওয়ার সার্কাসি কসরত দেখাচ্ছে—পিটার ব্রুক-এর ড্রিম-এ (মিডসামার নাইট'স ড্রিম) অনেকটাই তো অভিনয় হয় ট্র্যাপিজের খেলার মতো করে—এ সবের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের নাটকীয়তা তৈরি হয়ে চলেছে নিরন্তর। গান-বাজনার নাটকীয় ব্যবহারের চাক্ষুস দৃষ্টান্ত বছর দশেক আগে টোকিয়োতে জাপানি নাট্যকার তেরাইয়ামা-র নাটকে দেখেছি। কোয়াড্রোফোনিক অ্যামপ্লিফায়ারে বাজনাকে আস্তে আস্তে জমিয়ে তুলতে তুলতে এমন একটা চূড়ান্ত উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত হল চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে, আমাদের কানের পর্দা ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়বে বুঝি। এই রকম একটা দুঃসহ অবর্ণনীয় ক্লাইম্যাক্সে উঠে হঠাৎ সমস্ত শব্দ নিশ্চুপ। তখন আবার সে নৈঃশব্দ্যও অসহ্য অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছিল। এই একইভাবে ব্যবহার করা যায় আলোকে, মঞ্চের দৃষ্টিগ্রাহ্য আরো নানা উপকরণকে। কিন্তু প্রসেনিয়াম মঞ্চকে আমরা কতটুকু ব্যবহার করেছি? প্রসেনিয়ামে নাটকীয়তা সৃষ্টির যত সব উপকরণ ও সম্ভাবনা আছে তার কতখানি আমাদের দখলে? মনে রাখতে হবে, শুধু বাস্তবের ইলিউশন সৃষ্টির জন্যই প্রসেনিয়াম ব্যবহার নয়, তার পুরোনো ব্যবহার ভেঙে নতুন ব্যবহার তৈরি করা সম্ভব।

উনিশ-শো চল্লিশের আগে আমাদের ছিল পুরোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নাটকের মডেল, এখন আবার শুরু হয়েছে ব্রেশ্‌টীয় নাটকের মডেল—নাচ-গান-বাজনার একটা জগাখিচুড়ি। মাঝখানে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র প্রভাবে প্রতীকী-সাঙ্কেতিক-নাটকের একটা মডেল ঢুকে পড়েছিল। শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের নাটকে জোতদার-জমিদারকে কমেডিয়ান-ভিলেইন করে দেখানোর একটা সরল মডেল চালু হয়েছিল ষাটের দশকে, সেটা এখনও পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। আজ যখন হবিব তনবীর লোকনাট্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে তৈরি করেন 'চরণদাস চোর' তখন আমরা বাহবা দিই, লক্ষ করি, তার থেকে সুদূর প্রেরণাসূত্রেই, কিংবা হয় তো স্বতন্ত্র উৎসাহে, 'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা' বা 'নানা হে' ইত্যাদি নাটক তৈরি হচ্ছে। এরকম কয়েকটি নাটক আমাদের নিশ্চিত বুঝিয়ে দেয় যে, লোকনাট্যের মধ্যে আমাদের নাটকের এক সঞ্জীবন লুকিয়ে আছে।

বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণ বা অনুবাদ নাটকের অভিনয় নয়, সহজ মডেলের অনুসরণই আমাদের নাটকের দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড়ো কারণ। এই মডেল 'ক্ষমতাবান' নাট্যকারের হাত বেঁধে দেয়, অক্ষম নাট্যকারকে দিয়ে নকল করায়, এই মডেল সমালোচকের মনে সরল ছক ও মুখে বাঁধা বুলি বসিয়ে দেয়।

ভাষা:

নাট্যসংলাপের চরিত্র ও অ্যাবসার্ড নাট্যসংলাপ

১.

নাটকের সংলাপ যে নাট্যক্রিয়ার ভাষাগত বিস্তার এ মত এখন সকলেই স্বীকার করেন। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয় যে, নাটকে এমন কোনো কথা উচ্চারিত হবে না, যা কোনো-না-কোনো ভাবে নাটকের ক্রিয়া বা অ্যাকশনের সঙ্গে যুক্ত নয়। তা ক্রিয়াকে স্পষ্ট করবে, সাহায্য করবে, আগের বা পরের ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান ক্রিয়াটিকে যুক্ত করবে। আরো আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে স্মরণ করে এখনকার ঘটনা ও মনোভাবে তীব্রতা সঞ্চার করবে, কিংবা নাটকীয় 'আয়রনি'র সাহায্যে পরবর্তী সম্ভাব্য ঘটনের জটিল ব্যঞ্জনা তুলে ধরবে। ক্রিয়াভিত্তিহীন সংলাপ অবান্তর প্রগল্‌ভতা মাত্র। এই ক্রিয়া অবশ্য সরল অর্থে কেবল চরিত্রগুলির বাইরের কাজকর্ম বোঝাচ্ছে না। চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতও বাইরের দ্বন্দ্বসংঘাতের মতোই জরুরি নাট্যিক ক্রিয়া—এবং দুয়ে মিলেই নাট্যক্রিয়ার বৃত্তটি সম্পূর্ণতা পায়। সংলাপের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের প্রকাশই যথেষ্ট নয়, সে আবেগকে নাট্যিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে, মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এই জন্য জন হাওয়ার্ড লসন (Lawson) যখন ভালো নাট্যসংলাপের সংজ্ঞা হিসেবে জর্জ পিয়ার্স বেকারের এই কথা স্মরণ করেন[১]—"Good dialogue must be kindled by feeling, made alive by the emotion of the speaker"…তখন সে সংজ্ঞা আমাদের কাছে খণ্ডিত ও অসন্তোষজনক মনে হয়। লসন নিজে অবশ্য পরক্ষণে আমাদের দেখিয়ে দেন যে, জীবনপ্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত যে আবেগ, তা আসলে আবেগই নয়। তাঁর নিজের মতে রচনাপ্রকরণের দিক থেকে ভালো নাট্যসংলাপের লক্ষণ হল "clarity, compression, naturalness."[২]

উপরের কথাগুলি থেকে ভালো সংলাপের কাজ কী কী তা আমরা বুঝতে পারি। এই কাজ প্রধানত দুধরনের—আমরা নাম দিতে পারি 'উপস্থিত' কাজ আর 'সচল' কাজ। উপস্থিত কাজ হল, সংলাপ, অর্থাৎ একটি বিচ্ছিন্ন,

একক সংলাপ একটি চরিত্রের একটিমাত্র উপলক্ষ্যে বলা একটিমাত্র উক্তি, সাধারণত যার আগে এবং পরে আছে অন্য চরিত্রের সংলাপ—তা সেই চরিত্রটির ব্যক্তিত্বের সেই মুহূর্তের অবস্থা ও অবস্থানকে প্রকাশ করে। সে কী ভাবছে, কী অনুভব করছে, কোন্ প্রশ্ন তার মনে জাগছে, নাটকের অন্য চরিত্র সম্বন্ধে তার কী ধারণা ও বিচার, কোন্ খবর তার দেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে, কী দ্বন্দ্বে তার ভিতরটা আলোড়িত—এ সমস্তই তার সংলাপে প্রকাশিত হচ্ছে। এই 'প্রকাশ'ই হল সংলাপের উপস্থিত কাজ।

আর সংলাপের 'সচল' কাজ চলে তার নিজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে। তখন সে সংলাপ-শৃঙ্খলের অংশ, নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়। তখন সে আগের সংলাপের প্রসঙ্গ স্মরণ করে নাট্যক্রিয়াকে ঘনীভূত করে, পরের ঘটনা ও সংলাপ বিষয়ে আমাদের কৌতূহলী করে, নাট্যঘটনাকে আর-একটুখানি এগিয়ে নিয়ে পরবর্তী সংলাপের হাতে ছেড়ে দেয়। তখন সংলাপ হয়ে ওঠে নাট্যরথের চাকার একটি আবর্তন। তখন তার ভূমিকা স্থিতিশীল নয়, গতিশীল, তা নাটকীয় অগ্রগতি ও বিবর্তনের অংশ। আমরা একটি উদাহরণ[৩] তুলে সংলাপের এই দুধরনের কাজকেই বিশদ করবার চেষ্টা করি :

১ মেজো সর্দার।	নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।
২ সর্দার।	আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—
৩ মেজো সর্দার।	এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—
৪ সর্দার।	রাজা কি—
৫ মেজো সর্দার।	রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেননি। দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে—কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করিনে।
৬ সর্দার।	রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবারে কিন্তু ওই মেয়েটাকে অবিলম্বে—
৭ মেজো সর্দার।	না না, এসব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে-মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনো-রকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

আমরা আলোচনার সুবিধের জন্য সংলাপগুলিকে একক হিসেবে নম্বর বসিয়েছি। সংলাপ ১-এ লক্ষ করছি আগের প্রসঙ্গের অনুবর্তন—একটা উৎসবের আয়োজন চলছে, তারই আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন করছে মেজো সর্দার। ২ সংলাপে ধ্বজাপূজার উৎসবের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা সমান্তরাল আয়োজন যে চলছে—রঞ্জনকে রাজার এঁটোর দলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার—সে খবর আমরা পাই। সর্দারের কাছে দুটোই একই উদ্‌যাপনের অঙ্গ, সে যক্ষপুরীতে ধস আটকানোর চেষ্টায় ন্যায়-অন্যায় সততা প্রবঞ্চনার মধ্যে কোনো তফাত করছে না। কিন্তু সংলাপ ৩-এ মেজো সর্দার তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে খুব সহজেই—সে তার কর্তব্যের মধ্যে সংগত ও অসংগত—এ দুয়ের স্পষ্ট তফাত করে, এবং বিদ্রোহ না করলেও অসংগত কাজের দায়িত্ব পারতপক্ষে নিজে নেয় না। একটু প্রতিবাদও করে সংলাপ ৫-এ, এতে তার মানসিকতার চেহারাটি আমাদের কাছে বিশদ হয়। তার কথা থেকেই (সংলাপ ৩) ছোটো সর্দারের চরিত্রটিও ধরা পড়ছে, আবার পরে (সংলাপ ৭) মোড়ল বিষয়েও আমাদের একটি চমৎকার ধারণা জন্মে যায়। সংলাপ ৬-এ সর্দার নন্দিনী সম্বন্ধে যে-কথা বলেছে তা থেকে ভাবী নাট্যঘটনার একটি সূত্র তৈরি হবে। সর্দারকেও বুঝতে পারছি আমরা, তার কথা থেকে (সংলাপ ৬), দেখছি যে সে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত প্রতিনিধি; আবেগ, বিবেক, আত্মদ্বন্দ্ব, ধর্ম, অধর্ম, ন্যায় অন্যায় ইত্যাদির আন্দোলন অতিক্রান্ত হয়ে সে এক প্রবল যন্ত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

কিছু সংলাপ প্রত্যক্ষভাবেই, স্পষ্ট উল্লেখ বা reference-এর সাহায্যেই নাট্যক্রিয়ার অতীত-ভবিষ্যতের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে। যেমন ধরা যাক 'হ্যামলেট'-এর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ওফেলিয়া পোলোনিয়াসের কাছে বলছে তার সঙ্গে হ্যামলেটের উদাস-বিষণ্ণ ও অর্ধোন্মাদ আচরণের কথা যা হ্যামলেটের এখনকার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা ধারণা গড়ে দেয়, এবং তার ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি সম্ভাবনার আবহ তৈরি করে। কিংবা 'কিং রিচার্ড দ থার্ড'-এ ৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্যে লর্ড স্ট্যানলি রিচার্ডের কাছে বিদায় চেয়ে বলছে "I'll muster up my friends and meet your Grace/ Where and what time your Majesty shall please." যার উত্তরে রিচার্ড বলছে "Ay, ay, thou wouldst be gone to join with Richmond ; /But I will not trust thee."—এর শেষ বাক্যটিতে

রিচার্ডের মনোভাব বেরিয়ে আসছে, কিন্তু বাকি অংশে ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে সে সম্বন্ধে প্রায় মামুলি পূর্বসূত্র। কিন্তু যাকে নাটকীয় 'আয়রনি' বা গূঢ়াভাস বলা হয় তা এরকম সহজ প্রত্যক্ষ সংবাদমাত্র নয়। তা পূর্বে উচ্চারিত সংলাপের অন্তত দুটি পরস্পরবিরোধী অর্থের মধ্যে যেটি সেই মুহূর্তে প্রত্যাশিত সেটিকে নিরস্ত করে, পরে ঘটনার মধ্যে অভাবিত বা অপ্রত্যাশিত অন্য অর্থটিকে দর্শকের সামনে নিয়ে আসে। অর্থাৎ যে-সংলাপে গূঢ়াভাস আছে তার প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে একটা বিরোধ তৈরি হয়ে যায়। প্রথম অর্থটি মামুলি, অগভীর, সেই মুহূর্তের প্রসঙ্গ বা উপলক্ষ্যনির্ভর। কিন্তু পরে নাটকের ঘটনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়, অধিকতর ব্যঞ্জনাঋদ্ধ অর্থটি আভাসিত হয়ে নাটকের ঘটনাকেই নতুন করে আলোকিত করে, দর্শক আগের উচ্চারণ ও পরের ঘটনাকে মিলিয়ে নাট্যঘটনায় সে উচ্চারণের বড় ও প্রথমে অনাবিষ্কৃত একটা অর্থ উদ্ধার করেন। 'ম্যাকবেথ' নাটকে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ম্যাকবেথ যখন ব্যাংকোর সঙ্গে প্রথমে মঞ্চে এই কথা বলতে বলতে আসে—"So foul and fair a day I have not seen" তখন কথাটি নিছক আক্ষরিক অর্থেই সত্য বলে মনে হয় দর্শকদের কাছে। কিন্তু পরে তার সারাজীবনের আখ্যান দেখবার পর দর্শকের মনের মধ্যে এই সংলাপটিই আবার হয়তো ফিরে আসে, তখন তার আক্ষরিকতার খোলস খসে পড়েছে, তখন মনে হয় ওই দিনটা সত্যসত্যই ছিল ম্যাকবেথের জন্য foul ও fair, একই সঙ্গে তার সৌভাগ্য ও সর্বনাশের সূত্রপাত ওই দিনে। দর্শক হয়তো foul and fair-এর ক্রমটিও লক্ষ করেন, দেখেন শেক্সপিয়ার foul কথাটি বসিয়েছেন আগে, হয়তো ম্যাকবেথের ভাবী ট্র্যাজেডির অমোঘ ইঙ্গিত হিসেবে। সোফোক্লেসের 'রাজা অয়দিপৌস' এই ধরনের বাচনিক গূঢ়াভাসে অতিশয় সমৃদ্ধ। এমন-কী আমাদের বাঙালি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকের প্রথম দৃশ্যেও আমরা লক্ষ করি, রাজা নীলধ্বজের পরিবারের বিভিন্ন সদস্য অগ্নিদেবতার কাছে নিজের নিজের অভিপ্রায়সম্মত বর প্রার্থনা করছে, অগ্নিও উদারভাবে কল্পতরুর মতো প্রত্যেককে সেই বর দান করছে। যেমন জনা চাইছে জাহ্নবীর জলে জীবন সমাপন করতে, প্রবীর চাইছে তার 'যোগ্য বীর সনে' যুদ্ধবাসনা চরিতার্থ করতে। কিন্তু যে অর্থে বর সফল হল বলে আমরা মনে করি, সকলের সুখজনক ইচ্ছাপূরণে—সে অর্থে এই কথাগুলি সত্য হবে না। জনা গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করবে পুত্রশোকের সান্ত্বনাহীন হাহাকার বুকে নিয়ে—তার কাছে ওই বর হবে আত্মহত্যার নামান্তর। আর

প্রবীর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হবে, কাজেই তার কাছে অগ্নির ওই বর আসলে মৃত্যুর ছদ্মরূপ। এই ঘটনাগুলিই অগ্নির বরদানকে ভিন্ন এক অর্থ দেয়, সেগুলিকে আয়রনির স্তরে টেনে আনে। আমরা সংলাপের 'সচল' ভূমিকা বলতে এই বিষয়টা বিশেষভাবে বোঝাতে চাইছি।

২.

এরিক বেন্‌টলি নাট্যসংলাপের কতকগুলি সরল ভাগ করেছেন,[৪] যে-ভাগগুলি নাট্যতত্ত্বের বইয়ে স্বীকৃত ও গৃহীত—যথা স্বভাববাদী বা ন্যাচারালিস্টিক সংলাপ, বাগ্মিতাধর্মী গদ্য ও কাব্যিক সংলাপ। পরে তিনি কাব্য-বিরোধী বা নাট্যবিরোধী (অ্যান্‌টি-পোয়েট্রি, অ্যান্‌টি-প্লে) সংলাপেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। প্রথম চারধরনের সংলাপের পরস্পর তফাত সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হালকা মেজাজে তিনি বলেন "Naturalistic dialogue is homey, and says: "Please note how close our playwright has stayed to the ordinary conversation of ordinary people." The rationale could be called democratic. "This is your theatre." Rhetorical dialogue, in prose or verse, is aristocratic. It is an ideal speech, and will tend to consort with plots and characters above the ordinary."[৫] বেন্‌টলির দৃষ্টান্ত জার্মান নাট্যকার শিলার, বা ফরাসি কর্নেঈ। কাব্যিক সংলাপ সম্বন্ধে বেন্‌টলির সংজ্ঞা কিছু নেই, কিন্তু বিবরণ আছে। এই বিবরণ এই রকম যে, কাব্যিক সংলাপে স্বভাববাদ, গদ্য বাগ্মিতা, পদ্য বাগ্মিতা সবই থাকতে পারে। কিন্তু বাগ্মিতাধর্মী (রেটরিক্যাল) সংলাপে যেখানে মূলত সমষ্টিগত বা জীবিকাগত (প্রোফেশন্যাল) বিষয়গুলি স্থান পায়, সেখানে কাব্যিক সংলাপে ব্যক্তির ভিতরকার ভাবনা-বাসনা-বেদনা কথায় আকৃতি পায়। এতে জোরটি ব্যক্তির উপর, সমষ্টির উপর নয়। কাব্যিক সংলাপের বিষয়গুলি ব্যক্তির একার, সকলের নয়। বেন্‌টলি শেষ পর্যন্ত গীতিকবিতার সঙ্গে কাব্যিক সংলাপের নৈকট্য দেখান।

স্বভাববাদী সংলাপ প্রসঙ্গে বেন্‌টলি টেপরেকর্ডারের প্রসঙ্গ এনেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন যে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তা যেন অবিকল তুলে নিয়ে, তারপর তাকে সম্পাদনা করে নাটকে ব্যবহার করা হয়। এই বক্তব্যের মধ্যে আমাদের মতে একটু অতিরিক্ত সরলীকরণ আছে।

স্বভাববাদী উপন্যাসের জীবন যে-অর্থে slice of life, স্বভাববাদী নাটকের সংলাপ ঠিক সে অর্থে slice of life হয় না। নাটক মানেই একটি নির্মিতি, স্বভাববাদী নাটকও তাই। উপন্যাসের চেয়ে নাটকে এই নির্মিতির পরিমাণ অনেক বেশি। নাটকে স্বাভাবিক জীবনের ঘটনার গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচন থাকে, তেমনই সংলাপও 'রচিত' হয় নাট্যক্রিয়ার গতি ও পরিণতির দিকে লক্ষ রেখে। তা অনুকরণ নয়, রচনা। ফলে তাতে স্বাভাবিকত্বের একটা বাইরের চেহারা আছে, কিন্তু আসলে সে সংলাপও কৃত্রিম ও বানানো। নাট্যকারকে তার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রয়োগ ও বাক্যবন্ধ ভেবেচিন্তে খাড়া করতে হয়, দৈনন্দিন জীবনের অসংলগ্ন এলোমেলো কথাকে 'সম্পাদিত' করে সাজালেই হয় না। স্বভাববাদী সংলাপের চূড়ান্ত উৎকর্ষ যাঁর নাটকে সেই ইবসেনের নাট্যসংলাপ যদি একটু লক্ষ করি আমরা, তাহলে দেখব তার প্রত্যেকটি শব্দ নাটকের 'কাজ' করছে, নাট্যক্রিয়ার ওই 'উপস্থিত' আর 'সচল' প্রয়োজন সিদ্ধ করছে, কোনো কথাই অবান্তর নয়, মনে হয় না এ কথাটি না থাকলেও নাটকের কোনো ক্ষতি হত না। এখানেই ১৮৯৯-এ প্রকাশিত পিরানদেল্লোর প্রবন্ধের L'azione paralata [লাৎসিয়োনে পারলাতা] শিরোনামটি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর মতে নাটকের সংলাপ হল "the Action spoken, the Action in words."[৬] যত ধরনের স্বভাববাদী সংলাপই হোক না কেন— ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, হাউপ্টমান থেকে বেকেট পর্যন্ত, সে সংলাপ সব ক্ষেত্রেই নাট্যকারের সজ্ঞান ও সতর্ক রচনা, আহরণ নয়। তাতে দৈনন্দিনতার একটা বিশ্বাস্য সুর থাকে, যা শুনে মনে হয় যে, 'হ্যাঁ এরকম অবস্থায় এরকম একটি চরিত্র এ ধরনের কথাই বলে থাকে বটে'। যেমন ধরা যাক বাদল সরকারের 'পাগলাঘোড়া' নাটকে—

শশী ॥ বাইরেটা কি অন্ধকার রে বাবা। চাঁদ কি একেবারেই নেই আজ?

কার্তিক ॥ (খেলতে খেলতে) আছে। ছোট সাইজ।

মেয়েটা ॥ (যেন আপন মনে) আচ্ছা, সেদিন চাঁদটা কি সাইজের ছিল?

শশী ॥ (বাইরের দিকে চেয়েই) তাতে কি এসে যায়?

মেয়েটা ॥ না, ভাবছিলাম। এই রকম ছোটই ছিল বোধ হয়। না কি বড়ো? পূর্ণিমার রাত ছিল না কি সেটা? বড়ো গোল রুপোর থালার মতো চাঁদ?

পদ্য-বাগ্মিতাধর্মী সংলাপের উদাহরণ হিসেবে আমরা রঘুপতির ('বিসর্জন' দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য) সেই বিখ্যাত "পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কে বা / আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ! / এ জগৎ মহা হত্যা-শালা···" ইত্যাদি সংলাপটির উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু তার পরেই জয়সিংহের যে-সংলাপ, সেটি বাগ্মিতাধর্মী নয়, কাব্যধর্মী, তাতে হৃদয়বেদনার সমৃদ্ধ উচ্ছ্বাসই যেন উৎসারিত হয়েছে। তা কিছু প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করতে চায় না রঘুপতির মতো, কোনো প্ররোচনা বা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চায় না। বলা বাহুল্য প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডিতে বা শেক্‌সপিয়ারের নাটকে কাব্যিক সংলাপ চূড়ান্ত মহিমা লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের তথাকথিত কাব্যিকতার সঙ্গে শেক্‌সপিরীয় সংলাপের পার্থক্য শুধু শিল্পের ঋদ্ধিগত পার্থক্যে নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলির মুখে ওই আতিশয্যপূর্ণ উচ্ছ্বসিত কবিতা যেখানে বানানো আর চাপানো মনে হয়, সেখানে শেক্‌সপিয়ারের চরিত্রগুলি যেন কবিতার উচ্চারণে তাদের মহিমময় ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনাকেই উন্মোচিত করে। ক্লিয়োপেট্রার এই কথাগুলিকে কি কখনোই আমাদের কাব্যিকতাধর্মী বা সাজানো বলে মনে হয়?—

Give me my robe, put on my crown ;
I have
Immortal longings in me. Now no more
The juice of Egypt's grape shall moist this lip.
Yare, yare, good Iras ; quick. Methinks I hear
Anthony call. I see him rouse himself
To praise my noble act. I hear him mock
The luck of Cacsar, which the gods give men
To excuse their after wrath. Husband, I come:
Now to that name my courage prove my title !
I am fire and air ; my other elements
I give to baser self."……

৩.

পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে সংলাপ-রচনার নানাবিধ প্রকরণ তৈরি হয়েছে। এই সূত্রে একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে যে, আগেকার নাটকে নাট্যকার

অনেক সময় নিজেই পরিচালক ছিলেন, কিংবা পরিচালক-অভিনেতাদের দলেরই একজন ছিলেন বলে, সংলাপের আগে, পরে বা মধ্যে খুব বিস্তৃত নাট্যনির্দেশ থাকত না। শেক্‌সপিয়ারে প্রবেশ-প্রস্থানের বাইরে অন্য নির্দেশ কদাচিৎ পাই, কিন্তু কখনও হ্যামলেট ছুরি নিয়ে, ক্লাউন ট্যাবর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রবেশ করছে (টুয়েল্‌ফ্‌থ নাইট), অ্যাখিলিস তরোয়াল খাপে ভরছে (ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা), জুলিয়েট ছুরিকা নামিয়ে রাখছে ইত্যাদি নির্দেশ আমাদের চমকে দেয়। ইবসেন ও তাঁর পরে বার্নার্ড শ-তে অতি বিস্তৃত নাট্যনির্দেশ লক্ষ করি এই কারণে যে, তখন নাট্যকার আর মঞ্চের বা অভিনয়-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সব সময় সংশ্লিষ্ট নন, তাঁর নাটক একাধিক মঞ্চে, এমন-কী একাধিক দেশে অভিনীত হতে পারে। ফলে নিজের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনাটিকে তিনি যথাসম্ভব প্রাসঙ্গিক নির্দেশের আকারে কিছুটা বিস্তারিতভাবেই লিখে দিতে আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে স্বভাববাদী নাটকে নাট্যকারের detailing অতিশয় ব্যাপক হয়ে উঠল। জানি না ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভালো হয়েছে কি না। সম্ভবত হয়নি, কারণ অন্য দেশের বা অন্য কালের কোনো পরিচালক যখন নাটকটির মঞ্চরূপ দেবেন তখন নাট্যকারের অতিনির্দেশ তাঁর স্বাধীন ভাবনা ও কল্পনার পথ রুদ্ধ করতে পারে।

যাই হোক, সংলাপের নানা প্রকরণের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি রীতির কথা বলি। স্বগতোক্তি বা soliloquy এই ধরনের একটি রীতি। যেখানে চরিত্র মঞ্চে অবস্থিত আর কারও সঙ্গে কথা বলছে না, দর্শকের সঙ্গেও না, কেবল নিজের মনের কথাকে বাইরে প্রকাশ করছে, thinking aloud-এর ধরনে, নিজেকেই শোনাতে চায় সে কথাগুলি—তখন তাকে স্বগতোক্তির শরণ নিতে হয়। শেক্‌সপিয়ারের নাটকের স্বগতোক্তি তো বিখ্যাত, বিশেষভাবে স্মরণীয় ম্যাকবেথের 'Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow' শীর্ষক স্বগতোক্তিটি ('ম্যাকবেথ', পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য), কিংবা হ্যামলেটের 'To be, or not to be' (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) স্বগতোক্তি। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ বা দ্বিতীয় দৃশ্যে হ্যামলেট যে স্বগতোক্তি করছে, তাতে রোসেনক্র্যান্ট্‌স আর গিলডেনস্টার্ন বেরিয়ে যাওয়ার পরে হ্যামলেট বলে Ay, so God buy to you! Now I am alone···এবং এই একাকিত্বের পটভূমিকাতেই সে দীর্ঘ উনষাট পঙ্‌ক্তির এক স্বগতোক্তি করে। কিন্তু এই একা হওয়া বড় কথা নয়, মঞ্চে আরও লোক থাকলেও সে একা অনুভব করতে পারে, স্বগতোক্তির দরকার

বোধ করতে পারে। চেখভের 'দ সোয়ান সং' নামের একাঙ্কটিতে একজন প্রম্‌টার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বাতিল অভিনেতাটি অধিকাংশ সময় স্বগতোক্তি করে।

স্বগতোক্তির পাশাপাশি আর-একটি সংলাপ-রীতি হল 'জনান্তিকে', 'একান্তে' বা aside, যেখানে একজন অভিনেতা মঞ্চে অন্য অভিনেতাদের কান এড়িয়ে দর্শকদের সঙ্গে, বা অন্য একজন অভিনেতার সঙ্গে বাক্যালাপ করে। কথাগুলি অন্যদের জন্য নয়; এরই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অভিনেতার সোজাসুজি দর্শক-সম্ভাষণ বা direct address-এর রীতির কথা, যেখানে অভিনেতা সোজাসুজি দর্শকদের সঙ্গে কথা বলে। এটি কমেডিতে অনেক আগে থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার আধুনিক নাটকে 'স্টেজ ম্যানেজার' জাতীয় চরিত্রের সংযোজনে—যেমন জঁ আনুই-এর 'আন্তেগোনে'তে—সাধারণ নাটকেও গৃহীত হচ্ছে। এর সবগুলিই নাটকের প্রচলিত সংলাপরীতির সঙ্গে এক ধরনের বিরোধ বা contrast তৈরি করে, তাতে নাটকীয়তা পুষ্ট হয়। বিষয়গত নাটকীয়তার পাশাপাশি এইসব প্রকরণগত নাটকীয়তাও নাটককে সাহায্য করে।

কিন্তু সংলাপপরম্পরা রচনার সময়ও নাট্যকার কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। যখন পরপর আসে একটির পর একটি সংলাপ, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের পর্যায়ক্রমিক কথাবার্তা, তখন একটা সংলাপের সঙ্গে আরেকটা সংলাপের সম্পর্ক কী দাঁড়ায়? প্রথম সম্পর্ক হল সংঘাত বা বিরোধের—একজন যে-কথা বলছে অন্যজন সে-কথার প্রতিবাদ করছে, যেমন পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ওথেলো আর ডেসডেমোনার সংলাপ

Othello. That handkerchief which I so loved and gave thee
Thou gav'st to Cassio.

Desdem. No, by my life and soul!
Send for the man and ask him.

Othello. Sweet soul, take heed,
Take heed of Perjury. Thou'rt on thy death-bed.

Desdem. Ay, but not yet to die.

Othello. Yes, presently.

এই বিরোধী সংলাপ যে সবসময় মুখোমুখি বিতণ্ডা বা কলহ, বা প্রত্যক্ষ বাদ-প্রতিবাদ তা মোটেই নয়, এর নানা সূক্ষ্ম রূপান্তর আছে।

ধারাবাহিক সংলাপগুলির দ্বিতীয় সম্পর্ক হল স্তূপীকরণ বা cumulation-এর[৮]। এখানে পরপর যে সংলাপগুলি আসছে তাতে একটি আগেরটিকে প্রতিবাদ করছে না, বরং সমর্থন করছে, বা তারও উপরে এক কাঠি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যেমন সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা'-তে কেবলচাঁদ যখন খেঁটুরাম ও তুলিরামকে বজ্রাহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করছে—'সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?' খেঁটুরাম বলছে—'কোনো জন্মে নামও শুনিনি'—তুলিরাম তাসখেলায় ছোট রঙের তাসের ওপর বড় রঙের তাস চাপানোর মতো সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে—'চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না'—। এই স্তূপীকরণে কথার পিঠে কথা চাপানো হয়। ওই 'ঝালাপালা'তেই জমিদার এক জায়গায় বলছে—'ধূমকেতুটা এসে কী কাণ্ড করল? ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প—', সঙ্গে সঙ্গে খেঁটুরাম তার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে—'প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি'—এবং তুলিরাম তারও উপরে জুড়ছে—'পানের পোকা। এলাহাবাদ এগজিবিশন!'

আরেক ধরনের সংলাপ-শৃঙ্খল প্রধানত উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক, যা থেকে নাটকের পশ্চাদ্বর্তী নানা সংবাদ বেরিয়ে আসে। যেমন মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' থেকে এই অংশে

পুঁটি। ও ফতি, তুই এখন বলিস কি ভাই?

ফতেমা। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি? সোনার খাবি, সোনার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাকবি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব। তুই মোকে জওয়ান খসম ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ। ও সব কপালের কথা, ওসব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে?···

নাটকের বা দৃশ্যের প্রথমদিকে সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নোত্তরমূলক সংলাপ দিয়েই আরম্ভ করা হয়। গৌণ চরিত্রেরা এ ধরনের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নাটকের নেপথ্যের অনেক খবর দেয়, কোনো একটি information scene-এ।

আরেক-ধরনের সংলাপ সাজানোর কৌশলের নাম দিতে পারি খণ্ডীকরণ বা truncation। যেখানে একটি চরিত্র তার বক্তব্য একবারে বলে দিচ্ছে না, বরং অন্যদের প্রশ্নের উত্তরে, থেমে, অন্যদের আরও প্রশ্ন উপভোগ করে, নিজের ইচ্ছামতো সময় নিয়ে, কথাটিকে বলছে। এ হল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খণ্ডীকরণ। আবার অন্যারোপিত খণ্ডীকরণও আছে, যেখানে অন্যরাই কথাটিকে শেষ করতে দিচ্ছে না। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত'-র চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে চন্দ্রকেতু আর চন্দ্রগুপ্তের সংলাপে—

চন্দ্রকেতু। প্রিয়বর—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। মন্ত্রীকে ডাক।

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু! বিশেষ—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এই মুহূর্তে তাঁর কৈফিয়ৎ চাই।

চন্দ্রকেতু। তিনি বললেন—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি যা বলবেন, নিজে এসে বলবেন।"...ইত্যাদি

এই ধরনের সংলাপ-শৃঙ্খলের প্রকরণ কোনোটাই একটানা ব্যবহার করা যায় না, একে অন্যের সঙ্গে মিশে থাকে, তাতেই নাট্যসংলাপের বহুবিধ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। আমরা আলাপন-কৌশল বা conversatoinal strategy-র ধরনের দিক থেকে এই চারটি প্রধান ভাগ করেছি ধারাবাহিক সংলাপের, নিশ্চয়ই আরও অনেক গৌণ ভাগ করা যায়। কিন্তু কোনো একটি নাটকের সংলাপ পরপর অনুধাবন করলে এই চারটি ধরনের পুনরাবৃত্তিই বহুলভাবে চোখে পড়ে।

৪.

এরিক বেন্‌ট্‌লি প্রচলিত নাটকের চরিত্রের আলোচনায় বলেছেন যে, তারা প্রত্যেকেই মোটামুটিভাবে বাচাল যদি বা নাও হয়, সুবক্তা হবেই— "generally speaking, the drama has room only for proficient talkers".[৯] পরবর্তীকালে, বিশেষত পঞ্চাশের বছরগুলির পরবর্তীকালে ইয়োরোপে যে 'অ্যাবসার্ড' নাটকের আবির্ভাব ঘটল, তাতে ওই proficient talkers-দের জায়গায় একটি-দুটি এমন চরিত্র দেখা দিতে শুরু করল যাদের ভাষা-ব্যবহার অনর্গল নয়, বরং ভাষা নামক অস্ত্রটি যেন তাদের হাতে খুব অভ্যস্ত রইল না আর, কিংবা যেন এই অস্ত্রটি কেড়ে নেওয়া হল তাদের কাছ

থেকে। এমন নয় যে, অ্যাবসার্ড নাটকে অনর্গল বক্তা চরিত্র নেই, ইয়োনেস্কোর 'দ লেসন' নাটকের শিক্ষকমশাই-ই এ ধরনের একজন বক্তা। কিন্তু তার কথা কিছুক্ষণ অনুসরণ করার পরই আমরা বুঝতে পারি, ভাষার যে-একটা সুবোধ্য লজিক আছে, যার সাহায্যে একজন আরেকজনকে মনের কথা বুঝিয়ে দেয়, তা-ই যেন কে নষ্ট করে দিয়েছে। এদের ভাষায় তৈরি হয়েছে অন্যতর কোনো লজিক। শব্দের প্রাথমিক প্রতীকধর্ম ধ্বংস করে দিয়েছে কেউ, অনেক সময় বর্ণ জুড়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরিও হচ্ছে না সংলাপে।

একথা ঠিক যে, স্বভাববাদী সংলাপেই বাগ্মিতাকে বর্জন করা হয়েছিল। নাটক যখন রাজামহারাজাদের ছেড়ে সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনে এসে পড়ল, তখন লক্ষ করা হল যে সাধারণ মানুষ অত কথায় কথায় বক্তৃতা দেয় না। তাদের কথাবার্তা কাটা-কাটা, সংক্ষিপ্ত, কিছুটা অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ, এবং তার মধ্যে উচ্চাঙ্গের শিল্পপ্রকর্ষ প্রায়ই অনুপস্থিত। নাটকে তার উপস্থাপনার মধ্যেও অবশ্যই সম্পাদনা ও সজ্ঞান রচনা প্রায় সব জায়গাতেই থাকে—একথা বলেছি আমরা। তাতে স্বাভাবিকতার একটি 'ভাণ' তৈরি হয়ে যায়। অন্যদিকে অ্যাবসার্ড নাটকে সংলাপ প্রবল বা অনিবার্য নাটকীয়তা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় না, স্বভাববাদী নাটকে যেমন হয়। বরং বেনুটুলি দেখান, 'ওয়েটিং ফর গোদো' জাতীয় নাটকের চরিত্রগুলি…"talk to kill time, talk for talking's sake",[১০] এসব নাটকে কথাবার্তার মানে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে—কে কী বলছে তাই বোঝা যাচ্ছে না। দু'জন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, একজন আরেক জনকে তার মনের কথা জানাচ্ছে—এতে দুর্বোধ্যতার কী থাকতে পারে সেইটেই আমাদের কাছে অবোধ্য থেকে যায়।

আমরা বুঝি ভাষা হল 'কমিউনিকেশন'-এর অন্যতম উপায়, আমরা ভাবনা-চিন্তা আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিতে হলে ভাষাই আমার কাছে সবচেয়ে সহজ ও সুলভ বাহন। তার বদলে ওই সব নাটকে দেখা যাচ্ছে, চরিত্ররা এমন ভাবে কথা বলছে যেন তারা ওই মনের ভাব জানানোর জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়, যেন তারা অন্য লোকটির কথা শুনতেও এতটা আগ্রহী নয়, পরস্পরকে সম্মুখে রেখে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সামন্তরালভাবে তারা কথা বলে যাচ্ছে। আধুনিক নাট্যতত্ত্বের পরিভাষায় 'ডায়ালগ' নামে ব্যাপারটা উঠে গিয়ে 'ডুয়োলগ' নামে বিশেষ এক ধরনের সংলাপ এসে নাটকে জাঁকিয়ে বসছে।

দ্বিতীয়ত, নাটকে কথাবার্তার বদলে অর্থহীন ধ্বনি এবং নৈঃশব্দ্যের ব্যবহারও বেশি হচ্ছে। অ্যাবসার্ড বা ওই ধরনের নাটকের 'বোবা বা প্রায়বোবা' চরিত্র বেশ দেখা যাচ্ছে এখানে-ওখানে, যে ব্যাপারটা আগেকার বা অন্য ধরনের নাটকে ভাবাই যায় না। নাটকের চরিত্র মানেই ছিল কথা-বলা চরিত্র। এখন কেউ প্রথম থেকেই বোবা, প্রায় আগাগোড়াই বোবা, কিংবা হঠাৎ আকস্মিকভাবে দু' চারটে কথা বলছে, 'ওয়েটিং ফর গোদো' নাটকে লাকি যেমন; কেউ 'বক্তা'র চরিত্রে এসে অর্থহীন ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারণ করছে—ইয়োনেস্কো-র 'দ্য চেয়ার্স' নাটকের 'ওরেটর' যেমন বলছে Mmm, Mmm, Gueue, Gou, Gu··· ইত্যাদি; কেউ নিজে কোনো কথা না বলে অন্যের কথার প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্তি করছে, ইয়োনেস্কো-র 'দ্য নিউ টেনান্ট' নাটকের দ্বিতীয় ফারনিচার বাহকটি যেমন; কেউ টেলিগ্রামের মতো অতিশয় সংক্ষেপে কথাবার্তা সারছে। এদিকে বেকেট-এর মতো নাট্যকার মিউজিক হল বা সার্কাসের বাইরে, স্টেজের নাটকের জন্যে সংলাপহীন নাটক বা 'মাইম' লেখার কথা ভাবছেন—এ তো এরই সঙ্গে সম্পর্কিত। বেকেট এবং ইয়োনেস্কো-ই দুজন বড়ো নাট্যকার যাঁদের নাটকে ভাষার এরকম হেনস্তা করা হয়েছে দেখতে পাই। এই লক্ষণ গুলি যে মূল ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করে তা হল এই যে, ভাষা জিনিসটাকে যেন এঁরা আর তেমন বিশ্বাস করছেন না। ফলে নাটকে তার ভূমিকা এঁরা নানাভাবে সংকীর্ণ করে আনছেন, শেষ পর্যন্ত ভাষাহীন নাটক লেখার কথাও ভেবেছেন বেকেট—তাঁর দু'টি 'Act without words' আছে।

৫.

এখন আমরা ওই অ্যাবসার্ড জাতীয় নাটকে ভাষার যে অবমূল্যায়ন ঘটেছে তার লক্ষণগুলিকে একটু আলাদা করে চিনে নিতে পারি। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে যে অর্থে ভাষার শিল্প, নাটক সে অর্থে কেবল ভাষার শিল্প নয়। সংলাপ নাটকের অনেকগুলি উপকরণের একটি অংশ মাত্র। যতই জরুরি হোক সংলাপ, তা নাটকের সর্বস্ব নয়। তাতে মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চের উপকরণ আছে, পাত্র-পাত্রীর অভিনয়-চলাফেরা-রূপকর্ম-পোশাক-আশাক আছে। আলো বা সংগীতের অন্য এক ধরনের ভাষা আছে—সেগুলি নাটকেরই অঙ্গ। আর শ্রাব্য ও দৃশ্য শিল্পের মধ্যে ভাষার ভূমিকায় আপেক্ষিক তফাত সম্বন্ধে যাঁদের স্পষ্ট ধারণা নেই, তাঁরা কোনো ফুটবল খেলায় রেডিয়ো এবং টেলিভিশনের

ধারাবিবরণী পাশাপাশি লক্ষ করলেই তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। রেডিয়োতে শুধু কথা দিয়ে পুরো ঘটনার ছবি, নাটকীয়তা, উত্তেজনা ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলতে হচ্ছে। আর টেলিভিশনে অনেকটাই দর্শক দেখে বুঝে নিচ্ছে, মাঝে মাঝে দুটো-একটা মন্তব্যে ভাষ্যকার জিনিসটা ধরিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। সুতরাং নাটকে ভাষার ভূমিকা আপেক্ষিকভাবে সাহিত্যে তার ভূমিকার চেয়ে গৌণ। তা সত্ত্বেও নাট্যকার যখন নাটক লেখেন তখন ভাষা ছাড়া তার আর কোনো অস্ত্র নেই, ভাষাতেই লিখতে হয় তাঁকে। যতক্ষণ না অভিনয় হচ্ছে ততক্ষণ নাটক ভাষাশিল্প মাত্র। বেকেট যেমন বলেছেন, "শব্দ, শব্দ ছাড়া আমার হাতে আর কিছুই নেই।" এ বড়ো আশ্চর্য যে, একদিকে তাঁরা শব্দকে বা ভাষাকে গ্রহণ করেছেন অস্ত্র বা উপায় হিসেবে, তাঁদের নিজেদের কথা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবার বাহন হিসেবে, অন্যদিকে তাঁদের রচনার শব্দ বা ভাষা থেকে কেড়ে নিচ্ছেন অর্থ, স্বচ্ছতা, প্রকাশ। এই যে আপাত-বিরোধ ভাষার মধ্য দিয়ে ভাষার ব্যর্থতা বা দুর্বলতা বা অন্তঃসারশূন্যতা দেখানো—তা আধুনিক নাটকের সংলাপের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য।

সংলাপে ভাষার মূল্যহ্রাসের ওই লক্ষণগুলিকে আমরা আরেকবার বিচার করি।

ক. সংলাপ আছে, কিন্তু কিছুই বলা হচ্ছে না, কিংবা যা বলা হচ্ছে তাতে নতুন কিছুই নেই—চরিত্রগুলির কাছে তা বস্তাপচা খবর মাত্র। হয়তো দর্শকের তা জানা দরকার পটভূমিকা হিসেবে, চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে। কিন্তু তারা নিজেরা এই সংলাপ বলে নিজেদের বা নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না।

শ্রীমতী স্মিথ : এখন ন'টা। আমরা স্যুপ খেয়েছি। ফিশ অ্যাণ্ড চিপ্‌স আর ইংলিশ স্যালাড দিয়ে ডিনার সেরেছি। বাচ্চারা ইংলণ্ডের জল খেয়েছে। রাতের খাওয়াটা আমাদের মন্দ হয়নি। তার কারণ আমরা লণ্ডনের শহরতলির বাসিন্দা, আর আমাদের পদবী স্মিথ তো!

শ্রীযুক্ত স্মিথ : [খবরের কাগজ পড়তে পড়তে জিভে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করেন]

শ্রীমতী স্মিথ : চর্বিতে যে আলু ভাজা হয়েছিল তা খেতে বেশ চমৎকার। স্যালাডের তেল টকে যায়নি। রাস্তার ওপারের মুদির

দোকানের তেলটার চেয়ে মোড়ের মুদির দোকানের তেলটা আরেকটু ভালো। রাস্তার শেষের মুদির দোকানের তেলটার চেয়েও ভালো। তবে তেল খারাপ হলে ওদের সেটা বলতে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।

শ্রীযুক্ত স্মিথ : [খবরের কাগজ পড়তে পড়তে অনুরূপ আওয়াজ]

শ্রীমতী স্মিথ : যাই বলো, মোড়ের দোকানের তেলটাই সবচেয়ে ভালো।

শ্রীযুক্ত স্মিথ : [অনুরূপ আচরণ ও আওয়াজ]

[প্রথম দৃশ্য, ইয়োজিন ইয়োনেস্কো, 'দ্য বল্ড প্রিমা ডনা']

ইয়োনেস্কোর সংলাপের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে তাতে inanities বা হাস্যকর অতি তুচ্ছ তথ্যের ব্যবহার। প্রচলিত অর্থের 'নাটকীয়' সংলাপ হিসেবে এ কিছুই না, কারণ সংলাপ শ্রীমতী স্মিথ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলছে না। কিন্তু এ সংলাপে যা বলা হচ্ছে না সেটাই আসল, যা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটার জন্যেই আমাদের কান খাড়া করে রাখার দরকার হয়। এ সংলাপ যেন বুঝিয়ে দেয়, মানুষের ভাষা যেমন প্রকাশ করে, মানুষের ভাষা তেমনই গোপনতা তৈরি করতে পারে। এই গোপন করার মধ্যে থেকে আবার একটা অর্থ বেরিয়ে আসে, আভাসে, অনুমানে, ব্যঞ্জনায়—সেটাই এখনকার নাট্যকারের লক্ষ্য।

নাটকের সংলাপ একসময় ছিল ড্রামাটিক বা নাটকীয়। ক্লাসিকাল বা রোম্যানটিক ট্রাজেডিতে, মেলোড্রামায়, কমেডি অব ম্যানার্স-এ, কাব্যনাট্যে —সাজিয়ে-গুছিয়ে অতিরঞ্জিত করে সংলাপ তৈরি করা হত বা হয়। তা চরিত্র ও ঘটনার ভিতরটাকে সোজাসুজি আলোকিত করে, তার নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রত্যক্ষভাবে বাইরে এনে নাটকীয় মুহূর্তকে তীব্রতা ও শক্তি দেয়। পরে গত শতাব্দীর শেষভাগে ন্যাচারালিজ্‌ম বা স্বভাববাদের অভ্যুদয়ে 'স্বাভাবিক' বা ন্যাচারালিস্টিক সংলাপের যুগ এল। তখন সাজানো বা বানানো, খানিকটা কৃত্রিম, সংলাপের চেয়ে স্বাভাবিক কথ্য সংলাপকে গ্রহণ করা হল। যে-ধরনের কথাবার্তা আমরা রোজ ঘরোয়াভাবে বলে থাকি মূলত তারই উপর ভিত্তি করে তৈরি হল ন্যাচারালিস্টিক সংলাপ—যার প্রয়াস আছে ইবসেন, বার্নার্ড শ-এ, কিন্তু পরিণতি নেই, তা হয়তো আছে চেকফে। নাটকের ঘটনা ও পাত্রপাত্রী চেনা জগতের হলেই যে সংলাপও চেনা রীতির হবে বা স্বাভাবিক কথ্যভাষার হবে এমন প্রত্যাশা করা ঠিক

নয়। কারণ স্টুর্ম উন্ট্ ড্রাংক বা 'ঝঞ্ঝাবাত্যা' রীতির জার্মান নাট্যকার শিলার-এর 'প্রেম ও ষড়যন্ত্র' নামক নাটকটিতে পাত্রপাত্রীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হলেও তাদের কথাবার্তা মারাত্মক রকমের আলঙ্কারিক ও আতিশয্য-পূর্ণ। অনেকটা 'নীলদর্পণ'-এর ভদ্রলোক চরিত্রদের সংলাপের মতো। এমন কী ন্যাচারালিস্ট নাটকের সংলাপও অনেক সময় এরকম অস্বাভাবিক হয়। এমিল জোলার যে 'তেরেসে রাক্যাঁ' নাটকটি দিয়ে নাটকে স্বভাববাদের সূত্রপাত, তারও সংলাপ ছিল বেশ আতিশয্যদুষ্ট এবং বক্তৃতাধর্মী।

বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোদো' থেকে যে 'অ্যান্টি প্লে'-র যুগ শুরু হল, তার সংলাপও হয়ে উঠল 'অ্যান্টি ডায়লগ'। আমরা দেখছি, উপরে শ্রীমতী স্মিথের সংলাপও নেহাৎ সময় কাটানোর জন্যে কথা বলা।

খ. সংলাপ উদ্ভট ও পরস্পর বিরোধী এবং সেই সঙ্গে নিরর্থক তথ্য জানানো হচ্ছে, অর্থহীন শব্দও ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানেই আধুনিক সংলাপের ব্যাবেল চরিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। টাওয়ার অফ ব্যাবেল-এর ঘটনার পর ইহুদিরা আর কেউ কারো কথা বুঝতে পারত না, প্রত্যেকে ইয়েহোবার অভিশাপে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কথা বলতে শুরু করল—ওল্ড টেস্টামেণ্টের এই অনুষঙ্গ স্মরণ করে লু ক্রদের নামে এক সমালোচক পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ফরাসি থিয়েটারকে বলেছেন, 'লে তিয়েৎর্ দ্য বাবেল'। এই থিয়েটারে চরিত্ররা নিজেরাই নিজেদের কথা বুঝতে পারে না, বা বোঝাতে চায় না পরস্পরকে। তেমনই দর্শকের কাছেও বক্তব্য স্পষ্ট চেনা চেহারায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নাট্যকার নেন না। ইয়োনেস্কোর 'স্যালিউটেশন্‌স' নাটক থেকে উদাহরণ দিই। প্রথম ও দ্বিতীয় ভদ্রলোকের সাধারণ ভদ্রতাসূচক 'কেমন আছেন'-এর জবাবে তৃতীয় ভদ্রলোক বলছেন :

3rd Gentleman :

> Getting on......adoloscently, arthritically, asteroidically, astrolabically, atrabiliously, balalaikaly, basballically, barometrically, bisextically, cacophonically, callipygically, caniculishly, cantileverishly

ইত্যাদি।

এ শেরিডান-এর 'দ্য রাইভ্যাল্‌স' নাটকের শ্রীমতী ম্যালাপ্রপ-এর ব্যবহৃত

'ম্যালাপ্রপিজ্‌ম' নয়, ভুল শব্দটির ভুল অর্থে প্রয়োগ নয়। এগুলি নাট্যকার সচেতন ভাবেই তৃতীয় ভদ্রলোকের মুখে বসিয়েছেন। চরিত্রটি নিজের বিদ্যে জাহির করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে না। সে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কথাগুলি আউড়ে যাচ্ছে, কিছু একটা বলার ইচ্ছে নিয়ে। কিন্তু শব্দ জোগাড়ে সে যেমন পটু, শব্দ শাসনে তার তত দক্ষতা নেই। উত্তরের অসাধারণ যান্ত্রিকতা তার এই শব্দ প্রপাতের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে সন্দেহ নেই।

নিরর্থক তথ্য জানানো হচ্ছে এমন হেঁয়ালি জাতীয় সংলাপের উদাহরণও বহুবার পাই।

এখানে ইয়োনেস্কোর 'জ্যাক অব দ্য সাবমিশন' নাটকে জ্যাক এক জায়গায় বলছে, "যখন আমার জন্ম হল তখন আমার প্রায় চোদ্দ বছর বয়েস। তাই ব্যাপারটা কী ঘটছে আমি অনেকের চেয়েই বেশ সহজে বুঝে ফেলতে পারতুম।" আরেক জায়গায়:

রবার্ট ২ ॥ ওটা কী, তোমার মাথায়?

জ্যাক ॥ বলো তো কী? এটা এক ধরনের বেড়ালছানা। ভোর বেলায় ওটা মাথায় পরেছি।

রবার্ট ২ ॥ এটা কি বিলাসভবন?

জ্যাক ॥ সারাদিন এটা আমি মাথায় রাখি। খাবার টেবিল, বৈঠকখানায়, কোথাও এটাকে নামাই নে। লোককে দিয়েই দিই কখনো।

রবার্ট ২ ॥ এটা কি ব্যাঘ্র? নাকি বৃশ্চিক?

জ্যাক ॥ এটা থাবা দিয়ে মারে, কিন্তু মাটি চষতে পারে।

রবার্ট ২ ॥ না কি এটা বজ্রবাণ?

[ভাবানুবাদ]

গ. সংলাপে কোনো চরিত্র নিজের কথা প্রায় কিছুই বলছে না, অন্য একজনের কথার প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছে প্রায় অবিকল ভাবে কিংবা দুজন প্রায় একই কথা বলছে।

ইয়োনেস্কোরই 'দ্য নিউ টেনান্ট', নাটকের শেষ দিকে ফার্নিচার বাহকরা দু জনে প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করছে। প্রথম জন 'আ হা' বলছে তো দ্বিতীয় জনও তাই বলে উঠছে 'আ হা', একজন বলছে 'আ ইয়েস',

তো অন্যজনও বলছে 'আ ইয়েস'। এটা বেশিক্ষণ চলছে না, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে দুজনের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে এক ধরনের সীমাবদ্ধ কোরাস তৈরি করা হচ্ছে।

ঘ. সংলাপে টেলিগ্রামের বাক্যের ধরনে বাক্যের দৈর্ঘ্য ছোটো করা হচ্ছে।

বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোদো' নাটকেই ব্লাদিমির ও এস্ত্রাগঁ-র সংলাপে এর অজস্র উদাহরণ আছে। তেমনই আছে তাঁর 'এণ্ডগেম'-এ। ইয়োনেস্কো-র 'স্যালিউটেশনস' নাটকটিও এদিক থেকে খুব উল্লেখযোগ্য। মার্কিনি নাট্যকার এডোয়ার্ড অলবি-র 'দ্য স্যাণ্ডবক্স' নামে ছোট্ট নাটকটিতে 'মমি' চরিত্রটি ছাড়া বাকি তিনজনেই (ড্যাডি, গ্র্যাম্পা এবং যুবক) খুব অল্প কথা বলেছে, যদিও দু-এক জায়গায় গ্র্যাম্পা-র সংলাপ ছ-সাতটি বাক্যেও পৌঁছেছে। ইয়োনেস্কোরই 'ইমপ্রভাইজেশান'-এ বার্তোলোমিউ নামধারী চরিত্ররা অনেক জায়গায় অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত বাক্যে কথা বলছে :

বার্তো ৩ : [ইয়োনেস্কোকে] বড্ড চুপচাপ যে ?
ইয়ো : আমি···আমি···আমি···যাতে আপনারা···
বার্তো ২ : চুপ !
বার্তো ৩ : কিছু বলুন না।
বার্তো ১ ও ২ : বলুন···
বার্তো ৩ : চুপ !
ইয়ো : আমি···আমি···
বার্তো ২ : আমাদের কথা মানছেন তো ?

ইয়োনেস্কো-র 'দ্য বলড প্রিমা ডনা'তে আরো মজার জিনিস ঘটছে, সেখানে একটি বাক্যকে দুটি চরিত্র টুকরো করে বলছে, কখনো একটি শব্দকেও দুভাগে ভেঙে বলছে তারা :

Mr. Smith : It's !
Mrs. Martin : not !
Mr. Martin : that !
Mrs. Smith : way !
Mr. Smith : It's !
Mrs. Martin : O !

Mr. Martin : Ver !

Mr. Snith : Here !

ঙ. অর্থহীন ধ্বনির প্যাটার্ন ; সংলাপ শব্দার্থময় প্রণালীবদ্ধ ভাষা থেকে সরে আসছে।

ইয়োনেস্কোরই 'দ্য চেয়ার্স' নাটকের 'ওরেটর' বা বক্তার সংলাপের উল্লেখ এর আগে করেছি। তাছাড়া ঐ 'দ্য বল্ড প্রিমা ডনা' থেকে এ ধরনের সংলাপ বেশ খানিকটা তোলা যায়—আমরা কেবল নমুনা দিচ্ছি :

M.B. Smith : A, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. i !

M.B. Martin : B, c, d, f, g, l, m, n, p, r, s, t, v, w, x, z !

চ. নৈঃশব্দ্যের আংশিক ব্যবহার : অনেক চরিত্র অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে না, কদাচিৎ মুখ খুলছে।

বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোদো'র লাকি চরিত্রটির কথা সকলের আগে মনে আসে। ইয়োনেস্কো-র 'জ্যাক অব দ্য সাবমিশন'-এর 'জ্যাক'কেও মনে পড়ে। প্রাচীন পিরানদেল্লো-র একটি একাঙ্কেও দুটি চরিত্রের একটিই শুধু কথা বলছে, আরেকটি চুপচাপ বসে আছে—তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু সেখানে ব্যাপারটা নাটকীয় কৌশল মাত্র, এখানে এই কায়দাগুলি ভাষা সম্বন্ধে নাট্যকারদের একটা বিশেষ মনোভঙ্গি থেকে জাত।

ছ. নৈঃশব্দ্যের সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার, মাইম রচনা।

বেকেট-এর দুটি Act without word-এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এগুলিতেই বিশুদ্ধ অভিনয় ও দর্শকের দর্শনের উপর নির্ভর করা হচ্ছে, কথাকে মঞ্চের বাইরে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে।

৬.

আমরা এমন বলি না যে, কথার ক্রমিক অবমূল্যায়ন প্রতি ক্ষেত্রেই খুব ভেবেচিন্তে করা হয়েছে, কিংবা আধুনিক নাট্যকারেরা এইভাবে ধাপে ধাপে কথার অতীত কৌশলগুলিতে চলে যাবেন। নাটকে কথার ব্যবহার কোনো দিনই বন্ধ হবে না, এবং অধিকাংশ নাট্যকার সংলাপকে ভাব-বিনিময় বা কমিউনিকেশানের জন্যেই ব্যবহার করবেন। কথা সেখানে প্রকাশ করবে,

গোপন করবে না, বা বিভ্রান্ত করবে না শ্রোতাকে। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে—বেকেট, ইয়োনেস্কো, আদামভ প্রভৃতির নাটকে বিশেষ করে—ভাষার প্রতি এই যে আংশিক বিশ্বাসহীনতা—এর মূল আছে পৃথিবীর যুদ্ধোত্তর সংকটে ইয়োরোপের মূল্যবোধের ধ্বংসে। জর্জ অরওয়েল-এর রূপকটি এইখানেই বিশেষ সমাজব্যবস্থার প্রতি অন্ধ আক্রমণের দৃষ্টান্ত ছাড়াও ইয়োরোপেরই সংস্কৃতির গভীর অসুখের খবর দেয়। তাঁর যে 'Doublespeak'—সেই বিচিত্র ভাষার ব্যবহার চলে বহু অকমিউনিস্ট দেশেও। রাষ্ট্রনায়কদের কূটনীতির ভাষা Doublespeak-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয় তা কে বলবে? ফলে ভাষা যে কাচ, তা আর স্বচ্ছ নেই, তা আর উপায় নয়, তা হয়ে উঠেছে লক্ষ্য। সার্ত্র সম্বন্ধে লেখা বইটিতে শ্রীমতী আইরিস মারডক বলছেন, "we can no longer take language for granted as a medium of communication. It's transparency has gone. We are like people who for a long time looked out of a window without noticing the glass—and then one day began to notice this too"[১১] জানালার ওই কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে, এখন তার মধ্য দিয়ে ভিতর-বাহির দেখা খুব মুশকিলের কাজ। কাচও নিজে বলছে, 'আমাকেও লক্ষ করো'। কিন্তু সে স্পষ্ট নয়, সে কেবল যা বলে না সেইটেই সে বলে, যা লুকোয় সেইটে সে প্রকাশ করে। আর যখন ভাষাকে বিতাড়িত করা হচ্ছে মঞ্চ থেকে, তখন অভিব্যক্তির দায় গিয়ে পড়ছে নাটকের অন্যান্য অংশের উপর। সার্ত্র নিজেও এই crisis of language সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, তাঁর *Nausea*-তে, বলছেন, "Things are divorced from their names...I am in the midst of things, nameles things."[১২]

একথা আমরা দর্শনের দিক থেকে বিশ্বাস করি না, যেমন অ্যাবসার্ড নাটকের মূল্যবোধে বিশ্বাস করি না আমরা, কিন্তু ভাষার এই নিরর্থীকরণকে মানুষের ভাবনার ইতিহাসে নথিবদ্ধ করে রাখতে হবে নিশ্চয়ই।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. Lowdon, John Howard, 1960, *Theory and Technique of Playwrighting*, New York, Hill & Wang, P. 291

২. ওই, P. 293

৩. 'রক্তকরবী', দ্র. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ষষ্ঠ খণ্ড, ৬৮৫ পৃ.

৪. Bentley, Eric, 1970, *The Life of Drama*, New York, Atheneum, PP. 70-101

৫. ওই, P. 93

৬. ওই, P. 98

৭. 'বাদল সরকারের স্বনির্বাচিত নাট্যগুচ্ছ', ১৩৮৪, অপেরা প্রকাশিত, ১৪২-৪৩ পৃ.

৮. এই পরিভাষাগুলি আমি অন্য একটি জায়গায় ব্যবহার করেছি। দ্র. "সুকুমার রায়ের নাট্যপ্রকরণ", মৎ সম্পাদিত 'সুকুমার পরিক্রমা', ১৯৮৯, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০-২৩১ পৃ:

৯. পূর্বোল্লেখ, P. 76

১০. ওই, P. 100

১১. Murdoch, Iris, 1953, *Sartre*, New Haven. Yale University Press, P. 27

১২. দ্র. Lloyd Alexander-এর অনুবাদ, 1957, New York, New Direction Books, P. 169

নাটকে উপভাষার ব্যবহার

১.

একটি ভাষার সর্বমান্য উপভাষা বা স্ট্যাণ্ডার্ড ডায়ালেক্‌ট দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠে। লিখিত সাহিত্য এই মান্য উপভাষা গড়ে ওঠবার একটি বড় উপায়। লেখা পুথি অবলম্বন করে গায়েন নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে গান গায়, সে পুথির নকল হয়, লেখাটিতে সাহিত্যগুণ বা অন্য কোনো আবেদন থাকলে তা নানা অঞ্চলের পাঠক বা শ্রোতাদের কাছে ছড়িয়ে যায়, ফলে তার ভাষাও আঞ্চলিকতা উত্তীর্ণ হয়ে একটি ব্যাপক সর্বজনগ্রাহ্য রূপ লাভ করে। ভাষার লিখিত রূপ প্রবর্তনের আগে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় না তা নয়, কিন্তু লিখিত হলে তা ত্বরান্বিত হয়। মৌখিক (oral) সাহিত্যে আঞ্চলিকতার ছাপ এইজন্য অনেক বেশি থাকে। মৌখিক সাহিত্য সাধারণভাবে রচয়িতার নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেই ভাষা বা উপভাষায় তা রচিত হয় যে ভাষা-উপভাষা অব্যবহিত প্রতিবেশের শ্রোতারা বুঝতে পারে। অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে মৌখিক সাহিত্য ততটা আত্মসচেতন নয়, তাতে কবি বা লেখকের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ ভাষাটিরই ব্যবহার ঘটে। কিন্তু লিখিত সাহিত্য আত্মসচেতন, সেখানে নিজের সংকীর্ণ ভাষা বা উপভাষা-গোষ্ঠীর বাইরে পৌঁছোবার অভিপ্রায় কবি-লেখকদের থাকে, তাই তাঁরা নিজের উপভাষাটিকে প্রত্যাহার করে সর্বজন-বোধ্য ও বহুল-প্রচলিত অন্য কোনো উপভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এমন ঘটনা বারবার ঘটতে দেখা গেছে। চট্টগ্রামের কবি সর্ববঙ্গীয় কাব্যভাষায় কাব্যরচনা করেছেন, বরিশালের কবির রচনা বর্ধমানের কবির রচনা থেকে লিখিত ভাষায় কোনো বৃহৎ দূরত্ব তৈরি করেনি, তাঁদের মুখের ভাষার ব্যবধান যত বড়ই হোক।

মুদ্রাযন্ত্র এসে ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশনের কাজকে আরো দ্রুততা দিয়েছে। ছাপা বই সহস্র লোকের হাতে, দেশের দূর দূর প্রত্যন্তে পৌঁছে যাবে—তাদের সকলের মুখের ভাষা একরকম নয়। ফলে ছাপা বই আরো ব্যগ্রভাবে বেছে

নেবে সেই উপভাষাটিকে যা সকলে মোটামুটি স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারে। সাধারণ-ভাবে রাজধানী, প্রধান বাণিজ্য-শহর বা সংস্কৃতি কেন্দ্রের যে ভাষা, নানা অঞ্চলের বহু উপভাষার মানুষের নানা কাজে এক জায়গায় মিলিত হওয়ার যে-ভাষা, তাই হয়ে ওঠে স্ট্যাণ্ডার্ড। মুদ্রাযন্ত্রের আগেই তার অল্পবিস্তর মান্যতা তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র এসে তাকে স্থায়ী ও বদ্ধমূল করে দেয়। ফলে মুদ্রিত সাহিত্য সাধারণভাবে মান্য ভাষাতেই লিখিত হয়, উপভাষা তার বাহন হতে পারে না। যখন স্থানিক বা ব্যক্তিগত গর্ববোধ ও ভাষাপ্রেম থেকে উপভাষায় সাহিত্য-রচনা করাও হয়, তার ক্ষেত্রে এই অসুবিধাগুলির কথা ভেবে নিতে হবে : এক, তা সমস্ত অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারবে না, অনেক কথাই শ্রোতার কাছে নিরর্থক ঠেকবে। তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটকে রংপুরের চাষীর ভাষা যেমন সাধারণ বাঙালি দর্শকের বোধগম্য হয়নি। দুই, উপভাষার লিখিত রূপ থেকে অর্থোদ্ধারের অসুবিধা ছাড়াও তার কথ্যস্বভাব উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি আমরা সেই উপভাষাটি না জানি তাহলে অন্তত নাটকে সেই উপভাষাটির মৌখিক ধরনটি আনা কোনো অভিনেতার পক্ষে সম্ভব নয়, তাকে তখন লিখিত ভাষার বহির্বর্তী সাহায্যের সন্ধান করতে হয়, সেই উপভাষার বক্তা বা রেকর্ডের শরণ নিতে হয়। তিন, সে উপভাষার নিজস্ব শব্দাবলির মধ্যে কিছু যদি শ্রোতার নিজের উপভাষায় চালু না থাকে, যেমন ঢাকা অঞ্চলে 'থুতু' অর্থে প্রচলিত 'ছ্যাপ', কিংবা বাঁকুড়া অঞ্চলে 'কুমড়ো'র প্রতিশব্দ 'ডিংলা' কিংবা নোয়াখালি অঞ্চলে 'গামলা' অর্থে 'হিমা' কথাটির ব্যবহার (মঞ্চে বস্তু বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেখালেও) প্রায়ই অন্য অঞ্চলের শ্রোতা বা পাঠককে ধাঁধায় ফেলে।

২.

ছাপা বইয়ের চেয়ে অভিনীত নাটকে এই সমস্যাগুলি আরো প্রকট। তার কারণ, মুদ্রিত পাঠ্য ধীরে-সুস্থে পড়া যায়, প্রয়োজন হলে অভিধান উলটে বা বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যায়, অনেক সময় লেখকও টীকায় বা 'গ্লসারি'তে শব্দের অর্থ দিয়ে দেন। সেখানে যিনি শুধুই পাঠক, তাঁর উপভাষার মূল উচ্চারণ শোনবারও দরকার নেই। কিন্তু নাটকে, অর্থাৎ অভিনীত বা অভিনয়যোগ্য নাটকের অসুবিধা সহজেই অনুমান করতে পারি। মঞ্চে অভিনেতারা কথা বলে যাচ্ছে, সে কথাগুলি বাতাসে কম্পন তৈরি করে শ্রোতার

কানে এসেই পরমুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে শ্রোতা যদি তার অর্থ বুঝতে পারল তো পারল, নইলে সে-অর্থ তার নাগালের বাইরেই থেকে গেল। ফলে বার্নস, টেনিসন বা উইলিয়াম বার্নেস (১৮০১-১৮৮৬)-এর উপভাষায় রচিত কবিতা পাঠ্য হিসেবে আমরা কষ্ট করে বুঝতে পারি বা তার রসও পাই, কিংবা ওয়ালটার স্কটের উপন্যাসের কোনো স্কটিশ উপভাষা—কিন্তু আবার ওই স্কটিশ উপভাষাতেই, ধরা যাক গ্লাসগো স্কটিশে, যখন কোনো ব্যালাড জাতীয় গান শুনি, তখন শুধু ভারতীয় ইংরেজি-নবিশরা কেন, খাস ইংরেজরাও অসহায়বোধ করি। অর্থাৎ উপভাষা যখন উচ্চারিত হয়ে, পারফরম্যানস হিসেবে আমাদের কাছে আসে, তখন তার বোধগম্যতার বাধা অনেক বেশি। নাট্যকারকে এই কথাটাই বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হয় বলে কবিতায় বা উপন্যাসের সংলাপে উপভাষার ব্যবহার যত ব্যাপক হয়েছে নাটকে তত হয়েছে কি না সন্দেহ। নাটক সাধারণভাবে অভিনীত হবে রাজধানী বা প্রধান শহরের নাটমঞ্চে, সেখানকার দর্শক-শ্রোতা যে ভাষা বোঝে নাটককে সেই ভাষার মুখাপেক্ষী থাকতে হবে।

এইখানে নাটকের একটি নিজস্ব সংকটও তৈরি হয়। এ সংকট অন্যান্য মুদ্রিত বা লিখিত রচনার নেই। নাটকের পাত্রপাত্রীদের পরিচয় সুনির্দিষ্ট দেশকালের মধ্যে ধরা, তাদের 'name'-এর চেয়েও 'local habitation'-টা বেশি মূল্যবান। রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তাদের দেখতে গেলে তাদের যথার্থ ভূগোল ও ভাষা তৈরি করে দিতেই হবে। এবং নাট্যকার সবসময় রাজধানী অঞ্চলের চেনা ও মান্য ও সর্বজনবোধ্য ভাষার মানুষদের নিয়েই নাটক লিখবেন—এই প্রত্যাশা নাট্যকারের স্বাধীনতা এবং নাট্যসাহিত্যের বিবর্ধন—দুদিক থেকেই বিপজ্জনক। বিশাল ভাষা-অঞ্চলের নানান প্রান্তে বিচিত্র মানুষের জীবন, তাদের অস্তিত্বের নানা জটিল মাত্র', সমস্যা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, আন্দোলন ইত্যাদি সচেতন নাট্যকারের নাটকে প্রকাশ পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। নাট্যকার মান্য ভাষায় নাট্যরচনার লোভে এদের প্রতি উদাসীন থাকবেন, কিংবা মহানগরীর শিষ্ট মান্য ভাষা এদের মুখে বসিয়ে এদের ধোপদুরস্ত ও নিষ্প্রাণ করে হাজির করবেন মঞ্চে—এমন দাবি করা যায় না। বস্তুতপক্ষে বার্নার্ড শ'র 'পিগ্‌মেলিয়ন' নাটকে যেন এরই সূত্র দেওয়া হয়েছে ইঙ্গিতে—উপভাষা বদলের সঙ্গে চরিত্রও বদলে গেল ইলাইজার। এর আগেই জেনেছি যে, পাঠ্য গল্প-উপন্যাসে কবিতায় কিছু সুবিধে আছে; গল্প-উপন্যাসে সুবিধে আরও বেশি যে, এর সংলাপ অংশে উপভাষার প্রয়োগ অনিবার্য হলেও বর্ণনা অংশ মূলত

মান্য ভাষায় লেখা থাকে, ফলে অধিকাংশ পাঠক স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যান। কিন্তু নাট্যকারের অস্ত্র শুধু সংলাপ। বর্ণনার সুযোগ বা অধিকার তাঁর নেই—ওই তাৎক্ষণিক সংলাপেই তাঁর চরিত্রগুলি বেঁচে থাকে। ফলে নাটকের দর্শক-শ্রোতা বর্ণনা বা টীকাভাষ্য-অভিধান কোনো কিছুরই সহায়তা পান না। চরিত্রগুলিকে জ্যান্ত মানুষ করে তোলার জন্য তাদের সংলাপে নাট্যকারকে উপভাষার (বা অন্য ভাষার) প্রয়োগ করতেই হয় কপাল ঠুকে। দর্শকেরা সে ভাষা অল্পবিস্তর বুঝতে পারবে—এই আশা পোষণ করা ছাড়া নাট্যকারের আর কোনো উপায় নেই। একদিকে মৃত্তিকাময় প্রতিবেশের সত্য তাঁকে রক্ষা করতে হবে, অন্যদিকে দর্শকের কাছে সে সত্যকে পৌঁছেও দিতে হবে। ভাষার কমিউনিকেশনের রূপ ও বস্তুর মধ্যে, অর্থাৎ ফর্ম ও কনটেন্টের মধ্যে দর্শকের বোধগ্রহণে অসামর্থ্য একটা বিরোধ বা ব্যবধান তৈরি করলে নাট্যকারের আর কিছু করার থাকে না। নাট্যকারের কাছে উপভাষার ওই সংলাপে ফর্ম ও কনটেন্ট অভিন্ন ও অব্যবহিত, কিন্তু দর্শক ফর্মটিকে পৃথক করে তার বস্তু বা অর্থকে গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর পক্ষে ফর্মটিই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের মতো নাট্যকার দর্শককে কোনো পার্শ্বিক সাহায্য এগিয়ে দিতে পারেন না।

এই সংকট থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি পথ জাপানের নাটমঞ্চ খুঁজে পেয়েছে, কয়েক বছর আগে তা লক্ষ করেছিলাম। জাপানের কাবুকি নাটকে পুরনো জাপানি ভাষা আধুনিক দর্শকদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ায় টিকিট কাউণ্টারেই ছোট ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার ভাড়া দেওয়া হয়। তাতে কাবুকির সংলাপের আধুনিক জাপানি রূপ ক্যাসেটে রেকর্ড করা থাকে। দর্শক সেটি নিয়ে সিটে বসে কানে প্লাগ গুঁজে দিয়ে যথাসময়ে প্লেয়ারটি চালিয়ে দেয়। ফলে চোখে সে পুরনো জাপানি ভাষায় জমকালো কাবুকির অভিনয় দেখে, আর কানে সে আধুনিক জাপানি ভাষার সংলাপ শোনে। এই শ্রুতিগত 'ডাবিং' পদ্ধতি ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে কখনো চালু হবে কি না জানি না, হলেও তা সবক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয় না। জাপানি ওই পদ্ধতির মধ্যে চাতুর্য ও বাণিজ্যিক সুবুদ্ধি অসামান্য, কিন্তু শিল্পকলার পুরো সম্মান তাতে বজায় থাকে কি না সন্দেহ। উপভাষা শুধু অর্থ বা কনটেন্ট-সর্বস্ব নয় যে, তার অর্থটুকু যেমন-তেমন করে ধরতে পারলেই হল, এবং তার রূপটুকু অগ্রাহ্য করলেই চলে। উপভাষা একটি চরিত্রের ব্যক্তিগত প্রতীক, তার মাটি,

গৃহস্থালি ও সমাজগোষ্ঠীর নির্ভুল চিহ্ন। তাকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করলে সেই চরিত্রটির একটা বড় অংশকে বর্জন করতে হয়, কেবল তার একটা খণ্ড অস্তিত্বই আমাদের সামনে চলাফেরা করতে থাকে। অবশ্য কাবুকির ওই কৌশলের পক্ষ নিয়ে এটা বলা দরকার যে, তারা পুরোনো (এবং কাবুকির বিশেষ সুর-করা উচ্চারণে সে ভাষা আরো অস্পষ্ট শোনায়) ভাষাকেই আধুনিক চেহারা দেয় ক্যাসেটে—অন্য কালের ভাষাকে এ কালের কাছে সুবোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে। অন্য অঞ্চলের ভাষাকে এভাবে কোনো নাটকে ক্যাসেট-অনুবাদে প্রচার করা হচ্ছে বলে শুনিনি।

৩.

যাই হোক, অসুবিধা সত্ত্বেও নাটকে উপভাষার যথেষ্টই ব্যবহার হয়ে থাকে। পুরো উপভাষায় রচিত নাটকও বেশ কিছু রচিত হয়েছে, তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' ছাড়াও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলি থেকে শুরু করে শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' (এর ভাষা ঠিক আঞ্চলিক উপভাষা নয়, বরং আঞ্চলিকতার রঙ্-ছোঁয়ানো একটি কাব্যিক উপভাষা।) কিংবা মনোজ মিত্রের 'চাক-ভাঙা মধু' ও 'সাজানো বাগান' ইত্যাদির কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসে।

সেটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। ম্যাক্সমূলার যে বলেছিলেন উপভাষাই আসলে জ্যান্ত ভাষা—সে কথাটা মিথ্যে নয়, কাজেই দেশকালবদ্ধ জীবন দেখাতে গেলে নাট্যকারকে চরিত্রের মুখে উপভাষা বসাতেই হবে।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতে অবশ্য যে রীতি মানা হত তা নিছক প্রথা বা কনভেনশন। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা বা বিদূষক শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলবে, জেলে গাঁটকাটা জুয়াড়ি গাড়োয়ান মাগধী প্রাকৃতে, গানগুলি রচিত হবে মাহারাষ্ট্রী প্রকৃতে—এই নিয়ম কে কিসের তাগিদে আরম্ভ করেছিলেন জানি না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অনুকরণমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। নইলে তৃতীয় (?) শতাব্দীর ভাস থেকে একাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণ মিশ্র পর্যন্ত একই অবস্থা চলতে পারে না নাটকের ভাষার ক্ষেত্রে। বস্তুতপক্ষে প্রথম শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সংস্কৃতের মৌখিক রূপটিও আর মুখের ভাষা নেই, প্রাকৃত ভাষা হয়েছে মুখের ভাষা। একেবারে আদি পর্যায়ে তারই একটি মান্য রূপ, পালি, গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক ধর্মোপদেশনায় ব্যবহৃত

হয়েছে। তিনি এই কাজে লোকবচন বা উপভাষার অগ্রাধিকার স্বীকার করেছিলেন। পরে সম্রাট অশোক আদি স্তরের প্রাকৃত ভাষায় বুদ্ধবচনকে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ করে রাখেন এবং তার মূল ভাষাটি প্রাকৃত হলেও অঞ্চলভেদে তার যে অল্পবিস্তর রূপগত বিভিন্নতা—তাও রক্ষা করেন। এ সমস্তই লোকভাষাকে মান্য করে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের মূল বাণীগুলি পৌছে দেওয়ার ইচ্ছায় করা। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের দর্শক যদি-বা প্রাকৃতভাষী ছিল বলে ধরেও নিই, তবু বিশেষ অভিনয়ের দর্শকেরা নিশ্চয়ই একটিমাত্র ভাষাই বলত সাধারণভাবে। সেক্ষেত্রে নাটকে কোনো-কোনো চরিত্র সংস্কৃত বলছে, কেউ কেউ শৌরসেনী প্রাকৃত, কেউ বা মাগধী, কখনো দু-একজন বা পৈশাচী প্রাকৃত—এ ব্যাপারটা কেমন লাগত? মনে রাখতে হবে—এ রীতি দর্শকের মুখ চেয়ে তৈরি হয়নি, দর্শককে ঘনিষ্ঠতর সম্ভাষণের তাগিদে এর জন্ম নয়। এবং এ ব্যাপারটি স্বাভাবিকও নয় যে, একধরনের চরিত্র সবসময় একই ভাষায় কথা বলবে। জুয়াড়ি গাড়োয়ান ইত্যাদি অন্য অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষায় খুঁজলে পাওয়া যাবে না—এও তো অদ্ভুত কথা। কাজেই শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একটা সাহিত্যিক বা নাট্যিক রীতি বা প্রথা, বা অভ্যস্ত কনভেন্‌শন হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেখানে উপভাষার প্রয়োগ স্বাভাবিক থাকেনি, মূল উৎসেও তা স্বাভাবিক ছিল না। সেখানে চরিত্রের শ্রেণীগত ভিন্নতা নির্দেশের একটা কৃত্রিম উপায় ছিল ওই উপভাষা ব্যবহার, তার বেশি কিছু নয়।

জীবনের প্রতিফলন নয়, কেবল চরিত্রের ভিন্নতা বা সামাজিক দূরত্ব নির্দেশ যখন নাট্যকারের মূল বিবেচনা হয়ে ওঠে তখন যে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, তার আংশিক প্রমাণ পাই দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে। 'নীলদর্পণ' নাটক জীবনধর্মী নয় এমন কথা যেন কেউ না ভাবেন, আমাদের আগের বাক্যটির উদ্দেশ্য তা নয়। দীনবন্ধুর সমস্যা ছিল, তাঁর আদুরী, তোরাপ, রাইচরণ ও অন্যান্য চাষী ও ছোটখাটো চরিত্র যে-ভাষায় কথা বলে, তা যতই জীবন্ত ও স্বাভাবিক হোক তা 'ছোটলোক'দের ভাষা'; তাঁর ভদ্র গৃহস্থ চরিত্রেরা, ওই পরিবারের মেয়েরা এবং বিশেষত তাঁর 'হিরো-হিরোইন'রা সে ভাষায় কথা বলতে পারে না। ফলে তাদের জন্য অন্য ভাষার সন্ধান করতে হবে। কিন্তু সে কোন্ ভাষা হবে? বাঙালি ভদ্র গৃহস্থদেরও নিশ্চয়ই একটা ভাষা ছিল তখন, তার প্রমাণ পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে, এমন-কী

একটু আগে থেকে লেখা নাটক প্রহসনে যথেষ্টই পাই। দীনবন্ধুর মনে হয়েছিল, সে ভাষা যথেষ্ট মার্জিত বা উন্নত নয়, তা তাঁর ওইসব চরিত্রের সঙ্গে সামাজিক, শিক্ষাগত, বা স্বভাবগত দূরত্বের যথেষ্ট চিহ্ন বহন করে না। ফলে তিনি তাদের মুখে এমন এক ভাষা বসালেন, তাতে স্বাভাবিকত্বের কোনো চিহ্নই রইল না। ফলে সৈরিন্ধ্রী যখন বলে, "জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তাতে সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ কর্য়ে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে"—কিংবা বিন্দুমাধব যখন বলে, "আহা মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্রতা কি সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্রতা প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত; শোকশার্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম।" তখন এই মানুষগুলি সাজানো পুতুল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা জানি না ঠিক কেন দীনবন্ধু ভদ্র চরিত্রদের মুখে এই ভাষা বসালেন। হয়তো একটি ভিন্ন আদর্শ ভদ্র ও উন্নত নাট্যিক ভাষা তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, হয়তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন্ত কিন্তু সাধু গদ্যের উপর একটি বাড়তি আলংকারিকতা যোগ করে তিনি এই সংলাপ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন সংস্কৃত কাব্যরীতির প্রভাবে, কিংবা মধুসূদনের নাট্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর 'নীলদর্পণ'-এ ভদ্র চরিত্রের সংলাপ কৃত্রিম ও আড়ষ্টই থেকে গেছে। সম্ভবত উপভাষান্তর থেকে 'দূরত্ব' তৈরির বাসনাই তার মূলে। অন্যত্র, যেমন 'লীলাবতী'তে প্রেমালাপের অংশে তিনি নায়ক-নায়িকার মুখে কবিতাও বসিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে দীনবন্ধুর উপর ইংরেজি সংস্কৃত নাটক-নভেলের প্রভাবের কথাও লিখেছেন।

এ বিষয়টি বিচিত্র মনে হয় এই কারণে যে, সমসাময়িক মনোমোহন বসু তাঁর পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক নায়ক-নায়িকার মুখে এমন আড়ষ্ট ও কৃত্রিম সংলাপ কদাচিৎ বসিয়েছেন। তাঁর 'রামাভিষেক' নাটকে (১৮৬৭) দীনবন্ধুর ধরনে চাষী চরিত্র আছে, তারা চাষীদের সহজ গ্রাম্যভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু তাঁর বশিষ্ঠের ভাষা সমুন্নত অথচ সহজ—"কুলপাবন রামচন্দ্র শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর গাম্ভীর্য, ঔদার্য, ধীরতা, শীলতা ও দয়াদাক্ষিণ্য গুণে বশীভূত না হয়, এমন পাষাণ-হৃদয় কে আছে?" তাঁর রাম যদি-বা কখনো বলে—"সেই বন, সেই পর্বত, সেই নদী, সেই প্রান্তর, সেই মরুদেশ তোমার মরাল গতি-বিশিষ্ট এই কোমল পদকমলের যোগ্য পথ, না সেই তৃণপর্ণ রচিত

কঠোর শয্যা তোমার মলয়জসেবিত এই দেহের বিশ্রামযোগ্য স্থান ?"—তবু অন্যত্র তাকে বলতে শুনি, "ইটী নিশ্চিত জানবেন, আমার বনবাস তাঁর দোষেও নয়, ইটী নিতান্তই নির্বন্ধের কর্ম।" তাঁর কৈকেয়ীও চমৎকার নাট্যধর্মী ভাষায় স্বগতোক্তি করে, "একি সত্য, না স্বপ্ন ? এ যে মনে লাগে—এ যে সব উলটে দেয়। হা স্বপত্ন-দ্বেষ! তুমি কি এত কালে প্রবল হলে—সুযোগ পেলে ? হা ঈর্ষ্যা! তুমি কি শেষে মন্থরা রূপে এলে ?" এর কারণ কি এই যে মনোমোহনের নাটক তথাকথিত 'গীতাভিনয়' হওয়ার জন্য অন্য শ্রেণীর দর্শক-শ্রোতাদের কথা বেশি মনে রেখেছে, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকের মতো মুখ্যত নব্যশিক্ষিত দর্শকদের জন্য রচিত হয়নি ?

৪.

দর্শকবোধের বাধা সত্বেও নাটকে উপভাষার ব্যবহার কেন হয় ? একটা বড় কারণ এই যে, এই বাধাকে আমরা তাত্ত্বিক দিক থেকে যত বড় করেই দেখি না কেন তা এমন কিছু দুরতিক্রম্য নয়। আমরা যে-ভাষাই বলি না কেন, তার উপভাষা সম্বন্ধে আমাদের অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকে। আমরা নিজেরা হয়তো এক উপভাষায় কথা বলি, কিন্তু অন্য উপভাষার রচনার সঙ্গে বা বক্তাদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎকার ঘটে। পল্লির গান শুনি অন্য উপভাষায়, দোকানে বাজারে অন্য উপভাষার লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান হয়, যেমন হয় অন্য ভাষার লোকের সঙ্গে, যাত্রায় নাটকে অন্য উপভাষার চরিত্রের ভাষা শুনে হাসি, ইংরেজি নাটকের মধ্যে স্টক চরিত্র হিসেবে ওয়েলশ্‌ম্যান, স্কচ (বা আমেরিকার নাটকে নিগ্রো বা টেক্সান) চরিত্র দেখেশুনে ওখানকার লোকেরা যেমন হাসে। আমরা নিজেরাও একাধিক উপভাষা প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। এর ফলে আমাদের মধ্যেও গড়ে ওঠে একধরনের ব্যাপক ভাষাপ্রয়োগের অধিকার, যাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যান নাম দিয়েছেন সমাজভাষিক অধিকার বা Sociolinguistic competence। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি নিউ ইয়র্কের এক কল্পিত আমেরিকান ইংরেজিভাষী তরুণ নাগরিকের কথা তুলেছেন, যে হয়তো নোটিসে লেখে Kindly extenguish all illumination prior to vacating the premises," কিন্তু কখনো পার্টির শেষে বন্ধুদের বলে, "I sure hope yuz guys' ll shut the lights before

leavin." শুধু বলা নয়, অন্যের উপভাষা বুঝতেও পারি আমরা, যতটা বলতে পারি তার চেয়ে একটু বেশিই পারি সেটা।

তারও অবশ্য একটা সীমা আছে। উপভাষাগুলোকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা চলে, কেন্দ্রীয় (central) ও প্রান্তিক (peripheral)। এর মূলে কোনো ভৌগোলিক মানদণ্ড নেই। যে উপভাষাটি কালক্রমে স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান্যরূপ পায়, ধ্বনি, গঠন ও শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে তার কাছাকাছি যে-সব উপভাষা, সেগুলিই কেন্দ্রীয়, তার ওই সব দিক থেকে যা বেশি দূরবর্তী, তা প্রান্তিক। প্রান্তিক উপভাষার দুর্বোধ্যতা বেশি, যারা স্ট্যাণ্ডার্ড উপভাষা ব্যবহার করে অন্তত তাদের কাছে। ফলে হুগলীর লোক চট্টগ্রাম বা সিলেটের উপভাষা বুঝতে পারে না। নইলে একটা উপভাষা মিলিয়ে গিয়ে অন্য উপভাষার অঞ্চল কখন কোথায় আরম্ভ হচ্ছে তা বলা সহজ নয়, উপভাষাগুলির ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা (continuity) আছে। ফলে পাশাপাশি উপভাষার লোকেরা পরস্পরের কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা বোধ করে না। কিন্তু ওই কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় উপভাষার মধ্যে বোধগম্যতার তফাত থেকেই যায়। সে তফাত মূলত এক পক্ষের। চট্টগ্রামের মানুষ সাধারণভাবে স্ট্যাণ্ডার্ড উপভাষা সহজেই বুঝতে পারেন, কারণ তার লিখিত রূপ তিনি ব্যবহার করেন, স্কুলে বক্তৃতায় রেডিয়োতে সেই ভাষা তিনি শোনেন। কিন্তু এর উলটোটাই হয় না, অর্থাৎ হুগলীর মানুষের শোনা হয় না চট্টগ্রামের ভাষা। ফলে তাঁর কাছে এ ভাষা অনেকাংশে দুর্বোধ্য থেকে যায়, কারণ ধ্বনিতে শব্দে ব্যাকরণে এ ভাষা তাঁর ভাষার থেকে দূরে অবস্থিত। সেদিক থেকে হয়তো অন্য ভাষা, যেমন হিন্দি, তাঁর কাছে অনেক সুবোধ্য। অর্থাৎ যে উপভাষাগুলি কেন্দ্রীয় বৃত্তের অন্তর্গত সেগুলির পারস্পরিক বোধগম্যতা অল্প নয়। এ কারণে কলকাতার মানুষের পক্ষে নান্দীকারের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহৃত পুরুলিয়ার ভাষা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি, যেমন অসুবিধা হয়নি মনোজ মিত্রের 'চাক-ভাঙা মধু' বা 'সাজানো বাগান'-এর ভাষা, কিংবা দিব্যেশ লাহিড়ী রচিত 'নানা হে'-র ভাষা বুঝতে। এসব নাটকের উপভাষাগুলি বাংলা উপভাষাগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় বৃত্তের অন্তর্গত, সে-বৃত্তের মধ্যেই নানা জায়গায় এদের অবস্থান। কিন্তু রংপুর-কোচবিহারের রাজবংশী ভাষা, কিংবা সিলেট-নোয়াখালি-চট্টগ্রামের উপভাষার স্থান প্রান্তীয় বৃত্তে—অর্থাৎ মান্য উপভাষা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ফলে এসব উপভাষায় নাটক রচিত

হলে বাস্তবতার মাত্রা রক্ষিত হবে, কিন্তু স্বক্ষেত্রের বাইরে তার অভিনয়ে অন্য উপভাষার দর্শক তা সহজে গ্রহণ করতে পারবে না।

৫.

উপভাষী চরিত্র-সৃজনে বাস্তবতার তাগিদ থাকে তা আমরা লক্ষ করেছি। চরিত্র এক-এক ধরনের জীবন-পরিবেশ থেকে এক-এক ধরনের ভাষা নিয়ে মঞ্চে আসে, এবং সেই ভাষাটিকে বাদ দিলে তারাও নির্জীব হয়ে যায়। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য খুবই যথাযথ যে, আতুরীর ভাষা তোরাপের ভাষা বাদ দিলে আতুরীর রসিকতা আর তোরাপের রাগ আর আতুরীর রসিকতা বা তোরাপের রাগ থাকে না। বস্তুতপক্ষে ইতিহাসের সূক্ষ্ম পরম্পরার হিসেব করলে উপভাষা-নির্ভর বাস্তবতা মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯) বা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' থেকেই প্রধানভাবে আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। পরে এই শতাব্দীতে গণনাট্যের নাটক থেকে এই ঔপভাষিক বাস্তবতার ধারাটি আরো অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু এই বাস্তবতার ধারাটি একচ্ছত্র ছিল না। উপভাষা সম্বন্ধে আর একটি জরুরি কথা হল—তা মান্য উপভাষা থেকে ভিন্ন—এটুকুই তার পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। মান্য উপভাষা (তথাকথিত শিষ্ট উপভাষা) ব্যবহার-কারীর মনে, কিংবা অন্য উপভাষা-ভাষীর মনে কোনো নির্দিষ্ট উপভাষা সম্বন্ধে একটি বিশেষ মনোভঙ্গি বা attitude-ও জড়িত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটি অবজ্ঞার বা তুচ্ছতার। ফলে সেই উপভাষা বা উপভাষী মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি করার দীর্ঘ রীতি গড়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীতেই ভিন্নভাষী বা ভিন্ন উপভাষীদের সম্বন্ধে পরিহাস-রসিকতা চলে। এমন-কী উপভাষা থেকেই তার বক্তার সম্বন্ধে একটা কল্পিত বা অবহেলাসূচক ধারণা গড়ে ওঠে।

পরীক্ষা থেকে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। হাওয়ার্ড গিলেস নামক এক গবেষক ১৯৭০ সালে টেপ-করা কিছু কথার নমুনা ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক স্কুলের কিছু ছাত্রছাত্রীকে বাজিয়ে শোনান। যেসব ইংরেজিভাষার (উপভাষার) নমুনা তাতে ছিল তার মধ্যে ছিল ইংরেজির স্ট্যাণ্ডার্ড উপভাষা—যার নাম Received Pronunciation বা বি-বি-সি ইংরেজি ; ছিল আইরিশ, জার্মান ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের লোকেদের বলা ইংরেজি, ছিল সমারসেট ও সাউথ ওয়েল্‌স অঞ্চলের ইংরেজি উপভাষা আর ছিল লণ্ডনের কক্‌নি আর বার্মিংহাম

শহুরের উচ্চারণ। ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করা হল, এই যে এত লোকের এত ধরনের ইংরেজি শুনলে তোমরা, তাতে এর মধ্যে কোন্ বক্তা সম্বন্ধে তোমাদের সবচেয়ে ভালো ধারণা হচ্ছে? কে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র, শিক্ষিত, মার্জিত, সুবক্তা, পরিচ্ছন্নভাষী বলে মনে হল? ছেলেমেয়েরা যে উত্তর দিয়েছিল তার হিসেব কষে দেখা গেল বি-বি-সি ইংরেজির বক্তা সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রম আদায় করেছেন—তাঁকেই এদের সবচেয়ে ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত ও মান্যগণ্য বলে মনে হয়েছে। তার পরেই ভোট বেশি পেয়েছে সমারসেট আর নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের ইংরেজি। কিন্তু কক্‌নি আর চালু শহুরে ইংরেজ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের ধারণা খুবই নিচু। ওসব ভাষা যারা বলে তারা অশিক্ষিত, অমার্জিত, সংস্কৃতিহীন! মজার কথা এই যে, অনেক সময় গবেষকেরা matched guise পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ একই লোককে দিয়ে বিভিন্ন উপভাষা বলান—সে গলার স্বর একটু অদলবদল করে অভিনেতার মতো নানা উচ্চারণে নানা উপভাষা রেকর্ড করে। শ্রোতারা সেটা ধরতে পারে না—ফলে তাদের রায় অল্পবিস্তর একই থাকে। অর্থাৎ যে সব লোক মান্য উপভাষায় কথা বলছে যেসব লোককে তারা ভদ্র, সংস্কৃতিসম্পন্ন ইত্যাদি বলে মেনে নেয়, কিন্তু যারা তা বলছে না (সেই একই লোক) তাদের অশিক্ষিত নির্বোধ এবং গেঁয়ো বলে ধরে নেয়।

অর্থাৎ উপভাষা একটি চরিত্রের টাইপ তৈরি করে দেয়, এবং নাট্যকার তাকে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করেন। এই প্রথাও খুব পুরনো। গ্রিক আরিস্তোফানেস তা করেছেন, শেক্‌সপিয়র তা করেছেন, ইতালীয় লোকনাট্য থেকে শুরু করে মার্কিনি 'পাঞ্চ অ্যাণ্ড জুডি' ধরনের পুতুল নাট্যে তা করা হয়ে থাকে। গত শতাব্দীতে বাংলা প্রহসনে আমেরিকান ফার্স বা বারলেস্ক্‌ ধরনের নাটকের স্টক নিগ্রোর মতোই স্টক বাঙাল (বিশেষত ঢাকা বা বিক্রম-পুরের বাঙাল) চরিত্র এসে দেখা দিয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে (১৮৬৬) রামমাণিক্য তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। কিন্তু অমৃতলাল বসুর 'রাজাবাহাদুর' (১৮৯১) প্রহসনে সে-ই গাণিক্যধন হয়ে দেখা দেয়, গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার'-এ (১৮৮৬) তারই আরেক মূর্তি দাঁড়ায় দালাল দোকড়ি সেন-এ। এমন-কী এই সেদিন, উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) নাটকে পর্যন্ত একটি বাঙালভাষী চরিত্রকে নিয়ে কমিক রিলিফ তৈরি করা হয়েছে, যদিও সে ঠিক রামমাণিক্য বা গাণিক্যধনের টাইপ নয়।

এ নাট্যকারের, বিশেষত প্রহসনকারের, চিরাচরিত অধিকার—এ নিয়ে

সমালোচনা করার কিছু নেই। বিশেষ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা জাতিকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশার, ethnic jokes-এর রেওয়াজ যেমন আছে, তেমনই নাটকে তাদের ব্যবহার করে কমিক রিলিফ তৈরির প্রথা গড়ে উঠেছে। শুধু পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র কেন, বাংলা নাটকে ওড়িশাবাসী, দেহাতী, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বা পুরোহিত, কথায় প্রচুর ইংরেজির মিশেল দেওয়া ইঙ্গ-বঙ্গ সাহেব, মাড়োয়ারি, চীনাম্যান ইত্যাদি সকলেই এভাবে এসেছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কানাকড়ি' (১৮৮৮) নাটকে আছে, ওড়িশাবাসী জগবন্ধু মেসার্স মেকেঞ্জি লায়াল অ্যাণ্ড কোম্পানির নিলাম থেকে নিলামে তোলা 'মাল' হিসেবে এক কানাকড়ি দাম হেঁকে এক ডাক্তারকে কিনে নেয়। হাট থেকে গোরু কিনে যেমন তার খাওয়াদাওয়ার জোগাড় করে চাষী, তেমনি জগবন্ধুও ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে তার কোন্ কোন্ খাবার পছন্দ। ডাক্তার উত্তর দেয়—Bread, meat and wine। তার অর্থোদ্ধার হলে জগবন্ধু কপালে করাঘাত করে বলে ওঠে—"ছি ছি ছি! জগন্নাথ প্রভু এ মোতে কড়ঁ মিলিলে? গুটে মতার! হায় হায়, তিনগুটে কানা কৌড়ি ইমিতি করি মু মিচ্ছামিচ্ছি নাশ করিল!" রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' (১৮৬৬)-এ একটি ইঙ্গবঙ্গ চরিত্র বলে, "হাঁ, এখন আমার হেল্‌থ মচ্ ইমপ্রুব্‌ড বটে কিন্তু অনেকদিন এবার কলিকাতায় টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি, তাতে স্ট্রং ফিল কচ্চি নে। তা ভাই তুমি একটু ওয়েট কর, আমার একটি ফ্রেণ্ড আসবে।" মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', থেকেই ইঙ্গবঙ্গ হাসিঠাট্টার পাত্র হয়ে উঠেছে।

হাস্যকর এইসব উপভাষা-ভাষী চরিত্রের আচরণ ও সংলাপে অতিরঞ্জন বা আতিশয্য আছে, তা বলাই বাহুল্য। এই অতিরঞ্জনের ফলে সে আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়, এবং তার ফলে আমরা নিজেদের তাদের তুলনায় স্বাভাবিক ও উন্নত (সুপিরিয়র) বোধ করি, ফলে আমাদের হাসি পায়। একজন বিদেশী সমালোচক, রোনাল্ড পলসন, একটি নিবন্ধে লিখেছেন যে, "A foreigner is funny, because he is like ourselves, only different. A Scot or an Irishman is funny to the Englishman because he is almost exactly like himself, only slightly different." কিন্তু মনে রাখতে হবে, শুধু difference-এর মাত্রাটি হাসির মূল উৎস নয়। তার সঙ্গে নিজেদের একটু উচ্চতা বা 'সুপিরিয়ারিটি'র বোধও থাকা দরকার। অবশ্য এই উচ্চমন্যতা কল্পিত হওয়াই বেশি সম্ভব। সম্ভবত

মঞ্চের দূরত্ব সমপর্যায়ের দর্শককেও নিজেকে এই উঁচুদরের ভাববার সুযোগ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে যেটা লক্ষ করা যায় তা হল যে, হাস্যকর উপভাষী চরিত্র-গুলি সাধারণভাবে গৌণ চরিত্র, প্রধান চরিত্র নয়। কিন্তু যখনই উপভাষার চরিত্র প্রধান চরিত্র বা নায়ক-নায়িকা হয়ে ওঠে নাটকে উপন্যাসে গল্পে, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে আর কমিক্যাল থাকে না—সে রিয়্যালিজ্‌মের পরোয়ানা নিয়ে সর্বাঙ্গীণ মানুষ হিসেবে নাটকে গৃহীতে হয়।

বলা বাহুল্য, নাটকের মেজাজ বদলায় বলেই উপভাষী চরিত্রের মাত্রাগত বিস্তারও বদলায়। সিরিয়াস নাটকে কমিক রিলিফের জন্য গৌণ চরিত্রের ব্যবহার শেক্‌সপিয়ারের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে, বাংলা নাটকেও তার পুনরাবৃত্তি চলেছে। কিন্তু গণনাট্যেই সাধারণভাবে উপভাষী চরিত্র তার রিয়্যালিজ্‌মের অধিকার এবং নায়কত্বের পূর্ণ দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ফলে গণনাট্যের নাটক থেকে উপভাষার চরিত্রকে আর পরিহাসের পাত্র হতে দেখি না। যেটুকু পরিহাসের সুযোগ নাট্যকার করে নেন, তা পরে সে চরিত্রের সুখদুঃখের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে পুষিয়ে নেন। 'নবান্ন' থেকে এই ধারার সূত্রপাত ঘটেছে। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটক থেকে রহিমের এই সংলাপ উদ্ধার করি :

"মোর মতো মানুষ একটাও কি নাই ঐ উপাসীগুলার দলে? নিশ্চয়ই আছে। তারা লুট করে না খালি একটা কথা ভাবিয়া। বাপ্‌জান কইত—মান আর হুস্ এই দুইটা থাকিলে মানুষ মানুষ হয়। মানুষের মানেটা কি? না তারা পশু নয়। পশুগুলার নিজের ছাড়া কোনয় দায় নাই। কাড়াকাড়ি মারামারি করি খালি নিজের প্যাটটা ভইরলে হইল। মানুষ কাচ্চা-বাচ্চা, বাপ-মাও, ভাই-বইন—পাড়া-পড়শী—ঘর-বাড়ী সব কায়েম রাখতে খাটে, কাম করে। ঐ সব গুলার কথা ভাবিয়া তারা লুট দাঙ্গা কইরবার যায় না।"

উপভাষার এই সংলাপ নিয়ে বা আঞ্চলিক চরিত্র নিয়ে হাস্য-পরিহাসের ইচ্ছেটিকে নাট্যকার পরিত্যাগ করে এসেছেন এখানে, এ সহজেই স্পষ্ট হয়।

৬.

আগেই বলেছি, কেন্দ্রীয় উপভাষার মধ্যে একটি উপভাষাকে বেছে নিলে নাট্যকারের দর্শকের সঙ্গে যোগস্থাপনের সুবিধে হয়, প্রান্তিক উপভাষা বেছে নিলে তা হয় না—তা কেবল সেই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগ তৈরি করতে

পারে। পূর্ব বাংলার ঢাকাই উপভাষায় একটি ছুটি কাব্যনাট্য রচিত হয়েছে, তা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নাটকের অন্তরঙ্গ সংযোগ ঘটায়। আমরা আঞ্চলিক যাত্রাগুলিতেও এই ব্যাপার ঘটতে দেখি, এমন-কী লোকনাট্যেও অঞ্চলবদ্ধতার সূত্রটি মৌলিক। তবু বাস্তবতা এবং জনজীবনের যথার্থ প্রতিফলনের তাগিদে যখন উপভাষী চরিত্র নাটকে আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সেই অঞ্চলের যথার্থ উপভাষাটি তুলে আনা হয়, নাট্যকার তাঁর locale-এর বিশিষ্ট উপভাষাটিকেই গ্রহণ করেন। আবার বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে লক্ষ করি—নাটকের জন্য কয়েকটি সরল উপভাষার টাইপ গড়ে উঠেছে, কিছুটা দোখ্‌নো, কিছুটা পুরুলিয়া-বাঁকুড়া—কিছুটা খুলনা-যশোরের ধাঁচ তৈরি হয়েছে। অপিনিহিতির প্রয়োগ ('বলব'-কে 'বইল্‌ব', 'দেখে'-কে 'দেইখে' বলা), 'জ'-এর ক্ষেত্রে ইংরেজি 'জেড' ধ্বনির উচ্চারণ, 'যাব না' না বলে 'যাবনি' বা 'যাবুনি' ইত্যাদি মিলিয়ে কয়েকটি সরল ছক তৈরি হচ্ছে। একে অন্যের সঙ্গে মিশেও যাচ্ছে। যতক্ষণ তা বিশ্বাসযোগ্য থাকে প্রতিবেশের ক্ষেত্রে, ততক্ষণ তাতে আপত্তি নেই।

উপভাষার প্রয়োগে কাব্যের সম্মোহন সৃষ্টি হতে পারে। আইরিশ নাটকে সিঙ (Synge) ও শন ও'কেসি তা খুব সার্থকভাবেই করেছেন। বাংলায় বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে তার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত আছে। কখনো কখনো তা অবশ্য কৃত্রিম কাব্যিকতাতেও পৌঁছায়। তবু উপভাষার রোমান্টিক আবেদনজনিত কাব্যিক সম্ভাবনা নাটকের ক্ষেত্রে তার তৃতীয় মাত্রা গড়ে তোলে। পরিহাস ও বাস্তবতার অতিরিক্ত ওই তৃতীয় মাত্রা।

লোকবৃত্ত ও জাতীয় নাট্যরূপ

যাত্রা : প্রিয় পরম্পরা

যাত্রা লোকনাট্য[১] কি না এ নিয়ে যে-তর্ক আছে, তাতে অন্তত এ কথা বলা চলে যে, যাত্রার ফ্রেম লোকনাট্যের, প্রকরণ, নাট্যগঠন ও সংলাপ-বৈশিষ্ট্যের অনেকটাই লোকনাট্য থেকে নেওয়া; কিন্তু যাত্রার দল ও ব্যবসায়ের সংগঠনে লোকচরিত্রের কিছুই অবশিষ্ট নেই। কলকাতার এবং অন্যান্য শহরের যাত্রা-ব্যবসায়ের সংগঠনকে সংবাদপত্রের যাত্রা-পালকেরা 'যাত্রা ইণ্ডাস্ট্রি' নাম দিয়ে, তাকে লোকনাট্য থেকে পৃথক করে দেখানোর প্রয়াস পান। কিন্তু যাত্রার পালা, তার অভিনয় প্রকরণ ইত্যাদির মধ্যে তার লোকজীবন-উদ্ভবের স্মৃতি এত বেশি জড়িয়ে আছে যে, যাত্রা সম্পর্কিত প্রবন্ধকে লোকবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত না করে উপায় নেই। সমস্ত দিক বিবেচনায় এখন যাত্রাকে বিশুদ্ধ লোকনাট্য না বললেও বাংলার প্রথাগত নাট্যরীতি হিসাবে একে গ্রহণ করতে কারো আপত্তি হওয়ার কথা নয়। পশ্চিমি নাট্য তত্ত্বে নাটককে Classical, Traditional এবং Modern এই তিন ভাগে ভাগ করার যে রীতি আছে, তাই মেনে নিয়ে আমরা যাত্রাকে প্রথা- বা পরম্পরাগত নাট্যরীতি বলছি। ক্লাসিকাল নাট্যরীতির প্রকরণ প্রায় সম্পূর্ণ বর্ণিত, স্থিরীকৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ—তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে codified। যেমন প্রাচীন ভারতীয় নাট্য এবং এখন কেরলের কথাকলি। আধুনিক নাট্যরীতি আবার নতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করতে করতে এগোয়। পরম্পরার সঙ্গে তার যোগ অনিবার্য নয়, আপতিক। পরম্পরার সঙ্গে অবশ্য আধুনিক নাটকের বিষয়বস্তুর যোগ থাকেই—সে কথা বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। কিন্তু ঐতিহ্যগত নাট্যপ্রকরণকে আধুনিক নাটক যখন গ্রহণ করে তখন তার মূলে কোনো বাধ্যতা বা বিশ্বস্ততা থাকে না, বরং তার চেয়ে শিল্পগত প্রেরণাই বড় হয়ে ওঠে। ক্লাসিকাল আর আধুনিক নাট্যরীতির ঠিক মধ্যবর্তী হল ট্র্যাডিশনাল বা পরম্পরাগত নাট্যরীতি। তার আরম্ভ দূর অতীতে হলেও তা এখনও সম্পূর্ণ codified হয়নি। ফলে

তা পুরানো ফর্মের খানিকটা যেমন বজায় রাখে তেমনি তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়ও বেশ; যাত্রার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। পুরানো প্রকরণের কতকগুলি মূল নীতি যাত্রা এখনও মেনে চলে, কিন্তু সেই খোলসে সে অনেক নতুন ভাব এবং ধরন-ধারণকেও আত্মসাৎ করে নিয়েছে। অর্থাৎ যাত্রা এখনও একটি 'ওপন্ ফর্ম'—তার প্রকরণগত সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ক্লাসিকাল নাট্যরীতির উদ্ভব কখনো কখনো পৌরাণিক কাহিনী হয়ে থাকে, কিংবদন্তির আকারে আমাদের কাছে পৌছায়। যাত্রার উদ্ভব-সূত্র ধরে অতদূর যাওয়া যায় না। অন্যদিকে ওড়িশা আসাম পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে লোকজীবনে যে নাট্যরূপটি সবচেয়ে বেশি গৃহীত ও চর্চিত, সেটি যাত্রা। ইদানীং কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গে খাঁটি লোকনাট্য খুঁজে পাওয়ার খবর দিয়েছেন। যেমন শিশির মজুমদার বলেছেন উত্তরবঙ্গের 'খন'-এর কথা[২]। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই লোকনাট্যগুলি একদিকে অতিশয় সংকীর্ণরূপে শ্রেণী, সম্প্রদায় বা অঞ্চলে নিবদ্ধ, অন্যদিকে সংলাপের মধ্য দিয়ে খানিকটা প্রচ্ছন্ন বিবৃতি জানানোতে যতটা নাটকীয়তা সম্ভব তার বেশি নাটকীয়তার গর্ব এগুলির নেই। বইয়ে পড়েছি বলে এগুলি সম্বন্ধে আমার ধারণাও আংশিক। আর যাত্রার গ্রাহক-সমাজের সঙ্গে 'খন' ইত্যাদির গ্রাহক গোষ্ঠীর আয়তনগত তুলনাই চলে না। যাত্রা শহর এবং গ্রামের মানুষের আবেগ ও অভিজ্ঞতার যে বিচিত্র পর্যায়ে আঘাত করে, খন-এর উন্মথিত আবেগে না থাকে সেই গভীরতা, এবং তাদের অধিকৃত বা পর্যালোচিত অভিজ্ঞতায় না আছে সেই ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য। সুতরাং অন্তত গ্রাহক-স্বীকৃতির দিক থেকেও যাত্রা নিঃসন্দেহে অন্য সব নাট্যরূপের চেয়ে অনেক বেশি করে লোকনাট্য।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অবশ্য নয় যাত্রা লোকনাট্য কিন,—এ প্রশ্নের মীমাংসা করা। বাঙালি পাঠকদের জন্য যাত্রার একটি সামগ্রিক ছবি তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। খানিকটা ইতিহাস, খানিকটা বর্তমান চেহারা, খানিকটা ভাবী প্রবণতা—এই সব আলোচনা করে যাত্রার একটা পরিচয় তৈরি করা[৩], যে-পরিচয় আমরা শহুরে লোকেরা বড় একটা জানি না। ১৯৬১-র পুনরুত্থানের পর, এবং ১৯৭৩-৭৬এ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার পৃষ্ঠপোষিত যাত্রা উৎসবে যাত্রা ও সরকারি আনুকূল্যের হানিমুন পর্বের পর, শহরের শিক্ষিত সংস্কৃতিমন্য মানুষের কাছে যাত্রা আবার একটি দূরবর্তী বিষয় হয়ে পড়েছে। কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীদেরও যাত্রা সম্বন্ধে একটি সাধারণ অনাস্থা

এবং অজ্ঞতা আছে। এদের থেকে যাত্রায় অনেকে গিয়ে যোগ দিলেও আধুনিক থিয়েটারে অভিনয়ের চেয়ে যাত্রায় অভিনয় যে খানিকটা নিম্নার্হ ও অবজ্ঞেয়—এইরকম একটা মনোভাব খুবই বিস্তৃত। অথচ যাত্রার এই শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী সজীবতা এবং বিশাল জনপ্রিয়তার উৎস জানতে হলে যাত্রা বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া আমাদের খুব দরকার। গ্রুপ থিয়েটারের বৌদ্ধিক, নৈতিক, প্রাকরণিক বদ্ধদশার হাত থেকে মুক্তি চাইলেও যাত্রার ওই ওপন ফর্ম বেশ খানিকটা সহায়তা করতে পারে, তা-ও একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে না। কেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী একসময় পেশাদার মঞ্চের অধিরাজ হয়েও যাত্রা করার কথা ভাবেন,[৪] রবীন্দ্রনাথ কেন প্রচলিত নাট্যকলা সম্বন্ধে বিরক্ত হয়ে যাত্রার প্রকরণকে স্মরণ করেন,[৫] তার উত্তরগুলি জানতে চেয়েই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

২.

যাত্রার ইতিহাসে একটি অব্যাহত ধারাবাহিকতা আছে। কেউ কেউ[৬] যাত্রাগান আর্যরা ভারতে আসার চার-পাঁচ হাজার বছর আগেই প্রচলিত ছিল বলে দাবি করেছেন, তবে সেটা নাকি দ্রাবিড়ীয় প্রাকৃত (!) ভাষায়। এ কথার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলা যাবে না, কারণ যাত্রা বলতে আমরা এখানে নির্দিষ্ট ভাষায়, নির্দিষ্ট দেশকালবদ্ধ নির্দিষ্ট নাট্যরূপের ব্যাপারটাই বোঝাতে চাইছি—শুধু একটি বিশিষ্ট নাট্যপ্রকরণকে নয়। যাত্রার ওই ব্যাপক অর্থ ধরে নিলে পৃথিবীর সমস্ত লোকনাট্যকেই যাত্রা নাম দিতে হয়। তবু সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসকার কিথ সাহেব জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে এক ধরনের যাত্রা বলে অভিহিত করেছেন,[৭] এবং সে যাত্রার মধ্যেই বাংলার যাত্রার একটা প্রাগ্‌রূপ আমরা দেখতে পাই। যাত্রার ফর্মের মধ্যে খানিকটা পরম্পরাগত উপাদান আছে—সেখানে তা দীর্ঘ continuity-র অন্তর্গত; আবার বাংলাদেশের জলহাওয়ায় তা যে নিজস্ব চেহারা নিয়েছে তা বিশেষ স্থানের ও বিশেষ কালের সৃষ্টি। কাজেই এই যাত্রার উদ্ভব খুঁজতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে দৌড়োবার দরকার নেই। একজন গবেষক বাংলাদেশে যাত্রাগান "কত প্রাচীন তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়" বলে রায় দিলেও[৮], তিনি নিজেই বাংলা যাত্রার আদি প্রবর্তনার সঙ্গে চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে লোকশ্রুতিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করেছেন। আমরাও বাংলার যাত্রার বিশিষ্ট

রূপটি তৈরি হওয়ার পিছনে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের মৌলিক প্রেরণাটিকে এর বিবর্তনের প্রাথমিক স্তর হিসাবেই গ্রহণ করব। এটা লক্ষ করার বিষয় যে, মূলত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেই দেববিষয়ক বাংলা কাব্যগুলি একটি পরিকল্পিত আখ্যানের কাঠামোয় সংগঠিত বা structured চেহারা নিতে শুরু করে। লোকনাট্যের গান জুড়ে জুড়ে উক্তি-প্রত্যুক্তির আদলে তৈরি করা শিথিল রূপের মধ্যে একটা গল্প বলার প্রবণতা নিশ্চয়ই এই সময়েই প্রকট হয়ে ওঠে। যদি কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন যাত্রা (লোকভাষায় 'কালদমনে যাত্রা') প্রথম সম্ভাব্য বাংলা যাত্রা হয়, তবে তার আখ্যান-সংগঠনের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের আখ্যান-সংগঠনের মিল দুর্লক্ষ্য নয়। দু-জায়গাতেই বাধা ও বিপদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে আরাধ্য দেবতার জয় বর্ণনা করে তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। ঠিক এই প্যাটার্ন 'গীতগোবিন্দ'-এ নেই, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এও নেই। সেখানে দ্বন্দ্ব মূলত দুটি চরিত্রের আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গির যোগবিয়োগনির্ভর—এবং সেখানে কোনো দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার সজ্ঞান বা স্পষ্ট লক্ষ্য নেই। কালিয়দমন কাহিনীতেই প্রথম মঙ্গলকাব্যীয় সংস্কার বৈষ্ণব আখ্যানকে আক্রান্ত করছে দেখতে পাই। কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য প্রতিপাদক এই যাত্রা স্বয়ং চৈতন্য শুরু করেছিলেন কিনা তা বলা মুশকিল। চৈতন্যের যাত্রা হয়তো 'গীতগোবিন্দ'-ধর্মীই ছিল, মূলত রাধাকৃষ্ণ লীলার গীতি-আখ্যান। কিন্তু কালিয়দমন যাত্রা যে পরে খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার প্রমাণ, কালিয়দমন যাত্রা কথাটির অর্থপ্রসার—এ বলতে তখন সমস্ত কৃষ্ণযাত্রাকেই বোঝাত। অর্থাৎ বাংলা যাত্রার একটি বিশিষ্ট রূপ মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকাকে মান্য করে বাঙালি দর্শকরা নিজেরাই নির্দেশ করে তৈরি করে দিচ্ছে —এটা এ থেকে ধরা যাচ্ছে। পরে যে চণ্ডীযাত্রা, মনসার ভাসানযাত্রা, রামযাত্রা ইত্যাদি গড়ে উঠল, তার মূলেও ওই দুর্দম অন্যায়কে ধ্বংস করে দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার মূল প্যাটার্নটিকেই অনুসৃত হতে দেখি। অবশ্য 'গীতগোবিন্দ'-এর যাত্রা নামাঙ্কিত কীর্তনগানের একটা সমান্তরাল ধারাও পৃথকভাবে তৈরি হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতির হাতে তা বিশেষ গরিমা ও জনসমাদর লাভ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা যাত্রার গড়নে এবং বক্তব্যে বেশ বড়রকমের পরিবর্তন ঘটে। এই সময় "প্রাচীন" যাত্রা এবং "নূতন" যাত্রা এই দুটি কথা চালু হয়। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য[৩] শ্যামাপদ চক্রবর্তীর এই কথা স্মরণ করেছেন যে, বাংলা যাত্রার ইতিহাসে ষোড়শ ও উনবিংশ—এই দুটি শতাব্দীর গুরুত্ব খুব

বেশি। তবে আগে যাত্রা মূলত ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক ছিল, ফলে আমরা সেই সব প্রসিদ্ধ লোকের (তখনকার সম্ভ্রমহীন লৌকিক ভাষায় যাঁদের 'যাত্রাওয়ালা' বলা হতো) নামেই যাত্রার দলগুলিকে পরিচিত হতে দেখি : যেমন পরমানন্দ অধিকারীর দল, কৃষ্ণকমল অধিকারীর (গোস্বামী) দল, গোপাল উড়ের দল, এমন-কী বউ মাস্টারের দল। এখন সংগঠিত বাণিজ্যিক পটভূমিকায় অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে—এখন দলগুলির নামে অধিকারী বা ব্যক্তির পরিচয় খুবই কমই চিহ্নিত থাকে। যেখানে থাকে—যেমন সত্যম্বর অপেরার ক্ষেত্রে—সেখানে প্রতিষ্ঠাতা পুরুষকে নামে স্মরণ করা হয় মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রা 'পুরানো যাত্রা' ও 'নূতন যাত্রা'—এই দুটি ভাগে নির্দেশিত হতে থাকে। ষোড়শ থেকে উনবিংশ—পুরানো যাত্রার এই একছত্র অধিষ্ঠানের কালে তাকে যে নানারকম উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়নি তা নয়। কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রা, শিবযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ইত্যাদি ধর্মীয় এবং দেবনির্ভর, মূলত ভক্তিমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে পুরানো যাত্রার ব্যবসায় ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগর, কলকাতা ও তার কাছাকাছি নাগরিক আধা-নাগরিক রুচির যে সর্বাঙ্গীণ অবনমন ঘটেছিল তার সংক্রমণ থেকে যাত্রাও রক্ষা পায়নি। কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির প্রভাবে যাত্রায় নিম্নরুচির অনুপ্রবেশ ঘটে। ঠিক কী কী উপাদানের মধ্যে দিয়ে এই নিম্নরুচির নিদর্শন যাত্রায় ঢুকে পড়ল তার বিস্তৃত তালিকা আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। তবে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পালাটি যাত্রায় গৃহীত হওয়ার ফলে এই নিম্নরুচিতে নিশ্চয়ই আরেকটি মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল।

শান্তিদেব ঘোষ 'নতুন যাত্রা'-র উদ্ভবের অতি সুনির্দিষ্ট একটি তারিখ দিয়েছেন—১৮৪০ সাল[১০]। নতুন যাত্রা বলতে কী বোঝায় তা সম্ভবত আগে নির্ধারিত হওয়া দরকার। নানা আলোচনা থেকে পুরানো ও নতুন যাত্রার এই পার্থক্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

ক. পুরানো যাত্রা ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবমাহাত্ম্যনির্ভর, নতুন যাত্রা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ ;

খ. পুরানো যাত্রা অধিকারী-নিয়ন্ত্রিত পেশাদার সম্প্রদায়ের পরিবেশনা ; নতুন যাত্রা সাধারণভাবে শখের দলের—উনবিংশ শতাব্দীর বাবুদের প্রমোদসন্ধানের একটি অভিব্যক্তি।

হংসনারায়ণ ভট্টচার্য ওই প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, মূলত 'ধনাঢ্য ভদ্রসন্তানেরাই' এই শখের যাত্রা করতেন। তাতে জনচিত্তরঞ্জনের জন্য নানারকমের সঙ দেখানো হত। জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় যে শখের দল গড়েছিলেন তাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী দুইই ছিল—এই বোধহয় যাত্রায় প্রথম স্ত্রী-পুরুষের মিলিত অভিনয়ের সূচনা। 'নন্দ বিদায়' নামে একটি যাত্রায় (তৃতীয় অভিনয় ১৮৪৯-এর ১৪ এপ্রিল) এই যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। নূতন যাত্রায় গান ও সুরও খুব বড় ভূমিকা পায়। "উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণীর আলাপ, খেয়াল, টপ্পা, হাফ-আখড়াই গান এবং কীর্তন গানের ব্যবহার এ সকল যাত্রাভিনয়ে দৃষ্ট হয়।"[১১] গানের সঙ্গে এল নাচ। সুরবৈচিত্র্য, প্রচুর দামি সাজ-পোশাক, "পয়ারে কথা কাটা-কাটি এবং থিয়েটারি ধরনের সংলাপই" নাকি এই সব যাত্রার নূতনত্বের চিহ্ন। 'নল-দময়ন্তী', 'রাজা বিক্রমাদিত্য' এবং 'নন্দ বিদায়' ইত্যাদি পালা খ্যাতি পেলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় যে ছিল 'বিদ্যাসুন্দর পালা'—সে সম্বন্ধে কারো সংশয় নেই। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে যাত্রায় বিদ্যাসুন্দরের প্রথম অভিনয় হয় ১৮২২-এ, আড়িয়াদহের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। তবে তাঁর ওই প্রবন্ধে একটু আগেই আবার ১৮২১-এর ১৬ জুন-এর 'সমাচার দর্পণ'-এর উদ্ধৃতি আছে—তাতে "বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক এক প্রকরণের অনুসারে যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে"—এই খবর পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ ১৮২২-এ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সূত্রপাত হয়নি, হয়েছে তার আগেই। এ সম্বন্ধে সুকুমার সেনের সংবাদই যথার্থ—"অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, সম্ভবত তার আগেও, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ধর্মীয় বৈঠক ও শহুরে বারোয়ারিতে সমাদৃত ছিল,—বাংলায় নেপালে এবং হয়ত মিথিলাতেও।"[১২]

কাজেই নূতন যাত্রার একটা সুনির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া ঝুঁকির কাজ। বিষয়বস্তুর নূতনত্বের সূচনা হয়েছে অনেক আগে, সম্প্রদায়ের চারিত্রগত নূতনত্ব, প্রকরণের নূতনত্ব এসেছে পরে—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, প্রথমার্ধের শেষ দিকে।

তবে প্রাচীন যাত্রাও যে বদলায়নি তা তো নয়। অন্যান্য দেবকেন্দ্রিক যাত্রা সম্বন্ধে খবর সংক্ষিপ্ত—যেমন চণ্ডীযাত্রার সবচেয়ে খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন ফরাসডাঙার গুরুপ্রসাদ বল্লভ, মনসার ভাসান যাত্রায় অনুরূপ যশ লাভ করেন বর্ধমানের লাউসেন বড়াল, আবার রামযাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভ করেন পাতাই-হাটার প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী এবং জয়চন্দ্র অধিকারী—এর বাইরে

খুব বেশি কিছু জানা যায় না এগুলি সম্বন্ধে। কিন্তু কৃষ্ণযাত্রায় যে মাঝে-মাঝেই প্রকরণগত নূতনত্ব ঘটেছে তা হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য বিস্তৃতভাবেই লিখেছেন। কালিয়দমন যাত্রার পুরানো রীতির শেষ ধারক ছিলেন বদন অধিকারী। তাঁর প্রায় এক প্রজন্ম আগে পরমানন্দ দাস যাত্রাগানে 'তুক্কো' প্রথা প্রবর্তন করেন। বদন 'তুক্কো'কে আরো পরিমার্জিত করেন, আর কবিগানের সাক্ষাৎ প্রভাব স্বীকার করে গানে অনুপ্রাসের ব্যবহার শুরু করেন।

আমাদের লক্ষ্য নয় যাত্রার আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা। যে-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই সাধারণ তথ্যগুলি দেওয়া হচ্ছে তা হল ফর্ম হিসাবে যাত্রার উন্মুক্ততা। অর্থাৎ প্রায় প্রতি যুগেই বাইরের প্রভাব যাত্রাকে তার মূল উৎস থেকে খানিকটা করে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তার শরীরে প্রচুর রদবদল ঘটিয়েছে। তবু এমন একটা অবিনাশী উপাদান যাত্রা বজায় রেখেছে যে, এখনও পূর্বভারতে যাত্রাই সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যরূপ। শহরের নাটক বা ফিল্‌ম পৌঁছাতে পারে না এমন অনেক জায়গায় যাত্রা পৌঁছায়। কঠিন প্রশ্নটি এই—যাত্রার জনপ্রিয়তার মূল আশ্রয় কোন্‌টি—তার অব্যাহত মৌলিক কোনো লক্ষণ, না তার চলতি হাওয়ার সঙ্গে চলতি জনপ্রিয়তার উপাদানগুলিকে আত্মসাৎ করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওই অত্যাশ্চর্য অভ্যাস? সংগত উত্তর নিশ্চয়ই হবে 'দুইই', তবে পরেরটাই বেশি করে।

৩.

যাত্রার তথাকথিত 'দুর্দিনে'র কারণগুলি অনুসন্ধান করলে এই উত্তরের আরো খানিকটা সমর্থন পাওয়া যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে—সাধারণভাবে সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই যে যাত্রা শহরের নব্যশিক্ষিত সমাজের কাছে অনাদর লাভ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার অর্থ এই নয় যে, গ্রামাঞ্চলে যাত্রার জনপ্রিয়তার কোনোরকম হেরফের ঘটেছিল। তবু একটি জাতির সংস্কৃতির মধ্যে যখন নানারকম পরিবর্তন ঘটছে, তখন তার mainstream-এর মধ্যে যাত্রার কোনো সম্মানজনক স্থান থাকছে না, সাহিত্যের বা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে সে যুক্ত থাকছে না, এর একমাত্র কারণ কলকাতার শিক্ষিত সমাজ থেকে যাত্রার ওই নির্বাসন। আঠারো শো তিরিশের আগেই মেয়েদের পক্ষে 'যাত্রোৎসব গমন' ধর্মনাশের কারণ বলে ফতোয়া দিয়েছিল 'সমাচার দর্পণ'। শতাব্দীর মধ্যভাগে

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা শেষ দিকে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও যাত্রার প্রতি নব্য-শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের অভিযোগগুলি জ্ঞাপন করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, গত শতাব্দীতে বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতির একটি নতুন তৈরি হওয়া স্তর থেকে যাত্রার নির্বাসন ঘটেছিল। এ নির্বাসন সমগ্র সংস্কৃতি থেকে নির্বাসন নয়; কিন্তু যেহেতু ওই শিষ্ট সংস্কৃতিই সাধারণভাবে একটি জাতির একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্কৃতি বলে দীর্ঘদিন গৃহীত হয়েছে, সেখানে কোনো ভূমিকা না থাকা যাত্রার পক্ষে গৌরবজনক হয়নি। যাত্রার এই অগৌরবের দুটি স্পষ্ট সূত্র আমরা পাই। প্রথমত উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় নতুন যে নাট্য-সংস্কৃতি তৈরি হয় যাত্রা আদিতে তার কোনো 'মডেল' হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, কোনো যাত্রা পালা বাংলা সাহিত্যের একটি গ্রহণযোগ্য সংকলনে স্থান পাবার মতো শিল্পোন্নত সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ প্রচারযোগ্য শিষ্ট সংস্কৃতির উপর-মহলে যাত্রা আসন লাভ করেনি, বরং একটি subculture-এর অন্তর্গত হয়ে থেকেছে। এতে সাধারণভাবে তথাকথিত 'শিল্পমর্যাদা' পায়নি যাত্রা। তাতে অবশ্য যাত্রার কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ সংস্কৃতির অন্য এলাকায় তার দখল অসপত্ন।

কেন এরকম হল? যাত্রা কেন মার্জিত বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় অংশে জায়গা নিতে পারল না? আজকাল বহুল প্রচারিত কাগজগুলিতে যাত্রার পৃষ্ঠপোষকরা স্থায়ীভাবে বসে থেকে সাপ্তাহিক 'সমালোচনা'য় প্রতিটি যাত্রাকেই "যুগান্তকারী শিল্পসৃষ্টি" বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, বিজ্ঞাপনের বহর থেকে মনে হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় যাত্রাই একমাত্র প্রমোদবাহন। এর মধ্যে সরকারি আনুকূল্যও পেয়েছে যাত্রা। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস সরকারের —যাঁরা বোধ হয় বামপন্থী হিসাবে সাধারণভাবে চিহ্নিত কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিপক্ষ হিসাবে যাত্রাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন; অধুনা বামফ্রন্ট সরকারও বিভিন্ন যাত্রাদলকে সহায়তা ও পুরস্কার দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, যাত্রা বাংলাদেশের সবচেয়ে সুসংগঠিত প্রমোদ-ব্যবসায় শুধু নয়, সবচেয়ে ব্যাপ্ত ও গৃহীত নাট্যরূপও বটে। সুতরাং যাত্রার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে এবং সরকারি কাজকর্মে সেই গুরুত্বের প্রতিফলন সংগত ও স্বাভাবিক। তবু যাত্রা 'জাতে উঠছে না' কেন? যাত্রার নিজের ইতিহাসে প্রচুর স্মরণীয় এবং শিক্ষিত মানুষের কাছে অতি শ্রদ্ধেয় নাম থাকা সত্ত্বেও?

রুচির দৈন্যের অভিযোগ এখন তো খাটে না। তবে এর একটা কারণ

নিশ্চয়ই শিল্প হয়ে ওঠার আগেই যাত্রার ব্যবসায় বা ইনডাস্ট্রি হয়ে ওঠা এবং জনতোষণের উপর আত্যন্তিক নির্ভরতা। সাধারণভাবে বাংলা নাটক, পেশাদার মঞ্চের নিয়ন্ত্রণে থেকেও কখনও কখনও সাহিত্যমূল্যের দিকে হাত বাড়িয়েছে, যাত্রার সে-ধরনের প্রয়াস লক্ষ করা দুষ্কর। তার কারণ আছে। প্রথমত নগরবাসী শিক্ষিত উচ্চ রুচির সাংস্কৃতিক মহল থেকে যাত্রা-পালা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত প্রাগ্-আধুনিক পর্বে নেই বললেই চলে। যাত্রার স্পর্শদোষের ভয় ছিল তো বটেই, তা ছাড়া অভিজাতের অনুকম্পাও নিশ্চয়ই ছিল যাত্রার প্রতি। এবং যাত্রার কাব্য বা সংগীত-প্রধান প্রকরণ, ভক্তিরস, পুরাণনির্ভর ভাবাবেগ মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি গ্রহণ করলেও এবং 'গীতিনাট্য' নামে যাত্রা থেকেই পাওয়া একটি মিশ্র নাট্যরীতি তৈরি হলেও যাত্রা তথাকথিত উচ্চ সংস্কৃতির মধ্যে গৃহীত হয়নি, জাপানের নো বা কাবুকি যা হয়েছে। এর একটি সহজ প্রমাণ—কলকাতায় স্থায়ী থিয়েটারের মঞ্চ অনেক আছে, তা ছাড়া অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্র সদন ইত্যাদি জায়গায় প্রায় প্রতিদিনই গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখার সুযোগ থাকলেও নিয়মিত স্থায়ীভাবে যাত্রা দেখানোর কোনো জায়গা নেই। স্টার মঞ্চে নট্ট কোম্পানি প্রতি রবিবার যাত্রাপালার আয়োজন করেন বটে, কিন্তু মঞ্চের যাত্রায় যে যাত্রার স্বাদ আদৌ ফোটে না এ সম্বন্ধে যাত্রার দিকপালেরাই তীব্র মত প্রকাশ করে গেছেন[১৩]। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কলকাতায় যাত্রার নিজস্ব ফর্ম অনুযায়ী কোনো স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয়নি। যাত্রা মূলত ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার কি না, স্থায়ী মঞ্চে বদ্ধ হয়ে পড়াতে তার চরিত্র নষ্ট হয় কিনা—সে তর্কে আমরা যাব না।

৪.

যাত্রার মধ্যেই হয়তো আধুনিক ভারতবর্ষের সেই শহর ও গ্রামের বিরোধ, ইংরেজি শিক্ষিতের নতুন সংস্কৃতি ও দেশী সংস্কৃতির ব্যবধান সবচেয়ে বেশি চিহ্নিত। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এঁরা হলেন শিক্ষিত বাঙালির কবি, আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙালির কবি। যাত্রাও বাঙালির নাটক, কিন্তু শিক্ষিত (এখন 'শিক্ষিত' কথাটা আর ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থে ব্যবহার করা চলে না) উচ্চ সংস্কৃতি-বদ্ধ বাঙালির নাটক নয়।

যাত্রা এই উচ্চ সংস্কৃতির অন্দরমহলে ঢুকতে পারেনি, কিন্তু কখনো কখনো

নিজের মতো করে সম্ভ্রান্ততা উপার্জন করেছে তা আমরা জানি। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর বা মতিলাল রায়ের ভক্তি আবেগ ও পুরাণরস পরিবেশন, মুকুন্দ দাসের স্বদেশী প্রচার ইত্যাদির মধ্যে যাত্রা উনবিংশ শতাব্দীর অস্পৃশ্যতাকে অস্বীকার করার মতো আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল। আবার তারই মধ্যে নতুন বাংলা থিয়েটার থেকে অলজ্জভাবে প্রকরণ ধার নিয়ে যাত্রা হয়ে উঠেছিল থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা। ১৯১৩-১৮-র মধ্যেই নাকি যাত্রায় থিয়েটারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ঢুকে পড়ে[১৪]। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলি—যেগুলিতে শুধু যে প্রকরণগত মেলোড্রামার উদার প্রাচুর্য আছে তাই নয়, মেলোড্রামাটিক সংলাপের একটা রোমাঞ্চকর আদর্শও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। পরে যাত্রার অনেক বাঁধা চরিত্র বা স্টক ক্যারেক্টার যেমন গিরিশচন্দ্রের করিম চাচা বা বিদূষককে ('জনা') স্মরণ করায়, তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের দিলদারও প্রায়ই নাম বদলে নানা যাত্রা পালায় দেখা দেয়। যাত্রা পালাতে একটি ভিলেনও ঢুকে পড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, ঐতিহাসিক পৌরাণিক যাত্রার আবেগবহুল, declaim করে বলার মতো সংলাপের মডেলটি দ্বিজেন্দ্রলাল তৈরিকরে দেন। এ প্রভাব যে কত স্থায়ী তা ব্রজেন্দ্রনাথ দে-র 'সুলতানা রিজিয়া' গোছের যাত্রা-নাটক পড়লেই বোঝা যাবে।

থিয়েটারের ছোঁয়ায় যাত্রা কীভাবে নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করেছে তার একটা তালিকা করা যায়:

ক. গান ছাঁটাই, নাটকীয়তার বৃদ্ধি

গানের সংখ্যা কমে গিয়ে সংলাপের অংশ বেড়ে যায়। আর গান ছাঁটাইয়ের অর্থই হল জুড়ির বিলোপ। মতিলাল রায়ের যাত্রাতেও আট-দশটি করে জুড়ি চারটি দলে ভাগ হয়ে চরেদিকে দর্শকদের দিকে মুখ করে নানারকম রাগরাগিণীতে বসানো গান গাইত। সেই জুড়িয়া বিদায় নিয়েছে, জুড়িদের পরে ছেলের দল আসত গান গাইতে, তারাও আর নেই। জুড়িদের সঙ্গে কখনো কখনো অধিকারী নিজে বেহালা ধরতেন—শশিভূষণ অধিকারী তো অজস্র মেডেল ঝোলানো জামা গায়ে দিয়ে বেহালা বাজাতেন। তবে মতিলাল রায়ের মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৮৮৪-৭) যখন 'মতিরায়ের দল' চালাচ্ছেন তখন (১৯২৫ সালে) নাকি একবার দর্শকরা জুড়িদের গানে আপত্তি জানায়, তাদের মধ্যে থেকে উঠে অনেকে জুড়িদের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে।[১৫] তখন কলকাতার মঞ্চে

শিশিরকুমারের আবির্ভাব ঘটেছে, প্রতিপক্ষীয় স্টারে অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ যোগ দিয়েছেন। কাজেই জুড়ি গানের এ প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় তখন জুড়ি ও ছেলের দল একেবারে কমিয়ে দিলেন। জুড়ি আর ছেলেরা 'মুনিবালক', 'রক্ষী', 'সৈনিক' ইত্যাদি ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করল।

গান ছাঁটাইয়ে 'বিবেক'-এর ভূমিকাও সংকুচিত হয়ে পড়ল। এই 'বিবেক-' এর প্রবর্তনা করেছিলেন ওই শশিভূষণ অধিকারী। মতিলালের নিজের নাটক সাধারণভাবে নাটকীয়তাহীন, কিন্তু পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ যাত্রা-পালায় কথকতা কমিয়ে নাটকীয়তা বাড়ান, যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখাতে শুরু করেন, ফলে যাত্রায় ঘটনা সম্বন্ধে আগ্রহ বেড়ে যায়। বিবেক সেই আগ্রহেরই শিকার। তবে জুড়ি গায়কদের অবলুপ্তির পরই 'বিবেক' প্রধান হয়ে ওঠে। কালক্রমে 'বিবেক'ও সাধারণভাবে অন্তর্হিত হয়। এখন 'গায়ক' জাতীয় একটি চরিত্র কখনো কখনো বিবেক-এর জায়গা নেয়।[১৬]

আগে গানই ছিল যাত্রার বিশিষ্ট প্রকরণ—গানেই বিবৃতি ও সংলাপ দুয়েরই কাজ চালানো হত। এই শতাব্দীর বিশের দশকের 'বামন ভিক্ষা গীতাভিনয়' নামে একটি পালাতে গান ছিল আটচল্লিশটি। এখন গান অতিশয় নাটকীয় যাত্রার অলংকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশটির জায়গায় এখন দশবারোটি গানও শোনা যায় না। শম্ভু বাগ রচিত 'হিটলার' পালাতে ছটির মতো গান, আর তাঁরই ছদ্ম পৌরাণিক যাত্রা 'গণদেবতা'য় গানের সংখ্যা সাতটি।

খ. সময় সংক্ষেপ

আগেকার বারো ঘণ্টা থেকে সাত-আট ঘণ্টার যাত্রাকে এখন দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে যে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে তাও শহর আধা-শহরাঞ্চলের মানুষের বাঁধা সময়ের দিকে নজর রেখে, কৃষিজীবী সমাজের অবসরের প্যাটার্ন থেকে সরে এসে। গান ছাঁটাই এই সময়-সংক্ষেপের উদ্দেশ্য থেকে আরোপিত, সেই সঙ্গে পশ্চিমি নাটকীয়-তার ফর্মকে ক্রমশ আত্মীকরণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত। সে কথায় আমরা পরে আসছি। বলা বাহুল্য যাত্রার এই সময়-সংক্ষেপ তার প্রকরণের পুনর্বিন্যাসের সূচক। ৺কেয়া চক্রবর্তী "যাত্রা জগতের দীর্ঘদিনের বন্ধু" শম্ভুনাথ সিংহের উক্তি তুলেছিলেন, তাতে প্রকরণ ছাড়া অন্যান্য দিকেরও ইঙ্গিত দেখতে পাই :

"...ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলছি, তখন সন্ধ্যে রাত্তির সাতটা-আটটা থেকে যাত্রা আরম্ভ হোত, শেষ হোত সূর্যোদয়ের পর। আজকাল

সময় অনেক কমে গেছে। অতক্ষণ যাত্রা করবে বা দেখবে, লোকের শরীরে সে তাকত কই? সে খাওয়া কই? ধৈর্যও কমে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আজকাল লোকে অল্প কথায় বুঝে যায়, অত ফেনিয়ে বলবার দরকার করে না।"[১৭]

কিন্তু এই সময়-সংক্ষেপ শেষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক নাটকীয় গল্পের দিকেই যাত্রাকে এগিয়ে দেয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সময়-সংক্ষেপ অবশ্য ১৯৬১-তে শোভাবাজার যাত্রা-উৎসবের পরবর্তী ঘটনা। এর ফলে স্টেজে যাত্রা অভিনয় এখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও স্টেজের উপরেই কনসার্ট পার্টি বসিয়ে 'নিজস্বতা' খানিকটা বজায় রাখার চেষ্টা করা চলছে, তবু যাত্রা পালা টেক্সট হিসাবে ক্রমশ স্টেজের নাটকের কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট। আগে যাত্রা যেখানে ছিল মূলত দৃশ্য-পর্যায়, সেখানে অঙ্ক বিভাগ করে ব্রুনেতিয়ের-এর ত্রিভুজ-এর মতো সংগঠনের আদি-মধ্য-অন্ত এবং ক্লাইম্যাক্স-ওয়ালা গল্পের দিকে যাত্রা এগিয়ে চলেছে।

গ. বিষয়বস্তুর পরিবর্তন

গত শতাব্দী বা তার আগে থেকেই যে যাত্রার secularization বা ধর্ম-নিরপেক্ষ কাহিনীকে গ্রহণ শুরু হয় তা আমরা জানি। কলকাতায় পেশাদার থিয়েটার জমে ওঠবার পর মঞ্চের নাটকই সাধারণভাবে যাত্রাকে প্রভাবিত করতে থাকে। স্বদেশী যাত্রার আরম্ভ মুকুন্দদাসের হাতে। তার অনেক আগে থেকেই যাত্রায় ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালা লেখা শুরু হয়েছে।

কালীশ মুখোপাধ্যায় 'স্মারক পুস্তিকা'য় একটি নিবন্ধে বলেছেন, "১৯২০ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেসব যাত্রা দেখেছিলাম তার শেষের দিকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকই যেন বেশি দেখেছি। পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা যেন কমে আসছিল।"[১৮] সুতরাং বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ অনেক আগেই শুরু হয়েছে। ১৯৬১-র ২৩শে সেপ্টেম্বর শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রার পট-পরিবর্তন নিয়ে একটি আলোচনা-চক্রও বসেছিল। তাতে প্রবোধবন্ধু অধিকারী—অনেকটা যাঁর একারই অক্লান্ত চেষ্টায় যাত্রার সাম্প্রতিক পুনরুজ্জীবন ঘটেছে—সমাজ, সভ্যতা এবং জনরুচির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রার আধুনিকীকরণের পক্ষে সওয়াল করেন। স্বনামধন্য পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে ছিলেন রক্ষণশীল, আধুনিকীকরণের বিপক্ষে। ফলে সাম্প্রতিক যাত্রা-দৃশ্যের

কেন্দ্রস্থল থেকে তাঁর নিঃশব্দ অন্তর্ধান আমরা লক্ষ করেছি। এখন যাত্রার বিষয়-বস্তুতে কী থাকে আর কী থাকে না, তার হিসাব করাই দুষ্কর। তবে ১৯৬১-তেই তরুণ অপেরার 'হিটলার' প্রথম জীবনী-পালা হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কাঁচরা-পাড়ার আর্ট থিয়েটার ১৯৬২-তে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' প্রথম পালারূপে অভিনয় করেন। সত্যম্বর অপেরার কর্তা গৌরকিশোর বসাকের মতে 'ছেঁড়া তার'-এর অভিনয় যাত্রার বিষয়বস্তুতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করে।[১৯] এর পরে সত্যেম্বর অপেরা নিজেই অভিনয় করে 'একটি পয়সা' (১৯৬৩)। তারপর থেকে জীবনী-নাটক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, রোম্যান্টিক—সবরকম পালার বিপুল বন্যা এসে উপস্থিত হয়।

ঘ. আধুনিক মঞ্চ-কৌশল ও প্রকরণ-প্রয়োগ

এখানেই বোধ হয় যাত্রা তার প্রথাগত পদ্ধতি-কৌশল থেকে সবচেয়ে বেশি সরে এসেছে। গোল করে ঘেরা মঞ্চে, প্রায় চারদিকে দর্শক রেখে, রেড়ির তেলের বা কেরোসিনের বাতির সাধারণ আলোয় অভিনীত হত বলে যাত্রার অভিনয়ে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকট হয়েছিল। বাস্তবের ইলিউশন বা মায়া তৈরির কোনো অবকাশ ছিল না যাত্রার আসরে। এবং ঘুরে-ফিরে সমস্ত দিকের দর্শককে সম্ভাষণ করে যেমন অভিনয় হত, তেমনই দূরের দর্শককে প্রবল আবেগ দিয়ে দুলিয়ে দেবার মতো অঙ্গচালনা ও হস্তবিক্ষেপ, কণ্ঠস্বরের উত্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস, মুখে শুধু মোটা দাগের অভিব্যক্তি—সবই যাত্রার নিজস্ব রীতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মঞ্চে সেট-সেটিং বা 'প্রপ'-ছাড়া অভিনয়ে একটি চেয়ারকে যেমন কখনও সিংহাসন, কখনও প্রাসাদশীর্ষ, কখনও হাতির হাওদা, কখনও পাহাড় হিসাবে প্রতীকী ব্যবহার করে কল্পনার নানা রস আদায় করা হত। সেটের অভাব পূরণ করত পালার টেক্সট।

এখন মঞ্চে যাত্রা হলে যাত্রার অভিনেতার চারদিক ঘুরে অভিনয় করবার দরকার হয় না, অভিনয় সে-সব ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে মুখোমুখি বা frontal হয়ে দাঁড়ায়; দর্শক মাত্র একদিকেই বসে আছে, সুতরাং অভিনয়ের জন্য অভিনেতার গতিবিধিও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ১৯৬২ সালে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ রবীন্দ্রকাননে যে বিরাট যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেন; তাতে প্রথম তাপস সেনের নির্দেশনায় আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি যুক্ত হয়।[২০] উজ্জ্বল ফোকাসের[২১] সুযোগ নিয়ে, কিংবা ছোটো মঞ্চে অভিনয়ের

সুরাদে মুখে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা গেল—যাত্রার অভিনয় ক্রমশ ফিলম বা আধুনিক নাটকের রিয়্যালিস্টিক আদলের অনুসরণ শুরু করল। মাইক্রোফোন ও টেপ-রেকর্ডার ব্যবহারে[২২] গলার বিশাল ও উদাত্ত পরিসর সংক্ষিপ্ত হল। মুখে মাইমিংয়ের সুযোগ বৃদ্ধি, কণ্ঠস্বরের পরিসর কমিয়ে আনা—এ দুয়ে মিলে রিয়ালিস্টিক অভিনয়ের পথ ধরে যাত্রার অভিনয়ে আণ্ডার-অ্যাকটিংয়ের সূচনাও দেখা গেল। দৈহিক অভিব্যক্তি ও কণ্ঠস্বরপ্রসূত যে বীররস যাত্রার স্থায়ী অনুষঙ্গ, তা ক্রমশ অন্তর্হিত হতে লাগল।

আসরে 'আহার্য' বা প্রপ নিয়ে অভিনয়ও অবশ্য মতি রায়ের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। হরধনুভঙ্গের পালায় মাঝখানে খিলান দেওয়া ধনুক ব্যবহার করতেন তাঁর দলের অভিনেতারা—খিলানটি খোলার কৌশলে মড়মড় করে সে ধনু ভেঙে পড়ছে এমন দেখাত। ভীষ্মের শরশয্যাও আসরে দেখানো হত—"তিনটি লোহার রড অর্ধবর্তুলাকৃতির কয়েকটি লোহার পাতের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে একটি মানুষের শোওয়ার মতো স্থান সৃষ্টি হয়েছিল। লোহার তীরগুলি ফ্রেমটির পায়ের কাজও করত। অর্জুনশরে বিদ্ধ হবার সময়ে ভীষ্মবেশী মতিলাল আশ্চর্য কৌশলে শুয়ে পড়তেন সেই লৌহশয্যায়।"[২৩]

১৯৬৭-র 'হিটলার'-এ নকল মেশিনগানের গুলি চলে। তার আগেই এই লেখক 'রানী দুর্গাবতী' পালায় একটি চকচকে চাকাওয়ালা পিতলের কামান থেকে গুলি ছোঁড়া দেখে চমৎকৃত হয়েছে। পরে কোনো পালায় দেখা গেল হরাইজনটাল বার, সিঁড়ির ধাপ সাজানো, পর্দার উপর ছায়া ফেলে সূর্য সেনের ফাঁসি; এপিক অপেরা 'ওথেলো' যাত্রায় ফিলম প্রোজেকশন করল, ১৯৭৬-এ 'কলিকাতা যাত্রা সমাজ' আসরে উট নামাল, আনন্দলোক নিয়ে এল ঘোড়া এবং নবরঞ্জন অপেরা গরিলা। পঞ্চু সেনের ভাষায় যাত্রা হয়ে উঠল "থিয়েটার আর সিনেমার জারজ সন্তান"[২৪]।

মঞ্চে যাত্রা-অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার সম্বন্ধেরও অদলবদল ঘটছে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে পঞ্চু সেনের স্পষ্ট মতামত আরেকটু তুলে দেওয়া দরকার:

"আসরে দর্শকের মুখ দেখে বোঝা যায় দর্শক কতটা নিতে পারছে, আর কতটা ইমোশন দিতে হবে। আসরে একেবারে নিয়ারেস্ট কানেকশন দর্শকের সঙ্গে। কিন্তু অডিটোরিয়াম যেই অন্ধকার হয়ে গেল, অমনি স্টেজে তো আমি দর্শকের রি-অ্যাকশন থেকে একেবারে বঞ্চিত। হাততালিতে বা হঠাৎ একটা হাসিতে হয়ত কিছুটা বোঝা গেল। কিন্তু সে কতটুকু? আসরে তো আমি

সবসময় দর্শকের মুখ দেখতে পাই। স্টেজে দর্শকের সঙ্গে অ্যাক্টরের কতটুকু কানেকশন ?"[২]

এগুলিই যাত্রার মূল পরিবর্তন। অন্যান্য পরিবর্তন, যেমন "স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রী নিয়োগ", "আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ", "যন্ত্র ও কণ্ঠ-সংগীতের নবরীতি", "দলীয় ও ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা", "শিল্পী ও কর্মীদের আর্থিক ও সামাজিক মানোন্নতি"[২৬]—এগুলি যাত্রার ফর্ম এর সঙ্গে খুব আবশ্যিক সূত্রে বদ্ধ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই মেয়েদের দিয়ে অশোভন নাচের টুকরো যাত্রার মধ্যে গুঁজে দেওয়া হত। তবে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রায় অভিনেত্রী গ্রহণের একটি চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছে : "মেয়েরা এ লাইনে হঠাৎ এসেছেন, প্ল্যান করে নয়। একটি অপেরা পার্টিতে ছোটো একটি মেয়ে ধ্রুবর পার্ট করতো। মেয়েটির নাম জ্যোৎস্না দত্ত। সে বড়ো হোলো, তখন তাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে থেকে গেল। আস্তে আস্তে আরো মেয়ে আসতে লাগল"।[২৭] এর মূলে রিয়্যালিজ্‌মের তাগিদ, একটু যৌন আবেদনের ব্যাবসায়িক লক্ষ্য—এ সবও যে ছিল না তা নয়। তবে মাইক্রোফোন ব্যবহার মেয়েদের এ লাইনে টিকে থাকতে অনেকটা সাহায্য করছে তাও অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যৌন আবেদন টেকেনি—যাত্রায় ক্যাবারে-কে সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে যাত্রায় মেয়েদের অধিকাংশ এখন মূলত অভিনয়সামর্থ্যেই সম্মানজনক জায়গা নিয়েছেন।

দলীয় ও ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা আগেও বড় দলে ছিল, এখনও আছে। তবে ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে দলের ভিত্তি যত শক্ত হয়—শৃঙ্খলার দরকারও তত বাড়ে—প্রফেশন্যালিজম-এর পিছনে শৃঙ্খলা না থাকলে চলে না। যাত্রার মানুষদের আর্থিক সুযোগ বেড়েছে ব্যাবসা ফেঁপে ওঠার ফলেই, যাত্রা 'ইণ্ডাস্ট্রি' হয়ে উঠেছে বলে। কিন্তু এতে যে চূড়ান্ত অসাম্য বিরাজ করে তাও কারো অজানা নয়। নায়ক যদি সিজনে দেড় লাখ পায়, সিজনে সাড়ে তিনশো টাকার বেশি পায় না এমন 'শিল্পী'-ও সংখ্যায় বহু। অনেকে যে সিজনে শুধু দুবেলা পেট পুরে ভাত আর আলুর তরকারি খেয়েই দলের মুজরো খাটতে স্বীকৃত হয়, সে-খবরও মিথ্যে নয়। যাত্রাতেও 'হিরো' আর সাধারণ কর্মীর মধ্যে উপার্জনের তফাত পর্বত-প্রমাণ। আর বাঁধা মাইনে তো নয়, কাজেই সাধারণ যাত্রাশিল্পী বা শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তা বলতে প্রায় কিছুই নেই। ১৯৬৬-এ যাত্রা শিল্পী সঙ্ঘ গঠিত হলেও অবস্থার বিশেষ অদলবদল ঘটেনি।

অভিনেতাদের সম্মানের বিষয়টা একটু জটিল। এ ব্যাপারে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মনোভাবে খানিকটা ভণ্ডামি এবং ambivalence আছে। এককালে প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা শ্রীদাম স্থবলের সঙ্গে আত্মীয়তা নাকি খুব গৌরবের ছিল। কৃষ্ণকমল, মতিলাল রায়, মুকুন্দ দাসও সম্মান ও সমাদর পেয়েছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাঙালি মধ্যবিত্তরা যাত্রায় শিল্পকে সম্মান দেয় না, দেয় সাফল্যকে। এর একটা সহজ পরীক্ষা আছে। শিল্পের ক্ষেত্রে কয়েকটি জীবিকা বা কেরিয়ার—যেমন সংগীত-শিল্পী, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, নাট্যশিল্পী, নৃত্যশিল্পী এবং যাত্রাশিল্পী—যদি বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে কতকগুলি বিকল্প হিসাবে রাখা হয় এবং তাঁর সন্তানের জন্য প্রার্থিত কেরিয়ার হিসাবে কোন্‌টি তাঁর কীরকম পছন্দসই—এভাবে তাঁকে নম্বর দিতে বলা হয়—সেই সামাজিক মনোভঙ্গির পরিসংখ্যানে যাত্রাশিল্পী যে নিচের দিকে থাকবেন, এ ব্যাপোরে আমি নিশ্চিত। কাজেই ওই সম্মানের মধ্যে খানিকটা ফাঁকিও আছে। সেটা যাত্রার শিল্পীরা, এবং ব্যাপকভাবে অন্য শিল্পীরা জানেন না তা নয়।

৫.

প্রশ্ন হল—এত বদল সত্ত্বেও যাত্রার কী রয়ে গেল—যা এখনও চিত্তাকর্ষক—অন্তত যা একটা স্তরে মানুষকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করে চলবে দীর্ঘকাল? তার ভিলেন-সম্বলিত মেলোড্রামা—যা মূলে যাত্রার অন্তর্গত ছিল না, পরে যা থিয়েটারের প্রভাবেই ঢুকে পড়েছে যাত্রায়? তার স্থূল ভাঁড়ামো—যা দীর্ঘকাল বহু মানুষকে তাদের চাহিদামতো আনন্দ দিয়ে এসেছে? তার ফর্মের খোলা দিকটা—যেখানে ওই মেলোড্রামার অঙ্গ হিসাবে যখন-তখন যেখানে-সেখানে যে কোনো চরিত্র চলে আসে—দর্শককে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ের চমক এবং poetic justice-এর সুখ উপহার দেয়? যাত্রার ওই প্রচণ্ড আবেগ, যা মাইক্রোফোন এবং স্পটলাইট পরিপোষিত আণ্ডার-অ্যাকটিং সত্ত্বেও শ্রোতাকে দর্শককে ভিতরে ভিতরে দুলিয়ে দেয়?

আমরা দেখেছি যে, যাত্রার যা-কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তা তার একটি মেলোড্রামাটিক চরিত্রকেই গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। যে মেলোড্রামা কালিয়দমন যাত্রাতে ছিল না, ভক্তিরসে যার সন্ধান পাওয়া যায়নি, উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক-পৌরাণিক নাটকের প্যাটার্ন আত্মসাৎ করে যাত্রা সেই মেলোড্রামাকেই নিজের চরিত্র হিসাবে খাড়া করেছে। ইদানীংকালের যা-কিছু

অভিনবত্ব, রিয়্যালিজ্‌মের ছদ্মবেশ ধরে তা মূলত যাত্রার অতিনাটকীয় স্বভাবকেই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। গান ও ভক্তি, নীতিমূলক পৌরাণিক ঐতিহাসিক আখ্যানরস, এবং গীতাভিনয়ের সরণি বেয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর যাত্রা যেখানে এসে পৌঁছেছে তা অবিমিশ্র মেলোড্রামার পৃথিবী—এ যাত্রার সঙ্গে প্রাচীন যাত্রার ঐতিহাসিক ছাড়া আর কোনো যোগ নেই। এখানে এসেই যাত্রা জনপ্রিয়তার স্থায়ীতম ও ধ্রুবতম ভিত্তিটি লাভ করেছে। অট্টহাস্য, পদাঘাত, 'রে রে রে পাষণ্ড' গোছের সম্ভাষণ, অভিনয় ও সংলাপে অত্যুক্তি ইত্যাদি যাত্রার স্থায়ী অংশ হয়ে আমাদের চিন্তায় আসন নিয়েছে। পঞ্চু সেন সাধারণ মানুষের যে প্রচণ্ড 'মেলোড্রামার হাঙ্গার'-এর কথা বলেছেন, তা-ই এখন যাত্রার জনসমাদরের হেতু। একথা খেয়াল রাখা দরকার যে, সংগত ও নিপুণভাবে তৈরি মেলোড্রামার সঙ্গে শিল্পের কোনো বিরোধ নেই, বরং তা প্রকাশের বাহন হিসাবে আরো শক্তিশালী। সেই সঙ্গে এখানকার যাত্রায় কিছু পরস্পরবিরোধী প্রবণতাও লক্ষণীয়। যাত্রায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক বক্তব্য বলা হচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে 'বাবা তারকনাথ' বা 'সতী তুলসী'র মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও রক্ষণশীল বক্তব্যও প্রচার করা হচ্ছে। সবই সরল ছকে, শাদাকালোর স্পষ্ট বিভাজনে। বুদ্ধি দিয়ে ভাবলে জীবনকে যে জটিলতায় আচ্ছন্ন বলে মনে হয় তাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে যাত্রার এত সব আয়োজন শেষ পর্যন্ত সন্দেহ হয়, দু-একটি সম্মান-জনক ব্যতিক্রম ছাড়া,—সবই ব্যাবসার জন্য।

মননশীলতাকে যাত্রায় প্রায় সম্পূর্ণ পরিহার করা হলেও যাত্রার শক্তি ও প্রভাব অস্বীকার করার কিছু নেই। সে জন্যই, ১৯৭২-এ সংগীত নাটক অকাদেমি দিল্লিতে ঐতিহ্যগত নাট্যরূপগুলির সমকালীন ভূমিকা সম্বন্ধে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেছিলেন। উৎপল দত্ত সেই বৈঠকে রাজনৈতিক বক্তব্যপ্রচারের বাহন হিসেবে যাত্রার উপযোগিতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[২৮] গণনাট্য সঙ্ঘ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' খুব সাফল্যের সঙ্গেই অভিনয় করে। এমন-যে 'নবান্ন', যে-নাটক নতুন বাংলা নাটক ও গণনাট্যের উৎস হিসাবে আজ কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে—তারও খুব বেশি অভিনয় করা সম্ভব হয়নি কলকাতার বাইরে। তার কারণ, 'নবান্ন' করতে হত আলোকসম্পাতের ব্যবস্থাওয়ালা স্থায়ী স্টেজে, সম্ভবক্ষেত্রে ঘূর্ণমান মঞ্চে, অনেক কর্মীর সহযোগিতায়[২৯]। গণনাট্য সঙ্ঘ কেন 'রাহুমুক্ত'-এর বাইরে অন্য কোনো যাত্রা পালা তৈরি ও অভিনয়ের

কাজ হাতে নিল না তা আমার কাছে এক প্রহেলিকা। তবে এর উত্তর নিশ্চয়ই তখনকার গণনাট্য সঙ্ঘের অন্তর্বিরোধ এবং লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিবাদের ইতিহাসে খানিকটা নিহিত।

এখনও গ্রুপ থিয়েটারের মানুষদের মধ্যে যাত্রার লোকগ্রাহ্য ফর্মটি ব্যবহার করার তেমন আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠেনি। তবে সম্প্রতি অঙ্গনমঞ্চ নিয়েই যে-ধরনের শুচিবাই ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে তাতে গ্রুপ থিয়েটার যাত্রার ফর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে কতটা আগ্রহী হবে—সে সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, যাত্রাকে ব্যবহার করতে হবে যাত্রা-ব্যবসায়ের শর্তে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়, অনেকে নিরুপায় হয়ে যা করেছেন—বরং যাত্রাকে নিজের প্রকাশের বশংবদ বাহন করে নিয়ে, Off-Chitpore যাত্রার জন্ম দিয়ে। যাত্রা বাঙালির উচ্চ সংস্কৃতিতে সেভাবে গৃহীত হওয়ার প্রতীক্ষা করছে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. বলবন্ত গর্গী তাঁর *Folk Theatres of India* [University of Washington Press, Seattle 1966] বইয়েতেই যাত্রার আলোচনা করেছেন, এমন-কী গৌরীশংকর ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা'-তে (রবীন্দ্রভারতী, ১৯৭২) যাত্রারই ইতিবৃত্ত বলেছেন, কিন্তু আমরা ওই নামকরণের দ্বারা প্রভাবিত হতে রাজি নই।

২. দ্র. শিশির মজুমদার, "সরী পালার কথা", 'বহুরূপী' ৫১, (জুন ১৯৫৯) পৃ. ৫৬-৬৫। মুর্শিদাবাদের পুরোনো আলকাপ, বর্ধমানের 'লেটো'কেও লোকনাট্য বলা যেতে পারে।

৩. ১৯৭৫-এ প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধ "*Jatra* : The Popular Traditional Theatre of Bengal" [Coppola ইত্যাদি সম্পাদিত *Journal of the South Asian Literarure,* Vol x, Nos. 2-3-6, Asian Studies Centre, Michigan State University, pp. 87-107] এ প্রবন্ধের ভিত্তি হলেও মূলত বিদেশি পাঠকদের জন্য লেখা সে প্রবন্ধের সঙ্গে এর অনেক তফাত আছে।

৪. দ্র. শম্ভু মিত্র, 'প্রসঙ্গ : নাট্য', কলকাতা ১৯৭১, পৃ. ১৬৭।

৫. দ্র. "রঙ্গমঞ্চ", রবীন্দ্র রচনাবলী ৫ম খণ্ড (বিশ্বভারতী সংস্করণ), ৪৫১ পৃ.।

৬. দ্র. প্রবোধবন্ধু অধিকারী, "প্রাক্কার্ষ (Sic) ভারতে যাত্রাগান", অজিতকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'নাট্যদর্পণ', শারদীয়া ১৯৭৬ (৭-৩২), ৩২ পৃষ্ঠা।
৭. ..."in Jayadeva's *Gitagovinda* we have in literary form the expression of the substance of the Yatra, lyric songs, to which must be added the charms of music and the dance" দ্র. Keith, A. B. *The Sanskrit Drama*, 1924, London, Oxford University Press, p. 40.
৮. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, "যাত্রাগানের গোড়ার কথা", দ্র. 'যাত্রা উৎসব' স্মারক পুস্তিকা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৬, ৯-১৮ পৃষ্ঠা। (পরে শুধু 'স্মারক পুস্তিকা' হিসাবে এ বইটির উল্লেখ করা হবে)।
৯. ওই।
১০. 'গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য' (কলকাতা ১৯৫৯), ৭৬ পৃষ্ঠা।
১১. ৮-এর উল্লেখ, ১১ পৃষ্ঠা।
১২. 'নট নাট্য নাটক', ১৯৬৫, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ৯৬ পৃষ্ঠা।
১৩. ৺কেয়া চক্রবর্তীর নেওয়া ইনটারভিউতে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, পঞ্চু সেন, শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত প্রভৃতি মঞ্চে যাত্রাকে সমর্থন করেননি। "যাত্রা কর্মীদের দর্পণে" নামক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার (এপ্রিল-জুন ১৯৭১) এই ইনটারভিউটি সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত। দ্র. চিত্তরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত 'কেয়ার বই', ১৯৮১, নান্দীকার, কলকাতা, ৭১-৭৮ পৃষ্ঠা।
১৪. দ্র. শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পালাগানের পালাবদল" 'স্মারক পুস্তিকা', ৩২ পৃষ্ঠা।
১৫. অরুণকুমার নন্দী, "যাত্রার রূপান্তর", 'স্মারক পুস্তিকা', ৩৬ পৃষ্ঠা।
১৬. শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৩৩ পৃষ্ঠা।
১৭. ১৩ পাদটীকার উৎস, ৭৩ পৃষ্ঠা।
১৮. "রূপান্তরের শতবর্ষ", 'স্মারক পুস্তিকা', (২২-২৮), ২৬ পৃষ্ঠা।
১৯ দ্র. দিলীপ মৌলিক রচিত "আলোর বৃত্তে", 'অমৃত' (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯), ১০৩ পৃ.।
২০. ১৯৬২-তে রবীন্দ্রকাননে যাত্রা উৎসবের শেষ দিনে রঙিন আলোর ব্যবহার

করেন শ্রীতাপস সেন। ১৯৬৩ তে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'স্বামী বিবেকানন্দ' পালাতেও রঙিন আলোক-সম্পাত করা হয়েছিল।

২১. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কর্ণার্জুন' নাটক স্পটলাইট ব্যবহার শুরু করলেন, তখন থেকে অভিনয়ে মুখের অভিব্যক্তির সুযোগ হল। তার আগে আবেগের প্রধান বাহন ছিল কণ্ঠস্বর।

২২. ১৯৬৭-তে তরুণ অপেরার 'হিটলার' পালাতে সর্বপ্রথম টেপ-রেকর্ডার ব্যবহৃত হয়। এতে আলোর কৌশলও কম ছিল না।

২৩. অরুণকুমার নন্দী তাঁর "যাত্রার রূপান্তর" প্রবন্ধে ['স্মারক পুস্তিকা', ৩৫—৩৯ পৃষ্ঠা] সম্ভবত হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

২৪. ৺কেয়া চক্রবর্তীর পূর্বোল্লেখিত রচনা, ৭৫ পৃষ্ঠা।

২৫. ওই।

২৬. কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে ['স্মারক পুস্তিকা', ২৮ পৃষ্ঠা] যাত্রার দশরকম পরিবর্তনের যে-তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে এগুলি অন্তর্ভুক্ত।

২৭. ৺কেয়া চক্রবর্তীর ইনটারভিউ ; 'কেয়ার বই', ৬৬ পৃষ্ঠা।

২৮. দ্র. সুরেশ অবস্থী (সম্পা) *Jcurnal of the Sangeet Natak Akademi* 21, ((July-September, 1972), ১৬ পৃ.

২৯. "Navanna' as a big drama requiring the services of many I. P. T. A. members and friendly artists, limited I. P. T. A.'s activities to Calcutta, to well-constructed stages with lighting arrangements, and, therefore, had to be staged before only a restricted number of people". দ্র. আই. পি. টি. এর সংকলিত রিপোর্ট, সুধী প্রধান-এর *Marxist Cultural Movement in India*, 1979, (Calcutta), পৃ. ২৫৮। অন্যত্রও দেখি 'নবান্ন'-এর পরিচালক শ্রীশম্ভু মিত্র ঘূর্ণমান মঞ্চের বাইরে এ নাটক করতে দ্বিধা করছেন। (ওই, পৃষ্ঠা ২৯৪)।

ভারতবর্ষের 'জাতীয়' নাট্যরূপ : একটি বিতর্ক

১. ভূমিকা

কয়েক বছর আগে শ্রীশম্ভু মিত্র বক্তৃতায় বা লেখায় নাটকের 'বিশিষ্ট ভারতীয় রূপটি'[১] কী হবে এ নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলতেন এবং নিজেই তার একটা উত্তরও দেবার চেষ্টা করতেন। তাঁর নিজের জবানিতেই[২] পাই, শ্রীঅন্নদাশংকর রায় বহু বছর আগে এ বিষয়ে তাঁর মনে প্রথম ভাবনাটি বুনে দিয়েছিলেন। শ্রীরায় তখন তাঁকে বলেছিলেন, কলকাতার থিয়েটার অর্থাৎ পেশাদার নাট্যকলা নিকৃষ্টতম পশ্চিমি থিয়েটারের নকলনবিশি মাত্র। যদি আমাদের নিজেদের একান্ত একটি থিয়েটার তৈরি করতে হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের নাটক থেকেই তা দাঁড় করাতে হবে। শ্রীমিত্র জানাচ্ছেন, প্রথমে তিনি একথার মানে ঠিক ধরতে পারেননি ; পরে ১৯৫৬-তে 'রক্তকরবী' প্রযোজনার সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে, ওই নাটকটি আর কিছু নয়, "ভারতীয় নাট্যরূপণের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত"[৩]। তখন থেকেই তাঁর অব্যাহত অনুসন্ধান চলেছে, প্রবন্ধে বক্তৃতায় আলোচনায় বারবার বলেছেন, একটি ভারতীয় নাট্যরূপ চাই, চাই আমাদের একটি 'নিজস্ব' 'জাতীয়' নাট্যকলা—যা অন্যান্য দেশের 'নিজস্ব' এবং জাতীয়' নাট্যকলার সঙ্গে তুলনীয় অথচ সমান্তরাল।

যতদূর জানি, শ্রীশম্ভু মিত্রের এই প্রস্তাব বা অনুসন্ধান নিয়ে কোনো ব্যাপক আলোচনা কখনো হয়নি। গ্রুপ থিয়েটারের নানা দল কখনো কখনো রুজি-রোজগারের সমস্যা নিয়ে সেমিনার ডেকেছেন, সেখানে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা করার সুযোগ বা আগ্রহ কম থাকাই স্বাভাবিক ছিল, কাজেই এটি অগ্রাধিকার পায় নি। দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকের বিশেষ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানেও এ বিষয়ে কোনো তর্ক উঠেছে বলে খবর পাইনি। তবে নানা কাজের সূত্রে 'বহুরূপী'-র কাছাকাছি এসেছিল এমন দু-একটি দলের কিছু ব্যক্তিকে এই প্রশ্নটা একটু উৎসুক করে তুলেছিল। যেমন শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই নানা প্রসঙ্গে শ্রীমিত্রের এই প্রস্তাবটির উল্লেখ করতেন। থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়ের এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষের

সাম্প্রতিক দুটি প্রবন্ধেও[4] বিষয়টির উল্লেখ লক্ষ করলাম। এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার মতো নিঃসংশয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে খুব কমই। এটুকু হয়তো বলতে পারি যে, শ্রীমিত্র স্বয়ং তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৮) নাটকটি এইরকম একটা বিশিষ্ট নাট্যাদর্শের কল্পিত মডেল সামনে ধরেই রচনা করেছেন। শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা' (১৯৬৯)-ও সম্ভবত এই রকম একটা অস্পষ্ট আদলকে ভিত করে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোনো দলের কোনো প্রযোজনায় বা আর কোনো বিশিষ্ট নাট্যকারের কোনো নাটকে স্পষ্টভাবে এই আদর্শটা ধরবার চেষ্টা করা হয়নি। অবশ্য আমি একথা অস্বীকার করছি না যে, নিজেদের অজ্ঞাতসারে, হয়তো অচেতনভাবে, কিংবা একটা কিছু এরকম ভেবে নিয়ে, কেউ কেউ কখনো নাটকের অন্য ধরনের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কখনো দেশী মতে, কখনো বিদেশী নাটকের ফর্ম ধার করে। কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রয়াসই নিজস্ব ভারতীয় নাট্যকলার সন্ধানে একটি পদক্ষেপ বলে বিজ্ঞাপিত হয়নি, বা তার অন্য কোনোরকম তত্ত্ব বা থিয়োরি খাড়া করা হয়নি। বাংলাদেশে প্রচলিত আমদানি-করা নাট্য আদর্শের প্রতি বিতৃষ্ণা অনেকেই পোষণ করেছেন, কিন্তু শ্রীমিত্রের আগে কেউ নতুন কোনো নাট্য-আদর্শ তৈরির এতটা বিশদ প্রোগ্রাম দেননি।

এখন এই প্রশ্নটা একটু আড়ালে পড়ে গেছে। আগেই বলেছি যে, গ্রুপ থিয়েটার বাঁচা-মরার নানা জরুরি সমস্যা নিয়ে পাগল থাকার ফলে এই তাত্ত্বিক বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেয়নি। শ্রীমিত্রও সম্ভবত চতুর্দিক দেখেশুনে একটু নিরুৎসাহ হয়ে থাকবেন, ফলে তিনিও এ সম্বন্ধে তেমন আর উচ্চবাচ্য করছেন না। এমন-কী 'বিশ্বভারতী'তে অধ্যাপক হিসেবে তিনি সেখানে নাট্যচর্চাবিষয়ে যে-সব প্রস্তাব[5] দিয়েছেন তাওেও এ বিষয়টি তার প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। আমি আবার প্রশ্নটা খুঁচিয়ে তুলছি এইজন্য যে, আমি মনে করি প্রশ্নটাকে যতটা তাত্ত্বিক মনে করা হয়েছে এখন পর্যন্ত, ততটা তাত্ত্বিক নয় এটা। হয়তো এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ ভালোমন্দের দুএকটা রহস্যও জানা যাবে। কাজেই ব্যাপারটা একটু যাচিয়ে দেখা চলে।

২. 'জাতীয়' নাট্যরূপ বলতে শ্রীমিত্র যা বোঝেন

যে-ইংরেজি প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছি, তাতেই আদর্শ ভারতীয় নাট্যের রূপটি কী হবে সে সম্বন্ধে শ্রীমিত্রের অল্প আলোচনা রয়েছে। তা ছাড়া তাঁর অন্যান্য

প্রবন্ধেও[৬] নানা আকারে তিনি এই প্রসঙ্গ এনেছেন। আমি সে সমস্তের উপর ভিত্তি করে সেই আদর্শ ভারতীয় নাট্যরূপ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাগুলিকে কয়েকটি সূত্রের বা লক্ষণের আকারে নিচে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে, সংস্কৃতিগত ও গঠনগত—এই দুভাগে ওই লক্ষণগুলিকে ভাগ করা সম্ভব :

সংস্কৃতিগত লক্ষণ

এক. এটি ভারতবর্ষের 'নিজস্ব', 'বিশিষ্ট' নাট্যরূপ হবে—যা থেকে সহজেই ভারতবর্ষকে ধরা যায়। জাপানের যেমন আছে নো-কাবুকি-কিয়োগেন[৭], কিংবা জার্মানির যেমন আছে গয়টে শিলারের নাটক, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার যেমন আছে স্ট্রিণ্ডবার্গ ইবসেনের নাটক[৮]। এই নিজস্বতার চেহারাটি কী? "পাণ্ডুলিপি"তে শ্রীমিত্র বলেন, "ভারতীয় থিয়েটারে···বিভিন্ন স্তরের ব্যাপ্তি আছে। অতি সাধারণ দৈনিক কথা-বার্তা থেকে গভীর দার্শনিক উপলব্ধির কথা। সমস্তই একটা লীলা[৯]। এই যে মানুষ ছুটোছুটি করছে, ভুল করছে, আবার কখনো বা গভীর উপলব্ধিতে শান্ত হচ্ছে, এ সমস্তই তো একটা show-এর মতো, জগৎ জুড়ে যেন একটা নাচ চলেছে, একেই বলি লীলা।" [৪ পৃষ্ঠা]।... "বৈষ্ণব কবিতার মতো বা অবধী দোঁহার মতো একটা অনর্গলতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যসম্পদের লক্ষণ। একটা উন্মুক্ততা। যেখানে কেবল পরিশ্রম নয়, অপরের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ামাত্র সজারুর মতো সবগুলো কাঁটা উঁচিয়ে ধরা নয়, বরঞ্চ হওয়া, নিজে হয়ে ওঠা, যাতে একটা অনর্গল অন্তরঙ্গ রূপ ফোটে। আর সেই নাট্যাভিনয়ই তখন লীলার চেহারা নেয়। খুব সহজ, খুব সরল, কিন্তু কেমন যেন নেশার মতো গাঢ়। তাই আমাদের অভিনয়ের মূলকথা সেই অন্তরঙ্গতা, মঞ্চের ওপরকার সমস্ত খুঁটিনাটি যেন এক গাঢ় নেশাচ্ছন্ন সংগীতের সুরে বাঁধা।" [পৃ. ৫-৬]।

বলা বাহুল্য, শ্রীমিত্রের প্রকল্পে জাতীয় 'নাট্যরূপ' এবং 'নাটক' ও 'নাট্যকার—এ তিন সম্মিলিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক লক্ষণটির আমরা নাম দিতে পারি বিরোধী-লক্ষণ, অর্থাৎ এতে ভারতীয় নাট্যরূপটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিজস্ব নাট্যরূপ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। "পাণ্ডুলিপি"তে একটু উষ্মাভরে শ্রীমিত্র মন্তব্য করেছেন,

"আমরা আমাদের ভারতীয়ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো যেন না ভুলি। আমাদের থিয়েটার আমাদের মতো থিয়েটার। সে থিয়েটার যদি সাহেবরা না বোঝে তাতে কিছু যায় আসে না।" [পৃ. ২]।

দুই. দ্বিতীয় স্তরে শ্রীমিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই নাট্যরূপের যোগ ঠিক কোন্ জায়গায় ঘটছে সে-দিকটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এখানে তিনি হাতের কাছেই উদাহরণ পেয়ে গেছেন কিছু—রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলি। শ্রীমিত্রের মতে রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলি আদর্শ ভারতীয় নাট্যরূপের দৃষ্টান্ত, কিংবা তার ভিত হওয়ার যোগ্য, কেননা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে একমাত্র এই নাটকগুলিরই যোগ আছে। শ্রীমিত্রের কথায়, এগুলিতে ভারতের "স্বর্ণযুগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন"[১০] ঘটেছে; আর এগুলিতে রয়েছে "আমাদের সংস্কৃতির গভীর রূপটি"[১১]। অর্থাৎ এখানে যেন এইরকম ইঙ্গিত পাই যে, প্রাচীন অর্থাৎ মুসলমান-শাসনের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষেই ছিল আমাদের স্বর্ণযুগ, এবং তখনই প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের সংস্কৃতির গভীর রূপ।

তিন. অথচ আধুনিক ভারতবর্ষের সঙ্গেও এই নাটকের যোগ আছে—ইতিহাসের দিক থেকে না হোক, বাণীর দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথেরই 'রক্তকরবী' আর 'মুক্তধারা' যেমন। এগুলির ফ্রেমটি প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল ভারতবর্ষের, কিন্তু বলার কথাটি একালের। "আমরা যখন রবীন্দ্রনাথ করি বা তাঁর নাটকের অভিনয় দেখি তখন আমাদের সত্তার অন্তস্তল পর্যন্ত কাঁপে।" [পাণ্ডুলিপি ২ পৃ.]।

রূপগত লক্ষণ

মূলত 'রক্তকরবী'র নির্দিষ্ট শিল্প ও সাংগঠনিক চেহারা থেকে নাটকের ভারতীয়ত্বের যে বিশেষত্বগুলি শ্রীমিত্র নিষ্কাশন করেছেন সেগুলি এই:

এক. একই দৃশ্যে বা পটভূমিকায় এ নাটকে পাশাপাশি একাধিক ঘটনার (মাল্টিপল অ্যাকশন) অভিনয় চলে;

দুই. এতে মানুষের ভিতরকার জীবন ও বাইরেকার জীবন—দুইই তুলে ধরা হয়; এবং

তিন. এতে ব্যক্তি ও প্রতীক—উভয়কেই পাশাপাশি পাওয়া যায়।[১২]

আমার যতটা নজর গেছে, তাতে নাট্যকলার ওই উদ্দিষ্ট ভারতীয় রূপটি সম্বন্ধে এর বেশি কিছু বোধ হয় শ্রীমিত্র বলেননি। নানা কারণেই মনে হতে পারে, এক জায়গায় খুব গুছিয়ে যদি শ্রীমিত্র এ সম্বন্ধে বলতেন তাতে আমাদের খুব সুবিধে হত। ওই নাটকের ভাষা কী রকমের হবে, রূপকের খোলস ছেড়ে তা কখনো খুব রূঢ়, প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ছোঁবে কি না—গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস' যেমন করে ছোঁয়—এই সব অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। যাই হোক, তাঁর ভাবনার ছকটি এখানে যতটুকু আমি তৈরি করতে পেরেছি, তা থেকেই কতকগুলি প্রশ্ন উঠে পড়ে। এই প্রশ্নগুলি তোলবার আগে শ্রীমিত্র কেন এই আদর্শ ভারতীয় নাট্যরূপের সন্ধানে নামলেন, কোন্ ইতিবাচক নির্দেশ ও নেতিবাচক বিতৃষ্ণা তাঁকে ওই লক্ষ্যে ঠেলে দিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক। মূলত তাঁরই কথার উপর নির্ভর করে এই বিবরণ।

তিনি লক্ষ করেছেন, স্বাধীনতার পর জাতি হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এই জাতির আত্মবিশ্বাসের একটি বড়ো উপাদান তার প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি। কিন্তু তা 'অনাহত' থাকেনি। কালক্রমে আমরা শিল্পে-বাণিজ্যে যেমন, তেমনি সংস্কৃতিতেও ইউরোপ থেকে ধার নিয়েছি। ভারতবর্ষের আধুনিক থিয়েটার এইরকম একটি সাংস্কৃতিক ঋণ।

কিন্তু এ থিয়েটার কর্মসংঘাতময় ('অ্যাক্‌শন-ওরিয়েন্টড') এবং বহির্জীবন-নির্ভর ('অবজেকটিভ'), ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুগত হয়ে ভাবমূলক ('কনটেম্প্লেটিভ') নয়। সুতরাং তিনি সুনির্দিষ্ট একটি সংকল্প নিলেন :

> "আমি অন্য এক ধরনের নাটক তৈরি কথা ভাবছি। তাতে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকবে, সে তার চারপাশের সব কিছুর সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবনকে আবিষ্কার করবে। কর্মসংঘাতময় নাটকে আমরা বাইরের লোক, একটা কল্পিত দেয়ালের আড়াল থেকে অন্যদের আচরণ লক্ষ করি মাত্র। আমি যে আরো ভাবাশ্রয়ী "ভারতীয়" নাটকের কথা বলছি তাতে আমরা ঐ চরিত্রটির আরো কাছে যাই, তার অন্তরের ভাবলোকে আরো বেশি ঢুকে পড়ি।"[১৩]

দেখা যাচ্ছে, এখানেও 'দ্বন্দ্ব' ব্যাপারটি থাকছে। এবং এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে শ্রীমিত্রের ঐ 'লীলা'র ধারণার সম্পর্কটি ঠিক কী, স্পষ্ট হচ্ছে না। 'চাঁদ বণিকের পালা'-কেও ঠিক "লীলা"-র বহুবিধ দৃষ্টান্তের সংগঠন বলা চলে কিনা সন্দেহ। যাই হোক, শ্রীমিত্রের মতে ইয়োরোপের কর্মসংঘাতময় নাটক

ইয়োরোপেরই নিজস্ব জিনিস, তারই ইতিহাস ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তি। কিন্তু ভারতবর্ষে তা আমদানি-করা দ্রব্য, এদেশের সাংস্কৃতিক জমির স্বাভাবিক ফসল নয়। ফলে এখানকার মাটিতে তার শিকড়ও ঢোকেনি, আর এদেশের ঐতিহ্যের অংশও তা হয়ে ওঠেনি।

শ্রীমিত্রের ভারতীয় থিয়েটার যে অন্যদের, যেমন ধরুন আদ্য রঙ্গাচার্যের, ভারতীয় থিয়েটার নয়, তা স্পষ্ট। শ্রীরঙ্গাচার্য বলেন, "এক সামগ্রিক ভারতীয় থিয়েটারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে" তিনি "নিঃসংশয়। প্রদেশ, ধর্ম ও ভাষার আপাত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই ভারতীয় থিয়েটার শুধু প্রাচীনকালেই ছিল না, আধুনিক কালেও রয়েছে। এই ভারতীয় থিয়েটার ভারতীয় জনসাধারণের থিয়েটার, যার আবির্ভাব সংস্কৃত নাটকেরও আগে।"[১৪] দিল্লির নানা সেমিনার ও ন্যাশন্যাল স্কুল অব ড্রামার কল্যাণে যে নতুন ভারতীয় থিয়েটারের বোধ গড়ে উঠেছে তার সঙ্গেও শ্রীমিত্রের কল্পিত থিয়েটারের কোনো সম্পর্ক নেই। এ দুটো দেশকালধৃত নাট্যকলা, আর শ্রীমিত্রের বিষয় নাট্যরূপ-বিশেষ। এ তাঁর নিজস্ব মৌলিক প্রকল্প।

৩. ইয়োরোপের নাট্যকলা সম্বন্ধে শ্রীমিত্রের ধারণা

এ প্রশ্ন উঠবে যে, ইয়োরোপের নাটক 'কর্মসংঘাতময়'—এই সিদ্ধান্ত কি খণ্ডিত এবং একদেশদর্শী নয়? শ্রীমিত্র কি ভারতীয় নাটকের সঙ্গে ইয়োরোপীয় নাটকের চারিত্রিক দূরত্ব দেখাতে গিয়ে এক ধরনের অতিসরলীকরণের আশ্রয় নেননি? কর্মসংঘাতময় নাটক ইয়োরোপের নাটকের সবচেয়ে বড়ো ধারা, একথা অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু বহুকাল থেকেই তো ইয়োরোপে একটি সমান্তরাল এবং বিরোধী নাট্যধারাও চলে আসছে, প্রকাশ্যভাবে যার নিদর্শন আমরা পাই স্ট্রিণ্ডবার্গে, মেটারলিংকে, হাউপ্টমানের শেষদিককার দু-একটি নাটকে, চেখফে, সিং বা ইয়েটসের কাব্যনাট্যে, আলফ্রেড জ্যারি-র 'উবু রয়'-এ, আরো অজস্র ইম্প্রেশনিস্ট ও এক্সপ্রেশনিস্ট নাটকে। এরই সাম্প্রতিক চেহারা লক্ষ করি বেকেটের নাটকে এবং ইয়োনেস্কো প্রভৃতির 'অ্যাবসার্ড' নামে ছাপ-মারা নাটকাবলিতে। এই নাটকের অনেকগুলিতেই ব্যক্তির বহির্জীবনের ও অন্তর্জীবনের সমস্যা এসেছে, বাস্তব ও প্রতীকের যুগ্ম-ব্যবহার ঘটেছে, এবং কোনো-কোনোটিতে মাল্‌টিপল অ্যাকশন বা একসঙ্গে একাধিক ঘটনার অভিনয়ও চলছে। তা হলে কোন্ অর্থে এই নাটককে

শ্রীমিত্র তাঁর কল্পিত ভারতীয় নাট্যকলার প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করবেন? এই 'জাতীয়' নাট্যরূপের সাংগঠনিক লক্ষণগুলি তিনি যা-যা দিয়েছেন, সেগুলির সবই কি পাশ্চাত্যের নাটকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীমিত্রের পক্ষে একথা বলতে পারি যে, ইয়োরোপের যে নাটক বাংলাদেশ প্রথম ধার করেছিল এবং যা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপে ব্যাবসা চালিয়ে এসেছি, তা নিঃসন্দেহে কর্মসংঘাতময় এবং বাস্তবিকতা, চমক এবং বাগ্মিতার দ্বারা ভারাক্রান্ত। কিন্তু আমাদের পেশাদার থিয়েটারের ইয়োরোপীয় থিয়েটার সম্বন্ধে যে বিচার, তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মতো সর্বনেশে ব্যাপার আর কিছু নেই। কেন শ্রীমিত্র ইয়োরোপের নাটকের গায়ে এরকম একটা মোটা মার্কা দেগে দিলেন, সে কথা জানতে ইচ্ছে করে। ইয়োরোপের 'অন্য' নাট্যধারার খবর এদেশে তাঁর মতো আর কজন রাখে? ইয়োরোপেও ব্যাবসায়িক স্টেজের নাটক, আর বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, সচেতন দর্শক কিংবা কোথাও কোথাও সরকারি দাক্ষিণ্যে তৈরি জাতীয় নাট্যশালায় পরিবেশিত নাটকের মধ্যে যে একটা স্পষ্ট তফাত আছে তা শ্রীমিত্রের চোখে পড়েনি, একথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। হয় অজ্ঞতা না হয় অসহিষ্ণুতা সাধারণভাবে আমাদের বিচারকে বিভ্রান্ত করে— সে বিচার নিজেদেরই হোক, আর অন্যদেরই হোক। ইয়োরোপীয় নাটক সম্বন্ধে প্রথম ত্রুটিটি শ্রীমিত্রের থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়টিই বা কেন দেখা দেবে?

৪. 'জাতীয়' নাট্যরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন

এবার ভারতবর্ষের 'জাতীয়' নাট্যরূপটি সম্বন্ধে শ্রীমিত্রের যে-পরিকল্পনা, সে সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই প্রশ্নগুলি মূলত 'জাতীয়' কথাটার অর্থ নিয়ে—সেগুলিকে এইভাবে সাজানো হচ্ছে—এই জাতি বাঙালি না ভারতীয়? 'জাতীয়' কি এই অর্থে যে, 'জাতির সকলের কাছে গৃহীত ও স্বীকৃত'? কিংবা এই অর্থে যে, এ নাট্যকলা কেবল আমাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, বিদেশী কোনো সংক্রমণের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং বিদেশী প্রভাব পড়লেই তার 'জাতীয়তা' নষ্ট হয়ে যাবে? 'জাতীয়' নাট্যকলা বলতে কি শ্রীমিত্র একটি জাতিপিছু একটি নাট্যরূপ বুঝবেন, তার বাইরে আর কিছু জাতীয় নয়?

৫. 'জাতি' কথাটির অর্থ কতখানি ব্যাপক

'জাতি' বলতে শ্রীমিত্র কী বোঝাচ্ছেন, বাঙালি না ভারতীয়—এটা একটু ছেলেমানুষি প্রশ্ন, কারণ 'ভারতীয়' কিংবা 'ভারতবর্ষের'—এ ধরনের বিশেষণ তিনি ব্যবহার করেছেন সব সময়। কাজেই এখানে তিনি কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখেননি। রাজনৈতিক অর্থে ভারতীয়রা নিঃসন্দেহে একটি জাতি, সাংস্কৃতিক অর্থেও খানিকটা তাই। কিন্তু এখানেই দু-একটা কথা আসে। সাংস্কৃতিক ভাবে একটি নিশ্ছিদ্র অখণ্ড নিস্তর জাতীয়তা কি ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে? রবীন্দ্রনাথের হিন্দুবৌদ্ধ মীথের যে-জগৎ, একজন ভারতীয় মুসলমান—রামরাজ্যে রামনবমীর মিছিলের ধাক্কায় অস্তিত্ব-গুঁড়িয়ে যাওয়া ভারতীয় মুসলমান—কতখানি আত্মীয়তা খুঁজে পায় তার সঙ্গে? কিংবা বেশ কয়েক কোটি হরিজন, যাদের মাঝে মাঝে জাতীয় বিনোদন হিসাবে এদেশে দগ্ধ করা হয়,—তারা? কিংবা আর্য প্রভাবের বাইরে পড়ে-থাকা আদিম জনগোষ্ঠী, যাদের অনেকের জমিজমা জাতীয় সংহতির জন্য একসের নুনের মূল্যে এক বিঘা পরিমাণে উদরসাৎ করা হয়েছে? শুধু লেখাপড়া-জানা লোকের জন্য কি এ নাটক? শুধু শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দর্শকের সুখবিধানের জন্য? খুব অসম্পূর্ণ শিল্প-প্রসারের ফলে ভারতীয় মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে যে-ব্যক্তিত্ববোধের উদ্‌গম হয়েছে এবং যে-ব্যক্তিত্ব কখনো কখনো যূথের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে—শুধু তারই কথা বলবে এ নাটক? আমাদের জাতিত্বের কি একটা স্তর বা মাত্রা আছে?

বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য ভারতবর্ষের কতকগুলি নির্দিষ্ট জাতীয় প্রতীক আছে যা থেকে এই দেশটাকে চেনে বিদেশের লোকেরা। হিন্দু ধর্মের নানা প্রতীক ও প্রতিমা, মহারাজা, শাড়ি-পরা মেয়ে, টিকিধারী ব্রাহ্মণ, হাতি, রাস্তার ষাঁড় ও ভিখিরি। এইসব ছাঁকা, সরল প্রতীকে ভারতবর্ষের সমগ্রতা ও বৈচিত্র্য কতটা ধরা পড়ে? কাজেই 'জাতীয়' নাট্যরূপ বলতে ঠিক কী বুঝব, কতটা তার ক্ষেত্র, জাতির কতখানি অংশকে তা ধরতে পারছে সে কথাগুলি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

এর মধ্যে আরো একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। এ কথা সত্য যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক থিয়েটার বলতে প্রায় তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি। কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে প্রচুর নাটক হয়েছে, তাদের পালিশ ও ক্ষমতার অসমানতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নাটক যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সে সম্বন্ধে অন্তত কিছু লোকের

ধারণা জন্মেছে। নইলে নাটকের দল বা অভিনেতাদের উপর আক্রমণ হত না, তুয়েকজনের করুণ জীবনান্তও ঘটত না। শ্রীমিত্রের 'ভারতীয়' নাট্যরূপে রাজনৈতিক বক্তব্যের কি কোনো জায়গা থাকবে? নাকি রাজনৈতিক বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে বা এড়িয়ে বা ধামাচাপা দিয়ে ব্যক্তির দিকে মনোযোগ টানার ব্যাপারটাই থাকবে শুধু? অর্থাৎ ভারতবর্ষের এখনকার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক যা অবস্থা, তাতে শম্ভু মিত্রের প্রস্তাবমতো নাটকে ব্যক্তির সংকটই অগ্রাধিকার পাবে কি না, সে প্রশ্ন মোটেই অবান্তর নয়, তার কারণ ভারতবর্ষের বহু শ্রেণীগত সমস্যা বা সংকট এখনও নাটকে মনস্ক বুদ্ধিদীপ্তভাবে এসে পৌছোয়ই-নি। জোতদার-বর্গাদার কিংবা হিন্দু-মুসলমান কিংবা বিলাস ও ক্ষুধার বিরোধ নিয়ে সরল আবেগ বা রংতামাশার নাটক হয়েছে কিন্তু সে সব সমস্যার বয়োপ্রাপ্তের বিচার নাটকে প্রতিফলিত হয়নি। নাটক যদি একটা দেশের সমাজের সঙ্গে দায়িত্বের দিক থেকে যুক্ত হয় সেটা কীভাবে দেখা যাবে শ্রীমিত্রের ফ্রেমে?

ইণ্টারন্যাশন্যাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট এবং তার ভারতীয় সদস্যরা এবং দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যভোগী কিছু ব্যক্তি গত কয়েক বৎসর ধরে ভারতবর্ষের নাট্যপ্রয়াসকে রাজনৈতিক চিন্তা থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা যে চালিয়ে আসছে সেটা একটু চক্ষুষ্মান লোকের কাছে ধরা না পড়ে পারে না। ১৯৫৬-এ বম্বেতে আন্তর্জাতিক থিয়েটার সেমিনারে জোর দেওয়া হয়েছিল লোকনাট্যের উপরে; ১৯৬৬-এ দিল্লিতে অনুরূপ সেমিনারের বিষয় ছিল 'টোট্যাল থিয়েটার' বা সামগ্রিক নাট্যকলা। এইসব কেন্দ্রীয় র‍্যাকেটের কাছাকাছি থাকা পণ্ডিতদের চিন্তায় 'নাট্যশাস্ত্র', 'রামলীলা', 'নৌটংকি ইত্যাদি যত খেলা করত ভারতীয় জীবনের বাস্তব ('লীলা' তাকে বলব কিনা জানি না) সমস্যা ও সংকটের ব্যাপারটা তেমন করে আমলই পায়নি। ১৯৬৬-র সেমিনারে দর্শক হিসেবে এই লেখক লক্ষ করেছিল, প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটার বা তার কল্পিত রূপকে 'টোট্যাল থিয়েটার' প্রতিপন্ন করতে ভারতীয় পণ্ডিতদের কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! পরবর্তীকালে লোকনাট্য নিয়ে এদের মাতামাতির মধ্যেও থিয়েটারকে মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তোলার যে ক্ষীণ প্রবণতা এদেশে দেখা যাচ্ছিল তার বিপরীত বা পালটা একটা নাট্য তৈরি করার চেষ্টাই দেখা যায়। শ্রীমিত্র এই ধরনের তৃতীয় কোনো বিকল্প গড়ে তুলতে চেয়েছেন কিনা জানি না। তবে সংগীত-নাটক অকাদেমীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের পর থেকেই

তাঁর মনে 'ভারতীয় নাট্যরূপ'-এর এই থিসিসটি তৈরি হতে শুরু করেছে—তা বোধ হয় কমবেশি সত্য। এ থেকেই যে-প্রশ্নটা পরমুহূর্তে জেগে ওঠে, সেটা আগের অধ্যায়ের সাজানো ক্রম ভেঙে আমরা আগেই নিয়ে আসছি।

৬. এক জাতি এক নাট্যরূপ ?

নাটকের 'বিশিষ্ট ভারতীয় রূপ' কথাটির মধ্যে শ্রীমিত্র যেন এইরকম একটি একবচনের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, যেন বা মাত্র একটি রূপের মধ্যেই ওই নাট্যধারণার অভিব্যক্তি ঘটবে। আমার ধারণা, এমন কথা বললে ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার উপরে একটা অসংগত নিঃস্বতা চাপিয়ে দেওয়া হয়। জাপানের 'জাতীয়' নাট্যরূপ কমপক্ষে দুটি—যদি কিয়োগেনকে নো-র অংশ হিসেবে, আর কাবুকি আর বুনরাকুকে প্রকরণের বাইরেকার দিক থেকে, এক করে দেখি। দুয়ের ঐতিহ্য, পটভূমিকা এবং দর্শকও সম্ভবত—আলাদা। জাপানের 'জাতীয়' নাট্যরূপ এ দুয়ের কোন্‌টি ?

আবার অনেক দেশেই নাট্যকলা সাধারণত তিনটি ধারায় বিকাশ লাভ করেছে—ক্লাসিকাল, লোকনাট্য এবং ইয়োরোপীয় ধরনের আধুনিক নাট্যকলা। কোন্‌টি 'জাতীয়' নাট্যরূপের একমাত্র চেয়ারখানা দখল করবে ? ভারতবর্ষে একদিকে আছে নিখুঁত সূত্রবদ্ধ কেরলের কথাকলি—যাকে এখনকার ভারতীয় ক্লাসিকাল নাট্যরূপ বলতে পারি ; অন্যদিকে আছে আঞ্চলিক লোকনাট্যের অতীব ঐশ্বর্যময় মোজেইক—বাংলার গ্রামীণ যাত্রা, মহারাষ্ট্রের তামাশা, গুজরাটের ভাবই, উত্তর প্রদেশের রামলীলা, মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থানের নৌটংকি, আসামের অঙ্কীয়া নাট, কর্ণাটকের যক্ষগান, অন্ধ্রের কুড়িয়ত্তম্‌। এদের মধ্যে কোন্‌টি ভারতের বিশিষ্ট নাট্যরূপ হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবে ? তা ছাড়া সংস্কৃতের সুদূর আধারে রক্ষিত প্রাচীন নাট্যকলাও কি হৃত ও বিস্মৃত থাকবে ? পোলাণ্ডের ইয়ার্জি গ্রোটাউস্কি 'শকুন্তলা' নামিয়েছিলেন, নিউ ইয়র্কের নেবারহুড প্লেহাউজ সেই ১৯২৪-এ করেছিল 'মৃচ্ছকটিক'[১৫]। আমরা কেন তার পুনরুদ্ধার করব না—অন্তত তার যতখানি উদ্ধারযোগ্য ততটা ? তাও কি বিশিষ্ট ভারতীয় নাট্যরূপ আখ্যাটির দিকে হাত বাড়াবে না ? এখানে আগের অংশের দু-একটি কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি যে, একটা জাতির বিকাশের নানা স্তর আছে, তার সংস্কৃতির মধ্যেও নানা বিরোধ, বৈচিত্র্য, টেনশন আছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংস্কৃতির উপাদান ও প্রবর্তনা আলাদা,

রাজার সংস্কৃতি আর প্রজার সংস্কৃতি এক নয়। ভৌগোলিকভাবেও এদেশে সংস্কৃতির রকমফের ঘটে। সেক্ষেত্রে একটি অবিমিশ্র ভারতীয় নাট্যরূপ কেন আশা করব—যদি কর্ণাটকী ও উত্তর ভারতীয় মার্গ সংগীতের একটিমাত্রকে বিশিষ্ট 'ভারতীয়' সংগীত বলে বেছে না নিই? রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে ভারতবর্ষের এই বিপুল মাত্রা, তার আত্মিক দর্শন ও বাণিজ্যবুদ্ধি, তার কৃষিকেন্দ্রিক সারল্য ও অদৃষ্টবাদ, জাতিভেদের কুশ্রীতা, সাম্প্রদায়িকতার মালিন্য, তার আর্থিক শোষণ ও চূড়ান্ত দারিদ্র্য, তার মধ্যবিত্ততা ও আভিজাত্য সমস্ত কিছু প্রকাশ করার ফ্রেমটি পাওয়া যাবে—এ দাবিকে যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভারতবর্ষের রিয়্যালিটিকে প্রকাশ করবার কি ওই একটিমাত্র পথ? ভবিষ্যতের সমস্ত নাটকই শ্রীমিত্র ওই একটিমাত্র চেহারায় দেখতে চান? "পাণ্ডুলিপি"-তে যেমন তিনি আশা প্রকাশ করছেন, "আমাদের মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে সেই লীলার জায়গা হোক। সেই গাঢ় নেশাচ্ছন্ন অনর্গলতার জায়গা, যেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ আওয়াজও সংগীতের মতো, যেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্রিয়াও নাচের মতো" [পৃ. ৬]? না কি এ শুধুই পল্লবিত আবেগ?

৭. ওই নাট্যরূপ উদ্ভব ও বিবর্তনের দিক থেকে কতটা 'বিশুদ্ধ' হবে?

এই যে শ্রীমিত্রের সংকল্পিত আদর্শ ভারতীয় নাট্য, তা কি বাইরে থেকে আদৌ কোনো প্রভাব গ্রহণ এবং স্বীকার করবে না? সমস্ত দিকের দরজা-জানালা বন্ধ করে কেবল এদেশে চালু এক বা একাধিক নাট্যরূপ থেকে তৈরি হবে? শম্ভু মিত্র নিশ্চয়ই এমন ইঙ্গিত করবেন না—তাঁর দীর্ঘদিনের নাট্যব্যবহারের সঙ্গে এই দ্বৈপায়নী মনোভাব তো খাপ খায় না। সে অর্থে কোনো 'জাতীয়' নাট্যরূপই কি বিশুদ্ধ? কাবুকির মৌলিক মঞ্চ-কল্পনা এবং কালো পোশাক-পরা 'অদৃশ্য' স্টেজ-হ্যাণ্ডদের আনাগোনার রীতি চীনা ক্লাসিক্যাল থিয়েটার থেকে নেওয়া। ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ হিন্দু ভারত থেকে গৃহীত। কমিউনিস্ট চীনের নতুন অপেরার কাহিনী ছাড়া আর প্রায় সবটাই বিদেশী—তবু কি তা 'বিজাতীয়'[১৬]? ব্রেশ্‌ট তাঁর ফের-ফ্রেমডুংক বা 'বিযুক্তীকরণ'-এর অধিকাংশ সূত্র পুরোনো চীনা অভিনয়রীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন[১৭], পিসকাটর তাঁর এপিক নাট্যের ভাবগত উৎস হিসেবে চীনা ও ভারতীয় থিয়েটারের উল্লেখ করেছেন[১৮], নিজের প্রযোজনায় ব্যবহার করেছেন দৃশ্যান্তরের চীনা নাট্যরীতি[১৯]। এঁরা কি

জাতীয়তা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন তার দ্বারা? আরো নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন কিছু কিছু উন্মাদ নাট্যপ্রতিভা। ফরাসি জাক কোপো (Jaques Copeau) জাপানি নো নাটক রিহার্সাল করেছেন কিছু দিন—শুধু এই কারণে যে, "আমাদের জানত সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ নাট্যরূপ এটাই"[২০]। ওই দেশেরই আঁতোনেঁ্যা আর্তো (Antonin Artaud) তাঁর 'সৌর' ও 'চান্দ্র' নাট্য-সংস্কার নির্মাণের জন্য একদিকে ছুটে গেছেন মেক্সিকোতে—তারাহুমারাস উপজাতির কৃষ্ণসূর্যের উপাসনা-উৎসব দেখতে; অন্যদিকে খোলা রেখেছেন পুবের দরজা—জাপানের কাবুকির প্রেক্ষাগার কিংবা বলিদ্বীপের নৃত্যাভিনয়ে অঙ্গসঞ্চালনের অপরূপ লাবণ্য তাঁর নাট্যবোধে পাকাপাকি আস্তানা নিয়েছে[২১]। রুশিয়ার উন্মাদ দৈত্য মায়ারহোল্‌ড চীনের ক্লাসিক্যাল নাট্য, কাবুকি আর কথাকলির মধ্যে নাট্যের 'এসেন্স' বা মূলবস্তু আছে বলে মনে করতেন[২২]। আর ঠিক একই অন্বেষণ থেকে পোলাণ্ডের গ্রোটাউস্কি তাঁর ল্যাবরেটরি থিয়েটারে 'শকুন্তলা' অভিনয় করেছেন। তাঁর পরিষ্কার কথা—"পুবদেশী থিয়েটার বিশেষ করে পিকিং অপেরা, ভারতীয় কথাকলি, জাপানি নো—এ সবের শিক্ষণ পদ্ধতি আমার কাছে অতিশয় প্রেরণাদায়ক"[২৩]। আর রবীন্দ্রনাথ? তিনিও কি কেবল সংকীর্ণ অর্থে ভারতীয়? ইয়োরোপের নাটকে রূপক-প্রতীকের ঐতিহ্য না তৈরি হলে তাঁর নাটকে তা আসত কোথেকে?

এত সব কথা শুধু এইজন্যই বলা যে, কোনো 'জাতীয়' নাট্যকলা কেবল তার ঐতিহ্যাগত সাংস্কৃতিক পরম্পরা থেকে বস্তু, অলংকার ও প্রকরণ জোগাড় করে গড়ে উঠতে পারে না, তাকে হাত পাততেই হয় বাইরে। নিতে হয় অন্য সংস্কৃতির ঋণ, অন্য সভ্যতার সহায়তা। যা আমরা 'ভারতীয়' চিত্রকলা বা সংগীতকলা রূপে জানি, তাও তো বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্রভাবে 'ভারতীয়' নয়। অথচ কালক্রমে সে সবের মধ্যে একটি ভারতীয় চরিত্র অসন্দিগ্ধভাবে ফুটে উঠেছে। ফলে নাট্যকলার বিশিষ্ট ভারতীয় রূপ রচনার কোনো প্রোগ্রাম যখন আমরা হাতে নেব, তখন কি আমরা খুঁজব কেবল ভারতীয় উত্তরাধিকার? খুঁজতেই হবে—এমন কথা শ্রীমিত্র অন্তত এক জায়গায় বলেছেন। "পাণ্ডুলিপি"-তে গরিব দেশের মানুষের অভিমান নিয়ে শ্রীমিত্র বলছেন, "আমরা আমাদের ভারতীয়ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো যেন না ভুলি" [২]। "আমরা অনুকরণ করব না 'উন্নত' দেশ-গুলোর। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বন্ধক দেব না, নতুন Madison Avenue তৈরি করব না" [১]।

৮. 'জাতীয়' মানে কি জাতির সকলের কাছে স্বীকৃত ও গৃহীত ?

তা যদি হয়, 'জাতীয়' নাটক যদি কেবল এক সাংস্কৃতিক উৎস থেকেই শরীর প্রাণ ও প্রেরণা আহরণ করতে চায়, তাহলে অনেক 'জাতীয়' নাট্যরূপকেই বিশুদ্ধ জাতীয়তার সেই অহংকার বিসর্জন দিতে হয়। ধরা যাক জাপানের কাবুকি—যা শ্রীমিত্রের বিশেষণ অনুযায়ী একটি জাতীয় নাট্যকলা। জাপানের আধুনিক নাটক তাঁর কাছে তেমন সম্ভ্রম পায়নি[২৪]। এখন এই কাবুকি বা নো সম্বন্ধে আধুনিক জাপানের, কোরীয় যুদ্ধের উপলক্ষ্যে মার্কিনি ডলারে শাঁসালো হয়ে ওঠা, শিল্পে বাণিজ্যে দর্পী জাপানের আধুনিক থিয়েটারকর্মীর মনোভাব কী ? যে পত্রিকায় শ্রীমিত্রের ইংরেজি প্রবন্ধটি পেয়েছি তাতেই ছাপা হয়েছে চারজন জাপানির সাক্ষাৎকার। মিয়ামোতা কেন্, যিনি নাট্যকার, তাঁর উক্তি—"কাবুকি ধরনের জিনিসগুলো দু-চক্ষে দেখতে পারি না আমি"। কেন ? না, যতই নিখুঁত হোক তা, "তা এখন রক্ষা করছে এমন সব লোক যারা তাকে সৃষ্টি করেনি"[২৫]। নাট্যাভিনেত্রী সেকি হিরোকো-র কথা—"কাবুকি আমাদের কাছে মূলত একটা অচেনা জিনিস"[২৬]। নাট্যপরিচালক সুজুকি তাদাশি : "স্বীকার করতেই হবে যে, আমি কাবুকির অভিনয় দেখেছি খুব কম···কাবুকির কাছে আমি বিদেশী বললেই হয়"[২৭]। যদি কেউ বলেন, এ তো জাপানের আধুনিক নাট্যকর্মীদের কথা—যারা পশ্চিমি নাট্যমায়ায় মুগ্ধ—এ কি জাপানের সমগ্র জাতির কথা ? সে ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকাতেই ডেভিড গুডম্যানের দেওয়া কাবুকির অর্থনীতি-সংক্রান্ত খবরগুলি যাচাই করে দেখা যাক। তা থেকে জানতে পারি, বছর বছর কাবুকির দর্শক-সংখ্যা বাড়ছে নেহাৎ জন সংখ্যা বাড়ছে বলে, কিন্তু নাট্যরস পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তা দেখতে যাচ্ছে ক্রমশ কম লোক। টিকিট বিক্রির টাকার চেয়ে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তার উপর কাবুকির নির্ভর ক্রমশ বেড়ে চলেছে, আর কাবুকি দেখা অনেকাংশে ঐতিহ্যপূজা ও রিচুয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে[২৮]। আমি এখানে-ওখানে বেশ কয়েকজন চমৎকার জাপানির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের অধিকাংশই একবারের বেশি কাবুকি দেখেননি। ১৯৭৯-এর নভেম্বরে টোকিয়োর ন্যাশনাল থিয়েটারে কাবুকি দেখার দিনে আমার সঙ্গী ছিলেন তিরিশ বছরের জাপানি ছাত্র নাওকি নিশিওকা। ওই তাঁর প্রথম কাবুকি দেখা। বিদেশীদের কাবুকি বা নো ভালো লাগার নানা কারণ আছে—কিন্তু বিদেশে প্রতিদিন, বা সপ্তাহে চারবার কাবুকি দেখানো সম্ভব হবে কি ? একটা নাট্যকলা যদি কোনো দেশের জ্যান্ত

থিয়েটারের অন্তর্গত না হতে পারে, তাহলে জাতীয় থিয়েটার হলেই বা তার লাভ কী, আর "জগতে সম্মান লাভ করা"-তে তার কীই-বা এসে যায়।

কাবুকি বা নো জাদুঘরের শিল্প, তা বলছি না। তবু কাবুকি, নো বা কথাকলিকে একটা দেশের 'জাতীয়' থিয়েটার হিসেবে আগাপাশতলা মেনে নেওয়ায় বেশ ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি এই যে, কাবুকি কথাকলির মুদ্রাবদ্ধ সুনির্দিষ্ট নাট্যভাষার ফলে অদীক্ষিতের কাছে তা কিয়দংশে দুর্বোধ্য থেকেই যায়। তাছাড়া এগুলির উপাদান ও রেপার্টরিও সীমাবদ্ধ—কাবুকিতে (নতুন কাবুকি কমেডি ছাড়া) জাপানি বীরযুগ এবং কথাকলিতে রামায়ণ-মহাভারতের পট-ভূমিকা ছাড়া আর কোনো গল্প নেই। ফলে দেশের সব স্তরের মানুষের কাছে সে সব এখনও পৌঁছোয় না, ভবিষ্যতে হয় তো আরো কম পৌঁছোবে। যেখানে কাবুকি বা কথাকলি অদীক্ষিতেরও ভালো লাগে সেখানে মুদ্রা ও নিয়মকে অতিক্রম করে তা জীবন্ত থিয়েটার বলেই ভালো লাগে, 'জাতীয়' থিয়েটার বলে নয়। কথাকলিতে পৌরাণিক ছাঁচের মধ্যেই পশ্চিমি ন্যাচারালিজমের কিছু কিছু সংস্কারের ছোঁয়াচ যখন দেখি, তখন তা ভালোই লাগে, তার জাত গেল বলে আতঙ্কিত বোধ করার কোনো কারণ দেখি না। যেমন, কীচকবধে ভীম দড়ির মতো পাকানো চাদরে কীচকের গলা এঁটে তাতে একটু একটু করে টান লাগাচ্ছে, আর কীচক হাত পা আছড়াতে আছড়াতে দমবন্ধ হওয়ার ফ্যাঁসফ্যাঁসে আওয়াজ করছে প্রত্যেকটি টানের সঙ্গে। টানে বাঁধন যত এঁটে বসছে, ততই আওয়াজ ক্রমশ ক্ষীণ এবং সূক্ষ্ম হচ্ছে। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ধরে ব্যাপারটা চলতে থাকায় যে-টেনশন তৈরি হয় তার তুলনা খুব কম। কিংবা অন্যত্র, যেখানে ভীম দুঃশাসনের নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করছে, তার অভিঘাত হয় সাঙ্ঘাতিক। এ তো "লীলা" নয়! মুদ্রাশাসিত দূরত্বের মধ্য থেকেই কথাকলি দুর্ধর্ষ থিয়েটার হয়ে মানুষের কাছে কখনো কখনো পৌঁছোয়, যেমন পৌঁছোয় ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ ব্যালে। কিন্তু তাই বলে তারা কি আধুনিক মানুষের সর্বক্ষণের বিচিত্র পিপাসা মেটাতে পারে? সে ক্ষমতা তাদের কোথায়?

৯. শেষের কথা

তাহলে কী করা? 'জাতীয়' নাট্যরূপ কি আদৌ চাই না? আমার মনে হয় আসল কথাটা 'জাতীয়' 'বিজাতীয়' নাটক নিয়ে নয়, আসল কথাটা

অন্য ধরনের থিয়েটারের। এই গরিব দেশের জন্যে চাই এমন একটি নাট্যরূপ যাতে স্বাধীনতা অনেক বেশি, যাতে উপকরণ ও মুদ্রা মেনে চলার দায় কম। এ ফর্ম প্রাচীন এবং নতুনকে একই সঙ্গে চেহারা দিতে পারবে, গ্রহণ-বর্জনে হবে উদার। তার অভিনয়ে লীলায়ন বা স্টাইলাইজেশন আসবে দরকারমতো, আবার সরল দৈনন্দিন সম্ভাষণও থাকবে। শুধু রাজা বা এলিটদের খুশির জন্য এ নাট্য নয়, সব গোষ্ঠী সব অবস্থানের জন্য। লোকনাট্য ছাড়া এমন থিয়েটার আর কোথায়? শ্রীমিত্র নিজেই তো বলেছেন, "লোকনাট্য জীবন্ত, মুদ্রা জীবন্ত নয়"[২৯]। হবীব তনবীর তো লোকনাট্যের সম্বল নিয়েই হইচই ফেলে দিয়েছেন, বাংলাতেও দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানা হে' থেকে অন্য থিয়েটারের 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' পর্যন্ত লোকনাট্যের উপাদানের চমৎকার ব্যবহার হয়েছে এর মধ্যে। সেই লোকনাট্যের কাছেই হাত পাততে হবে। বাংলার যাত্রা এইরকম একটি ফ্রেম, যার মধ্যে যে-কোনো জিনিস ঢেলে দেওয়া যায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে প্রায়ই "যাত্রায় ফিরে যাওয়া"র[৩০] কথা বলতেন, তা ওই অবাধ স্বাধীনতারই জন্য। কলকাতার এখনকার যাত্রার যে বীভৎসতা তার জন্য যাত্রার সচল, জীবন্ত ও নমনীয় ফ্রেমকে দায়ী করা ঠিক নয়। ১৯৭৬-এ একটি অমুদ্রিত ইংরেজি প্রবন্ধে[৩১] আমি 'অফ-চিৎপুর' (Off Chitpore) যাত্রার একটি ঐতিহ্য তৈরি করার কথা বলেছিলাম, সে কাজে এখন কোমর বেঁধে লাগা যেতে পারে। এতে ভারতীয় চেহারা সহজেই ফুটে উঠবে যদি এখনকার সংলাপের পীড়াদায়ক নাটকীয়তা ও আধিক্য কমিয়ে আনা যায়, কথায় আরিস্ততলীয় আনাগ্নরিসিস বা আকস্মিক উদ্‌ঘাটনের চমক ছেঁটে দেওয়া হয়, গান জুড়ে দেওয়া যায়, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ নাচের ঐতিহ্য থেকে চালচলন ধার করা যায়, মাইম ঢোকানো যায় একটু। এইভাবেই তাহলে তৈরি হবে ভাগ্‌নার বা অ্যাডলফ আপ্পিয়ার নয়, এই গরিব দেশের নিজস্ব 'টোটাল থিয়েটার'।

এ কাজ শুরু হয়নি, তা নয়। অচেতন হলেও, বিচ্ছিন্ন চেষ্টা এর মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে। নাটকের ফর্মে সারল্য, প্রত্যক্ষতা ও সচলতা আনবার প্রয়াস বাদল সরকার করছেন তাঁর সাম্প্রতিক প্রযোজনাগুলিতে। তাঁর 'তৃতীয় থিয়েটার'-এর সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামই আছে। শুধু বাদল সরকার কেন, সচেতন থিয়েটারের সমস্ত ছোট বড় দলই তাদের প্রযোজনায় নানা সরলতা আনার চেষ্টা করেছেন। বলবার কথাকে আরো তীব্র করার চেষ্টার অনুষঙ্গ হিসেবে সন্ধানটা সম্ভবত চলছে আরো মূল থিয়েটারের, আরো নির্বিশেষ থিয়েটারের। শুধু

রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথে নয়, লোকনাট্যের সিংহদ্বার দিয়েই সেখানে পৌঁছোতে হয়। 'বিভাব'-এর লেখক-প্রযোজক-অভিনেতা-পরিচালক শম্ভু মিত্র এ কথা আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন। এখনকার বাক্স-স্টেজের দেয়াল ভেঙে সেই আদ্য ও ধাতুগত থিয়েটারই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। তাতে বিদেশী প্রভাব আসুক না। আমরা আমাদের বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে সেই থিয়েটার যদি নিজেরা তৈরি করতে পারি, তাহলে তা আপনা থেকেই 'জাতীয়' বা 'ভারতীয়' হয়ে উঠবে—একমাত্র রবীন্দ্রনাটকের সংকীর্ণ মডেল ধরবার প্রয়োজনও হবে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি লোকনাট্যের কাছে প্রচুর দায়বদ্ধ নন? শ্রীমিত্র নিজে যেমন এবিষয়ে আরেকটু ভেবে আমাদের নতুন নির্দেশ দেবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি, তেমনি বাংলা বা ভারতবর্ষের নাট্যকর্মীরাও নিশ্চয়ই ভাববেন, কিসে আসবে থিয়েটারের আরও বেশি স্বাধীনতা, আরও ব্যাপ্তি ও সচলতা।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. "একটি অন্বেষণ" ১৩৭২, দ্রষ্টব্য 'প্রসঙ্গ : নাট্য', ১৯৭১, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ. ১০২। ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে হায়দরাবাদের 'রবীন্দ্র-ভারতী'তে 'বিভাব' নাটকের অভিনয়ে ভূমিকা করবার সময়েও আমি তাঁকে এ প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যেতে শুনেছি। তাছাড়া তাঁর একটি প্রবন্ধের বাংলা পাণ্ডুলিপি—পরে যেটি ইংরেজি রূপে TDR-এ (নিচে দেখুন) প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল—বন্ধুবর শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অনুগ্রহ করে দেখতে দিয়েছেন। এতে শ্রীমিত্রের যুক্তিগুলি আরো শাণিত ও স্পষ্ট। উদ্ধৃতিসূত্রে এটিকে আমরা কেবল "পাণ্ডুলিপি" বলে উল্লেখ করব।

২. "Building from Tagore", 1969, in *The Drama Review* (সংক্ষেপে TDR) T50, Vol. 15, No. 3, Spring 1971, pp. 201-204. তুলনীয় "রাজার কথায়" (১৯৬৬), 'প্রসঙ্গ : নাট্য', পৃ. ১৬০-৬৭।

৩. "...a distinctive form of Indian theatrical expression." দ্র. "Building from Tagore," পূর্বোল্লেখ, p. 202. এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯৫৬-তেই তিনি ভারতের নিজস্ব নাট্যরূপের সম্ভাব্য

ধরনটি সম্বন্ধে একটা আঁচ করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৭২-এ তাঁর উক্তি "আমরা এখনও জানি না যে আমাদের নাট্যাভিনয়ের সেই বিশিষ্ট ভারতীয় রূপটি কী হবে" ("একটি অন্বেষণ")—একটু ধাঁধা লাগায়। ১৩৫৬-তে যেটা উপলব্ধি করলেন ১৩৭২-এ (১৯৬৪) সেটি সম্বন্ধে অনিশ্চয় বোধ করবেন কেন? নাকি এ একটা আলঙ্কারিক প্রশ্ন মাত্র?

৪. "আধুনিক বাংলা নাটক", 'দেশ', ২২ অক্টোবর ১৯৭৭, পৃ. ৪৯; এবং "সাম্প্রতিক থিয়েটার : শিকড় ও ডানা," 'দেশ', ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৫৩-৫৪।

৫. উপাচার্য সুরজিৎচন্দ্র সিংহকে লেখা ১৯৭৮-এর ৩০ জানুয়ারির পত্র। বহুরূপী ৫১ (জুন, ১৯৭৯)-তে বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত, পৃ. এগারো-বারো।

৬. "একটি অন্বেষণ", "রাজার কথায়", "আজকের বাংলা নাটকের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ"—'প্রসঙ্গ : নাট্য'-এর এই প্রবন্ধগুলি এবং "পাণ্ডুলিপি" দ্রষ্টব্য।

৭. 'প্রসঙ্গ : নাট্য', পৃ. ৯৮।

৮. ওই, পৃ. ১০৬।

৯. সুরেশ অবস্থীর 'Lila play's অবশ্য আলাদা, তা কেবল রামলীলা কৃষ্ণলীলা জাতীয় অপেরাধর্মী নাটকের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত। দ্র. *Seminar* 32, April 1962 (On Stage) "Folk Forms," p. 16.

১০. 'প্রসঙ্গ : নাট্য', পৃ. ৯৮।

১১. ওই, পৃ. ৯৯।

১২. TDR, পূর্বোল্লেখ, p. 202.

১৩. ওই, p. 203. "I would like to develop another kind of Drama, which has a single central character who discovers life through a conflict with everything around him. In action-oriented drama we are outsiders watching others' behaviour through an imaginary wall. In the more contemplative "Indian" drama that I propose, we come closer to the character and more into his subjective world."

১৪. দ্র. আশু বন্দ্যাচার্য, 'ভারতীয় থিয়েটার' ১৯৭৫, অরুণ মিত্রের বঙ্গানুবাদ,

নয়া দিল্লী, ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, পৃ. 2. তবে এখানে ভারতীয় থিয়েটার সংস্কৃত নাটকের চেয়ে প্রাচীনতর বলেও ঐতিহ্য হিসাবে তার বেঁচে থাকার জন্য রঙ্গাচার্য কৃতিত্ব দিয়েছেন ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'কে (পৃ. 24)।

১৫. আর্থার উইলিয়াম রাইডারের অনুবাদকে কেঁটেছেঁটে আধুনিক প্রযোজনার উপযোগী ছিমছাম চেহারা দিয়েছিলেন অ্যাগ্‌নেস মরগ্যান। তাঁর এবং আইরিন লিউইসন (Lewisohn)-এর যুগ্ম পরিচালনায় এটি অভিনীত হয়। দ্র. *The Little Clay Cart,* 1934, New York, Theatre Arts, Inc. ১৯২৪-২৫-এর সিজনের প্রথম নাটক হিসেবে ৫ই ডিসেম্বর প্রথম অভিনয় হয় এর—তা outstanding success বলে বইটির প্রথম ফ্ল্যাপে জানানো হয়েছে।

১৬. বিশেষ করে পিকিং অপেরার 'দ রেড ডিট্যাচমেন্ট অব উইমেন', 'টেকিং টাইগার মাউনটেন বাই স্ট্র্যাটেজি', 'শাচিয়াপাং', 'দ রেড ল্যান্টার্ন' ইত্যাদি অপেরাগুলির কথা ভেবে একথা বলছি। মাদাম মাও-এর সাম্প্রতিক ক্ষমতাচ্যুতির পর এগুলি 'বিজাতীয়' বলে গণ্য হবে কিনা জানি না। দ্র. Snow, Lois Wheeler, *China on Stage,* 1972, New York, Random House.

১৭. দ্র. "Alienation Effects in Chinese Acting" in Willet, John, *Brecht on Theatre,* 1964, London, Methuen & Co., pp. 91-99.

১৮. Ley-Piscator, Maria. *The Piscator Experiment,* 1967, London etc., Feffer & Simons, Inc., p. 9.

১৯. ঐ, p. 229. 'Le Aristocrat'-এর প্রযোজনা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২০. Roose-Evans, James, *Experimental Theatre,* 1970, New York, Avon, p. 73.

২১. 'Occident'-এর নাট্যরীতি ও জীবনবোধের সঙ্গে 'Orient'-এর অনুরূপ ব্যাপারগুলির তুলনা আরতো তাঁর *The Theatre and its Double* বইতে (মেরি ক্যারোলিন রিচার্ডস-এর অনুবাদ, ১৯৫৮, Grove Press, New York) বহুবার করেছেন। ভাষাকে অতিক্রম করে প্রাচ্য নাট্যকলার মতো ইঙ্গিত-ভঙ্গিমায় যেতে হবে, কারণ তা ভাবকে আরো স্পষ্ট করে দেয় (p. 118-19); আত্মাকে দেখাতে হবে 'ভিন্ন মন্ত্রের'

মতো উচ্চারণ করে (p. 135) ইত্যাদি। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, Sellin, Eric, *The Dramatic Concepts of Antonin Artaud*, 1968, Chicago, University of Chicago Press.

২২. দ্র. *Experimental Theatre*, p. 39.

২৩. Grotowsky, Jerzy, *Towards a Poor Theatre*, 1968, New York, Simon and Schuster, p. 16. "Also particularly stimulating to me are the training techniques of oriental theatre—specifically the Peking Opera, Indian Kathakali and Japanese No theatre."

২৪. "জাপান আধুনিক থিয়েটার জগতে সম্মান লাভ করতে পারেনি"—'প্রসঙ্গ : নাট্য', ১৩৬ পৃষ্ঠা। এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতে দেখি ফবিয়ন বাওয়ার্সকে—"আধুনিক জাপানি থিয়েটারে এমন একটি সর্বজনীনতা ও বিস্তার আছে যে, অন্য যে-কোনো জায়গার থিয়েটারকে তা বহু পেছনে ফেলে যায়" ("···the modern theatre of Japan has an internationality and breadth about it that outstrips theatre anywhere else.") দ্র. Bowers, Faubion, *Theatre in the East*, 1956, New York, Grove Press, p. 322. এই লেখক নিজে জাপানি নাট্যকার তেরাইয়ামা-র 'The Knight of the Blue Castle.' নাটক দেখে অভিভূত হয়েছে।

২৫. "I utterly detest things like Kabuki...because I dislike things that are perfect but preserved now by people who did not create them." TDR, পূর্বোল্লেখ, p. 179.

২৬. ঐ, p. 181. "Kabuki is basically alien to us."

২৭. ঐ, p. 183. "I must admit that I have seen very few Kabuki productions...I am a foreigner to Kabuki."

২৮. ঐ, pp. 175-77.

২৯. 'প্রসঙ্গ : নাট্য', পৃ. ১০৬।

৩০. ঐ, পৃ. ১৬১।

৩১. হীনযান আন্তর্জাতিক সংখ্যার (অপ্রকাশিত) জন্য লেখা "The Theatre in Calcutta : Its Worries and Woes"।